মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

৫ম ভাগ] শ্রাবণ, ১৩১৬, আগষ্ট ১৯০৯। [১ম সংখ্যা।

প্রার্থনা।

বিশ্বজননি! নারীজাতি ও পুরুষজাতি উভয়েই তোমার সন্তান। উভয়ের প্রতি তোমার তুল্য স্নেহ প্রেম। কিন্তু উভয়ের প্রকৃতি তুমি ভিন্ন উপাদানে গঠিত করিয়াছ। নারী-প্রকৃতি কোমলতা প্রধান, তাহার স্নেহ প্রেমের মাধুর্য্যে সকলের মন আকৃষ্ট হয়। পুরুষ-প্রকৃতি দৃঢ়তা প্রধান। তাহার কার্য্যোদ্যম ও শ্রমশীলতা সকলের মনকে উৎসাহ ও উদ্যমে পূর্ণ করে। মা, প্রকৃতির এইরূপ ভিন্নতা জন্য তুমি উভয়ের জীবনের কার্য্যও ভিন্ন নির্দ্দিষ্ট করিয়াছ। তোমার কন্যা স্তন্যদানে সস্নেহ যত্নে শিশুসন্তানদিগকে লালনপালন করিবেন, তিনি সুমাতা হইবেন, তোমার এই প্রকার নির্দ্দেশ। তুমি ইচ্ছা কর যেন তাঁহাকে সেরূপ শিক্ষা দান করা হয়। যাহারা তাঁহাদের প্রকৃতির তারতম্যানুযায়িনী শিক্ষা দান না করিয়া পুরুষোচিত শিক্ষা দিয়া তাঁহাদিগকে পুরুষ-প্রকৃতি করিয়া তোলে, তাহারা তোমার নিকটে ঘোরতর অপরাধী। গৃহ কর্ম্মাদিতে নারীর কর্ত্তৃত্ব থাকে তোমার এইরূপ বিধি। তাঁহারা যেমন সুমাতা হইবেন তদ্রূপ গৃহ-কর্ম্ম নৈপুণ্যে সুগৃহিণী হইবেন তুমি এই-রূপ ইচ্ছা কর। যাহারা গৃহকর্ম্মাদি শিক্ষা না দিয়া কন্যাদিগের মন ভোগ বিলাস ও আলস্যের দিকে আকর্ষণ করে, তাহারা তাঁহাদের ভয়ানক শত্রু বলা যায়। তাহারা তোমার বিধির বিরুদ্ধাচারী। পতি-সেবা ও পতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রীতি শিক্ষা করিয়া প্রত্যেক কন্যাকে সুপত্নী হইতে হইবে। ইহাই তোমার আদেশ। মা, আমরা যেন আমাদের কন্যাগণ যাহাতে ভবিষ্যতে সুপত্নী হইতে পারেন তদ্রূপ শিক্ষা যত্নপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে দান করিতে পারি। তুমি এরূপ আশীর্ব্বাদ আমাদিগকে কর এবং শুভবুদ্ধি দান কর!

মহিলার পঞ্চদশবর্ষ বয়ঃক্রম।

মঙ্গলনিলয় পরমেশ্বরের কৃপায় নানা বিঘ্ন বিপদ অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান শ্রাবণ মাসে আমাদের প্রিয় মহিলা পঞ্চদশবর্ষে উপনীত হইলেন। যিনি প্রথম হইতে চতুর্দ্দশ বৎসরের অধিকাংশ সময় পর্য্যন্ত মহিলা যোগে বঙ্গীয়া মহিলাদিগের সেবা করিয়াছেন তিনি দীর্ঘকালব্যাপী কষ্টজনক শ্বাসকৃচ্ছ্র রোগে আক্রান্ত হওয়ায় তৎসম্পাদনে অক্ষম হইয়াছেন, অগত্যা তাহা সম্পাদনের ভার হস্তান্তরে ন্যস্ত করিয়াছেন। একটী সুযোগ্যা কন্যাও সম্পাদন কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিতেছেন। পূর্ব্বে মহিলা প্রতি মাসের শেষ মাসে প্রকাশিত হইত, পরে মহিলা নিয়মিতরূপে প্রতি মাসে প্রকাশিত হয় নাই। তাহা পরমাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের নিকটে প্রেরিত হইয়াছে। এক্ষণ যেরূপ ব্যবস্থা, অতঃপর আরো বিলম্বে প্রকাশ হওয়ার সম্ভাবনা। কেননা যিনি বিশেষ ভাবে মহিলা সম্পাদনের ভার গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাকে অন্য অনেক গুরুতর কার্য্য সম্পাদন করিতে হয়, এবং দূর হইতে প্রুফ ও কপি ইত্যাদি যোগাইতে হয়, সময় মত সেই সকল যোগান তাঁহার পক্ষে দুষ্কর। বর্ত্তমান বৎসর হইতে মহিলার কিছু কিছু পরিবর্ত্তন আবশ্যক হইয়াছে। এক্ষণ হইতে প্রথম পৃষ্ঠায় স্ত্রীনীতিসারের পরিবর্ত্তে একটী প্রার্থনা থাকিবে। গত মাসের মহিলাতেও প্রার্থনা প্রকাশিত হইয়াছে। কোন একটী বিশেষ কবিতাও প্রার্থনার পরে প্রকাশিত হইতে পারে। বঙ্গমহিলাদিগের কল্যাণোদ্দেশ্যে যে সকল নারী হিতৈষী বন্ধু প্রবন্ধাদী প্রদান করিয়াছেন, আশা করি তাঁহারা নিয়মিতরূপে সেইরূপ অনুগ্রহ প্রকাশ করিবেন। তাঁহাদের অনুগ্রহের উপর মহিলার উন্নতি ও জীবন রক্ষা নির্ভর করে। মনস্বিনী মহিলাগণ যেরূপ সুন্দর সুন্দর গদ্য পদ্য প্রবন্ধ প্রদান করিয়া মহিলাদিগের রচনা স্তম্ভটি পূর্ণ করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের নিকটে সেই অনুগ্রহ ভিক্ষা করি। মহিলা তাঁহাদেরই পত্রিকা তাঁহাদের সেবাতেই নিযুক্ত। তাঁহারা উপেক্ষা করিলে বিশেষ ক্ষতি। মহিলার বর্ত্তমান অবস্থা দেখিয়া আমরা জানি, অনেক পাঠক পাঠিকা বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছেন। যাহাতে উত্তমরূপে মহিলার কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে তজ্জন্য আমরা বিশেষ যত্ন করিব। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও গ্রাহক গ্রাহিকাদিগের অনুগ্রহ আমাদিগের সম্বল।

আকস্মিক ঘটনা ও সামান্য রোগাদির গৃহচিকিৎসা।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর।)

পূর্ব্বে উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হইয়াছি যে সেঁকো বিষ, লাইকর আর্সেনিকরূপে ঔষধে ব্যবহার হইয়া থাকে, ডাক্তারেরা উহা পুরাতন জ্বর এবং চর্ম্ম রোগাদিতে প্রয়োগ করিয়া থাকেন। উপযুক্ত কারণ-

বশতঃ কেহ কেহ লাইকর আর্সেনিক গৃহে রাখিয়া থাকেন, এবং তাহাতে অনিষ্টোৎপত্তি হইতেও দেখা যায়। লেখকের এরূপ একটী ঘটনা মনে আছে। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কোন স্থানে একটী ডেঃ মাজিষ্ট্রেটের বিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র, ডাক্তারের উপদেশানুসারে পুরাতন জ্বরের জন্য পাঁচ ফোঁটা করিয়া Liquor arsenic জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিতেন। একটী শিশিতে এক আউন্স পরিমাণ ঔষধ ...র কক্ষে রাখা ছিল। একদা তাঁহার ...টী শিশু ভ্রাতা কোনরূপে সে শিশিটী প্রাপ্ত হইয়া প্রায় অৰ্দ্ধেক ঔষধ পান করিয়া ফেলিয়াছিল, এবং কঠিনরূপে পীড়িত হইয়াছিল। এই ঔষধটীর দশ ফোঁটার অধিক পান করিলেই বিষের লক্ষণ উপস্থিত হইয়া থাকে।

লক্ষণ।—সেঁকো বিষ (সিমূলক্ষার বা white arsenic) ভক্ষণ করিবার অৰ্দ্ধ ঘণ্টা হইতে এক ঘণ্টার মধ্যে এবং কখন কখন তদপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যেই মুখে শুষ্কতা, পিপাসা এবং গলনলী ও পাকাশয়ে তীব্র জ্বালা ও বেদনানুভব হয়। উদরের উপরে চাপ দিলে বেদনা অসহ্য বোধ হয়। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই বমন আরম্ভ হয়। পাকাশয়ে যাহা কিছু থাকে তাহা সমুদায় উঠিয়া গেলে পর পিত্ত ও রক্তমিশ্রিত জলীয় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। উদ্গীর্ণ পদার্থ একটু বিশেষরূপে লক্ষ করিয়া দেখিলে কখন কখন উহার মধ্যে সেঁকো বিষের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শ্বেতবর্ণ কণিকা দেখিতে পাওয়া যায়। বমনের অব্যবহিত পরেই ভেদ আরম্ভ হয়। প্রথমে জল এবং পরে জলের ন্যায় তরল বাহ্যে হইতে থাকে। বাহ্যে হইবার সময়ে মলদ্বারে জ্বালা ও বেদনা অনুভব হয়, অনেক সময়ে বাহ্যের সহিত রক্তও নির্গত হয়। পাকাশয়ের বেদনা ক্রমশঃ সমস্ত উদরে ছড়াইয়া পড়ে, এবং হস্ত পদ ও উদরের মাংশপেশীতে আক্ষেপ উপস্থিত হয় বা "খাল ধরে"। এরূপে বারম্বার ভেদ ও বমন এবং আক্ষেপ ও বেদনা পীড়িত ব্যক্তি ক্রমে দুর্ব্বল ও নিস্তেজ হইয়া পড়ে, তাহার স্বর ক্ষীণ হয়, নাড়ী দুর্ব্বল, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হয়, চক্ষু কোটরস্থ এবং হস্ত পদের চর্ম্ম কুঞ্চিত ও নখ নীলবর্ণ হয়।

সেঁকো বিষের লক্ষণ এবং ওলাউঠার লক্ষণে দুই একটী বিষয়ে কিছু বিভিন্নতা আছে, তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক লক্ষ করা আবশ্যক। সেঁকো বিষ সেবনে পাকাশয়ে যে তীব্র জ্বালা ও বেদনা উৎপন্ন হয়, ওলাউঠাতে তাহা দেখা যায় না, এতদ্ভিন্ন ওলাউঠাতে মলদ্বারে জ্বালা বা বেদনা অনুভব হয় না এবং বাহ্যেতে রক্ত নির্গত হয় না। ওলাউঠাতে পেটের উপরে চাপিলে বেদনা বোধ হয় না।

প্রতীকার।—Dialysed iron নামে একটী ঔষধ আছে উহা সেঁকো বিষের আশু প্রতিষেধক। Dialysed iron এবং arsenic এই দুইটী দ্রব্য একত্রিত হইলে উহাদের রাসায়নিক সংযোগে একটী নূতন পদার্থের সৃষ্টি হয়, এই পদার্থটী

বিষ নহে, এজন্য arsenic সেবনের পর তৎক্ষণাৎ Dialysed iron সেবন করাইলে বিষের লক্ষণ বিদূরিত হয়। সেঁকো বিষ কেহ সেবন করিয়াছে তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারিলে চিকিৎসকের অপেক্ষা না করিয়া নিকটস্থ ডিস্‌পেন্সারি হইতে এক আউন্স পরিমাণ dialysed iron আনাইয়া তাহা সমান পরিমাণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া অবিলম্বে পান করাইয়া দিবে। তাহার পর অণ্ডের লালা এবং দুগ্ধ কিম্বা নারিকেল বা তিল তৈল কিম্বা তিল বা তিসি ভিজান জল কিম্বা ইসফগুল বা তোকমা জলে ভিজাইয়া খাইতে দিবে।

কাঠবিষ।—কাঠবিষ সচরাচর একোনাইট, (aconite) বলিয়া আমাদের নিকটে পরিচিত। ডাক্তারেরা উহা জ্বর এবং অন্যান্য রোগের জন্য সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা একটী ক্ষুদ্র বৃক্ষের মূল। এই মূল কিংবা ইহা হইতে প্রস্তত করা আরক (Tincture Acconite) সেবন করিয়া মৃত্যু হইতে দেখা যায়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে শুষ্ক মূলের চূর্ণ আটার সহিত মিশ্রিত করিয়া তদ্দ্বারা রুটী প্রস্তুত করতঃ তাহা খাওয়াইয়া নরহত্যা করিতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—কাঠবিষ সেবন করিবার অল্পক্ষণ পরেই ওষ্ঠে, মুখে জিহ্বাতে এবং গলনলী মধ্যে এক প্রকার "সুড়সুড়ী" অনুভূত হয় এবং কখন কখন বোধ হয় যেন অসংখ্য অসংখ্য সূচিদ্বারা ঐ সকল স্থান ন্যূনাধিকরূপে বিদ্ধ হইতেছে। এই সূচিবিদ্ধ নব্যভাব সময়ে সময়ে সমস্ত শরীরেও অনুভূত হয়। কিছুক্ষণ এইরূপ হইয়া পরে ঐ সকল স্থান এবং কখন সর্ব্বশরীর অসাড় হইয়া যায়। ইহার পর বিবমিষা এবং পাকাশয়ে জ্বালা এবং বেদনা অনুভব হয় এবং শীঘ্রই ভেদ ও বমন আরম্ভ হয়। বারম্বার ভেদ ও বমনের পর ক্রমশঃ দুর্ব্বলতা এবং অবসাদের লক্ষণ উপস্থিত হয়, বক্ষে অত্যন্ত ভার বোধ হয় এবং নিশ্বাসে কষ্ট হয়, কিছু গলাধঃকরণ করিবার শক্তি থাকে না। অকস্মাৎ নিশ্বাস রোধ হইয়া মৃত্যু হয়।

প্রতীকার।—যথেষ্টরূপে বমন করান গরম চা বা কাফি পান করান শায়িত অবস্থাতে রাখা, এবং শরীর যাহাতে শীঘ্র শীতল হইয়া না যায় এরূপ ব্যবস্থা করা।

করবি ও কলিকা ফুলের মূল।

কখন কখন আত্মহত্যা করিবার জন্য করবি বা কলিকা ফুলের মূল ব্যবহার করিতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—করবি এবং কলিকা ফুলের মূলে একই প্রকার বিষ অবস্থান করে এবং উভয়েরই লক্ষণ একই প্রকার; যথা,—পাকাশয়ে দারুণ জ্বালা এবং বেদনা, বমন, মুখের মাংসপেশীতে আক্ষেপ, গলাধঃকরণ করিবার অক্ষমতা, নিশ্বাসের কষ্ট, শেষ অচৈতন্য।

প্রতীকার।—গরম জলাদি পান করাইয়া যথেষ্টরূপে বমন করান, শয়ান অবস্থায় রাখা গরম চা বা কাফি, এবং নাড়ী

ক্ষীণ হইয়া আসিলে মধ্যে মধ্যে ব্রাণ্ডি পান করান।

তারপিন।

অনেক সময়ে আমাদের গৃহে তারপিন থাকে, এবং ভ্রমক্রমে উহা পান করিয়া কখন কখন কঠিনরূপে পীড়িত হইতেও দেখা গিয়াছে।

লক্ষণ।—মুখে তারপিনের গন্ধ পাওয়া যায়। প্রথমে এক প্রকার নেশার ভাব উপস্থিত হয়, পরে অচৈতন্য—অচৈতন্য অবস্থায় নিশ্বাসে ঘড়্ ঘড়্ শব্দ হয়। মধ্যে মধ্যে মুখের ও হস্তের মাংসপেশীতে আক্ষেপ হয়। ঘন ঘন প্রস্রাব ত্যাগ করিবার ইচ্ছা হয় এবং উহা অতি অল্প পরিমাণেও কষ্টের সহিত নির্গত হয়। সময়ে সময়ে একেবারে প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়।

প্রতীকার।—প্রথমে বমন করাইবে, পরে এক আউন্স সল্ট (Salt) যাহা ডিসপেন্সরিতে Sulphate of Magnesia or Epsom Salt নামে বিক্রি হয় অর্দ্ধ গ্লাস (জলপান করিবার গ্লাস) ঈষদুষ্ণ জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করাইয়া দিবে। পরে ডিম্বের লালা ও দুগ্ধ, তিল বা তিসির জল, ইসফগুল, তোকমা ইত্যাদি খাইতে দিবে।

ফস্ফরস্।

মহিলার পাঠিকাগণের মধ্যে বোধ হয় সকলেই অবগত আছেন যে বিলাতী দিয়াসলাইর কাটিতে যে জ্বলনীয় পদার্থটী লাগান থাকে, যাহা ঘর্ষণ করিলে দিয়াসলাই জ্বলিয়া উঠে তাহা ফস্ফরস্ সংযোগে নির্ম্মিত হইয়া থাকে। এইজন্য সময়ে সময়ে শিশুদিগকে দিয়াসলাইর কাটি চুষিয়া ফস্ফরসের বিষলক্ষণাক্রান্ত হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—মুখে রসুনের গন্ধের ন্যায় এক প্রকার গন্ধ পাওয়া যায়। অন্ধকারে দেখিলে ওষ্ঠে সামান্য আলোকের আভা দৃষ্টিগোচর হয়। অধিকমাত্রা ফস্ফরস সেবন করিলে পেটে জ্বালা এবং বেদনানুভব হয় এবং বমন হয়। দুই চারিটী দিয়াসলাইর কাটি চুষিলেও বমন হইয়া থাকে। বমনে পরিত্যক্ত পদার্থ অন্ধকারে লইয়া গিয়া দেখিলে তাহা ঈষদুজ্জ্বলা দেখায়।

প্রতীকার।—অধিক পরিমাণ ফস্ফরস্ সেবন না করিলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না এবং কোন চিকিৎসারও প্রয়োজন হয় না। শিশুরা দিয়াসালাইয়ের কাটি চুষিয়া প্রায়ই বমন করে এবং তাহাতেই অসুখ সারিয়া যায়, তাহা যদি না হয় তবে অবিলম্বে চিকিৎসকের সাহায্য গ্রহণ করিবে।

কেরোসিন।

কেরোসিন আজকাল সকল গৃহেই থাকে, সময়ে সময়ে উহা পান করিয়া শিশুদিগকে কঠিনরূপে পীড়িত হইতে দেখা যায়, ইহাতে মৃত্যু হইতেও দেখা গিয়াছে।

লক্ষণ।—মুখে কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া যায়। অধিক মাত্রা পান করিলে

মুখে ও গলনলীতে ও পাকাশয়ে জ্বালা অনুভব হয়, ভেদ ও বমন হয়, এবং পিপাসা বোধ হয়। ভেদ ও বমনে নির্গত পদার্থে কেরোসিনের গন্ধ পাওয়া যায়, এবং তাহাতে তৈলবৎ পদার্থ দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ শিশু দুর্ব্বল ও অচেতন হইয়া পড়ে, এই অচৈতন্য শেষ মৃত্যুতে পরিণত হয়।

প্রতীকার।—প্রথমেই ঈষদুষ্ণ গরম জল পান করাইয়া যথেষ্টরূপে বমন করাইবে। নাড়ী ক্ষীণ, শরীর শীতল এবং অচৈতন্যের ভাব দেখিলে একটু ব্রাণ্ডি উষ্ণ জলের সহিত পান করাইবে, এবং শরীরের উত্তাপ যাহাতে রক্ষিত হয়, তাহার চেষ্টা করিবে।

কর্পূর।

অধিক পরিমাণ কর্পূর খাইয়াও শিশুদিগকে পীড়িত হইতে দেখা যায়।

লক্ষণ।—মুখে কর্পূরের গন্ধ পাওয়া যায়। মুখে ও মস্তকে এবং কখন কখন সর্ব্বশরীরে জ্বালা বোধ হয়। মাথা ঘোরে, এবং কখন কখন মুর্চ্ছাও হয়। কোন কোন শিশুর ফিট্ বা Convulsion হইতে দেখা যায়। জ্বালার পর শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হয়, নাড়ী দুর্ব্বল হইতে থাকে এবং নিশ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া কষ্টজনক হয়, ক্রমশঃ অচৈতন্য উপস্থিত হয়, এবং শিশু গভীর নিদ্রাভিভূতের ন্যায় পড়িয়া থাকে। কর্পূর সেবনে ভেদ বা বমন হয় না এবং পেটেও বেদনানুভব হয় না।

প্রতীকার। রাই বা লবণ মিশ্রিত গরম জল পান করাইয়া বমন করান। মাথায় পর্য্যায়ক্রমে শীতল ও ঈষদুষ্ণ জলের ধারা দেওয়া। শরীরের উত্তাপ রক্ষা করা।

ম্যাজিণ্টা।

একদা একটী ভদ্রলোক লালকালী প্রস্তুত করিবার জন্য কাগজের পুরিয়া করিয়া কিছু ম্যাজিণ্টারচূর্ণ গৃহে আনিয়া রাখিয়াছিলেন, তাঁহার দুই বৎসরের কন্যা তাহা কোনরূপে প্রাপ্ত হইয়া প্রায় সমস্তটাই গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিয়াছিল, এবং অবিলম্বে কঠিনরূপে পীড়িতা হইয়াছিল। লেখক ইহার পূর্ব্বে এরূপ ঘটনা কখন দেখেন নাই, পরেও দেখেন নাই। এরূপ ঘটনা নিতান্ত বিরল হইলেও অঘটনীয় নহে। বালিকার পিতা গৃহে ছিলেন না, মাতা বালিকার মুখে, ওষ্ঠে, জিহ্বায় ম্যাজিণ্টার রং দেখিতে পাইয়া তাহা ধুইয়া দিবার চেষ্টা করিতে করিতে বালিকা কয়েকবার বমন করিয়া নিস্তেজ ও নিদ্রাচ্ছন্নবৎ হইয়া পড়িল। এইরূপ অবস্থা দেখিয়া তিনি লেখকের নিকটে সংবাদ পাঠাইলেন। লেখক গিয়া দেখিলেন বালিকা অচেতন, নাড়ী অতি সামান্য মাত্র অনুভূত হইতেছে, শরীর শীতল ও ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে এবং নিশ্বাস কষ্টের সহিত সম্পন্ন হইতেছে। তিনি উত্তেজক ঔষধাদি প্রয়োগ করিয়া এবং মস্তকে শীতল জল সিঞ্চন করিয়া বালিকার চৈতন্য উৎপাদন করিতে চেষ্টা করিলেন, ইতিমধ্যে বালিকা আর একবার প্রচুর পরিমাণে বমন করিল, এবং তৎপরেই

ক্রমশঃ সুস্থ হইয়া উঠিল। বলা বাহুল্য যে এস্থলে স্বাভাবিক বমনই ইহার জীবন রক্ষার প্রধান উপায় হইয়াছিল। ম্যাজিণ্টা যে একটী মারাত্মক বিষ তাহা পাঠিকাগণের গোচর করাই এই ঘটনাটী উল্লেখ করিবার প্রধান উদ্দেশ্য। এই দ্রব্যটী যে গৃহে শিশু আছে সে গৃহে সাবধানে রাখা উচিত।

সিন্দুর।

সিন্দুর প্রায় সকল গৃহেই থাকে, ইহাও একটী তীব্র বিষ। শিশুদের হস্তে যাহাতে ইহা কখন না পড়ে তৎসম্বন্ধে সাবধান থাকা উচিত।

লক্ষণ।—কোন শিশু সিন্দূর খাইয়া ফেলিলে তাহার ওষ্ঠে, মুখে ও জিহ্বাতে অবশ্য উহার রং দেখিতে পাওয়া যাইবে। সামান্য পরিমাণ খাইলে বিশেষ কিছু ক্ষতি হয় না, স্বভাবতঃ দুই একবার বমন হইয়া তাহা উঠিয়া যায়। অধিক পরিমাণ খাইলে, মুখের অভ্যন্তর হইতে পাকাশয় পর্য্যন্ত বেদনা হয়, এবং ভেদ ও বমন হয়। ভেদ ও বমনে নির্গত পদার্থে সিন্দূর ও রক্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সময়ে সময়ে মলদ্বারে অত্যন্ত বেদনা হয়।

প্রতীকার।—অণ্ডের লালা জলের সহিত মিশ্রিত করিয়া কিম্বা ময়দা জলে গুলিয়া পান করাইবে, তৎপরে দুগ্ধ ও চুণের জল সমান ভাগে মিশ্রিত করিয়া মধ্যে মধ্যে পান করিতে দিবে।

কোকেইন।

উপরিলিখিত মাদক দ্রব্যটী সম্প্রতি আমাদের দেশে প্রচলিত হইয়াছে। মদ্য ও অহিফেন ইত্যাদির ন্যায় ইহাও প্রতিদিন ব্যবহার অনেকের অভ্যাস হইয়া উঠিয়াছে। ইহা সচরাচর পানের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অনেকদিন, যে কোন নেশার দ্রব্য ক্রমশঃ বর্দ্ধিত পরিমাণে সেবন করিতে করিতে মানুষের যে অবস্থা হয়, কোকেইন সেবনেও তাহাই হইয়া থাকে, এবং অন্যান্য নেশার দ্রব্যের ন্যায় একেবারে অধিক মাত্রা সেবন করিলে ইহাতেও বিষের লক্ষণ উৎপন্ন হয় এবং মৃত্যু ও ঘটে।

লক্ষণ।—অধিক মাত্রা কোকেইন সেবন করিলে অন্যান্য মাদক দ্রব্য সেবনের ন্যায় প্রথমে উত্তেজনা ও উল্লাসের ভাব উপস্থিত হয়, পরে শিরঃপীড়া মস্তকে অসাধারণ ভারবোধ ঘূর্ণা এবং কখন কখন বা মূর্চ্ছা হয়। উত্তেজনার অবস্থাতে শরীরের উত্তাপ এবং নাড়ীর গতি বর্দ্ধিত হয়, মুখে শুষ্কতা এবং পিপাসা অনুভব হয়। এই সমুদায় লক্ষণের পর ক্রমে অবসাদের ভাব উপস্থিত হয়। নাড়ী ক্ষীণ ও শরীর শীতল হইতে থাকে, কখন কখন ফিট্ হয় এবং হস্ত পদাদী অসাড় হইয়া যায়, পরে অচৈতন্য ও মৃত্যু হয়।

প্রতীকার।—উত্তেজনার অবস্থাতে মস্তকে শীতল জলের ধারা দিবে, এবং বমন করাইবে। অবসাদের অবস্থাতে যাহাতে নাড়ী দুর্ব্বল এবং শরীর শীতল হইয়া না যায় তাহার চেষ্টা করিবে। মধ্যে মধ্যে ব্রাণ্ডি ও গরম জল পান করাইবে।

দেবী জগন্মোহিনী।

জন্ম—২৮শে ডিসেম্বর ১৮৪৭।

স্বর্গারোহণ—১লা মার্চ্চ ১৮৯৮।

(ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী কর্ত্তৃক রচিত।)

"এই শরীর পড়িয়া রহিবে, জড় জগতে মিশিবে, পৃথিবীর দ্রব্য পৃথিবীতে রহিবে, অমরাত্মা ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইবে, নিশ্চয়ই যাইবে।"

কি সুন্দর কথা!! কেমন আশা এবং উৎসাহ-পূর্ণ বাক্য!! "অমরাত্মা ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইবে, নিশ্চয়ই যাইবে।" ইহা অমরাত্মার স্বর্গারোহণের কথা। কে এই কথা বলিয়াছেন? কে ইহা লিখিয়াছেন? যিনি স্বর্গারোহণ করিয়াছেন, যে অমরাত্মা পৃথিবীর দ্রব্য নশ্বর শরীর পৃথিবীতে রাখিয়া ঊর্দ্ধে অর্থাৎ স্বর্গে উঠিয়া গিয়াছেন তিনিই এই দিব্য কথা বলিয়া গিয়াছেন। এই সুন্দর কথা তিনি কোথায় পাইয়া ছলেন? ইহা কি কোন পুস্তকের কথা? কোন পুস্তকে তো এই কথা নাই। এই অমৃতমাখা অমরত্বের কথা তিনি কাহার কাছে শিখিয়াছিলেন? ইহা কি তিনি কাহার মুখে শুনিয়াছিলেন? তিনি কি মৈত্রেয়ীর ন্যায় তাঁহার পতির নিকটে এই অমৃতত্বের কথা শুনিয়াছিলেন? রাজর্ষি জনকের কুলগুরু মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের সহধর্ম্মিণী মৈত্রেয়ী পতিকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "হে ভগবন্, যদি ধনেতে পরিপূর্ণ এই সমুদয় পৃথিবী আমার হয়, তবে তদ্দারা কি আমি অমর হইতে পারি? পতি বলিলেন, "না, ধন দ্বারা অমৃতত্ব লাভের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী বলিলেন, "যদ্দারা আমি অমর হইতে না পারি, তাহা লইয়া কি করিব?" যাজ্ঞবল্ক্য স্পষ্টরূপে বলিয়াছিলেন, "যাঁহারা ব্রহ্মকে জানেন তাঁহারাই অমর হয়েন। যে ব্যক্তি ব্রহ্মকে না জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়, সে কৃপাপাত্র অতি দীন। আর যিনি ব্রহ্মকে জানিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হয়েন তিনিই ব্রাহ্মণ।" যিনি "অমরাত্মা ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইবে, নিশ্চয়ই যাইবে" এই কথা বলিয়াছিলেন কিম্বা লিখিয়াছিলেন তিনি ব্রহ্মকে জানিয়া পরলোকে গিয়াছেন, সুতরাং মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাক্যানুসারে তিনি অমৃতের অধিকারিণী হইয়াছেন। ইনি আপনার প্রিয়তম পতির নিকটে প্রচুররূপে ব্রহ্মতত্ত্ব, আত্ম-তত্ত্ব, এবং পরলোক-তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহার এই কথাটী শিক্ষিত কথার মত মনে হয় না। "এই শরীর পড়িয়া রহিবে, জড় জগতে মিশিবে, পৃথিবীর দ্রব্য পৃথিবীতে রহিবে, অমরাত্মা ঊর্দ্ধে উঠিয়া যাইবে, নিশ্চয়ই যাইবে।" কি তেজের কথা! কি সুদৃঢ় বিশ্বাসের উক্তি! ইহা কোন ধর্ম্মগ্রন্থ কিম্বা সাধুর নিকটে শিক্ষিত দুর্ব্বল, নির্জীব কথা নহে। ইহা সর্ব্বশক্তিমান্ জীবন্ত ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নিঃশ্বাস, সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ। পরলোকে লইয়া যাইবার কিছুকাল পূর্ব্বে ব্রহ্ম স্বয়ং তাঁহার কন্যার আত্মার কর্ণে নীরবে সুরবে অমরত্বে বিশ্বাস-পূর্ণ এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়াছিলেন। ধন্য তাঁহারা যাঁহারা মনোনীত করিয়া এই মন্ত্রটী মা জগন্মোহি-

নীর নির্ম্মল, সুন্দর সমাধি-প্রস্তরে অঙ্কিত করিয়াছেন! এই ব্রহ্ম-বাণী দেবী জগন্মোহিনীর জীবনের—অনন্ত জীবনের কুঞ্চিকা। ইহা ব্যবহার করিলেই তাঁহার স্বর্গীয় জীবন রহস্য উদ্ঘাটিত হইবে। দেবী জগন্মোহিনীর প্রিয়তম পতি নববিধানাচার্য্য ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে যে সকল জলন্ত প্রত্যাদেশ পূর্ণ উপদেশ প্রদান করিতেন তাহার প্রথম কয়েকটী তাঁহার অনুজ শ্রীমৎ কৃষ্ণবিহারী সেন লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন। পরে তিনি অন্যান্য কার্য্যে নিযুক্ত হওয়াতে মন্দিরের উপদেশগুলি আর লিখিতে পারিতেন না। উপদেশগুলি লেখা হইত না বলিয়া শ্রীমদাচার্য্য একদা তাঁহার মনের গভীর ব্যথা প্রকাশ করেন। উক্ত উপদেশগুলি বর্ত্তমান লেখক দ্বারা লিপিবদ্ধ হইতেছে দেখিয়া শ্রীআচার্য্যদেব একদিন সহাস্যবদনে বলিলেন, "ইনিই এখনকার 'গণেশ' অর্থাৎ প্রত্যাদেশ-লেখক।" এই কথা শুনিয়া দেবী জগন্মোহিনী তাঁহার পুত্রকন্যাগণকে লেখককে "গণেশ দাদা" বলিয়া ডাকিতে শিখাইয়া দিলেন, এবং তিনি নিজে সর্ব্বদাই লেখককে "ছেলে" বলিয়া সম্বোধন করিতেন (যেহেতু তাঁহার শ্বশুরের নাম প্যারিমোহন)। "ধর্ম্মতত্ত্ব" পত্রিকায় প্রকাশ করিবার জন্য প্রার্থনাদি লেখকের হস্তে দিতেন। কয়েক বৎসর পরে সে সকল একত্র করিয়া একটী ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিতে লেখকের সঙ্কল্প হইল। লেখক মাতা জগন্মোহিনী দেবীকে উক্ত পুস্তকের কি নাম দেওয়া হইবে জিজ্ঞাসা করাতে দেবী প্রফুল্ল মনে বলিলেন, "উঁহাকে জিজ্ঞাসা করুন।" ভক্তিভাজন আচার্য্যদেব বলিলেন, "ভক্তি-কুসুম" এই নামে দেবীর প্রথম পুস্তক মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইল। আচার্য্যদেবের স্বর্গারোহণের পরে দেবী আচার্য্যের কতকগুলি প্রার্থনা পদ্যে অনুবাদ করেন। সে সকলও তিনি লেখকের হস্তে প্রদান করেন। লেখক কোন বিশেষ কারণে চট্টগ্রামে যাওয়ার পরে শ্রদ্ধাস্পদ প্রেরিত শ্রীযুক্ত ত্রৈলোক্যনাথ সান্যাল মহাশয় সে সকল প্রার্থনা "প্রেম কুসুম" নামে মুদ্রিত এবং প্রকাশিত করেন। ইহা দেবীর দ্বিতীয় পুস্তক। তাঁহার পরে সিংহলদ্বীপ দর্শন করিয়া, এবং হিমালয়ে অবস্থানের সময় যে সকল সুন্দর ভাবময় প্রবন্ধ এবং ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, সে সমস্তও পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবার জন্য লেখকের হস্তে দান করিয়াছিলেন। নানা কারণবশতঃ সে সমস্ত গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয় নাই। তাহার কতকগুলি "পরিচারিকায়" প্রকাশিত হইয়াছে। দেবী জগন্মোহিনী কোন বালিকা কিম্বা নারী বিদ্যালয়ে রীতিপূর্ব্বক শিক্ষা লাভ করেন নাই, অথচ কিরূপে তিনি অতি সুন্দর এবং স্বর্গীয় ভাবময় সঙ্গীত, কবিতা, এবং গদ্য প্রবন্ধাদি রচনা করিতেন ইহা চিন্তা করিলে মনে আশ্চর্য্য রসের সঞ্চার হয়। গভীররূপে আলোচনা করিলে ইহাই প্রতীত হয়, জগদ্বিখ্যাত প্রিয়তম পতির প্রতি পতিপ্রাণা সতী জগন্মোহিনী দেবীর নিগূঢ় অনুরাগই তাঁহার এই মান-

সিক উচ্ছ্বাসের কারণ। কমলকুটীরের অদূরে আপারসার্কুলার রোডের পূর্ব্ব দিকস্থ বৃহৎ বাটীতে (ইদানীং ভস্মিভূত) যখন "ভারতাশ্রম" ছিল, প্রতি শুক্রবার প্রাতে শ্রীমদাচার্য্য ব্রাহ্মিকাদিগের জন্য বিশেষ ভাবে উপাসনা করিতেন এবং উপদেশ দান করিতেন। বর্ত্তমান লেখক সে সকল উপদেশ লিপিবদ্ধ করিয়া "ব্রাহ্মিকাদিগের প্রতি উপদেশ" নামক পুস্তক মুদ্রিত করেন। অসুস্থতা প্রযুক্ত কিছুকালের জন্য শ্রীমদাচার্য্য তাঁহার কলুটোলা ভবনে গিয়া বাস করেন; যাইবার সময়ে এই লেখককে "ভারতাশ্রমে" প্রতি শুক্রবার প্রাতে ব্রাহ্মিকা-সমাজের উপাসনা করিতে অনুরোধ করিয়া যান। লেখকের অনুরোধে এক দিন মাতা জগন্মোহিনী দেবী উপাসনা করেন। আচার্য্যদেব যে ভাবে এবং যে প্রণালীতে উপাসনা করিতেন দেবী জগন্মোহিনীও ঠিক সেইরূপে উপাসনা করিলেন দেখিয়া লেখক এই সত্য হৃদয়ঙ্গম করিলেন যে দেবী জগন্মোহিনী সত্য সত্যই ব্রহ্মানন্দ আচার্য্যদেবের প্রিয়তমা এবং উপযুক্তা সহধর্ম্মিণী। দেবীর প্রতি ক্রমশঃ লেখকের আন্তরিক শ্রদ্ধা বাড়িতে লাগিল। কিছুকাল পরে মাতৃদেবী লেখককে সঙ্গে লইয়া ব্রহ্মকন্যাদিগের উপযোগী হয় এই ভাবে মধ্যে মধ্যে ব্রহ্মোপাসনা করিতেন। সেই ভাবের উপাসনা এবং নারীর পক্ষে নববিধানের আদর্শ চরিত্র আগামীবারে দেওয়া হইবে।

—

মেয়েদের আদান প্রদান।

এই সজীব জগতের মধ্যে কতকগুলি নিয়ম কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাই। তাহাদের মধ্যে প্রধান একটী, গ্রহণ ও দান। গ্রহণ ও দানেই জীবনের পূর্ণ বিকাশ বা পূর্ণতা হয়। যিনি অহঙ্কার করিয়া বলেন, আমি কাহারও নিকট ঋণী নই, এবং কাহাকেও দান করিয়া বাধিত করিতে চাহি না, তিনি ভ্রান্ত। কেহ কি একথা বলিতে পারেন, তিনি কাহারও নিকট ঋণী নন? কিম্বা কেহ কি কাহাকেও কিছু না দিয়া থাকিতে পারেন?

মনুষ্য জীবনকে দুই ভাগে বিভক্ত করিতে পারি, গ্রহণ ও দান। শিশু জন্মগ্রহণ করিয়া অবধি তাকে সকলের নিকট হইতে অবিশ্রান্ত লইতে হয়, শিখিতে হয়। সকলের সাহায্যে স্নেহ যত্নে তার জীবন রক্ষিত বর্দ্ধিত উন্নত হয়। পিতা মাতা, ভাই ভগিনী ও সমাজের নরনারীদের নিকট হইতে সকল শিক্ষা করে, বাক্য উচ্চারণ ব্যবহার রীতিনীতি সকলই শিক্ষা করে, সকলের নিকট হইতে লইয়া সে একটী মানুষ হয়। মানুষ শৈশবে যাহা শেখে, তাহাই সমস্ত জীবনের সম্বল। তারপরে বিদ্যালয়ে শিক্ষক সহপাঠী, সমাজে আচার্য্য উপদেষ্টা বন্ধু শুভাকাঙ্ক্ষী ইঁহাদের সকলের নিকট হইতে ক্রমাগত আরও কত গ্রহণ করে, তাহার ইয়ত্তা নাই। এইরূপে সকলের নিকট হইতে গ্রহণ করে, তবে সে একটী মানুষ হয়।

যখন সে মানুষ হয়, তখন সে জীবনের আর এক বিভাগে এসে পড়ল, জীবনের অপরার্দ্ধে উপনীত হইল। এখন শুধু গ্রহণ নয়, দান,—এতদিন গ্রহণ করিলে, এখন দেবার সময়। এসময় স্বার্থপর হইলে, কৃপণতা করিলে হইবে না। যেমন অবিরাম, অযাচিতভাবে অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে পাইয়াছ সেইরূপ দান করিতে হইবে। একবার যখন ভাবি, কত লোকের নিকট হতে কত পাইয়াছি, শিখিয়াছি, হায়, কেনা দিয়াছে, কাহার কাছে না শিখিয়াছি, (প্রতিবেশী হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবীর) কত দূর দেশের অজ্ঞাত অপরিচিত লোকের কত উপকার পাইয়াছি। কত দাস দাসী ভৃত্য পরিচারক, কত গ্রাম্য সরল কৃষক, কত শ্রমজীবি, কেনা আমাদের সেবা করিয়াছে। একবার এই জগতের বক্ষে আপনাকে স্থাপিত করে যদি ভাবি তখন বিস্মিত হই, দেখি, মণ্ডলাকারে চতুর্দ্দিকে সকল উপকারী বন্ধু দ্বারা আমি বেষ্টিত। কাহার দ্বারা না উপকৃত হইলাম, কি মহা দানসাগরের মধ্যে বাস করিতেছি, সকলের দানের সমষ্টি আমার জীবন।

অবাধে সকলের দান গ্রহণ করিতেছি, তারপর দান করিবার কথা কি মনে হয়? যে এত পাইয়া কিছু দান করিল না, তার গ্রহণও স্থায়ী হইল না, সম্পূর্ণ হইল না। বৃক্ষের সঙ্গে মানবজীবনের অনেক সাদৃশ্য আছে, বৃক্ষ জন্মগ্রহণ করিয়া মাটী বাতাস হইতে আহার গ্রহণ করিল, গ্রহণ করিয়া আপনার উন্নতি পুষ্টি সাধন করিল। তার পরেই দান আরম্ভ হইল, ফুল ফল বীজ দান করিল! যে গাছ ফল ফুল না দেয় তাহা নিরর্থক, তাহাকে বিনাশ করা হয়। প্রথমতঃ নানা উপায়ে গ্রহণ করিয়া সংগ্রহ করিয়া পরে দান করা—আপনার যা কিছু সঞ্চয়, সম্বল, সারশক্তি দেহ প্রাণ সকলই দান করা তার জীবন। দান করে বৃক্ষের পূর্ণ বিকাশ হয়। দান করা তার জীবনের এক অংশ, তাহা বিনা জীবন অসম্পূর্ণ থাকে। তেমনি দান করিলে আমাদেরও জীবন সম্পূর্ণ হয়, সার্থক সফল হয়। যে যাহা কিছু দেয়, সেইনামে সে পরিচিত, তাহারই জন্য তাহার আদর। চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রের দান করাই জীবন।

একবার যদি আমরা স্ব স্ব গৃহের চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখি, একবার যদি আমাদের আহার পান সুখ সুবিধার দিকে চাহিয়া দেখি, কি দেখি, কিছুই আমার পরিশ্রম-লব্ধ বস্তু নয়। কত অগণ্য নরনারীর সেবা যত্ন পরিশ্রম বুদ্ধি শক্তি গ্রহণ করিতে হইয়াছে। গৃহ দ্বার অন্ন বস্ত্র সকলই অন্যের দান—তাহা কি ভুলেও একবার মনে স্থান দি। সকলই অন্যের প্রদত্ত,—না অজ্ঞানতা অহঙ্কারে মুগ্ধ হয়ে বলি "আমিত অর্থ দ্বারা এ সমুদায় ক্রয় করিয়াছি।" কাহারও কোন পরিশ্রম বা সেবার জন্য যদি অর্থ দান করি তাহা হইলেই কি সব দেওয়া হইল? না, সে যে উপকার করিল, তাহা অমূল্য, তাহার ঋণ পরিশোধে অসমর্থ। দরিদ্র কৃষকেরা কত পরিশ্রম করিয়া কত রৌদ্র বৃষ্টি সহ্য করিয়া শস্য উৎপাদন করিল, আমরা অর্থ

দ্বারা ক্রয় করিয়া তাহার সম্পূর্ণ অধিকারী হইলাম তাহার নিকট ঋণ মুক্ত হইলাম। হয়তো সে নিজে উদর পুরিয়া আহার পাইল না, সে নিজে না খাইয়া আমাকে খাওয়াইল, আমি তার জন্য কি করিলাম। অকৃতজ্ঞ আমরা, জ্ঞান সভ্যতার অভিমানে স্ফীত আমরা, আমাদের ধিক! সেই দরিদ্র কৃষকদের অনাহার দুর্দশা অজ্ঞানতার কথা ভাবিলে চক্ষে জল আসে তাদের প্রতি অবিচার অত্যাচারের কথা ভাবিলে, মুখ হেঁট হয়। তাই বলি, ভগিনীগণ জাগো, সেই তোমাদের জীবন-রক্ষক দরিদ্র কৃষকদের অনাহার দুঃখ দুরবস্থা অজ্ঞানতা হইতে রক্ষা করিতে অগ্রসর হও, বদ্ধপরিকর হও। সে প্রতিদিন, নিয়মিত তোমার ক্ষুধার অন্ন আনিয়া যোগাইতেছে, তুমি তার কি করিলে, সেতো তাহার কাজ করিল, সে তোমাকে তার সম্পদ যা তাহা দান করিল, তুমি তাকে কি দিলে? পৃথিবীতে পরস্পরের সহায়তায় পরস্পরের জীবনরক্ষা, সকলে সকলের অভাব পূর্ণ করে। পৃথিবীর অন্যান্য জাতি, সমাজের রক্ষক এই দলের জন্য কত কি করিল তাহাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিল কত নির্দোষ আমোদ আহ্লাদের ব্যবস্থা করিল। আমরা কি করিলাম, তাহাদের জ্ঞানের উন্নতির পথ কই পরিষ্কার করিলাম। তাই বলি ভগিনীগণ আমরাতো গ্রহণ করিলাম, কিন্তু কি দান করিলাম। যার যা জিনিষ আছে, তাহা সে অন্যকে দিতে বাধ্য।

যে গ্রহণ ও দান উভয়ই করে সেই যথার্থ জীবিত। আমরা যে বাল্যকালে শিখিয়াছিলাম, "যতই করিবে দান তত যাবে বেড়ে" একথাটা খুবই সত্য। দান করিলেই গ্রহণ করিবার ক্ষমতা বাড়ে, তুমি যদি দান না কর, তোমার গ্রহণ করা কঠিন। তোমার বিদ্যা থাকে বিদ্যা দান কর, তোমার আরও বিদ্যার প্রয়োজন হইবে, আরও বিদ্যালাভ করিবার ইচ্ছা হইবে। ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিজ্ঞান চিত্রবিদ্যা সঙ্গীত, যাহাই বল না কেন, তুমি যদি তাহা বিতরণ কর, সেই বিতরণই তোমার উচ্চতর অধিকতর জ্ঞানলাভের কারণ হইবে। এইরূপে গ্রহণ তৎসঙ্গে দান, ইহাই উন্নতিশীল মানবের জীবন, ইহার কোনদিন বিরাম হইবে না, অনন্ত জীবনই এইরূপ চলিবে। গ্রহণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে দানের দায়িত্ব হয়। গ্রহণ করারও অন্ত নাই, দান করারও শান্তি নাই।

অতিপূর্ব্ব কালে, মানব জাতি যে প্রকারে পরস্পরের অভাব পূর্ণ করিত তাহাই স্বাভাবিক ও হিতকারী। এখন কোনও দ্রব্যের আবশ্যক হইলে, বাজারে গিয়া দ্রব্যের মূল্য স্বরূপ কিছু অর্থ দিয়া, তাহা লইয়া আসি, ক্রেতা অর্থ দিয়া ঋণ মুক্ত, বিক্রেতা অর্থ পাইয়া সন্তুষ্ট। মুদ্রা প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে সমাজে এই ব্যবস্থা ছিল, যে শস্য উৎপন্ন করিল, তাহার বস্ত্রের প্রয়োজন সে আর এক ব্যক্তির নিকট গেল, যে বস্ত্র বয়ন করিয়াছে, কিন্তু শস্য উৎপন্ন করে নাই, তখন পরস্পরের অর্জ্জিত বস্তুর বিনিময় করিয়া পরস্পর

অভাব মোচন করিল। সমাজে তাই দেখিতে পাই, একজন মানুষের কত শত রকমের অভাব, কত শত বস্তুর প্রয়োজন, কিন্তু সে নিজে কেবল এক প্রকার বস্তুর অধিকারী। তাহার কি করিতে হইবে, নিজের যা আছে, তাহা অন্য সকলকে দান করিতে হইবে, ও নিজের অন্যান্য শত অভাব সমাজের শত ব্যক্তির নিকট হইতে প্রাপ্ত বস্তুর দ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে। ইহাই যথার্থ মানব সমাজ। কিন্তু সকল লোকে সকল বস্তুতে এই নিয়ম পালিত হয় না। এখন অর্থ মধ্যবর্ত্তী হইয়া দাঁড়াইয়া কোন কোন বিষয় দানের পথ বন্ধ করিয়াছে। এখানে এই একটী কথাই আমার বিশেষরূপে মনে হইতেছে, তাহারই উল্লেখ করিতেছি। কৃষকেরা শস্য উৎপন্ন করিল, তারা তাহা জ্ঞানী বিদ্বানদের দান করিল, বিদ্বানেরা তাহাদের অর্জ্জিত বিদ্যা সেই কৃষকদিগকে দান করিল। তোমার উদরান্নের জন্য তুমি ত চাষ করিলে না, তোমার হইয়া চাষা উহা করিল, সেই প্রকার তাহার মনের আত্মার আহারের জন্য তোমার ব্যবস্থা করা উচিত।

শ্রাবণ মাসের প্রবাসীতে "আমেরিকার কৃষক ও মজুর" নামক একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। সে দেশের কৃষক ও আমাদের দেশের কৃষকে কত প্রভেদ! সুসভ্য আমিরেকা মহাদেশ, নিজদেশের কৃষকদের জীবনের কত উন্নতি করিয়াছে। তাহাদের শিক্ষার কত ব্যবস্থা, তাহাদের বাসগৃহ কত সুন্দর পরিষ্কার স্বাস্থ্যকর; বিজ্ঞানসম্মত কোন প্রকার সুখ সুবিধা হইতে তাহারা বঞ্চিত নয়। তাহারা বিজ্ঞানসম্মত উৎকৃষ্ট নূতনতম প্রনালীতে শস্য উৎপাদন করে। তাহাদের সন্তানগণ বিদ্যাশিক্ষা করিতেছে, পত্নীগণ বিদ্যালয়ে শিক্ষিত, তাহাদের গৃহে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তকালয় আছে, তাহারা সংবাদ পত্র পড়ে, নানা উপায়ে আপনাদের মনের উন্নতি করিতেছে, সঙ্গীত বাদ্য চিত্রবিদ্যা দ্বারা অবসর সময়ের সদ্ব্যবহার করিতেছে। ভগিনীগণ তাই বলিতেছি, এস একবার ভাবিয়া দেখি, আমরা এদেশে দরিদ্র শ্রমজীবী কৃষকদের জন্য কি করিতে পারি।

পুরীর বিশেষ দর্শনীয় বিষয় ও স্ত্রীস্বাধীনতা।

পুরীর দর্শনীয় বিষয়ের মধ্যে সর্ব্ব প্রধান দর্শনীয় বিষয় জগন্নাথবিগ্রহ। জগন্নাথ কতকাল হইল প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন নিশ্চয় বলা যায় না। প্রকাণ্ড প্রস্তর বিনির্ম্মিত মন্দিরে জগন্নাথদেব প্রতিষ্ঠিত। লোকে বলে পূর্ব্বে উহা বুদ্ধবিগ্রহ ছিল, হিন্দুরা পরে তাকে হিন্দুবিগ্রহ রূপে পরিণত করিয়াছে। জগন্নাথদেব প্রতি দ্বাদশ বৎসরান্তে একবার নূতন কলেবর ধারণ করেন, এবং প্রতি বৎসর একবার করিয়া তাঁর অঙ্গরাগ করা হয়। জগন্নাথের রূপের বর্ণনা আর কি করিব, অনেকে জগন্নাথের পটেতেই তাহা দর্শন করিয়াছেন। এই জগন্নাথ দর্শনের আকাঙ্ক্ষায়

বহুদূর দূরান্তর দেশ হইতে যাত্রিকগণ আসিয়া থাকেন। গুজরাট, বোম্বে, পঞ্জাব, মান্দ্রাজ প্রভৃতি দূরদেশ হইতে বহুকষ্টে বহু অর্থ ব্যয় করিয়া বৎসর বৎসর আষাঢ় মাসের রথের সময় নরনারীগণ দলে দলে এই পুরীধামে উপস্থিত হইয়া থাকেন। রথযাত্রার সময় লক্ষ লক্ষ লোক একত্র হয়। কত কত স্ত্রীলোক শিশুসন্তান ক্রোড়ে করিয়া মনের আগ্রহে উপস্থিত হন। ইঁহারা যে প্রকার আগ্রহ ও ব্যাকুলতাসহ জগন্নাথ দর্শনের জন্য উপস্থিত হন, দেখিলে অবাক্ হইতে হয়। এবার নাকি রথযাত্রার সময় দেড়লক্ষ যাত্রিক উপস্থিত হইয়াছিলেন। জগন্নাথদেবের একটি বিশেষ মাহাত্ম্য যে, এখানে প্রসাদ ভক্ষণে কোন জাতি বিচার নাই। ব্রাহ্মণ চণ্ডাল এখানে একত্র প্রসাদ ভক্ষণ করিতেছেন। ব্রাহ্মণের মুখে চণ্ডালে অন্ন তুলিয়া দিতেছে, ইহাতে কোন দ্বৈধ ভাব নাই। ইহাতে কেহ ঘৃণা বা বিদ্বেষ করিতে পারেন না। ভারতে এই এক অপূর্ব্ব দৃশ্য। আনন্দবাজার বলিয়া একটি বাজার আছে, তাহাতে সর্ব্বদা অন্ন ব্যঞ্জন বিক্রয় হইতেছে। যার ইচ্ছা সে ক্রয় করিতেছে, কোন বাধা নাই। কেবল হিন্দু ব্যতীত অপর জাতির তথায় প্রবেশাধিকার নাই। হিন্দুদের যে এত জাত বিচারের কঠিন শাসন, জগন্নাথদেবের প্রভাবে এখানে তাহা একবারে বিনষ্ট হইয়াছে। এই প্রসাদ আবার নিষ্ঠাবতী হিন্দুমহিলাগণ আপনাদের জপমালার আধারের ভিতর পুরিয়া রাখেন এবং সন্ধ্যা আহ্নিকের পর তাহার এক এক কণিকা মাত্র ভক্ষণ করিয়া আপনাদিগকে পবিত্র মনে করেন। এই প্রসাদ জগন্নাথদেবের ভোগের শুষ্ক অন্নমাত্র। জগন্নাথদেব একটি দারুময় মূর্ত্তি। জগন্নাথ বলরাম ও সুভদ্রা এই তিন বিগ্রহ মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত। রথযাত্রার সময় এই তিন দেবতার জন্য তিন খানা প্রকাণ্ড রথ প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহাতে এই তিন দেবতা আরোহণ করিয়া অর্দ্ধ মাইল দূরে গুণ্ডিচাবাড়ীতে যাইয়া কয়েকদিন অবস্থিতি করেন। আবার নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজমন্দিরে আনীত হইয়া থাকেন। সেই রথযাত্রার সময় হাজার হাজার স্ত্রীলোক পুরুষ রথ ভক্তিসহকারে টানিয়া লইয়া যান। আবার প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় মন্দিরে যে জগন্নাথদেবের আরতি হয় তাহাতেও বহু স্ত্রী পুরুষ একত্র হইয়া, কত ভক্তিসহ প্রার্থনা স্তবস্তুতি করিয়া মনের আবেগে জগন্নাথ দর্শন করিয়া থাকেন। কতজন ভূমিষ্ঠ হইয়া গড়াগড়ি দিয়া অশ্রুপাত করেন, দেখিলে বাস্তবিক অভক্ত জনেরও মনে ভক্তির সঞ্চার হয়। কেহ চামর ব্যজন করিতেছে, কেহ দুবাহু তুলিয়া 'জয় জগন্নাথ জয় জগন্নাথ' বলিয়া স্তব করিতেছে, কেহ বা প্রার্থনা করিতেছে, আর আনন্দে বিহ্বল হইয়া কেহ কেহ বা নৃত্য করিতেছে। এই সকল অতি চমৎকার দৃশ্য।

কোন কোন ভক্তিমান হিন্দু গরিব দুঃখীদিগের জন্য প্রতিদিন প্রসাদ ক্রয় করিয়া বিতরণ করিতেছেন। পুরীর লোক অধিকাংশই গরিব, এই ভিক্ষায়ই

তাহাদের একমাত্র জীবনোপায়। জগন্নাথের মন্দিরটি অতি প্রকাণ্ড। শুনেছি, ১২০ হাত উচ্চ। ইহার গঠন পারিপাট্য ও অতি সুন্দর।

তারপর দ্বিতীয় দর্শনীয় বিষয় ভক্তির অবতার মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের সাধন স্থান প্রসিদ্ধ কাশীমিত্রের ভবন। যেস্থানে শ্রীগৌরাঙ্গদেব সাধন ভজন করিতেন, সেস্থানটীও একটি পবিত্র তীর্থস্থান। যেস্থানে বসিয়া সাধন করিতেন,. সে গৃহটির নাম "গম্ভীরা।" ইহা একটি ক্ষুদ্র মন্দির এবং অতি নির্জ্জন স্থান। সেখানে এখনও তাঁর ব্যবহারের ছিন্ন স্থার একখণ্ড অতি যত্নে কাচদ্বারা আবৃত বাক্স মধ্যে রাখা হইয়াছে। এবং তাঁর ব্যবহারের ভগ্ন মৃণ্ময় কড়ঙ্গ ও জীর্ণ কাষ্ঠ পাদুকা বর্ত্তমান রহিয়াছে। তাহা কত ভক্তির সহিত রক্ষিত হইয়াছে। কেহ দেখিতে চাহিলে বাবাজিরা পূতবস্ত্র পরিধান করতঃ তাহা দেখাইয়া থাকেন। আজ ৪০০ বৎসর অতীত হইল, শ্রীগৌরাঙ্গদেব বঙ্গদেশে নবদ্বীপধামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁর শেষ লীলাক্ষেত্র এই পুরুষোত্তমধাম। ২৪ বৎসর বয়সে তিনি সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়া অবশিষ্ট ২৪ বৎসরের অধিকাংশ সময় সেস্থানেই যাপন করিয়াছেন। তাঁহারই পবিত্র চরিত্রপ্রভাবে সেদেশের অনেক লোক বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। কাশীমিত্রের বাড়ীটি সমগ্র মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গদেবের নামে উৎসর্গ করা হইয়াছে। তথায় অনেকগুলি ভক্ত বৈষ্ণববাবাজি বাস করেন ও সাধন ভজন করিয়া জীবনকে সার্থক করিতেছেন। শ্রুত হওয়া গিয়াছে প্রায় ৬০ হাজার টাকার আয়ের সম্পত্তি সাধুসেবার জন্য নির্দ্ধারিত আছে। এই পুরীতেই শ্রীগৌরাঙ্গ লীলা শেষ করেন। সমুদ্র জলে ঝাঁপ দিয়া নাকি দেহত্যাগ করেন। তাঁর আর কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আর একটী দর্শনীয় বিষয় "সিদ্ধ বকুল।" এখানে ভক্তপ্রধান হরিদাস ঠাকুর প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম সাধন করিতেন। তিনি যে তরুমূলে বসিয়া সাধন করিতেন, সেই বৃক্ষের নামই "সিদ্ধ বকুল।" সেই বকুল বৃক্ষ এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার, চারি শত বৎসরের সেই বকুল বৃক্ষটি এখনও সজীব রহিয়াছে। এখনও ফুল ফুটে, নূতন পাতা উদ্গত হয়, কোটি কোটি পাতা গাছে পূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু গাছের ভিতরকার সার অংশ কিছুই নাই, কেবল বল্কলের উপরি গাছটি দণ্ডায়মান রহিয়াছে। এই হরিদাস ঠাকুর যবনকুলসম্ভূত। ইঁহার প্রথম সাধন স্থান শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়া গ্রাম। এখনও সেই স্থানটি পবিত্র ভূমিরূপে বর্ত্তমান রহিয়াছে। হরিদাস ঠাকুরের জীবনের শেষ সময় পুরীধামেই অবস্থিতি হয়, এবং সেখানেই তিনি দেহলীলা শেষ করেন। মহাপ্রভু স্বয়ং তাঁহার দেহের সৎকার করেন এবং ভক্ত গোষ্ঠী লইয়া মহাসংকীর্ত্তন করিয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও শ্রাদ্ধ কার্য্য সমাধা করেন। হরিদাস ঠাকুরের

সমাধিস্থান এখনও সমুদ্রকূলে বর্ত্তমান আছে।

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের বাড়ীও একটি দর্শনীয় বিষয়। কথিত আছে এই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য সপ্ত দিবস পর্য্যন্ত বেদান্ত শাস্ত্র পড়িয়া শ্রীগৌরাঙ্গদেবকে শুনাইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হাঁ কি না, সাত দিন পর্য্যন্ত কিছুই বলেন নাই। তৎপর ভট্টাচার্য্য মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি সাত দিন তোমাকে বেদান্ত শুনাইতেছি. কিন্তু তুমি হাঁ কি না কিছুই বলিতেছ না, ইহার তাৎপর্য্য কি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। তখন শ্রীগৌরাঙ্গ বলিলেন, তুমি যে শ্লোক পড় তাহা ত উত্তম বুঝিতেছি, কিন্তু ব্যাখ্যা দ্বারা বিপরীত অর্থ করিতেছ। মেঘ যেমন সূর্য্যকে আচ্ছাদন করে, তোমার ব্যাখ্যা সেইরূপ মূল অর্থকে আচ্ছাদন করিয়া ফেলিতেছে। তখন পণ্ডিত অবাক্ হইলেন এবং তাঁর অমৃতময় কথা শুনিয়া অদ্বৈতবাদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তির মর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শ্রীচৈতন্যের শিষ্যত্বস্বীকার করিলেন। সেই স্থানটি এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে। এক দিকে শ্রীগৌরাঙ্গের ছবি ও অন্য দিকে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের ছবি বর্ত্তমান। এই সকল দর্শন করিলে ভক্তদের বড়ই আনন্দ উথলিয়া উঠে।

তারপর দর্শনীয় বিষয় সমুদ্র। সমুদ্রের কথা আর বলিবার কি আছে? দিবা রাত্রি গভীর গর্জ্জনে কর্ণ বধীর হইতেছে। এই সাগরের গভীর গর্জ্জন ও আস্ফালনে সকলকে প্রমত্ত করিয়া তুলিতেছে। সাগরের বর্ণও এক এক সময় এক এক রূপ দেখা যায়। কখন গভীর ঘন কৃষ্ণবর্ণ কখনও সবুজ রঙ্গ, কখন বা ধূসর বর্ণ ধারণ করিয়া বিশ্বপতির বিচিত্র লীলা প্রকাশ করিতেছে। এমন প্রমত্ত নৃত্য আর কীর্ত্তন কে করিতে পারে। ইহাই ভারত মহাসাগর। ইহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কূল কিনারা কিছুই দেখা যায় না। কেবল অনন্ত জলরাশি ধূ ধূ করিতেছে। ইহার সঙ্গে আবার প্রমত্ত বায়ু প্রবাহিত হইয়া সাগরের আস্ফালনকে বৃদ্ধি করিয়া দিতেছে। সাগরের এই জলরাশি লবণাক্ত, কিন্তু স্বাস্থ্যকর। ওতে স্নানাবগাহন করিলে আরাম ও স্বাস্থ্যলাভ হয়, কিন্তু পান করিবার সাধ্য নাই। আবার এই জলে অসংখ্য জলজন্তু সব আনন্দে বিচরণ করিতেছে, খেলা করিতেছে. তাহাদের কোনই ক্লেশ বোধ হয় না। বিশ্বপতির বিচিত্র লীলা বুঝে কার সাধ্য। এই সমুদ্রই আমাদের জীবনোপায়ের জন্য শস্যাদি উৎপাদনের জন্য উপাদান প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, অনবরত বাষ্প উৎপন্ন হইতেছে, তাহা হইতে মেঘজাল উৎপন্ন হইতেছে, সেই সব মেঘ হইতে বারিধারা বর্ষিত হইয়া নদনদী পূর্ণ করিতেছে, এবং তদ্দ্বারা পৃথিবী ফল শস্যে পূর্ণ হইতেছে। পুরীর নিকট নৌকা কি অর্ণবযান তিষ্ঠিতে পারে না, ভয়ানক উত্তালতরঙ্গ। কিন্তু মান্দ্রাজ দেশীয় জলজীবিরা সামান্য দুই তিন খণ্ড কাষ্ঠ একত্র ভেলার আকারে বন্ধন করতঃ তাহাদ্বারা সেই সকল সমুদ্রতরঙ্গ উল্লঙ্ঘণ

পূর্ব্বক মৎস্যাদি শিকার করিয়া আনিয়া বিক্রয় করে। ইহাদের সাহস আশ্চর্য্য। পুরীর নিকটবর্ত্তী বালুখণ্ড নামক স্থানে গবর্ণমেণ্ট হইতে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়া কলিকাতা অঞ্চলের ধনী লোকেরা অনেকে সুন্দর সুন্দর ইষ্টক ও প্রস্তরময় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। অনেকে স্বাস্থ্য-লাভের জন্য পুরীতে আসিয়া সমুদ্রজলে স্নান ও সমুদ্র বায়ু সেবনে অনেক উপকার লাভ করেন। শরীর ও মনের স্ফূর্ত্তি লাভের পক্ষে পুরী বিশেষ অনুকূল স্থান।

তারপর তথাকার স্ত্রী স্বাধীনতার বিষয় উল্লেখযোগ্য। এখানকার স্ত্রী লোকেরা বঙ্গদেশীয় স্ত্রীলোকের মত এত অবগুণ্ঠনে আবৃতা নহেন। ভদ্র পরিবারের যুবতী কন্যা ও বধূগণ অপর পুরুষের সঙ্গে কথোপকথন করেন। ভদ্র পরিবারের মেয়েরাও প্রকাশ্যভাবে রাস্তায় অবাধে গমনাগমন করেন, তাহাতে বিশেষ কোন সঙ্কোচের চিহ্ন দেখা যায় না। জগন্নাথের মন্দিরে কি সমুদ্রতটে সর্ব্বদাই তথাকার স্থানীয় কি বিদেশীয় মহিলারা প্রকাশ্যভাবে বিচরণ করিতেছেন। বঙ্গ-দেশীয় মহিলারাও তথায় যাইয়া বিলক্ষণ স্বাধীনতা ভোগ করিয়া থাকেন। আর তথাকার শ্রমজীবী স্ত্রী পুরুষ উভয়েই সমান পরিশ্রম করিয়া থাকে। পুরুষেরা রোজ তিন আনা ও স্ত্রীলোকেরা দুই আনা পারিশ্রমিক লইয়া থাকে। ব্রহ্ম দেশীয় স্ত্রীলোকের মত এই সকল শ্রমজীবী অধিকাংশ স্ত্রীলোকেরা চুরটের ধূম পান করিয়া থাকে। তবে ব্রহ্মদেশের মত এত বড় চুরট প্রায় পুরীতে দৃষ্ট হয় না। আর কতকগুলি মান্দ্রাজী লোক তথায় বাস করে, তাহারা প্রায়ই ঘন কৃষ্ণবর্ণ। গৌরবর্ণ স্ত্রী পুরুষ পায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এদের ভাষাও এক স্বতন্ত্র রকমের, কিছুই বুঝা যায় না। পুরীর স্ত্রীলোকদের বস্ত্র পরিধান প্রণালী অতি কুৎসিৎ। আর কাংস পিত্তলাদি নির্ম্মিত হস্তভূষণ মণিবন্ধ হইতে ককোনি পর্য্যন্ত হস্তকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে।

হেলেন কেলার। *

উনবিংশ শতাব্দিতে দুইটী আশ্চর্য্য জীবন আমরা দেখিতে পাই। একজনের নাম সকলেই শুনেছেন, তাঁর নাম নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মত আশ্চর্য্য ক্ষমতাশালী পুরুষ শুধু উনবিংশ শতাব্দিতে কেন, জগতের কোন সময়ের ইতিহাসেই দেখিতে পাওয়া যায় না। ফরাসী বিপ্লবের সময় এঁর অভ্যুদয় হয়। ইনি সামান্য সৈনিক থেকে ক্রমে সমস্ত ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্রাট্ হ'য়েছিলেন। ইনি যে কত যুদ্ধ জয় ক'রেছেন, যুদ্ধের আগে ইনি যে কি রকম আশ্চর্য্য ক্ষমতায় চারিদিকের অবস্থা সমস্ত ধারণা ক'রে নিয়ে যুদ্ধের ফলাফল ঠিক ক'রে রাখতেন, চারিদিক দেখে সৈন্য সজ্জিত ক'রবার ইঁহার এমন আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল, যে অনেক যুদ্ধে

* মহিলাবিদ্যালয়ে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের বক্তৃতার সার।

প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সৈন্যদলকে ইনি অনেক অল্প সৈন্য দ্বারা পরাজিত ক'রতেন। ইংলণ্ড ছাড়া প্রায় সমস্ত ইউরোপকে এঁর কাছে বশ্যতা স্বীকার ক'রতে হ'য়েছিল। একদিকে এই যুদ্ধ জয় ও সাম্রাজ্যস্থাপন, আর একদিকে দেশের সকল রকম বিদ্যার, শিল্পের, উন্নতির জন্য ইনি নানা উপায় ক'রেছিলেন। একজন লোকের ভিতরে এত শক্তি;—এত অদ্ভুত রকমের শক্তি কোথা থেকে এল যখন আমরা ভাবি, অবাক হয়ে যেতে হয়। যেমন এই তাঁর করবার ক্ষমতা, তেমনি তাঁর আশ্চর্য্য আকর্ষণী শক্তি ছিল। লোকের মনকে তিনি আশ্চর্য্য রকমে বশ করতে পারতেন। যখন তিনি যুদ্ধযাত্রা ক'রতেন তখন তাঁর সৈন্যদের বরফের ভেতরে, ক্ষুধা তৃষ্ণায় কত কষ্ট সহ্য ক'রতে হ'ত, কিন্তু তাঁর মুখের দু চারিটী কথায় তারা সকল কষ্ট ভুলে গিয়ে নূতন উৎসাহে উত্তেজিত হ'য়ে উঠ্‌ত। তারপরে যখন তিনি পরাজিত হ'য়ে এল্‌বা দ্বীপে নির্ব্বাসিত হ'য়ে ৬ মাস পরে আবার সেখান থেকে গোপনে পলায়ন ক'রে ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হন তখন তাঁর সঙ্গে লোক বেশী ছিল না। তখন ফ্রান্সে পুরাণ রাজবংশেরই একজন রাজা হয়েছিলেন; তিনি নেপোলিয়নের আসবার সংবাদ পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অনেক সৈন্য পাঠালেন। যখন নেপোলিয়ন তাঁর দু চারিটী অনুচর নিয়ে প্যারিসের কাছে এসেছেন তখন রাজার সৈন্য এসে তাঁর গতিরোধ ক'রে দাঁড়াল। নেপোলিয়ন খালি তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ব'ললেন, দেখ আমার সঙ্গী কেহ নেই, এই আমি তোমাদের সাম্‌নে বুক পেতে দিয়ে দাঁড়ালাম, তোমাদের ইচ্ছা হয় তো আমাকে মারতে পার। এক সময়ে সেই সৈন্যদের মধ্যে অনেকে নেপোলিয়নের অধীনে কাজ ক'রেছে; আর আজ তাঁকে একাকী নিরস্ত্র তাদের সামনে দাঁড়াতে দেখে তাদের মধ্যে একটা অদ্ভুত ভাবের তরঙ্গ বয়ে গেল; তখন সেই হাজার হাজার সৈন্য আপনাদের অস্ত্র নামিয়ে নেপোলিয়নের অধীনতা স্বীকার ক'রে তাঁর পক্ষ অবলম্বন ক'রলে, আর নেপোলিয়ন তাদের চালিয়ে নিয়ে প্যারিসের অভিমুখে যেতে লাগলেন। যে সব সৈন্য তাঁকে পরাজিত করবার জন্য প্রেরিত হ'য়েছিল তারাই তাঁর অধীনে রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ক'রবার জন্য চলিল। সে রাজা তখন ফ্রান্স থেকে পালিয়ে কোন রকমে আত্মরক্ষা করেন;—পরে অবশ্য ইয়ুরোপের সমস্ত রাজশক্তি একত্রিত হ'য়ে নেপোলিয়নকে হারিয়ে দিয়ে সেণ্টহেলেনায় বন্দি করেন;—সে সব ইতিহাসের অনেক কথা। কিন্তু এঁর জীবনে আমরা দেখতে পাই কি রকম তাঁর আশ্চর্য্য ক্ষমতা ও প্রভাব ছিল।

উনবিংশ শতাব্দিতে এই একটী আশ্চর্য্য জীবন, আর একজন হচ্ছেন হেলেন কেলার; ইনি আঠার বছর বয়সের একটী বালিকা, (এখন ইনি উনত্রিশ বছরের) এবং ইনি অন্ধ, মূক, ও বধির। এখানে প্রশ্ন হ'তে পারে এই দুইটী

জীবনে তুলনা সম্ভব কিসে? কিন্তু হেলেন কেলারের জীবন আলোচনা ক'রলে আমরা দেখ্‌তে পাই যে এঁর জীবন কম আশ্চর্য্য নয়, কম ক্ষমতাশালী নয়। ইনি নিজে আপনার জীবনী লিখেছেন; এঁর ভাষা এত মিষ্ট, এত কবিত্বপূর্ণ, প্রকৃতির বর্ণনা, তুলনা, সব এত সুন্দর যে পড়লে মনে হয় না যে ইনি অন্ধ। একজন আঠার বছরের অন্ধ, মূক বধির বালিকার লেখা পড়ে আশ্চর্য্য হ'য়ে যেতে হয়। এঁর জীবন পড়ে বুঝা যায় কি অদ্ভুত এঁর ক্ষমতা, কি আশ্চর্য্য প্রতিভা; আর এঁর শিক্ষক মিস্ সালিভ্যানের প্রতিভাও আশ্চর্য্য, নতুবা এ রকম একজনকে শিক্ষা দেওয়া কম ক্ষমতার কথা নহে। মিস্ সালিভ্যান নিজে অন্ধ ছিলেন; অন্ধদের জন্য A Perkins Institution বলে একটী স্কুল আছে, তিনি প্রথমে সই স্কুলে শিক্ষালাভ করেন, তারপরে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসে। দৃষ্টি লাভ করে অন্ধদের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁর বড় আগ্রহ হয়, এবং হেলেন কেলারের নাম শুনে তাঁর শিক্ষাভার গ্রহণ করেন।

হেলেন কেলার জন্মাবধি অন্ধ ছিলেন না। এক বৎসর পর্য্যন্ত এঁর সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি খুব তীক্ষ্ণ ছিল; ছয়মাসে ইনি প্রথম কথা বলিতে শেখেন; Water, Tea, কথা ইনি প্রথম কথা বলিতে শেখেন; "How d' ye" মানে কেমন আছ এই কথাটীও বলতেন। দেড়বৎসর বয়সের সময় এঁর খুব কঠিন পীড়া হয়; ডাক্তারেরা সে রোগ ধরতে পারেননি। তারপরে হঠাৎ একদিন আপনি আপনি জ্বর ছেড়ে গিয়ে তাঁর সব অসুখ ভাল হয়ে যায়; কিন্তু সেই সঙ্গে তাঁর চোখের দৃষ্টি, কথা কইবার ক্ষমতা, শ্রবণ শক্তি সব চলে গেল। প্রথমে তাঁর বাপ মা বা ডাক্তারেরা এ কথা বুঝতে পারেন নি। কিন্তু হেলেন কেলার বলেন এই যে দেড় বছর এঁর সকল ইন্দ্রিয় তীক্ষ্ণ ছিল, সেই সময়ের স্মৃতি কিছু কিছু এঁর মনে ছিল; যেমন সেই ছয়মাসের সময় Water বলতে শিখেছিলেন,—হেলেন বলেন বাক্‌শক্তি চলে যাবার পরেও তিনি ঐ কথাটী বলতে চেষ্টা করতেন, কিন্তু স্পষ্ট কথাতো বেরুত না, শুধু Wah, Wah শব্দটী বেরুত। অনেক সময় দেখা যায় অন্ধ বোবারা প্রায় একটু বেশী দুষ্ট হয়। হেলেন কেলার নিজেই বলেন যে ইনি ছোটবেলায় খুব দুষ্ট এবং রাগী ছিলেন। একদিন তাঁর মা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকেছিলেন আর হেলেন বাইরে থেকে চাবি বন্ধ করে দিয়েছিলেন; বাড়ীর চাকরেরা তখন অন্যদিকে ছিল, কেউ তাঁর ডাক শুনতে পায়নি; হেলেন কেলার বলেন, মা যে ক্রমাগত দরজায় ধাক্কা দিচ্ছিলেন তাতে তাঁর ভারি আনন্দ হচ্ছিল, তিনি অবশ্য শব্দ কিছু শুনতে পান নি, কিন্তু দরজায় যে খুব একটা আঘাত পড়ছে সেটা অনুভব করতে পারছিলেন। তারপরে চাকরেরা তিন ঘণ্টা পরে এসে তাঁকে দরজা খুলে দেয়। তাঁর শিক্ষয়িত্রী মিস্ সালিভ্যানকেও তিনি ঘরে বন্ধ ক'রেছিলেন। এবং তার চাবি এমন জায়গায়

লুকিয়েছিলেন যে কেউ তা' খুঁজে বের করতে পারে নি; ছমাস পরে তিনি নিজে সেই চাবি বের ক'রে দেন। হেলেন বলেন যে ক্রমে তিনি যত বড় হতে লাগলেন তত তিনি বুঝতে পারতেন যে অন্য লোকদের সঙ্গে তাঁর অনেক প্রভেদ আছে। তাঁর কতক গুলি সঙ্কেত ছিল যা দিয়ে তিনি তাঁর মনের ভাব প্রকাশ করতেন,— যেমন হাঁ কি না বলতে হ'লে ঘাড় নেড়ে বলতেন, রুটী চাইতে হ'লে হাত দিয়ে রুটী কাটার নকল করতেন Ice cream খেতে ইচ্ছা হ'লে Ice creamএর কল ঘুরাবার নকল করিতেন এবং যেন খুব শীত হয়েছে এমনভাবে কাঁপতেন। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তিনি বুঝতে লাগলেন যে তাঁর মা এবং অন্য লোকেরা কিছু চাইতে হ'লে তাঁর মত ইঙ্গিত ক'রে জানায় না, কিন্তু মুখ দিয়া কথা কয়। ছুজন লোকের কথাবার্ত্তার সময় তিনি তাদের মধ্যে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে তাদের ঠোঁট নাড়া দেখতেন; কিন্তু তার মানে কিছু বুঝতে পারতেন না, তাদের মত ঠোঁট নাড়তে চেষ্টা করতেন, তাতে কোন ফল হ'ত না, শেষে ভয়ানক রেগে গিয়ে হাত পা ছুড়ে কাঁদতে আরম্ভ করতেন। তিনি বলেন তাঁর মনে হ'ত যেন চারিদিক থেকে তাঁকে কে ধরে রেখেছে, আপনাকে ছাড়িয়ে নেবার জন্যে জোর করতে ইচ্ছা হ'ত, কিন্তু জোর ক'রে ত ফল হ'ত না তাই কান্না আসত, রাগ আসত। ক্রমে এই আব্দার ও কান্না এত বেড়ে উঠ্‌ল তাঁর বাপ মা বুঝতে পারলেন যে তাঁকে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত দরকার। তাঁরা শুনেছিলেন তাঁদের মেয়ের মত Laura Bridgman ব'লে একটী মেয়ে বিদ্যা শিক্ষা ক'রেছিলেন। তিনি শুধু যে অন্ধ মূক বধির ছিলেন তা' নয়, তাঁর আবার ঘ্রাণশক্তি, স্বাদ গ্রহণ শক্তি ছিল না। কালা বোবারা ঘ্রাণশক্তি, স্পর্শশক্তি দিয়ে অনেক জিনিষ বুঝতে পারে, তাদের এই ইন্দ্রিয়গুলি খুব তীক্ষ্ণ হয় সকলেই জানেন। কিন্তু Laura Bridgman সকল ইন্দ্রিয়ের মধ্যে কেবল একটীর সাহায্যেই জগতের সঙ্গে পরিচয় ক'রতে পেরেছিলেন; তাঁর স্পর্শশক্তি খুব তীক্ষ্ণ ছিল।

হেলেন কেলারের যখন সাত বৎসর বয়স তখন তাঁর শিক্ষয়িত্রী তাঁদের বাড়ীতে আসেন। Perkins Institution ব'লে যে অন্ধবিদ্যালয়ের কথা বলা হ'য়েছে সেইখান থেকে তাঁকে আনান হয়। মিস্ সালিভ্যান আসবার পরদিন থেকেই হেলেনকে শেখাতে আরম্ভ ক'রলেন। অন্ধবিদ্যালয়ের ছেলে মেয়েরা হেলেনের জন্যে তাঁর কাছে একটী পুঁতুল দিয়েছিল। মিস্ সালিভ্যান সেই পুঁতুলটী হেলেনের হাতে দিয়ে তাঁর অন্য হাতে doll কথাটী লিখতে লাগলেন। অবশ্য এ লেখার মানে হেলেন কিছু বুঝলেন না, শুধু তাঁর হাতে একটা সুড়সুড়ীর মত একটা অনুভূতি হ'ল। হেলেন তার মানে কিছু না বুঝলেও তাঁর অনুকরণ করতে লাগলেন। তারপরে মিস্ সালিভ্যান Mug Water এই ছুটী কথা শেখাতে লাগলেন;

কিন্তু কিছুতেই দুটী জিনিসের প্রভেদ তাঁকে বোঝাতে পারলেন না। সে দিন বিকালে তিনি হেলেনকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছেন সেই সময় সেখানে একটী কল থেকে জল প'ড়ছিল; মিস সালিভ্যান হেলেনের হাত ধ'রে সেই কলের তলায় পেতে দিলেন এবং অন্য হাতে লিখলেন Water। তখনি হেলেনের মনে এই কথাটী আলোকের মতন প্রবেশ ক'রল যে এই যে জিনিসটী ঠাণ্ডা, তরল, এর নাম হ'চ্ছে Water;—অবশ্য ঠাণ্ডা, তরল ব'লে নাম গুলি হেলেন জানতেন না, শুধু জলের ঐ রকম স্পর্শ জানতেন;—আর সেই যে হাতে শিক্ষয়িত্রী সকাল বেলায় আর এক রকম সুড়সুড়ী বা সঙ্কেত ক'রেছিলেন তার মানে হচ্ছে, যাতে জল রাখে Mug। সেই সঙ্গে এই সত্যটী তাঁর মনে প্রবেশ কর'ল যে, সকল জিনিসের নাম আছে! এরপর থেকেই ক্রমাগত সব জিনিসের নাম শেখবার জন্যে তাঁর ভারি একটা উৎসাহ ও আগ্রহ জন্মে গেল। শিশুরা অতি ছোটবেলা থেকেই চারিদিকে সকলের কথাবার্ত্তা শুনে শুনে শেখে যে সকল জিনিসের একটা একটা নাম আছে; যখন সে নিজে কথা কইতে শেখেনি তখনও এ কথা সে জানে, আর যে অন্ধ বধির সে ত কিছু দেখেনি শোনেও নি তাকে এই কথাটী জানান কি রকম শক্ত! কিন্তু একবার যখন এই সত্যটী তাঁর মনের মধ্যে প্রবেশ ক'রল তখন তাঁকে অন্য শিক্ষা দেওয়া অনেকটা সহজ হ'য়ে এল। তারপরে এক দিনের মধ্যেই হেলেন অনেক জিনিসের নাম শিখে ফেলেছিলেন। মিস সালিভ্যান যে নিয়ম ক'রে হেলেনকে খানিকক্ষণ শেখাতেন তা নয়, সকল সময়েই হেলেনের হাতে লিখে লিখে তাঁর সঙ্গে কথা কইবার চেষ্টা ক'রতেন। একদিন হেলেনকে তিনি আদর ক'রতে চাইছিলেন, হেলেন কিন্তু কিছুতেই তাতে রাজী ছি'লন না, তখন মিস সালিভ্যান তার হাতে লিখলেন "I love Helen" (আমি হেলেনকে ভালবাসি।) হেলেন জিজ্ঞাসা ক'রলেন love কি? মিস্ সালিভ্যান তখন হেলেনের বুকে হাত দিয়ে দেখিয়ে ব'ললেন "এখানে"। কিন্তু হেলেন বুঝতে পারলেন না; কারণ তিনি তখন যে জিনিস স্পর্শ ক'রতে পেতেন না তার বিষয় কিছু বুঝতেন না। হেলেন বড় ফুল ভাল বাসতেন; মিস্ সালিভ্যানের হাতে ভায়লেট ফুলের গন্ধ পেয়ে জিজ্ঞাসা ক'রলেন "এই কি ভালবাসা"? শিক্ষয়িত্রী ব'ললেন "না"। তখন বেশ রৌদ্র ছিল, হেলেন রৌদ্র বড় ভালবাসতেন, হেলেন যেদিক থেকে সূর্য্যের উত্তাপ আসছিল সেইদিকে দেখিয়ে ইঙ্গিতে জিজ্ঞাসা ক'রলেন "এই কি ভালবাসা"? তারও উত্তর পেলেন "না"। সেদিন ভালবাসা কি তা আর তাঁর শেখা হ'ল না। তার দু এক দিন পরে হেলেন ব'সে ব'সে পুঁতি গাঁথছিলেন, দুটো ক'রে বড় পুঁতি তারপর তিনটা ক'রে ছোট পুঁতি, এই রকম ক'রে গাঁথছিলেন। তাঁর

বার বারই ভুল হচ্ছিল, শিক্ষয়িত্রী তাঁকে সংশোধন ক'রে দিচ্ছিলেন; আবার একবার ভুল বুঝতে পেরে হেলেন ব'সে ব'সে ভাবতে চেষ্টা ক'রছিলেন; ঠিক এই সময়ে তাঁর শিক্ষয়িত্রী হেলেনের কপালে হাত দিয়ে তাঁর হাতে লিখলেন "think" তখনই মুহূর্তমধ্যে হেলেন বুঝতে পারলেন এই যে তাঁর মনের মধ্যে ক্রিয়াটী হচ্ছে এর নাম হচ্ছে think চিন্তা করা। আবার তাঁর মনের মধ্যে যেন একটী নূতন আলো প্রবেশ ক'রল। তিনি তখন পুঁথি গাঁথা ভুলে গিয়ে অনেকক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে ভাবতে লাগ্‌লেন যে সেদিন সেই love কথাটী হ'য়েছিল তার মানে কি। সেই সময় হঠাৎ মেঘমুক্ত হ'য়ে সূর্য্যের আলো ফুঠে উঠ'ল' তখন আবার তিনি শিক্ষয়িত্রীকে জিজ্ঞাসা ক'রলেন "এই কি ভালবাসা?" মিস্ সালিভ্যান ব'ললেন "ভালবাসা কতকটা ঐ সব মেঘের মতন; মেঘকেও তুমি ছুঁতে পার না, কিন্তু সমস্তদিনের উত্তাপের পর যে বৃষ্টি হয় তা তুমি স্পর্শ ক'রতে পার এবং তাতে গাছপালা কত আনন্দলাভ করে তাও বুঝতে পার; সেই রকম ভালবাসাকেও তুমি স্পর্শ ক'রতে পার না, কিন্তু ভালবাসা জীবনকে যে মিষ্ট করে তা অনুভব ক'রতে পার"। এই কথাটীর পরে হেলেনের মনে এই মধুর সত্যটী জেগে উঠ'ল যে তাঁর আত্মার সঙ্গে অন্য লোকদের আত্মার একটী যোগ আছে, সে যোগ চোক্ দিয়ে দেখা যায় না, হাত দিয়ে স্পর্শ করা যায় না। ক্রমে মিস্ সালিভ্যান তাঁকে প'ড়তে শেখাতে লাগলেন। কতকগুলি কার্ডের উপর একটী একটী কথা উঁচু উঁচু অক্ষরে লেখা থাক'ত, যেমন doll ইত্যাদি। সে গুলি যে একটী একটী কথা তা হেলেন খুব শীঘ্রই শিখতে পেরেছিলেন, আর এ শিক্ষায় তাঁর খুব আমোদ ছিল। একদিন দেখা গেল তাঁর বিছানার উপরে তাঁর dollটীকে শুইয়ে তার পাশে is on bed কথাগুলি সাজিয়ে রেখেছেন, অর্থাৎ বলতে চান যে doll is on bed। আর এক দিন দেখা গেল girl লেখা এক খানি কার্ড নিজের পোষাকের উপর এঁটে wardrobe এর ভিতর গিয়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছেন, আর তাকের উপর is in wardrobe কথাগুলি সাজিয়ে রেখে দিয়েছেন, অর্থাৎ ব'লতে চান্ girl is in wardrobe। এই রকম ক'রে মিস্ সালিভ্যান তাঁকে এমন ভাবে শিক্ষা দিতে লাগলেন যে ব্যাকরণ প্রভৃতি যে সব শিক্ষা ছেলেদের কাছে কষ্টসাধ্য ও ভয়ের জিনিষ, হেলেন সে গুলি খেলার মধ্যে দিয়ে অতি সহজ ভাবেই শিখতে লাগলেন। এই রকম ক'রে তিনি ভূগোল শিক্ষা ক'রেছিলেন। অন্য ছেলেদের মতন তাঁকে কতকগুলি জিনিস মুখস্ত ক'রে শিখতে হয়নি; মিস্ সালিভ্যান তাঁকে নদী প্রভৃতি সকল জিনিস স্পর্শ করিয়ে করিয়ে শেখাতেন, এবং যখন সে সুবিধা হ'তনা তখন বাগানের ভিতরে হ্রদ, দ্বীপ, পাহাড় প্রভৃতি প্রস্তুত ক'রতেন; মাটী দিয়ে উঁচু ক'রে

ম্যাপ প্রস্তুত করে শেখাতেন। এই রকম ক'রে সকল জিনিস স্পর্শ ক'রে ক'রে হেলেন Botany, zoology, প্রভৃতি অনেক বিদ্যা শিখেছেন।

মহিলার রচনা।

চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজে পঠিত।

প্রিয় ভগিনীগণ, সমাজে আমাদিগের কি কর্ত্তব্য তাহা আমাদিগকে সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে। কর্ত্তব্যজ্ঞান মানব-উন্নতির একমাত্র উপায়। কর্ত্তব্যজ্ঞান বিহীনের ইহ পর কোন কালেই সুখ নাই। শুষ্ক তৃণখণ্ড যেরূপ যেদিকে বায়ু সেই দিকে ধাবিত হয়, তাহার নিজের গতি কিছুই নাই, কর্ত্তব্যজ্ঞান-বিহীন ব্যক্তিও সেইরূপ বাহিরের শক্তি-দ্বারা অথবা স্বীয় মানসিক কাম ক্রোধাদি নীচ প্রবৃত্তিদ্বারা সর্ব্বদা চালিত হইয়া থাকে, আত্মার উন্নতি এরূপ মানবে অসম্ভব; অথচ আত্মার উন্নতি না হইলে প্রকৃত সুখ শান্তি লাভ হয় না।

বর্ত্তমান সামাজিক নিয়মে অর্থোপা-র্জ্জন সম্বন্ধে আমরা কিছুই নহি। কিন্তু অর্থই আমাদের সামাজিক উন্নতির এক-মাত্র সাধন নহে। শাস্ত্রকারেরা বলেন, আত্মা সচ্চিদানন্দ। জ্ঞান, আনন্দ ও নিয়-মিত কার্য্যাকরণ এই তিনটী মাত্র তাহার প্রকাশ। এই কারণে সর্ব্বধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞান, প্রেম ও কর্ত্তব্য ইচ্ছা বৃদ্ধির পক্ষপাতী, এই তিনটী যত বর্দ্ধিত হইবে, এবং যত বিশুদ্ধ হইবে আমাদের আত্মা তত উন্নত হইবে। এই তিনটী যাঁহার উন্নত তিনি সংসারে দিনান্তে অৰ্দ্ধাশনে ছিন্নবস্ত্রে থাকিলেও সতত অসীম শান্তি সুখে পরিপূর্ণ থাকেন।

অসুখ কাহাকে বলে তাহা তাঁহার অবিদিত। তাঁহাকে যে অবস্থায় রাখুন, যে কাজে নিযুক্ত করুন তিনি স্বীয় আত্মা-নন্দে পরিতৃপ্ত। সে সুখ যে কেবল তাঁহাকেই পরিতৃপ্ত করে তাহা নহে, যে ব্যক্তি তাঁহার সংস্পর্শে আসেন সে ব্যক্তির নিজের অশান্তির যত কারণই থাকুক না কেন, যতকাল তাঁহার সংস্পর্শে থাকেন ততকাল সেই আত্মতৃপ্তির অংশ-ভাগী হন।

অতএব দেখুন, আত্মোন্নতির সহিত অর্থের সম্বন্ধ অতি সামান্য। এবং অর্থো-পার্জ্জন সম্বন্ধে পুরুষের সহিত আমাদের অংশ না থাকিলে ও প্রকৃত আত্মোন্নতি তাঁহাদের একচেটে নহে, বরং ইহার জন্য তাঁহাদিগের অপেক্ষা আমাদের অধিকতর সুবিধা, কারণ অর্থোপার্জ্জনে বহু ক্লেশ, বহু উদ্যম ও যত্নের প্রয়োজন। আমরা উহার হস্ত হইতে বিমুক্ত বলিয়া এ সকল অসুবিধার কিছুই আমাদিগকে ভোগ করিতে হয় না, সাংসারিক কর্ত্তব্য সমা-ধান্তে বাকী সমস্ত সময়ই আমরা আত্মোন্ন-তির জন্য দিতে পারি। যদি নিদ্রা, আলস্য পরচর্চ্চা, বৃথা আহার বিহার, পরি-চ্ছদ আভরণাদির প্রলোভন ও হিংসা দ্বেষ পরিত্যাগ করিয়া আমরা পবিত্রভাবে আমা-দিগের অবসরকাল সংশিক্ষা ও সৎসঙ্গে আত্মোন্নতির জন্য ব্যবহার করিতে পারি,

তাহা হইলে এ কথা অত্যুক্তি নহে যে, আমরা অচিরাৎ এই সংসারকে স্বর্গধামে পরিণত করিতে পারিব। সংসারে প্রকৃত সুখ দুঃখ সম্বন্ধে আমাদেরই হস্ত অধিক। যে গৃহের গৃহিণী ধার্ম্মিকা, সে গৃহ দরিদ্র হইলেও সুখ ও শান্তির আলয়। মহা ধনীর গৃহিণী অধার্ম্মিকা ও হিংসা দ্বেষাদির আশ্রিতা হইলে সে গৃহে সুখ অপরিচিত।

পাশ্চাত্য সূক্ষ্মদর্শী বীরবর নেপোলিয়ন বলিয়াছেন, মাতৃগণের উন্নতিসাধন দেশোদ্ধারের এক মাত্র উপায়। আমরাই দেশের মাতা এবং মাতার ধমনীপ্রবাহিত রক্তই গর্ভস্থ সন্তানের পরিপুষ্টি এবং তাঁহার ক্রোড়স্থ সন্তানের শরীর গঠনের একমাত্র উপাদান। আমরা কেবল সন্তানের স্থূল শরীরের উপাদানদাত্রী নহি। সন্তান যতদিন আমাদের আশ্রিত ততদিনই তাহার প্রকৃত শরীর ও স্বভাব গঠনের মুখ্যকাল। আমরা যে কেবল আমাদের রক্ত ও স্তন্য দ্বারা তাহাদের স্থূল শরীর গঠন করি তাহা নহে, তাহাদের মন ও স্বভাব অনেকাংশে আমাদের দ্বারাই গঠিত হয়। আমাদের ক্রোড়ে তাহারা যে উপদেশ পায় তাহাই তাহাদের স্বভাবের মূল সূত্র। কাজেই আমাদের যেরূপ স্বভাব সন্তানগণের সেইরূপ স্বভাবই প্রবল হয়। জগতের ধনী, দরিদ্র ভাল মন্দ সকল মানবই আমাদের হস্ত গঠিত। যিনি সমাজের সংস্কর্ত্তা বলিয়া কালান্তরে পূজ্য হন, তিনিও আদিতে আমাদিগেরই সন্তান, তাঁহার উন্নতির ভিত্তি আমাদের হস্ত প্রোথিত।

অতএব আমাদের স্বভাব ও ধর্ম্ম প্রবৃত্তি, আত্মার উন্নতি বা অবনতি শুদ্ধ আমাদের সাময়িক সাংসারিক সুখ দুঃখের কারণ তাহা নহে প্রকৃতপক্ষে আমরাই দেশের ও জগতের মঙ্গলামঙ্গলের জন্য দায়ী।

শ্রীমোহিনী দাস।

সংবাদ।

পেশোয়ার নগরের অর্দ্ধ মাইল দূরে এক স্তূপের নীচে বুদ্ধদেবের অস্থি আবিষ্কৃত হইয়াছে। প্রায় ত্রিশ ফুট নিম্নে স্ফটিক পাত্রে শ্রীবুদ্ধের তিন খানি অস্থি পাওয়া গিয়াছে। মার্শাল সাহেব ইহা বাহির করিয়াছেন। এ অস্থি কোন্ দেশে সংরক্ষিত হইবে ইহা লইয়া বিলক্ষণ আন্দোলন চলিয়াছে। ভারতীয় মহাপুরুষের অস্থিতে ভারতেরই দাবী বেশী।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় এখনও পুরী বাস করিতেছেন। তাঁহার শরীর কখনও একটু ভাল, কখনও মন্দ। সেপ্টেম্বর মাসের মধ্যেই তিনি কলিকাতা আসিতে পারেন।

গত আষাঢ় মাসে মহিলার চতুর্দ্দশ বর্ষ শেষ হইয়াছে। যাঁহারা এখনও মূল্য দেন নাই, তাঁহারা দয়া করিয়া সত্বর উহা প্রদান করিলে আমরা উপকৃত হইব।

ভ্রমক্রমে মহিলার চতুর্দ্দশ বৎসরের নির্ঘণ্ট গত সংখ্যায় প্রকাশিত হয় নাই। উহা এই সংখ্যায় প্রদত্ত হইল। পাঠক পাঠিকাগণ তাহা যথাস্থানে সংলগ্ন করিয়া লইবেন।

মহিলার চতুর্দ্দশ বর্ষের নির্ঘণ্ট।

সূচী।

কলিকাতা

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি নাথ কর্ত্তৃক ১৩ই আশ্বিন মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৫শ ভাগ] ভাদ্র, ১৩১৬, সেপ্টেম্বর ১৯০৯। [২য় সংখ্যা।

প্রার্থনা।

দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ পরমেশ্বর, আমরা দুর্ব্বল অসহায় মোহাচ্ছন্ন হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমাদের মোহ এত গভীর যে শত আঘাতেও সে মোহ ভাঙ্গে না। সংসারে কত দুঃখ বিপদ, শোক সন্তাপ আমাদিগকে ঘেরিয়া রহিয়াছে। রোগ শোক ক্রমাগত আমাদিগকে আঘাত করিতেছে, ভয়ানক আঘাত পাইলে একটু চমকিয়া উঠি, কিন্তু তাহাতে চৈতন্য হয় না। রোগে যখন মুমূর্ষুপ্রায় হই, ভাবি এবার আরোগ্য লাভ করিলে তোমার অনুগত হইয়া চলিব, আর অধর্ম্মের পথে যাইব না, তোমারই প্রিয় কার্য্যে জীবন মন অর্পণ করিব। যাই রোগের হাত হইতে মুক্তি লাভ করি, আবার যে পুরাতন মোহাচ্ছন্ন জীব আমি সেই রূপ ধারণ করি। আমার এইরূপ যে ঘোর মোহের অবস্থা ইহা তুমি ভিন্ন আর কে দূর করিতে পারে? তাই তোমার শরণাপন্ন হই, তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি। তুমি তোমার অলৌকিক শক্তি প্রভাবে আমার মোহ ভাঙ্গিয়া দাও, আত্মাতে দিব্যজ্ঞানের সঞ্চার কর। যে জ্ঞানপ্রভাবে তোমার সঙ্গে আমার যে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ তাহা বুঝিতে পারিব। তুমি যে আমার পিতা মাতা আশ্রয়দাতা স্বামী সখা এসকল সম্বন্ধ অনুভব করিয়া তোমারই আশ্রিত হইয়া জীবন যাপন করিতে থাকিব। তোমাকে পিতা মাতা রূপে পাইলে আর আমার ভাবনা কি? তোমাকে স্বামী সখা রূপে পাইলে আমি চিরকৃতার্থ হইব। সেই কৃতার্থতা দান করাই তোমার অভিপ্রায়। তোমার অভিপ্রায় আমার জীবনে সুসিদ্ধ হউক!

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নারীজনোচিত খেলা।

"শরীরমাদ্যং খলুধর্ম্মসাধনম্"

শরীরী জীবের পক্ষে শরীর-চিন্তা সর্ব্বপ্রধান। যদিও শরীরের জন্য মনুষ্যের প্রাধান্য নহে, তথাপি শরীরের স্বাস্থ্য ও বল রক্ষা করিতে না পারিলে ধরাতলে প্রত্যেক মনুষ্যের জীবনই অতি বিড়ম্বনার বিষয় হইয়া উঠে। স্ত্রীলোকদিগের স্বাস্থ্য অধুনা অস্মদ্দেশে ক্রমে হীনদশা প্রাপ্ত হইতেছে। একথা প্রত্যক্ষ সত্য, যেমন হস্তের কঙ্কণ কেহ দর্পণে দর্শন করে না, তেমনি এদেশীয় নারীদিগের শারীরিক স্বাস্থ্যের হীনতারও প্রমাণ প্রয়োগ প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। এসময়ে যাহাদের সাংসারিক অবস্থা স্বচ্ছল, যাঁহাদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার, যাঁহারা সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত, তাঁহাদের অধিকাংশের শরীরই রুগ্ন ভগ্ন ও অপটু। যদি শিক্ষা সভ্যতা ও ধনাগমে স্বাস্থ্যের অপগম ঘটে, তবে পৃথিবীতে অধিবাসকালে শিক্ষা সভ্যতাদি কে স্পৃহা করিবে? পৃথিবীতে শারীরিক স্বাস্থ্য অপেক্ষা স্পৃহনীয় পদার্থ কিছুই নাই। অতএব যাঁহারা এদেশের মহিলাদিগের শিক্ষা সভ্যতা ও সাংসারিক সমৃদ্ধির বৃদ্ধি দেখিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা সভ্য ও শিক্ষিতাদিগের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় অবধারণের চিন্তা করুন। মানসিক উন্নতিতে যদি স্ত্রীলোকের দৈহিক অবনতি আনয়ন করে, জ্ঞানবলে যদি শরীরে হীনবল হয় তবে পৃথিবীতে তাহা আদরণীয় হইবে না।

শিক্ষা ও সভ্যতা বিস্তারের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থার সহিত তৎপরবর্ত্তী নারীদিগের শারীরিক অবস্থার তুলনা করিলে আমরা কি দেখি? প্রত্যেকে স্ব স্ব পিতামহী মাতামহীদিগের শারীরিক শক্তি ও স্বাস্থ্য যদি স্মৃতিপটে দর্শন করেন, এবং বর্ত্তমান সময়ের শিক্ষালোক প্রাপ্তা, সভ্যতার সুবেশযুক্তা রমণী দেহের প্রতি যদি নেত্রপাত করেন, তবে কি দেখিতে পান? পূর্ব্ববর্ত্তিনীদিগের দেহ প্রস্তর মন্দিরবৎ; এবং পরবর্ত্তিনীদিগের দেহ ঠিকা দেওয়া পর্ণকুটীর সদৃশ। পূর্ব্ববর্ত্তিনীগণ ঝড় ঝঞ্ঝা ভূকম্পেও অটলা, পরবর্ত্তিনীগণ সুমন্দ দক্ষিণানিলের সামান্য আঘাতেই পতমানা। শিক্ষা শীঘ্র বার্দ্ধক্য আনয়ন করে, এপ্রকার মত অনেক নারীচিত্তে ইহারই মধ্যে বদ্ধমূল হইতেছে। শারীরিক স্বাস্থ্যরক্ষায় অবহেলা জন্য যে দৈহিক দুর্ব্বলতা ও বিবিধ রোগ দেহমধ্যে উৎপন্ন হয় তাহা শিক্ষিতা স্ত্রীলোকগণও যেন বোঝেন না। সুতরাং তাঁহারা শিক্ষাকে অকালবার্দ্ধক্য ও বিবিধ রূপ দুর্ব্বলতার প্রসূতি বলিয়া অনায়াসে অপসিদ্ধান্ত করেন। চুলপাকা, মাথাঘোরা চব্বিশে চল্লিশ, এবং চল্লিশে অশীতিবর্ষের অবস্থাপন্ন হওয়া যেন শিক্ষার অপরিহার্য্য ফল বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিতেছে।

বর্ত্তমান সময়ে এতদ্দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে অত্যল্প সংখ্যক নারীই উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছেন। পরন্তু সভ্যতার ফল তদপেক্ষা অধিক সংখ্যক স্ত্রীলোক উপভোগ করিয়া থাকেন। সেই সকল রমণী যদি অনুগ্রহ পূর্ব্বক আপনাদের কায়িক

অধোগতির হেতু চিন্তা করিবার জন্য অত্যল্প কাল ব্যয় করেন, তবে দেখিবেন শরীরের প্রতি ঔদাস্য, শারীরিক পরিশ্রমে আলস্য ও বিলাসে আসক্তি তাঁহাদের রোগ দুর্ব্বলতা এবং অকালবার্দ্ধক্য ও দেহপাতের নিদান। শারীরিক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ প্রতিদিন নিয়মিত রূপে পরিচালন না করিলে শরীর অবশ্যই অপটু, দুর্ব্বল ও রোগাগার হইবে। প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন করিয়া শিক্ষার গরিমায় বিনাদণ্ডে কেহই পার পাইতে পারে না! পৃথিবীতে পুরুষেরা নারীর অনেক দোষ ক্ষমা করিতে পারেন; কিন্তু প্রকৃতি প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন রূপ পাপ কোন প্রকারে ও কোন অবলা মহিলাকেও ক্ষমা করেন না। অতএব যতদিন শরীর ধারণ করিবেন ততদিন মহিলাগণ শরীরের শক্তি রক্ষার নিয়ম পালনে সর্ব্বপ্রযত্নে অবহিত থাকিবেন।

খেলা নারীর শক্তি বিকাশ ও সংরক্ষার জন্য অতি আবশ্যক। খেলাতে আমোদ, উৎসাহ এবং নিরালস্য জন্মে। যাহারা শরীর ব্যবহার পূর্ব্বক সংসারে কর্ম্ম না করে, যাহাদের অশন বসন প্রতিদিন অন্যে যোগায়, তাহাদের শারীরিক জীবন রক্ষা ও ভোগের নিমিত্ত কোন না কোন রূপ ব্যায়াম না করিলে চলে না। আলস্য কেবল অশেষ দোষের আকর নহে, ইহা অসংখ্য রোগেরও আকর বটে। পৃথিবীতে যত্ন পূর্ব্বক যেমন জ্ঞান তেমনি স্বাস্থ্যও আহরণ করিতে হয়। জ্ঞানোপার্জ্জন করিলে যদি সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্যলাভ হইত, তবে স্বাস্থ্য অর্জ্জনে যাহারা যত্নশীল, তাহাদেরও বিনা যত্নে জ্ঞানলাভ হইত। কিন্তু তাহা পূর্ব্বেও কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, এখনও ঘটিবে না। বিনা যত্নে কোন নারীর বা নরের জ্ঞান, স্বাস্থ্য বা ধর্ম্ম কিছুই উপার্জ্জিত হইতে পারে না। পুত্তিকা যেমন যত্ন সহকারে ধীরে ধীরে মৃত্তিকা সঞ্চয়ে বল্মীক নির্ম্মাণ করে, তেমনি প্রত্যেক নারী নরকে যত্ন সহকারে শারীরিক শক্তি, জ্ঞান ও ধর্ম্ম সঞ্চয় করিতে হইবে। ক্রীড়ামোদ উপেক্ষণীয় নহে। স্ত্রীলোক স্বভাবতঃ আমোদপ্রিয় কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীলোক (বর্ত্তমান সময়ে বিশেষতঃ) আলস্যপ্রিয়ও বটে। বিলাসিতা এই অলসতাকে অধিকতর পরিবর্দ্ধিত করিয়াছে। সে জন্য বর্ত্তমান সময়ে রমণীর কমনীয় বপু রোগরাক্ষসের দংষ্ট্রা নিষ্পেষণে বিগতলাবণ্য ও হীনবল পরিদৃষ্ট হয়।

যে সকল রমণী গৃহকর্ম্মে নিরত, তাঁহাদের সুখভোগ্য স্বাদু আহার্য্য উদরস্থ না হইলেও শারীরিক নিয়মিত পরিশ্রমের গুণে স্বাস্থ্য সুরক্ষিত এবং শরীর রোগাক্রমণ পরিশূন্য; সুতরাং তাঁহাদের দেহে স্বাস্থ্যের সহিত লাবণ্যও সংযুক্ত থাকে। যে সকল নারী গৃহকর্ম্মে পরাঙ্মুখ, তাস বা কড়ি খেলার আমোদে মত্ত, তাঁহারা নানারূপ রোগশঙ্কটাপন্ন। এসকল শঙ্কট দূরীকরণের যত্নও মহিলাদের অবশ্য কর্ত্তব্য।

জ্ঞান গুণাদি মানসিক শক্তি বিস্তারের তুলনায় যদি উপযোগী ক্রীড়ামোদ ও শরীর পরিচালনার উপায় বিস্তার না হয়,

কখনই দেশে পার্থিব জীবনের উপযোগী শিক্ষা বিস্তার হইবে বলিতে পারিব না। এজন্য খেলার প্রবর্ত্তনা ও মহিলাসমাজে অলঙ্ঘনীয় রূপে আবশ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়। আমাদের দেশের বালিকা এবং যুবতীদিগের জন্য কি প্রকার ক্রীড়া-মোদ বিশুদ্ধ রূপে উপযোগী তাহাও চিন্তা করা উচিত। উপযোগিনী ক্রীড়ার উদ্ভাবন ও প্রবর্ত্তন সহজ নহে। ক্রীড়ামোদ কেবল অল্প বয়স্কা বালিকাদিগেরই জন্য প্রয়োজনীয় এমন নহে; যুবতী এবং বর্ষীয়সীদিগেরও উহাতে প্রয়োজন আছে।

তাস, পাশা, কড়ি প্রভৃতি খেলাতে যে অপকার তাহা বিশদরূপে জ্ঞানবতী মহিলাগণ বালিকা ও যুবতীদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিবেন। অদ্যাপি বঙ্গদেশে মহিলাদিগের মধ্যে তাশ কড়ি প্রভৃতি খেলার যথেষ্ট প্রচলন দেখা যায়। ব্রাহ্ম-সমাজে ঐ সকল খেলার প্রতি প্রথমকালে একটা ঘৃণা জন্মিয়াছিল। কিন্তু কাল ক্রমে সে ঘৃণা বিদূরিত পায়। অনেক ব্রাহ্মিকা কি তাশ কড়ি প্রভৃতি খেলায় অধুনাতন কালে বৃথা কালক্ষয় করেন না? উপযোগী ভাল খেলা ও আমোদের উপায় উদ্ভাবিত এবং প্রচলিত না করিলে হীনতর ও পরিত্যক্ত ক্রীড়ামোদ সকল পুনর্গৃহীত হইবে ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ক্রীড়ার সঙ্গে শ্রম ও আমোদ উভয়ের যোগ থাকিলে তদ্দ্বারা শরীর মন উভয়ই উপকৃত হয়। সংসারে শরীর মনের, মন শরীরের পরম সহায়। শরীর মন উভয়েই আনন্দবাদী। আনন্দই স্ফূর্ত্তি। স্ফূর্ত্তিতেই আনন্দ। উৎসাহ, উদ্যম ও শক্তি যাহাতে বৃদ্ধি হয় অথচ মনটি সম্পূর্ণরূপে চিন্তাবিনির্ম্মুক্ত থাকে, এপ্রকার ক্রীড়া প্রায় প্রতিদিন আবশ্যক। আমাদের শিক্ষিতা মহিলাগণ এরূপ ক্রীড়ামোদ কি জীবনের কর্ত্তব্য সাধন জন্য অতি আবশ্যকীয় বিবেচনা করেন না? তাঁহারা কি আমাদের দেশের উপযোগী উক্তবিধ ক্রীড়ার উদ্ভাবন জন্য যত্ন ও চিন্তা করা কর্ত্তব্য বোধ করেন না? শিক্ষিতা মহিলাদিগের জন্য ক্রীড়া বা খেলাও একটি অভাব। এ অভাবের তিরোভাব ও মহিলাকুলের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতি পক্ষে আবশ্যক। শ্রীঈ—

নারীর উচ্চ অধিকার।

পৃথিবীর পক্ষে সৌভাগ্যের দিন আসিতেছে, মানবজাতির মাতৃবংশ আপনাদের গুরুতর দায়িত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির অধিকার লইয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে ভিন্ন ভিন্ন রকমের আন্দোলন চলিয়াছে। কোথাও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে স্ত্রীলোকের অধিকার লইয়া তুমুল সংগ্রাম, কোথাও বিষয় কর্ম্মের ক্ষেত্রে তুল্যাধিকার লাভের চেষ্টা, কোথাও সামাজিক জীবনে সমান অধিকার লাভের উদ্যোগ। যাঁহারা ভীরু প্রকৃতি রক্ষণশীল, তাঁহারা এ সকল নব উদ্যমের একান্ত বিরোধী; তাঁহারা মনে করেন, এতদ্দ্বারা মহা সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইবে, মহা বিপ্লব ঘটিবে। কিন্তু যাঁহারা ঈশ্বর-বিশ্বাসী-ভক্ত তাঁহারা কি দেখেন?

তাঁহারা দেখিতে পান, বিধাতা সামান্য বস্তুরও অপচয় হইতে দেন না। স্থূলদর্শী লোক যাহাকে অপচয় মনে করে, তদ্দ্বারাও বিধাতা কোনও না কোনও প্রয়োজন সাধন করেন। মানবজাতির মধ্যে যখন যে কোনও বিষয়ে ঘোরতর ঝটিকা উত্থিত হইয়া সমাজকে ওলটপালট করিয়া দেয়, তারও ভিতরে বিধাতার লীলা পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান থাকে।

সমগ্র মনুষ্যজাতি একটী দেহ, নারী তাহার অর্দ্ধাঙ্গ—যাঁহারা তাঁহাকে "উত্তমাঙ্গ" বলিয়াছেন, তাঁহারা সুবুদ্ধির পরিচয় দিয়াছেন। এই অর্দ্ধাঙ্গকে যাঁহারা অকর্ম্মণ্য, অসাড়, ভোগ্যবস্তু, ক্রীড়ন সামগ্রী করিয়া রাখেন তাঁহারা মানবকুলের মহা অনিষ্টকারী। বিধাতা নর নারী দুইকে মিলাইয়া পৃথিবীতে সৃষ্টির ভূষণ নরজাতি সৃজন করিয়াছেন। অহঙ্কারী মানব, তুমি কে যে নারীকে হেয় ভাবিয়া তাঁহাকে নীচে রাখিতে চাও? বিধাতা এমন সুদৃঢ় বন্ধনে নরনারীকে বাঁধিয়াছেন যে একের অভাবে অন্যের জীবনই অসম্ভব।

নারীর সঙ্গে নরের কত মিষ্ট মধুর সম্বন্ধ। নারী আমার গর্ভধারিণী জননী, তাঁর সুকোমল স্নেহক্রোড়ে লালিত-পালিত হইয়াছি, তাঁর স্তন্যসুধা-পানে আমার দেহ গঠিত হইয়াছে। নারী আমার স্নেহময়ী ভগ্নী, সোদর জ্ঞানে তিনি কত আমায় স্নেহ আদর করিয়া থাকেন। নারী আমার সহধর্ম্মিণী, ধর্ম্মপথে, সংযমের পথে তিনি আমার পরম সহায়; আমার কঠোর প্রাণ তাঁর পবিত্র প্রেমস্পর্শে দ্রবীভূত হয়। নারী আমার কন্যা, কত আদর যত্নে আমার সেবা করিয়া আমার আনন্দবর্দ্ধন করিয়া থাকেন।

গত শ্রাবণ মাসের মহিলায় "মহিলার রচনা" স্তম্ভে চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজে পঠিত একটী মহিলার প্রবন্ধ পাঠে আনন্দিত হইলাম। তিনি লিখিয়াছেন, "আমরাই দেশের (মানবজাতির) মাতা, এবং মাতার ধমনীপ্রবাহিত রক্তই গর্ভস্থ সন্তানের পরিপুষ্টি এবং তাঁহার ক্রোড়স্থ সন্তানের শরীর গঠনের একমাত্র উপাদান।" "আমরা যে কেবল আমাদের রক্ত ও স্তন্য দ্বারা তাঁহাদের স্থূল শরীর গঠন করি তাহা নহে, তাহাদের মন ও স্বভাব অনেকাংশে আমাদের দ্বারাই গঠিত হয়।" বড়ই সুখের বিষয় যে আমাদের দেশের নারীরাও এই ভাবে আপনাদের অধিকারের বিষয় ভাবিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

নারীকে যাঁহারা পুরুষ করিয়া তুলিতে চাহেন, তাঁহারা মহা ভ্রান্ত। আবার নারীকে যাঁহারা তাঁহার উচ্চ অধিকার দানে কুণ্ঠিত তাঁহারাও ভ্রান্ত। মানব পরিবারে নারী রাণীস্বরূপা, তিনি গৃহকর্ত্রী, গৃহলক্ষ্মী। মানুষ প্রস্তুত করিবার ভার তাঁহার হাতে। পৃথিবীতে যত মহাজন সাধু ভক্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, জ্ঞানী, গুণী, কর্ম্মী, জনহিতৈষী বীরপুরুষ জন্মিয়াছেন, সকলই মাতৃ-গর্ভজাত। মাতার দেহ মন আত্মা তাঁহাদের পরিপোষক। মাতার চরিত্র ভাব তাঁহাদের চরিত্রকে গঠন করিয়াছে। যে শাক্যসিংহের

সুপবিত্র চরিত্র ভারতাকাশে সমুদিত হইয়া এসিয়াখণ্ডকে আলোকিত করিয়াছিল, এখনও কোটি কোটি লোক তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের আশ্রিত, তিনি নারীশ্রেষ্ঠ মায়াদেবীর গর্ভ-সম্ভূত। যে যিশুখৃষ্ট পালেস্তাইন দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ঈশ্বরের পুত্র চরিত্রের মধুর উজ্জ্বল জ্যোতিতে পৃথিবীকে আলোকিত করিয়াছিলেন, এখনও কোটি কোটি লোক তাঁহার ধর্ম্ম আচরণ করিয়া কৃতার্থ, তিনি দেবী মেরির গর্ভজাত। যে গৌরচন্দ্র বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া স্নিগ্ধজ্যোতিতে অন্ধকারময় বাঙ্গলার মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন, এখনও ভারতের কোটি কোটি লোক তাঁহার প্রচারিত হরিনাম-সুধা পান করিয়া কৃতার্থ, তিনি সচীদেবীর গর্ভজাত। যাবৎ মানবজাতি পৃথিবীতে বাস করিবে, তাবৎ এই সকল নারী নরজাতির ভক্তি শ্রদ্ধা প্রাপ্ত হইবেন। শাক্যের চরিত্রে তাঁর মাতার প্রভাব কত, তাহা কি পরিমাণ করা যায়! ঈশার চরিত্রে তাঁর মাতার জীবন কত মিশ্রিত তাহা কি বর্ণনা করা যায়, গৌরাঙ্গের চরিত্রে সচীর কত প্রভাব কে তাহা ওজন করিবে? মানব-চরিত্র, মানবজীবন গঠনে নারীর কত বড় উচ্চ অধিকার একটু ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়। সেই নারীকে পিঞ্জরাবদ্ধ পাখীর ন্যায় যবনিকাবদ্ধ করিয়া রাখিয়া কোন্ কল্যাণ সাধিত হয়! সেই নারীকে কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আপনার কর্ত্তব্যসাধনে বাধা দিলে কোন্ পুরুষার্থ সাধন হয়! বিংশশতাব্দীর জ্ঞানদীপ্ত সময়ে যদি তুমি বল, নারীর আত্মা নাই, সে কি ধর্ম্ম সাধন করিবে, স্বামীর মনস্তুষ্টি করাই তার কর্ম্ম, ছায়ার ন্যায় স্বামীর অনুবর্ত্তন করাই তার ধর্ম্মকর্ম্ম, এ কথা শুনিয়া বালক বালিকারাও হাস্য সম্বরণ করিতে পারিবে না।

ধর্ম্মক্ষেত্রে চিরকাল নারী ধর্ম্মপরায়ণা। পুরুষ নাস্তিক হয়, নাস্তিকতা পচার করে, কিন্তু কোনও নারী নাস্তিকের নাম তো শুনি নাই। ফেরোণের ন্যায় অহঙ্কারী পুরুষ পৃথিবীতে আত্ম-পূজা প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পাইয়াছে, কিন্তু কোনও নারী আপনার পূজা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা পান নাই। কত পুরুষ ঈশ্বরের অবতার মধ্যবর্ত্তীরূপে দণ্ডায়মান হইয়া মানুষকে ঈশ্বর হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছেন, কিন্তু কোনও নারী এরূপ স্পর্দ্ধা করেন নাই। এখানে কি নারীজাতির শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয় না? প্রেম ভালবাসা সেবাতে নারীর শ্রেষ্ঠতা সকলেই স্বীকার করে। ভালবাসার অনুরোধে কত নারী আত্মবিসর্জ্জন করিয়াছেন। সেবার শিক্ষয়িত্রী নারী। সহিষ্ণুতার সহিত কেমন করিয়া পরের সেবা করিতে হয় তাহা তিনিই জানেন ভাল। এমন কি যুদ্ধক্ষেত্রেও নারীকুলতিলক ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল প্রভৃতি মহিলারা আহত সৈনিকদিগকে যেরূপ মায়ের মত সেবা করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া জগৎ স্তম্ভিত হইয়াছে।

নারীকে ছাটিয়া ফেলিয়া কোথাও নরজাতির কল্যাণ নাই। নারীর সঙ্গে মিলিয়া কার্য্য করিলে সর্ব্বত্রই কুশল-

লাভের সম্ভাবনা। কর্ম্মক্ষেত্রে যে সকল কর্ম্ম অতিশয় পরিশ্রমসাধ্য সে সকল পুরুষ সম্পন্ন করুন, সেখানে নারী ও পুরুষের তুল্য পরিশ্রম না করাই শ্রেয়ঃ কেন না তদ্দ্বারা মাতৃত্বের হানি হইতে পারে। পুরুষের তুল্য গুরুভার বহনে তাঁর সামর্থ্য নাই, কৃষিক্ষেত্রে হল চালনাদি তাঁহার কর্ম্ম নয়, নাবিকের কর্ম্মে তাঁর কৃতিত্ব নাই। এ সকল না থাকাই প্রয়োজন। আবার সন্তান পালন প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য আছে, যাহা নারীর একচেটিয়া কার্য্য, পুরুষের তাহাতে অধিকার নাই।

শ্রীবৈ—

কেশবজননী সাধ্বী শারদা দেবী।

(১৪শ ভাগ, ৭ম সঙ্খ্যা, ১৭৫ পৃষ্ঠার পর।)

তোমাকে আগে এ কথাটী বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি। আমার শ্বশুর মহাশয় কথায় কথায় "পর্য্যন্ত" বলিতেন কেশবের জন্মের পর বলিয়াছিলেন (কেশবকে লক্ষ্য করিয়া) "এই পর্য্যন্ত আমার মতন হইবে।" ইহাকে দিয়া তোমার খুব সুখ হইবে।" সুখ অবশ্য খুবই হইল, কিন্তু সে সুখ চোখের জলে পূর্ণ।

কেশবের যৌবনকাল ও প্রৌঢ়াবস্থার কথা অনেকে বলিয়াছেন, তাহা আর এখানে বলিবার দরকার নাই। তবে এই কথা বলি তিনি যখন লিলিকটেজ করেন এবং এখান থেকে চলিয়া যান তখন তাঁর ভাই বোন্‌দের প্রতি কিম্বা আমার প্রতি একটুও মায়া মমতা কমে নাই। লিলিকটেজে যজ্ঞির সময় (নিমন্ত্রণ) অনেকবার বাবুরা বোধ হয় ভুলক্রমে কৃষ্ণবিহারীকে বাদ দিতেন, শেষে কেশব তাহা জানিতে পারিলে কাহাকেও কিছুই বলিতেন না বটে, কিন্তু মনে মনে বড় কষ্ট পাইতেন। এক দিন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম তোমার ছোট ভাই তোমার এখানে আসিলে তাহাকে তুমি ভাল করিয়া খাওয়াইবে। সেই অবধি কৃষ্ণবিহারী তাঁহার কাছে যখন যাইতেন তিনি নিজের খাবার হইতে কৃষ্ণবিহারীকে অৰ্দ্ধেক তুলিয়া খাওয়াইতেন। তিনি মাকে যে কত ভাল বাসিতেন তাহা তাঁহার শেষের ব্যমুতে প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁর যখন খুব রোগ বাড়িত আমি পাগলের মত তাঁর কাছে ছুটিয়া যাইতাম, তিনিও সব সময় মা মা করিতেন। বাবুরা কিন্তু সব সময় আমাকে তাঁর কাছে যাইতে দিতেন না। তাঁহারা বলিতেন ডাক্তারে মানা করিয়াছেন, আপনি যদি তাঁর নিকট যান তাহা হইলে তাঁর ব্যমু বাড়িবে। আমি বলিতাম আমার এই নিশ্বাসে কেশবের জন্ম, আমার রক্তে কেশবের দেহ, আমার নিশ্বাসে কখনও কেশবের অসুখ করিবে না, আমাকে তাঁর কাছে যেতে দাও। আমি অনেক সময় তাঁর ঘরের পাশেই পড়িয়া থাকিতাম। কেশব এক এক বার জাগিয়া মা মা বলিয়া ডাকিয়া উঠিলে আমি ছুটিয়া যাইতাম। তিনি বলিতেন

মা আমার কাছে বোস, আমায় কোলে ক'রে নিয়ে শুয়ে থাক।" একদিন তিনি রোগ যন্ত্রণায় খুব অস্থির হইয়াছিলেন; আমি দুঃখ করিয়া বলিলাম, কেশব আমি কি পাপ করিয়াছি জানি না, তাহাতেই বুঝি তুমি এত কষ্ট পাইতেছ। এই কথা শুনিয়া সেই কষ্টের মধ্যেও তিনি বলিলেন, "না মা, তুমি আমার বড় ভাল মা, এ রকম মা কে পায়, আমার যা কিছু ভাল সব তোমার কাছ থেকে পাইয়াছি।" এই বলিয়া আমার পায়ের ধূলা মাথায় নিলেন।

তিনি আমার হাতে দুধ খেতেন, তাঁর ভয় ছিল পাছে অন্য কেহ ঔষধের নাম করিয়া মাংসের জুস্ খাওয়াইয়া দেন। এক দিন কোনও এক প্রচারক, নাম করিব না শিশির ভিতর জুস্ ঔষধ বলিয়া আমার হাতে দিয়াছিলেন। কেশবের মুখে দিতেই তিনি তাহা ফেলিয়া দিলেন এবং বলিলেন, "মা তুমি আমাকে গু খাওয়ালে।" তারপর থেকে আর কাহারও হাতে খেলেন না। খাওয়া একেবারে বন্ধ করিলেন। মেজ বৌএর ও মহারাণীর হাতে তিনি আগে খাইতেন এই রকম দু'একবার জুস্ দেওয়াতে তাঁহাদের হাতে খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলেন।

কেশব খুব অসুখের সময় বলিতেন, "মা তুমি কি দেখ্‌তে পাচ্ছ না, আমি কার কোলে শুয়ে আছি। তুমি যেমন আমায় দুধ খাওয়াচ্ছিলে, তিনিও আমায় তেম্নি করে দুধ খাওয়াচ্ছেন।" এই ঘটনার দু'একদিন পরেই তিনি যান।

কৃষ্ণবিহারী।

কেশবের আড়াই বছরের পর ফুলেশ্বরী, তার আড়াই বছরের পর চূণী এবং তার আড়াই বছরের পর পান্না। পান্নার আড়াই বছর পর এবং আমার ২৬ বছর বয়সে কৃষ্ণবিহারীর জন্ম হয়। এক অগ্রাহায়ণে কৃষ্ণবিহারীর জন্ম হয়, ফিরে কার্ত্তিকে আমার স্বামী মারা যান। কৃষ্ণবিহারী ঐ নীচের গলিটায় হইয়াছিল। সেখানে একটা লম্বা ঘর ছিল, সেই ঘরের দরজায় কৃষ্ণবিহারীর জন্ম হয়। সেখানে বেহারী গুপ্ত, ওপিন্ ও অন্যান্য ছেলেরা হইয়াছিল। উপরকার যে ঘরে তোমার সুশান্ত হয় সেই ঘরে নরেন্দ্রের জন্ম হয়। মুরলীধর সেনের এখন যেখানে রান্না হয়, তারই পাশে একটি চালা ছিল সেই খানে মহারাণীর জন্ম হয়। কৃষ্ণবিহারী ছোট বেলায় পিতৃহীন হইয়াছিল বলিয়া সকলেই তাঁহাকে ভালবাসিতেন, বিশেষ আমার ভাশুর কৃষ্ণবিহারীকে খুব ভালবাসিতেন, এবং সব সময় তাঁহাকে কোলে কোলে রাখিতেন। যেখানে যেতেন সঙ্গে সঙ্গে নিতেন। পূজার সময় রাশি রাশি কাপড় দিতেন। রাত্রে কাঁদিলে নিজের কাছে তুলিয়া লইয়া যাইতেন ও শান্ত করিতেন। সকলের আদর পাইয়া কৃষ্ণবিহারী কি রকম দুরন্ত হইয়া গেলেন। দুরন্তপনা আর কাহারও সঙ্গে নয় শুধু আমার সঙ্গে ও আমার বড় বৌএর সঙ্গে। ছেলেবেলায় পড়িতে চাহিতেন না, আমিও ছোট ছেলে বলে কিছুই বলিতাম না। শেষে নবীন এক

দিন আমায় বকিলেন, যে "তুমি ওকে মূর্খ করবে।" সেই সময় তাকে ধরিয়া স্কুলে দেওয়া গেল, কিন্তু আশ্চর্য্য সেই থেকে যে তার পড়ায় কি মন বসিল তার পর থেকে আর স্কুল কামাই করে নাই। কিম্বা পড়ায় অমনোযোগী হন্ নাই। কৃষ্ণবিহারী ছেলেবেলা হ'তে খুব বুদ্ধিমান্ ছিলেন, স্কুলের যাওয়ার সময় হইতেই ফাষ্ট প্রাইজ পাইতে আরম্ভ করিলেন। ঐ বাড়ীর গোল সিঁড়িতে তেতলার ছাদে কেশব কৃষ্ণবিহারীকে লইয়া পড়িতেন, সেথানে আর কেহ যাইত না। কেশবের মত কৃষ্ণবিহারীর বৈষ্ণব ধর্ম্মে দীক্ষা হয় নাই, কিন্তু দুজনের পৈতা হইয়াছিল। পৈতা হওয়ার পর থেকে কেশব ধর্ম্মে (কুলধর্ম্মে) মেতে গেলেন, এক বৎসর একাদশী করিয়াছিলেন, ভাত খেতেন না।

নবীন ও কেশবের সময় এত পাস্ ছিল না কিন্তু কৃষ্ণবিহারী একে একে সমস্ত পাস্ দিতে আরম্ভ করিলেন, চারিদিকে তাঁর নাম বেরুতে লাগিল।

আমার ভাশুরপো ওপিন ও রাজেশ্বরীর ছেলে বেহারীলাল গুপ্ত (ইনিও আমাদের বাড়ীতে থাকিতেন) এই তিন জনে বড় বন্ধুত্ব ছিল। ইহাদের নাম ছিল উচ্ছে (কৃষ্ণবিহারী) আলু (বেহারী গুপ্ত) পটল (উপেন)। কৃষ্ণবিহারী যখন লেখা পড়া শিখে বিদ্বান্ হইলেন, তখন তাঁহার বিলাত যাওয়ায় কথা হইল, সমস্ত ঠিক, কৃষ্ণবিহারীও নিজে প্রস্তুত, কিন্তু আমি দিলাম না। কৃষ্ণবিহারী বিলাত যাইবেন শুনে আমি মূর্চ্ছা গিয়াছিলাম। আমার অবস্থা দেখে কৃষ্ণবিহারী বিলাত যাওয়ার সংকল্প ত্যাগ করিলেন। আমার জন্য কৃষ্ণবিহারীর সব গেল। চিরকালই তিনি আমার জন্য কষ্ট পাইয়াছেন। আগেই বলিয়াছি কৃষ্ণবিহারী আমার সঙ্গে সব সময় আব্দার করিতেন। আমাকে রাগাবার জন্য বলিতেন আমি টেবিলে বসে খানা খাব আর ঢগ্ ঢগ্ ক'রে মদ ঢাল্‌ব আর খাব। এ শুনে আমি ভয় খেতাম। আমি এত ভয় করিতাম যে তিনি যে দিন ঠাকুরদের বাড়ী যাইতেন, সেখান থেকে ফিরে এলে, যখন ঘুমাইতেন আমি তাঁর মুখ শুঁকে দেখ্‌তাম যে সত্যি মদ খাইয়াছেন কি না। কিন্তু ছেলেবেলা হইতে আমার ছেলেদের এত মনের বল ছিল যে, কতরকম লোকের সঙ্গে মিশেও এক দিনের জন্য ভ্রমেও কুপথগামী হয়েন নাই। এই বিষয় আমি চিরকাল সুখী। একটা পাস্ বাকী থাকিতে কৃষ্ণবিহারীর বিয়ে দিলাম, সে বিয়ে এক নূতন রকম। কৃষ্ণবিহারীর অনেক বড় বড় ঘর থেকে সম্বন্ধ আসে কিন্তু আমি একটি মেয়ে ঠিক করি তারপর যখন কৃষ্ণবিহারীকে বিয়ের কথা বলি, তখন কৃষ্ণবিহারী বলিলেন, "মা বিয়ে আবার লোকের কটা হয়?" আমি বলিলাম, তোর আবার বিয়ে হইল কখন? কৃষ্ণবিহারী এই কথা শুনে বলিলেন, আমি পটলডাঙ্গার তারক সেনের বড় মেয়েকে মনে মনে বিয়ে করিয়াছি।

ভাশুর ঐ মেয়ের পিতার কুলের বিষয় লইয়া বিবাহে ভয়ানক অমত করিলেন, কেন না তাঁহারা কুলে আমাদের চেয়ে ছোট ছিলেন। শেষে আমি এই বিবাহের জন্য অনেক সাধ্য সাধনা করাতে মত দিলেন। আমাদের নিচু বাগানের বাগান ওয়ালা বাড়ীতে কৃষ্ণবিহারীর বিবাহ হয়। কৃষ্ণবিহারী চিরকালই গরিব ছিলেন, বিয়েও গরিবের মতন হইল। শেষে বৌ যখন এলেন এবং সেই বৌ লইয়া যখন ভাশুরকে দেখান গেল, তখন তিনি বৌ দেখিয়া বলিলেন, এমন সুন্দর বৌ আমাদের বাড়ীতে একটীও হয় নাই। বিয়ের পর আমি নিজে কৃষ্ণবিহারীর বৌকে লইয়া গিয়া মন্দিরে কেশবের নিকট দীক্ষিত করাই। সেই সঙ্গে আনন্দ বসু ও তাঁর স্ত্রী এবং গোপাল রায় আরও কে কে দীক্ষিত হন।

দীক্ষার পর কৃষ্ণবিহারী একেবারে মাটীর মানুষ হইয়া গেলেন। কৃষ্ণবিহারীর পড়ার উপর চিরকাল ঝোঁক ছিল, সব সময় বই সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। তিনি ঐ বারওয়ারি স্কুল করিয়াছিলেন তাহাতে বাড়ীর বৌদের পড়াইতেন, বৌরা এক এক সময় ঠাট্টা করিতেন যে "তোমাকে আমরা হাতে করে মানুষ করিলাম, আবার তোমার কাছে পড়িব।" আবার বৌরা তাঁকে সব সময় মাষ্টার মাষ্টার বলিয়া ডাকিতেন।

আমার ভাশুর কৃষ্ণবিহারীকে খুব স্নেহ করিতেন। তিনি আমার দেবর মুরলীধর সেনকে লিখিয়া গিয়াছিলেন যে তিনি কৃষ্ণবিহারীর গোবিন্দবাবুর ও মুরলীধরের টাকা ধারেন, কিন্তু কৃষ্ণবিহারী চিরদুঃখী কিছু পায় নাই, সুতরাং কৃষ্ণবিহারীর টাকা আগে দিয়া তারপর যেন তাঁহারা দু'জনে টাকা লন। সেই কাগজ মুরলীধর নিজের কাছে রাখিয়া দিয়াছিলেন পরে তমাদি হইলে সেই কাগজ কৃষ্ণবিহারীকে দেন। কৃষ্ণবিহারী একটা কথাও বলিলেন না। চিরকাল যেমন নীরবে সহ্য করিয়াছিলেন, তখনও সহ্য করিলেন। মুরলীধরের মৃত্যুর পর কৃষ্ণবিহারীর যে কি কষ্ট হইয়াছিল তাহা বলা যায় না, ছেলে মানুষের মত খুড়ার জন্য কাঁদিয়াছিলেন। খুড়াও মৃত্যুশয্যায় অনবরত "কৃষ্ণবিহারী কৃষ্ণবিহারী" ছাড়া আর কোনও কথা ছিল না।

কৃষ্ণবিহারী চিরকালই কেশবের অনুগত ছিলেন, দীক্ষিত হওয়ার পর ছোট দাদা ছোট দাদা বলে ক্ষেপিয়া গেলেন, কৃষ্ণবিহারীর জয়পুরে বেশ বড় কাজ হইয়াছিল কিন্তু তিনি বড় স্বাধীন প্রকৃতি লোক ছিলেন বলিয়া সেই কাজ করিতে পারিলেন না। রাজার কাছে রোজ গিয়া বসিয়া থাকাটা তাঁর ভাল লাগিল না।

(ক্রমশঃ।)

মাংসাহার।

এতদ্দেশের আধুনিক শিক্ষিত নরনারীদের সংস্কার যে মাংসাহার ভিন্ন

দৈহিক উন্নতি সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইতে পারে না, দেহকে বলবান্ ও পুষ্ট করিতে হইলে মাংস আহার একান্ত প্রয়োজন। ইয়োরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশের লোকেরা মাংসভোজী, মাংস তাহাদের প্রধান খাদ্য, তাঁহাদের মধ্যে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা পরীক্ষা করিয়া ইহার বিপরীত সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছেন, এবং মাংস আহার হ্রাস কিংবা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ করিতেছেন।

"রিভিউ সাইন্টিফিক" পত্রিকা লিখিয়াছেন যে যাহারা মাংস খায় তাহাদের অপেক্ষা নিরামিষভোজীরা বিনা ক্লান্তিতে অধিকক্ষণ কাজ করিতে পারে।"

আমেরিকার অধ্যাপক আর্ভিং ফিশার এই সম্বন্ধে পরীক্ষা করিয়াছেন। তিনি বলেন—

"খাদ্য বিশেষে আমাদের শরীরে য়ুরিক অ্যাসিড অধিক পরিমাণে উৎপন্ন করে। এই য়ুরিক অ্যাসিডের একটা গুণ এই যে তাহা রক্তকে গাঢ় করে। রক্ত গাঢ়তর হইলে তাহাকে শরীরের সূক্ষ্ম শিরাগুলির মধ্য দিয়া চালনা করিতে গেলে হৃৎপিণ্ডকে বেশি চাপ প্রয়োগ করিতে হয়। তাহাতে অনেকটা শক্তি খরচ হইয়া যায়। যাহারা অনেকক্ষণ পরিশ্রম করিতে পারে দেখা গিয়াছে তাহাদের রক্তের চাপ কম। মাংসভোজনে যে শরীরে য়ুরিক অ্যাসিড অধিক পরিমাণে জন্মে তাহা সকলের জানা আছে।

একটা মত চলিত আছে যে অতিরিক্ত শ্রমে শরীরে একটা বিষ জন্মে—সেই বিষে জন্তুকে ক্লান্ত করে। জন্তুর মাংস খাইবার কালে সেই বিষকেও আমরা উদরস্থ করি। এই ক্লান্তিবিষ আমাদের শ্রমের ব্যাঘাতকর হয়।

এ সম্বন্ধে আর একটি মত আছে। ভাত, গম, যব প্রভৃতি হইতে আমরা যে আঙ্গারিক পদার্থ সংগ্রহ করি তাহা এবং স্নেহপদার্থগুলি শরীরের দাহক্রিয়ায় সম্পূর্ণরূপে পুড়িতে পারে। পুড়িয়া তাহারা কার্ব্বনিক অ্যাসিড ও জল আকারে পরিণত হইয়া আমাদের প্রশ্বাস প্রভৃতির দ্বারা বহির্গত হইয়া যায়। কিন্তু মাংসে যে এল্‌বুমেন পদার্থ আছে তাহা এমন করিয়া নিকাশ হইতে পারে না। শরীরে এই এল্‌বুমেন এমন কতকগুলি অবশেষ রাখে যাহার দানা বাঁধিবার স্বভাব আছে। ইহাদের মধ্যে য়ুরিক অ্যাসিড একটি। ইহারাই শরীরে জমিয়া তাহাকে ক্লান্ত করিতে থাকে।

অতএব যে খাদ্যে এল্‌বুমেনের অংশ অল্প তাহা আমাদিগকে অধিক পরিমাণে শ্রমের উপযোগী করে। আধুনিক ডাক্তারেরা রোগীর পথ্য হইতে এই সকল কারণে মাংস বাদ দিতেছেন।

লেখক বলেন আজ কাল য়ুরোপে অনেকে তাঁহাদের সায়াহ্ন ভোজনে মাংস বর্জ্জন করিতেছেন—তাহাতে তাঁহারা বিশেষ উপকার পাইয়াছেন। মাংসাহারে যাঁহারা অভ্যস্ত তাঁহারা তাহা একেবারে ত্যাগ করিলে সহ্য করিতে পারেন না কারণ পাকস্থলী হঠাৎ নূতন খাদ্য পরিবর্ত্তনকে প্রসন্নভাবে গ্রহণ করে না, কিন্তু

ক্রমে সহাইয়া মাংস ত্যাগ করিলে যে উপকার হয় তাহাতে সন্দেহ নাই।”

চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজের অষ্টম বার্ষিক রিপোর্ট।

(১৯০৮—৯)

অনন্ত করুণাময়ী জননীর কৃপায় আমাদের ভগ্নীসমাজ অদ্য অষ্টম বৎসর অতিক্রম করিয়া নবমবর্ষে পদার্পণ করিতেছেন। আজ ভগ্নীসমাজের শুভ জন্মোৎসব দিনে মায়ের করুণা স্মরণ করি এবং ভক্তি ও কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার চরণে লুণ্ঠিত হই।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট ভগ্নীসমাজ সংস্থাপিত হইয়াছে। ১৯০১ খ্রীঃ হইতে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই আগষ্ট পর্য্যন্ত শ্রীযুক্তা আশালতা পট্টনায়ক ইহার সম্পাদিকা ছিলেন তিনি ৭ সাত বৎসর কাল ভগ্নীসমাজের কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদন করিয়া বিগত ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর পরিণীতা হইয়া স্থানান্তরে অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি এতকাল দেহ মন দিয়া ভগ্নী সমাজের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন, তাঁহারই যত্নে ভগ্নীসমাজ নিয়মিত রূপে চলিয়াছে। আজ শুভদিনে আমরা তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ প্রদান করি। যদিও তিনি স্থানান্তর গমনবশতঃ সম্পাদিকা পদ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছেন তবুও এখন পর্য্যন্ত নিয়মমত চাঁদা দিয়া ভগ্নীসমাজের সাহায্য করিতেছেন এবং সর্ব্বান্তঃকরণে ভগ্নীসমাজের উন্নতি ও কল্যাণ কামনা করিতেছেন। আমরা পরম জননীর নিকট এই প্রার্থনা করি তিনি আমাদের ভগ্নীকে তাঁহার সেবায় নিযুক্ত রাখিয়া চিরসুখী করুন।

নানা প্রতিবন্ধকতায় সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর দুই মাস সমিতির অধিবেশন হয় নাই।

১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ১লা নবেম্বর হইতে ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত ভগ্নীসমাজ অষ্টম বৎসরের কার্য্য-বিবরণ সংক্ষেপে বিবৃত করিতেছি।

১লা নবেম্বর হইতে ১৬ই মে পর্য্যন্ত সহকারিণী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরোজিনী চৌধুরী উৎসাহের সহিত সমিতির কার্য্যভার বহন করিয়া আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। মা তাঁহার কন্যাকে তাঁহার কার্য্যে আরও উৎসাহ প্রদান করিয়া ধন্য করুন।

১৬ই মে ভগ্নীসমাজের কার্য্য নিম্নলিখিত রূপে বর্দ্ধিত ও বিভক্ত হয়। প্রত্যেক বিভাগের বিশেষ ভার এক এক জন ভগিনী গ্রহণ করেন।

১। ধর্ম্ম ও নীতি বিভাগ—উপাসনা, পাঠ, আলোচনা, প্রবন্ধ লেখা ও পড়া পর্য্যায়ক্রমে সকলেই করিবেন, না করিলে তজ্জন্য সম্পাদিকা দায়ী হইবেন।

২। সহকারিণী সম্পাদিকা শ্রীযুক্তা সরোজিনী চৌধুরী মহাশয়া কার্য্যবিবরণী লেখা ও পড়ার ভার গ্রহণ করিলেন।

৩। শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী গুপ্তা মহাশয়ার উপর লাইব্রেরীর ভার অর্পিত হইল। পুস্তক রক্ষা করা, যাহাতে সকলে

পুস্তক পড়েন তাহার চেষ্টা করা, পুস্তক ফিরাইয়া লওয়া লাইব্রেরীর পুস্তক বৃদ্ধি করা এই সব কাজ তিনি করিবেন।

৪। শিক্ষা-বিভাগ ভগ্নী সমাজের প্রত্যেক ভগ্নী অপরকে লেখা পড়া ও সেলাই শিক্ষা দিতে দায়ী, যেরূপে হউক অন্ততঃ এক জনকে প্রত্যেক ভগ্নী নিয়মিত রূপে শিক্ষা দান করিবেন। এ কাজ সকলে নিয়ম মত করিতেছেন কি না, কে কে কাহাকে কাহাকে কিরূপ শিক্ষা দান করিতেছেন তাহা দেখিবার জন্য এবং সে কাজ যাহাতে ভালরূপে চলে সে জন্য বিশেষ যত্ন নেওয়ার ভার শ্রীযুক্তা অনন্তময়ী দাস মহাশয়ার উপর অর্পিত হইল।

৫। শিল্প-বিভাগ—সেলাই শিখান, সেলাই দ্বারা আয় বৃদ্ধি করা, পুরানা ও নূতন কাপড় সেলাই করা প্রভৃতি কার্য্য সকল ভগ্নীই করিবেন এবং মাসান্তে একটি শিল্পজাত দ্রব্য ভগ্নীসমাজে দান করিবেন। তাহা সংগ্রহ করা ও রক্ষা করা এবং তাহা বিক্রয় করিয়া লব্ধ আয় দ্বারা পুনঃ বস্ত্র ক্রয় করিয়া ভগ্নীদিগকে দেওয়া, কে কে কি কি সেলাই দিলেন তাহারও আয় ব্যয়ের হিসাব রাখা, বিক্রয় লব্ধ আয় দ্বারা কি হইবে সে বিষয়ে ভগ্নীসমাজের পরামর্শ লওয়া এই সব কার্য্যভার শ্রীযুক্তা অমলাবালা সেন মহাশয়ার উপর অর্পিত হইল।

৬। দাতব্য-বিভাগ—দান সংগ্রহ করা, বস্ত্র ও ঔষধ সংগ্রহ করা এবং সকলের মত নিয়া উপযুক্ত পাত্রে বিতরণ করা এই সব কার্য্যভার শ্রীযুক্তা সাবিত্রীবালা বিশ্বাস মহাশয়া গ্রহণ করিলেন।

৭। সেবা-বিভাগ—প্রত্যেক ভগিনী এরূপভাবে সেবা করিবেন। যেন তাহা দেখিয়া গৃহের শিশুটী পর্য্যন্ত সেবা শিক্ষা করিতে পারে। অসহায়, অসহায়া, রুগ্ন, দরিদ্র নরনারীর সেবার জন্য প্রত্যেক ভগিনী আপনাকে দায়ী মনে করিবেন এবং এরূপ নরনারীর সংবাদ পাইলে ভগ্নীসমাজে তাহা জ্ঞাপন করিবেন। ভগ্নীগণ তাহার সম্বন্ধে ইতি কর্ত্তব্যতা নির্দ্ধারণ করিবেন।

৮। দুই মাসে অন্ততঃ একবার এক এক জন উপযুক্ত লোক ভগ্নীসমাজে নিমন্ত্রিত হইবেন তাঁহারা নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ভগ্নীদিগকে শিক্ষাদান করিবেন।

৯। প্রবন্ধগুলি পর্য্যায়ক্রমে লিখিত হইবে এবং তাহা পূজনীয় শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয়কে দিতে হইবে।

১০। চিঠি বিলি করা, স্থানীয় এবং বিদেশীয় ভগ্নীদিগকে বিশেষ পত্র লেখা ভগ্নীসমাজের চাঁদা সংগ্রহ করা, গাড়ীর বন্দোবস্ত করা, আয় ব্যয়ের হিসাব ও সমস্ত বিভাগের কার্য্য বিবরণ রক্ষা করা প্রভৃতি কার্য্যভার সম্পাদিকা বহন করিবেন। বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও যাহাতে সমিতির কার্য্য নিয়মিত চলে সে জন্য বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

১১। সভ্য সংখ্যা যাহাতে বৃদ্ধি হয় তজ্জন্য প্রত্যেক ভগ্নী বিশেষ চেষ্টা করিবেন।

মায়ের কৃপায় ভগ্নীসমাজের বর্ত্তমান

সভ্য সংখ্যা ২৫ জন গত বৎসর দশজন, ছিলেন। ৩টী ভগ্নী বিদেশে থাকিয়াও নিয়ম মত চাঁদা দিয়াও প্রবন্ধ লিখিয়া ভগ্নী সমাজের সহিত যোগ রক্ষা করিতেছেন। স্থানীয় একটী ভগ্নী চাঁদা দিয়াও প্রবন্ধ লিখিয়া যোগরক্ষা করিবেন, কিছুদিন উপস্থিত থাকিতে পারিবেন না জানাইয়াছেন তিনিও সভ্যশ্রেণীভুক্তা। অবশিষ্ট ১টী ভগিনী নিয়মিত সভ্য। গড় উপস্থিত সংখ্যা দশজন এবৎসর এদেশের স্বাস্থ্য নিতান্ত খারাপ হওয়াতে ভগ্নীগণ ও সন্তানগণ পীড়িত থাকা প্রযুক্ত উপস্থিত সংখ্যা বড় কম হইয়াছে। ১লা নবেম্বর হইতে ১লা আগষ্ট পর্য্যন্ত ১৭টী অধিবেশন ও একটী বিশেষ অধিবেশন মোট ১৮টী অধিবেশন হইয়াছে! গত বৎসর গড় উপস্থিত সংখ্যা দশজন ও ১২টী অধিবেশন হইয়াছিল। সম্পাদিকা দীর্ঘকাল পীড়িতা থাকায় সমিতির কার্য্যে মনোযোগ দিতে পারেন নাই, তজ্জন্যই ওরূপ হইয়াছিল।

উপাসনা।—ভক্তিভাজন শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় ১ দিন শ্রীযুক্ত রাজেশ্বর গুপ্ত মহাশয় ১ দিন, শ্রীযুক্ত অনঙ্গচন্দ্র দত্ত মহাশয় ১ দিন, শ্রীযুক্তা বিন্দুবাসিনী সেন মহাশয়া ৩ দিন, শ্রীযুক্তা কামিনীসুন্দরী গুপ্তা মহাশয়া ১ দিন ও সম্পাদিকা ৪ দিন করিয়াছেন। ১১ দিন উপাসনা হইয়াছে। ৭ দিন প্রার্থনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

আলোচ্যবিষয়।—(ক) সাধ্বী মীরাবাইয়ের জীবনী। (খ) সভ্য বৃদ্ধি করা। (গ) ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকাকে স্মৃতিচিহ্ন উপহার দেওয়া। (ঘ) একাগ্রতা সাধন। (ঙ) ভগ্নীসমাজের কার্য্যের অভাব। (চ) সাধনা। (ছ) সেবা। (জ) ভগ্নীসমাজের কাজ কিরূপ হওয়া উচিত। (ঝ) মিতভাষিতা। (ঞ) সেলাই দ্বারা ভগ্নীসমাজের আয় বৃদ্ধি করা। (ট) অন্যের সদ্‌গুণ অন্বেষণ ও নিন্দা পরিহার। (ঠ) সর্ব্ব ধর্ম্মের সাধু মহাজনদের প্রতি ভক্তি ও নির্ব্বিশেষে সকলকে প্রেম ও সমাদর করা। (ড) বিরক্ত হইলেও নীরবে থাকা ও ভাব ভঙ্গীতেও তাহা প্রকাশ না করিতে অভ্যাস করা। (ঢ) ভগ্নীসমাজের প্রতি আকর্ষণ ও উৎসাহ বৃদ্ধির উপায়। পর্য্যায়ক্রমে উপাসনা করা ও উৎসব।

আলোচ্যবিষয়ই মধ্যে মধ্যে সাধনার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছে। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সাধনার জন্য গ্রহণ করা হইয়াছিল।

১। সহিষ্ণুতা। ২। সেবা। ৩। মিতভাষিতা। ৪। সদ্‌গুণ অন্বেষণ ও নিন্দা পরিহার। ৫। সাধু ভক্তি ও সকলের প্রতি প্রেম। ৬। বিরক্ত হইলেও প্রকাশ না করা।

প্রবন্ধ।—এবৎসর ৬টী ভগ্নী কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত ৭টী বিষয়ে ৭টী প্রবন্ধ লিখিত ও পঠিত হইয়াছে।

১। প্রকৃত সুখ কোথায়? ২। সন্তান পালন ও তদ্দ্বারা জননীর শিক্ষা। ৩। ঈশ্বর পরমাশ্রয়। ৪। জাগরণ। ৫। জীবনের লক্ষ্য। ৬। আত্মোন্নতির উপায়। ৭। সমাজে নারীর দায়িত্ব। সবগুলি প্রবন্ধই সুলিখিত ও শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। এইরূপ

প্রবন্ধ পর্য্যায়ক্রমে লিখিত হইলে ভগ্নী-সমাজে বেশ শিক্ষালাভ করিতে পারেন এবং লেখিকাগণ ভগ্নীসমাজের ও দেশের হিত সম্পাদন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। সবগুলি প্রবন্ধই এত সুন্দর হইয়াছে যে ২টী প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় মুদ্রিত হইয়াছে। অন্যগুলিও মুদ্রিত হইবার উপযুক্ত।

লাইব্রেরী।—এবৎসর লাইব্রেরীর কোনও উন্নতি সাধিত হয় নাই পুস্তকাদিও ভগ্নীগণ লাইব্রেরী হইতে নিয়া পড়িতে সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই। এইবার মাত্র ১২টী ভগ্নী ১২ খানা পুস্তক পাঠার্থ গ্রহণ করিয়াছেন। লাইব্রেরীর উন্নতি সাধিত হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। ভগ্নীগণের পাঠোপযোগী অধিক পুস্তক লাইব্রেরীতে নাই। সাধ্বী নারীদিগের জীবনী অধিক পরিমাণে আনয়ন করা অত্যাবশ্যক। লাইব্রেরীর কয়েক খানা পুস্তক পাওয়া যাইতেছে না। যাহাতে পুস্তকগুলি সযত্নে রক্ষিত হয় সেজন্য বিশেষ সতর্ক হওয়া প্রয়োজন। ভগ্নীসমাজের জন্য ২।১ খানি মাসিক পত্রিকা গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন বোধ হইতেছে। ভগ্নীসমাজে নিয়ম মত প্রবন্ধ প্রেরণ করিলেই ত্বই এক খানি মাসিক পত্রিকার গ্রাহিকা হইতে পারেন। লাইব্রেরীতে মোট ৯১ খানা পুস্তক ছিল নিম্নলিখিত তিনখানা পুস্তক পাওয়া যাইতেছে না—১। মহর্ষির আত্ম-জীবনী। ২। হিমাচলের প্রার্থনা। ৩। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন। উক্ত তিনখানা ব্যতীত এখন মোট ৮৮ খানা বই লাইব্রেরীতে আছে। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে শ্রীযুক্ত জানকীনাথ দাস বি, এ, মহাশয় তাঁহার পিতার আদ্যশ্রাদ্ধোপলক্ষে লাইব্রেরীর জন্য ২৲ দুটী টাকা দান করিয়াছেন। এবং শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা ইন্দ্রানমী দাস মহাশয়া তাঁহার দ্বিতীয়া কন্যা, আমাদের স্নেহের ভগিনী শ্রীমতী তরুবালার শুভ বিবাহোপলক্ষে ভগ্নীসমাজে ২৲ দুটী টাকা দান করিয়াছেন।

শিক্ষা-বিভাগ।—এবিভাগে এখন পর্য্যন্ত উল্লেখ যোগ্য তেমন কোন কাজ হইতেছে না। যাঁহাকে এবিভাগের বিশেষ ভার অর্পণ করা হইয়াছিল তিনি কার্য্যভার গ্রহণে সম্মতা হইয়াও শারীরিক অসুস্থতা বশতঃ কার্য্যভার বহনে অক্ষমা। আশা করি তিনি সুস্থা হইয়া তাঁহার কার্য্য উৎসাহের সহিত নির্ব্বাহ করিয়া ভগ্নী-সমাজের উন্নতি বিধান করিবেন। তবুও বলিতে পারি কোন কোন ভগ্নী আপনার সন্তানদিগকে নিয়মিত শিক্ষাদান করিতেছেন। কেহ কেহ কোন কোন ভগ্নীকে সেলাইও শিক্ষা দিয়াছেন। তাঁহারা ইহা দ্বারা সমাজের উপকার করিয়াছেন সন্দেহ নাই।

শিল্প-বিভাগ।—এবিভাগের ভারপ্রাপ্তা ভগ্নীও দীর্ঘকাল পীড়িতা থাকাতে নিজ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে পারেন নাই, এ বিভাগের কার্য্যও একরূপ বন্ধ রহিয়াছে। কেবলমাত্র দুটী ভগিনী (শ্রীযুক্তা পার্ব্বতী-বালা অধিকারী ও শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী গুপ্ত) দুইটী শিল্পদ্রব্য প্রদান করিয়া ভগ্নী-সমাজকে উপকৃত করিয়াছেন।

দাতব্য-বিভাগ।—ভারপ্রাপ্তা ভগিনী অতি অল্প দিন মাত্র কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন, তার উপর নিজেও অসুস্থা ছিলেন, তাই এ বিভাগের কার্য্যও আশানুরূপ হয় নাই অতি সামান্য চাঁদা সংগৃহীত হইয়াছে তাহা উৎসব দিনের দান কার্য্যেই ব্যয়িত হইবে। আশা করি ভারপ্রাপ্তা ভগিনী এ বিভাগের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করিয়া আমাদিগকে সুখী করিবেন। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে দাতব্য বিভাগের জন্য নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত দান প্রাপ্ত হইয়াছি।

শ্রীযুক্তা রামপ্যারী দেবী	১৲
„ কুমুদিনী দেবী	১৲
বালিকা স্কুলের কোন শিক্ষয়িত্রী	১৲
বালিকা স্কুলের ছাত্রীগণ কর্ত্তৃক বালিকা স্কুল হইতে সংগৃহীত	৪৷০
সংগৃহীত ক্ষুদ্র দান	৫৲

শ্রীযুক্তা রামপ্যারী দেবী কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত ভগিনীদিগের নিকট হইতে সংগৃহীত।

শ্রীযুক্তা রাণী দেবী	৶০
„ বিদ্যুল্লতা মিত্র	৶০
„ হরসুন্দরী প্রজাপতি	।০
„ দিলজান বিবি	।৶০
„ মিশ্রিজান	।৶০
„ মাতাবজান	।০
„ জমিলা খাতুন	।০
„ জবেদা খাতুন	।০
„ মতিরনেছা	।০

সেবাবিভাগ।—কয়েকটী ভগ্নী বিশেষ ভাবে এবার সেবা কার্য্যে ব্যবহৃতা হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা জ্ঞানবালা দত্ত মহাশয়া ধাত্রীকার্য্যে সুনিপুণা। তিনি কয়েক বৎসর যাবৎ একার্য্য করিয়া বিপন্না প্রসূতিদিগের সেবা করিয়া মায়ের আশীর্ব্বাদ ভাজন ও আমাদিগের ধন্যবাদার্হা হইয়াছেন। এ বৎসরও তিনি ঐরূপ সেবাকার্য্যে ব্যবহৃতা হইয়া ধন্যা হইয়াছেন। শ্রীযুক্তা মানদাবালা সেন মহাশয়া পীড়িতা ভগিনী অমলাবালাকে নিজগৃহে আনিয়া বিশেষ সেবা যত্ন করিয়া আরোগ্য করিয়াছেন। তিনি এই কার্য্য দ্বারা আমাদিগকে সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদর্শন ও আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছেন।'

শ্রীযুক্তা রমাসুন্দরী গুপ্ত মহাশয়া প্রতিবেশীদের নানা প্রকার সেবা করিয়া আমাদের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা ভাজন হইয়াছেন।

একটী অনাথ বালিকাকে আশ্রয় দিয়া তাহার সদ্গতির জন্য কিছু চেষ্টা করা হইয়াছিল কিন্তু কিছুদিন পরেই বালিকাটী হঠাৎ চলিয়া যাওয়াতে তাহার জন্য কিছুই করা যায় নাই। ভগবান্ আমাদিগের সহায় হউন। আমরা তাঁহারই প্রীত্যর্থে জগতের সেবা করিয়া শুদ্ধ হই।

এবৎসর তিনজন ভক্তিভাজন ভ্রাতা উপাসনা করিয়াও উপদেশ দান করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করিয়াছেন আমরা এজন্য তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

বিগত ৮ই জুন বেথুন কলেজের লেডী প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্তা কুমুদিনী দাস বি, এ, মহাশয়ার চট্টগ্রাম আগমনোপলক্ষে বিশেষ

অধিবেশন ও তাঁহাকে উপদেশ দানার্থ অনুরোধ করা হইয়াছিল। তিনি আলোচনায় যোগ দান করিয়া ও আমাদিগকে উপদেশ দিয়া সুখী করিয়াছিলেন, আমরা এজন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ আছি। তিনি ভগ্নীসমাজের কার্য্য দেখিয়া বিশেষ সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আয় ব্যয়—বিগত বৎসর ৪১৷৷১৭৷৷ পয়সা আয় ৪৩৷৵৭৷৷ পয়সা ব্যয় হইয়াছে। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদিকাকে স্মৃতি উপহার দানার্থ ৫৲ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল; দুঃখের বিষয় এপর্য্যন্ত তাঁহাকে কিছু দেওয়া হয় নাই।

৮ বৎসর পূর্ণ হইয়া গেল মা আমাদিগের জন্য এই শিক্ষাক্ষেত্র খুলিয়াছেন এবং আমাদিগকে নানারূপ শিক্ষাদানে ব্যস্ত রহিয়াছেন, এই ভগ্নীসমাজ মায়ের ব্যস্ততারই নিদর্শন। তিনি আমাদিগকে তাঁহার উপযুক্তা কন্যা করিয়া লইবার জন্য কতই ব্যস্ত। কিন্তু আমরা এতই চঞ্চলচিত্ত ও অবাধ্য যে মায় শ্রীমুখের বাণী শ্রবণ করিতে ও তদনুসারে চলিতে প্রস্তুত নই। তাই এখনও আমরা মায় মনোমত সুকন্যা হইয়া তাঁর সাধ মিটাইতে পারিতেছি না। কিন্তু সত্য সঙ্কল্পা পরম জননী এই ক্ষুদ্র কন্যাদিগকে লইয়া যে মহৎকার্য্য করিবেন সঙ্কল্প করিয়াছেন, তাহা নিশ্চয়ই করিবেন।

নববর্ষের প্রারম্ভে মা আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন তাঁহার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া নিত্য নব শিক্ষালাভ করি এবং তাঁর ইচ্ছা পালন করিয়া ধন্যা হইতে পারি। তিনিই আমাদের শক্তি, জীবন পথের একমাত্র আলো ও নেত্রী হউন।

শ্রী প্রফুল্লকুমারী চৌধুরী
সম্পাদিকা।

মহিলাদিগের রচনা।

অঞ্জলী।

দিতে অঞ্জলী—
প্রভাতে উঠি,
আবেগে ছুটি,
যতনে লইয়া ডালি।
হইল ভোর,
ঠেলিয়া ঘোর,
উড়িছে মধুপ গুলি॥ ১

দিতে অঞ্জলী;—
জেগেছে পাখী,
দুলিছে শাখী,
তারাই তুলেছে তান।
অমিয় ভরিয়া,
ললিত গাইয়া,
আকুল করিছে প্রাণ॥ ২

দিতে অঞ্জলী;—
ঊষার আলো,
বায় পরিমল,
ধায় ধরণী ব্যাপিয়া।
পল্লব শিরে,
শিক্ত শিশিরে,
মুক্ত রয়েছে ঝাকিয়া॥ ৩

দিতে অঞ্জলী;—
ভকত প্রাণ
গাহিয়া গান,

করিতে মঙ্গল আরতি।
উচ্ছ্বাস ধন্না,
উল্লাসে ভরা,
কতই করিছে মিনতি ॥ ৪

দিতে অঞ্জলী ;—
ফুল্ল সোহাগে,
নব অনুরাগে,
স্বভাব সুন্দরে ভুলি।
কাননে তাই,
তুলিতে যাই,
নবীন প্রসূন কলি ॥ ৫

দিতে অঞ্জলী ;—
রচনা মাঝে,
মোহন সাজে,
কে হাঁসে দেখিতে পাই।
নিয়তি আসে,
নয়ন ভাসে,
নীরবে হরষে খুজিগো তাই ॥ ৬

দিতে অঞ্জলী ;—
কি আছে আর,
সকলি তাঁর,
যাহা কিছু এই জগত মাঝে।
করিছেন দান,
মোদের প্রাণ,
যেন গো তাঁহারি চরণে সাজে ॥ ৭

প্রার্থনা।

(চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজের উৎসবে পঠিত।)

প্রভো—তোমারি মহিমা,
ওগো দয়াময়,
তরুণ তপনে মাখা।
তোমারি মহিমা,
গাহে বনে পাখী,
প্রফুল্ল বদনে আঁকা।
তব কৃপা বলে,
ফুল্ল ফুল দোলে,
মৃদু মৃদু সমীরণে,
তোমারি মহিমা,
মন প্রাণ খুলে,
গায় যোগী ঋষিগণে।
উসাসতী নিতি,
গায় তব গীতি,
নিহায় লহর গলে।
শীতল পবন,
বহিয়ে সঘন,
ভ্রমর চুমিয়ে ফুলে।
কুলু কুলু নাদে,
তোমারি মহিমা,
তটিনী গাইছে ধীরে।
ফুল্ল কমলিনী,
হয়ে মাতোয়ারা,
নাচিছে সরসী নীরে।
মধ্যাহ্ন তপন,
বসিয়ে যখন,
তোমারি মহিমা গায়।
সন্ সন্ সন্,
গুঞ্জরে পবন,
মৃদুল মধুর বায়!
গায় যবে পাখী,
বন আলো মাখী,
কি মধুর বাজে প্রাণে।
ইচ্ছা হয় শুধু,

পাখীটীর মত,
উড়ে উড়ে গাই বনে।
মলিন বসন,
পরিয়ে যখন,
সন্ধ্যাসতী খোলে আঁখি।
হতাশ হৃদয়ে,
আত্মহারা হয়ে,
আমরা নিরখি থাকি।
ক্ষীণপ্রভা করে,
প্রণমি চাঁদিমা,
অনিমেষ আড়ে চায়।
গাইতে বসিল,
তোমারি মহিমা,
জোছনা মাখিয়ে গায়।
জাগুক হৃদয়ে,
তোমারি মহিমা,
ধন্য হো'ক এ হৃদয়।
ছোট বড় মিলে,
গাব মন খুলে,
তোমারি করুণাচয়।

শ্রী কুসুমকামিনী গুহ
চট্টগ্রাম
৩১।০।৭ প্রীতিকুটীর।

[চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজে পঠিত ।]

ভগিনীসমাজে সম্মিলিত হইয়াও আমি অদ্যাপিও সকল ভগিনীর সহিত পরিচিতা হইতে পারি নাই, কিন্তু আমিও একজন ভগিনীগণের ভগিনী, মায়ের কাজে একই উদ্দেশ্যে আমাদের মিলন। আমাদের প্রত্যেকের প্রতি প্রত্যেকের কি কর্ত্তব্য, তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

স্বভাব মায়ার বশীভূত, শূন্য প্রাণের কোন আকর্ষণী শক্তি থাকে না। ভালবাসাই মানুষের জীবনের বন্ধন, ভালবাসা হইতেই একতা, বিশ্বাস এবং আত্মবিনিময় হইয়া থাকে। একে অন্যের সহিত আলাপ পরিচয়ে এবং সরল আত্মপ্রকাশে ও একে অন্যের যথাসাধ্য উপকার করিলে ভালবাসায় ভিত্তি স্থাপিত হয়। এবং ভগিনীর প্রতি ভগিনীর বোধ হয় ইহাই প্রথম কর্ত্তব্য।

আমাদের মা মায়াময়ী, আমরা তাঁহার আরাধনা করিয়া তাঁহার আশীর্ব্বাদ লইয়া তাঁহারই কাজের অনুসরণ করিতে মনন করিয়াছি। সংসারে শান্তি ও পুণ্যের সম্মিলন করিতে আকাঙ্ক্ষিতা হইয়াছি, কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে কিছুই করিতে পারি না, মনের ইচ্ছা মনেই বিলীন হয় কেন? মাতো তাঁহার স্নিগ্ধ স্নেহবারি আমাদিগের প্রাণে সতত সিঞ্চন করিতেছেন আমরা কেন তাহার কণামাত্র জগতে প্রতিদান দিতে পারি না। শুধু গণ্ডীর মধ্যে থাকিয়া পিতা মাতা ভাই বোন্ স্বামী পুত্র কন্যার প্রতিই আমাদের ভালবাসার উৎস বহিয়া যায়। জগৎ ভরিয়া যে আমরা এক মায়ের সন্তান তাহা এক বারও ভাবি না। জগৎকে ভাগ করিয়া অংশক্রমে নিজস্ব করিয়া আত্মপর ভাবে মনকে পরিপূর্ণ করিয়া রাখি। অহঙ্কার, আত্মগরিমা লইয়াই বিব্রত থাকি। মনের এই সকল সঙ্কীর্ণতা দূর করিয়া যেদিন আমরা এই বিস্তীর্ণ জগতে নিজকে বিস্তারিত করিতে পারিব,

যে দিন হইতে আমরা আমাদের গরীব ভাই বোন্‌দের দুঃখ হৃদয়ে ধারণ করিয়া যথাসাধ্য তাহাদের দুঃখ মোচন করিতে পারিব, যে দিন হইতে পরোপকার পরম ধর্ম্ম এই জ্ঞান আমাদের কার্য্যে পরিণত হইবে, সেই দিন হইতে আমরা ভগিনীর ভগিনী নামের যোগ্য হইব।

এ জগতে একা কোন কাজ হয় না, মিলন চাই। মিলন ব্যতিরেকে উৎসাহ হয় না, উৎসাহহীন কাজ কখনও প্রতিষ্ঠালাভ করে না, তাই আমাদের এই শুভ সম্মিলন। আমরা সময়ানুযায়ী মিলিত হইয়া আমাদের উদ্দেশ্যের আলোচনা করিলে নিশ্চয়ই একদিন আমরা সাধনাসিদ্ধ হইতে পারিব।

মায়ের নিকট ব্যাকুলতা জানাইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকিলে ধর্ম্ম হয় না। কর্ম্মই ধর্ম্মের সোপান, মা আমাদিগকে কাজ করিতেই পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, সৎকাজে মা সন্তুষ্ট হন, মানুষ অমরত্ব লাভ করে, মহৎ কাজের স্মৃতিই মানুষের জীবন।

আমার ভগিনীগণ, সকলেই আজ মায়ের নিকট এই শক্তি ভিক্ষা চাই, যেন আমরাও এই শুভ সম্মিলনের কিছুমাত্র কাজ করিয়া একটু ক্ষুদ্র স্মৃতি রেখে যেতে পারি। প্রতিবাসী কি বিদেশী, পরিচিত কি অপরিচিত, গরীব, রুগ্ন, সকলকেই আমাদের ক্ষুদ্র হৃদয়ের স্নেহটুকু দান করিতে পারি!

বালিকার রচনা।

পরোপকার।

[চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজে পঠিত।]

শ্রদ্ধেয়া ভগিনী সম্প্রদায়! ভগিনী সমাজের এই অষ্টম সাম্বৎসরিক উৎসবে আমার ন্যায় ক্ষুদ্রমতি বালিকার পক্ষে প্রবন্ধ রচনা করা: ধৃষ্টতা প্রদর্শন মাত্র। কিন্তু গুরুজনের আদেশ অলঙ্ঘনীয়, এ জন্য নিতান্ত অযোগ্যতা সত্ত্বেও নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি রচনা করিলাম। আশা করি সহৃদয়া ভগিনীগণ আমার সহস্র ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। যে সকল সদ্‌গুণরাশি মহাত্মাদের চরিত্রকে অলঙ্কৃত করে পরোপকার তাহাদের অন্যতম। সমভাবে পরোপকার গুণ সকল দেশেই সমাদৃত। সমভাবে পরোপকার দ্বারা মানবের ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার মঙ্গল সাধিত হয় বলিয়া সকল দেশের ধার্ম্মিক ব্যক্তিরা মানবকে পরোপকারী হইতে উপদেশ দেন। পরোপকারী হইতে হইলে দয়া, মমতা, মহানুভবতা প্রভৃতি কতকগুলি আনুষঙ্গিক গুণ থাকা দরকার, নিষ্ঠুর লোকেরা পরের দুঃখ বুঝিতে পারে না। সুতরাং কদাচিৎ তাহারা পরোপকার করিতে সমর্থ হয়। পরোপকার করিতে হইলে পরের দুঃখ কষ্ট বুঝিতে হইবে। পরের অভাব সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে ও তদনুসারে নিজের অক্লান্ত পরিশ্রম নিয়োগ করিতে হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মহাত্মারা সকলকেই পরোপকারী হইতে

বলেন। খ্রীষ্ট বলেন, "তোমরা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া দরিদ্রকে দান কর।"

হিন্দু ও বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মগ্রন্থ সকল পরোপকার সম্বন্ধে উপদেশে পরিপূর্ণ। অনেকে মনে করেন অর্থ ভিন্ন পরোপকার করিতে পারা যায় না, কিন্তু ইহা তাহাদের ভ্রান্ত সংস্কার। অর্থ ভিন্ন সহস্র উপায়েও পরোপকার করিতে পারা যায়। যিনি মনস্বী তিনি দরিদ্র হইলেও পরের যথেষ্ট উপকার করিতে পারেন। পরোপকারী অন্যের সামান্য উপকারের জন্যও প্রাণ বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত। পরোপকারের সমান ধর্ম্ম আর নাই। সাধু ব্যক্তিরা পরোপকার ব্রতে তাহাদের সমস্ত জীবন উদযাপিত করেন। পরোপকার করিতে পাইলেই তাহাদের মনে আনন্দ হয়। পরোপকারীরা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করেন। এস্থলে পরোপকারের একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত হিন্দু পুরাণ হইতে উদ্ধৃত করিলাম। পুরাকালে বৃত্রাসুর যখন ইন্দ্রাদি দেবগণকে স্বর্গপুরী হইতে বিতাড়িত করিয়া স্বর্গে আধিপত্য করিল, তখন সকল দেবতারা একত্র হইয়া গিয়া বিষ্ণুর নিকট নিজ নিজ দুঃখ নিবেদন করিলেন। বিষ্ণু বলিলেন, তোমরা সকলে দধিচি মুনির নিকট গিয়া তাহার অস্থি প্রার্থনা কর। সেই অস্থি দ্বারা বজ্র অস্ত্র নির্ম্মাণ করিলে সেই অস্ত্রে বৃত্রাসুর নিধন হইবে। তখন দধিচির নিকট গিয়া দেবতারা তাঁহার অস্থি প্রার্থনা করিলেন। মহামুনি তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আমি মরিলে যখন দেবতারা রক্ষা পাইবেন তখন আমার এই ক্ষণস্থায়ী শরীর রাখিয়া কোনও প্রয়োজন নাই। এই বলিয়া আত্মত্যাগের জলন্ত দৃষ্টান্ত মহামুনি যোগাসনে বসিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। ফলতঃ পরোপকার করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে স্বার্থ বিসর্জ্জন শিক্ষা করিতে হইবে। আমাদের দেশে আজি কালিও পরোপকারের দৃষ্টান্ত নিতান্ত বিরল নহে। পরোপকারের মহৎ দৃষ্টান্ত বিদ্যাসাগর মহাশয়, পথ-পার্শ্ব-শায়ী বিসূচিকা রোগাক্রান্ত দীন-হীন কত লোককে বাড়ীতে লইয়া গিয়া চিকিৎসা করাইতেন। এক জন ধীবর পরের প্রাণ রক্ষার জন্য কিরূপ ভাবে নিজের জীবন বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্ময়সাগরে নিমগ্ন হইতে হয়। ১৩০৯ সালের প্রবল বর্ষণের কথা বোধ হয় সকলেই জ্ঞাত আছেন। সেই সময় কলিকাতা হইতে খুলনা পর্য্যন্ত যে রেলপথ গিয়াছে বৃষ্টির জলে তাহার একটি পুলের কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া যায়। কর্ত্তৃপক্ষ না জানিয়া রাত্রি নয়টার ট্রেণ রওয়ানা করিয়া দিয়াছেন। একটী ধীবর পুলের নিকট দাঁড়াইয়া মাছ ধরিতেছিল, সে দেখিতে পাইল গাড়ী যেরূপ দ্রুতবেগে আসিতেছে তাহাতে মুহূর্ত্তমধ্যে পুলের উপর আসিয়া পড়িবে ও অসংখ্য জনপ্রাণিসহ বিনষ্ট হইবে।

যেরূপ ঘর ঘর শব্দ হইতেছে তাহাতে শত ঢাক বাজাইলেও শ্রুতিগোচর হইবে না। তখন ধীবর কুলতিলক গাড়ীর রাস্তার উপর আসিয়া দাঁড়াইল এবং এক খণ্ড যষ্টী দ্বারা কাপড়ের অগ্রভাগ নাড়িতে

লাগিল। উদ্দেশ্য এই যে চালক তাহাকে দেখিতে পাইয়া গাড়ী থামাইবেন, নয় গাড়ী তাহার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে এবং পরমুহূর্ত্তেই গভীর খাদে নিমগ্ন হইয়া অসংখ্য জন-প্রাণিসহ বিনষ্ট হইবে। ভগবান্ সদয় হইলেন। চালক ধীবরকে দেখিতে পাইয়া গাড়ী থামাইলেন এবং রাস্তার বিপদের কথা অবগত হইয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। তখন সেই বিজন প্রান্তরে যে কি বিমল আনন্দের উদয় হইল তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। এই সামান্য ধীবর পরোপকারের যে অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইল তাহা আমাদের সকলেরই শিক্ষা করা উচিত। আমরা ইচ্ছা করিলে সকল সময়েই পরোপকার করিতে পারি। উপকার পাইবার যোগ্য লোক এ সংসারে বিরল নহে। আমরা যখন দান করিব তখন সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হইয়া দান করিব। নিঃস্বার্থ পরোপকারীরা দান করিয়া কৃতজ্ঞতা পাইবারও আশা করেন না। তাহা হইলে তাহাদের দানের অর্দ্ধেক ফল নষ্ট হয়। যে সকল ব্যক্তি নিজের স্বার্থসিদ্ধির অভিপ্রায়ে পরের উপকার করে তাহাদের দান নিষ্ফল ও তাহারা সকলের হেয়। ফলাকাঙ্ক্ষা না করিয়া নিঃস্বার্থভাবে পরোপকার করা উচিত। মহাত্মারা পরের উপকার করিয়া প্রত্যুপকার পাওয়া দূরে থাক কত সময়ে যাহাদের উপকার করিয়াছেন তাহারাই অকৃতজ্ঞতাসহকারে তাহাদের প্রতি ঈর্ষ্যা প্রদর্শন করিয়াছে। তথাপি তাঁহারা পরের উপকার করিতে বিরত হন নাই। স্বার্থ-শূন্য-ভাবে পরোপকার করিলেই আমরা ধন্য হইব ও মানব নামের যোগ্য হইব। অতএব সকলেই পরোপকার ব্রতে ব্রতী হউন।

কুমারী বনলতা দাস।

ভিক্ষা।

প্রতিদিন মনে ভাবি প্রতিক্ষণে
হে প্রভু পরমেশ্বর!
কি হেতু সৃজিলে কেনবা পাঠালে
আমারে এ ধরাপর।
দীনা হীনা আমি প্রেমময় স্বামী
কেন কর এত স্নেহ
চাহেনা তোমারে তুমি চাও তারে
এমন কি আছে কেহ?
তুমি কত ভাবে দিতেছ অভাবে
ভাবিয়া দেখিলে পরে
নয়নেতে জল ঝরে অবিরল
এত আর কেবা করে?
মৃদু সমীরণ বহি অনুক্ষণ
বাঁচায় জীবের প্রাণ
বৃষ্টি ধারা আসি ধরণী পরশি
করিছে কত কল্যাণ।
এরূপে নিয়ত সেবিছ সতত
পাপী তাপী সবাকারে।
আমি, জেনেও জানিনা বুঝেও বুঝিনা
ডুবিয়া আছি সংসারে।
ভুলে থাকি নিতি কেন এ বিস্মৃতি
কেন এই মোহজাল
কৃপা ক'রে হরি দাও অপসারি
অজ্ঞানতা অন্তরাল।
করুণা মমতা সুখ স্বচ্ছন্দতা
যত পাই প্রতি পলে

ভুলে যাই তত ভালবাসা যত
একি বিপরীত ফলে!
এত তুমি প্রভু করিতেছ তবু
আরো এক ভিক্ষা আছে
হে করুণাময় হইয়া নির্ভয়
এসেছি তোমার কাছে।
সুদিনে দুর্দ্দিনে জীবনে মরণে
মন যেন স্থির রহে
শোকে দুঃখে প্রাণ নহে ম্রিয়মান
নির্ব্বিকার যেন রহে।
সদানন্দ প্রাণ দয়াময় গান
কর সদা মনে মনে
যেন এ জীবন হয় সমাপন
সুমধুর বিভু গানে।

শ্রীমতী সা—
গাজীপুর।

সংবাদ।

শ্রীমান্ যতীন্দ্রনাথ সেন নামে একজন যুবক বরিশালের কুলকাটী নামক গ্রামের বাবু চণ্ডিচরণ রায় চৌধুরীর কন্যাকে বিবাহ করিতে আসিয়াছিল। এই বিবাহার্থী যুবক বিবাহের অব্যবহিত পূর্ব্বে তাহার আত্মীয় কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইল যে, তাঁহারা কন্যাপক্ষ হইতে যৌতুকাদিব্যপদেশে যে টাকা লইয়াছেন, তাহা কন্যাপক্ষকে ফিরাইয়া না দিলে সে কিছুতেই বিবাহ করিবে না। বাধ্য হইয়া বরকর্ত্তা সমস্ত টাকা প্রত্যর্পণ করিলেন। এই যুবকের নির্লোভ সৎসাহসকে আমরা প্রশংসা করি। যুবকগণ বৃথা বক্তৃতা ও হুজুক না করিয়া এইরূপ নিঃস্বার্থ দেশহিতৈষণার কার্য্যে ব্রতী হইলে সমাজের কত কুপ্রথা কলঙ্ক দূর হইতে পারে।

সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, ডাক্তার কুক এবং ক্যাপ্তান প্যারী উত্তর মেরু প্রদেশ আবিষ্কার করিয়াছেন। দুজনের মধ্যে এ বিষয় লইয়া বিলক্ষণ দ্বন্দ্ব উপস্থিত হইয়াছে।

প্রতিবর্ষে ম্যালেরিয়া রোগে পৃথিবীর বহুসংখ্যক লোক কালগ্রাসে নিপতিত হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে ইহার প্রাবল্য সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। ইয়োরোপ ও আমেরিকা প্রভৃতি দেশেও এ ব্যাধি প্রবেশ করিয়া বহুলোকের প্রাণহরণ করিয়াছে। সে সকল দেশের লোকেরা এ ব্যাধির কারণ ও নিবারণের উপায় উদ্ভাবন করিতেও তৎপর হইয়াছেন। অস্মদ্দেশীয় লোকে অদৃষ্টের উপর দোষ চাপাইয়া এক প্রকার নীরবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়া থাকে, কেহ কেহ বা হাতুড়ে ডাক্তারের ম্যালেরিয়া রোগের "অমোঘ" ঔষধি সেবন করিয়াই নিশ্চিন্ত! সৌভাগ্যের বিষয় যে এতকাল পরে আমাদের দয়ালু গভর্ণমেণ্ট সুযোগ্য ডাক্তারদের এক কন্ফারেন্স বসাইয়া ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন।

কলিকাতাতে এ বৎসর বেরি বেরি পীড়ার বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। মাঝে মাঝে পীড়া মারাত্মক হইতেছে। সাহেবদের উপর ইহার আক্রমণ নাই। মেয়েদের উপর যেন আক্রমণটা বেশী।

শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় পুরী হইতে কলিকাতা আসিয়া প্রচারাশ্রমে বাস করিতেছেন। হাতে বাত ধরায় বড়ই কষ্ট পাইতেছেন।

সুখের বিষয় যে পূর্ব্ববাঙ্গলা ও আসামী গভর্ণমেণ্ট স্ত্রী শিক্ষায় অর্থ ব্যয় করিতে একটু মুক্তহস্ত হইয়াছেন। গত বৎসর ওপ্রদেশে ছয়টি মেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন, সকলকেই কুড়ি টাকার বিশেষ বৃত্তি প্রদত্ত হইয়াছে।

মূল্যপ্রাপ্তি।

একাদশবর্ষ।

শ্রীমতী জগন্মোহিনী চৌধুরাণী, আদাঐর ১৲
" তরঙ্গিনী দেবী, কুলটী ১৲

দ্বাদশবর্ষ।

শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবী, কুলটী ২৲
" জগন্মোহিনী চৌধুরাণী, আদাঐর ২৲
" সুজাতা সেন, রেঙ্গুন ২৲
শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কুচবিহার ॥০
" প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী, ময়মনসিং ১৲
" বৈকুণ্ঠনাথ দাস, বালেশ্বর ২৲

ত্রয়োদশবর্ষ।

শ্রীমতী জগন্মোহিনী চৌধুরাণী, আদাঐর ১৲
" তরঙ্গিণী দেবী, কুলটী ১৲
" ভূপেশনন্দিনী সেন, ১৲
" নীশিতারা সেন, রাজসাহী ২৲
" সুরবালা সেন, রেঙ্গুন ॥০
" ব্রজবালা সরকার, বালেশ্বর ২৲
" সরোজিনী রায় চৌধুরী, বাঁকা ২৲
" বিনোদমণি গুপ্তা, রাঁচি ২৲
" হেমলতা দাস, হাবড়া ২৲
" সুজাতা সেন, রেঙ্গুন ২৲
শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, কাছাড় ২৲
" বৈকুণ্ঠনাথ দাস, বালেশ্বর ২৲
" দেওয়ান কালিকা দাস দত্ত বাহাদুর C. I. E. কুচবিহার ২৲
" হেমেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কুচবিহার ১॥০
" অবিনাশ চন্দ্র রায়, ২৲
" প্রসন্নচন্দ্র চৌধুরী, ময়মনসিং ১৲

চতুর্দ্দশবর্ষ।

শ্রীমতী ভূপেশনন্দিনী সেন, ১৲
" সুরবালা সেন, রেঙ্গুন ॥০
" সরোজিনী রায় চৌধুরী, বাঁকা ২৲
" কুসুমকুমারী রায়, পিঙ্গনা ২৲
" বিনোদমণি গুপ্তা, রাঁচি ১৲
" হৈমবতী দেবী, ভাগলপুর ২৲
" হেমলতা দাস, হাবড়া ২৲
" ক্ষীরদাসুন্দরী সেন, ঢাকা ২৲
" ইন্দুমতি দাস, ঐ ২৲
" সরস্বতী সেন, কলিকাতা ২৲
" সরোজিনী রায়, ঐ ২৲
" কুমুদিনী দাস, ঐ ২৲
শ্রীযুক্ত বিমলানন্দ নাগ, ঐ ২৲
" চুনীলাল বসু, ঐ ২৲
" হরিসাধন চট্টোপাধ্যায়, ঐ ॥০
" সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, কাছাড় ॥৵১৫
" মাধবচন্দ্র ঘটক, পাথ্‌রাইল ২৲

পঞ্চদশবর্ষ।

শ্রীমতী সুবোধবালা দেবী, টাঙ্গু ২৲
" ইচ্ছাময়ী দাস, কলিকাতা ২৲
শ্রীযুক্ত হরিসাধন চট্টোপাধ্যায় ঐ ১॥০

(ক্রমশঃ)

সূচী।

লাভ করিয়া নরনারী সকলে তোমার চরণের দিকে অগ্রসর হইতে পারে। হে শান্ত মঙ্গলময়, সকল গৃহিণীর হৃদয়কে তোমার শান্ত প্রেমে পূর্ণ কর এই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা।

দেবী জগন্মোহিণী।

২য় অংশ।

(ভাই প্যারীমোহন চৌধুরী কর্তৃক রচিত।)

মা, তুমি আমাদের প্রাণদায়িনী মহাতেজস্বিনী জননী, তুমি আদ্যাশক্তি মহাসতী। তোমার শক্তিতে আমরা শক্তিমতী, তুমি জগজ্জননী।

মা, তুমি নিরাকারা সরস্বতী, মহাবিদ্যা পরাবিদ্যা, তুমি চিন্ময়ীরূপে আমাদের অন্তরে নিত্য বাস করিতেছ। তোমার প্রদত্ত জ্ঞানপ্রভাবে আমরা তোমাকে চিনিতে পারিতেছি; কিন্তু তুমি যেমন আমাদিগকে চিনিতে পার, তোমাকে আমরা তেমন চিনিতে পারি না। তুমি আমাদিগের ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান এবং অনন্তজীবন এখনই দেখিতেছ। তুমি মনের মধ্যে থাকিয়া মনের সমস্ত চিন্তা ভাব গতি ইচ্ছা এবং রুচি দেখিতেছ।

মা, তুমি অনন্তরূপিণী, সমুদ্রে রত্নপ্রসবিনী তুমি, পর্বতে পর্বতেশ্বরী তুমি। তুমি মহাবিরাটমূর্ত্তি। তোমার মধ্যে অগণ্য ব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছে। তুমি সর্বব্যাপিনী ও অনন্তকালবাসিনী। তোমার কিছুরই অন্ত নাই। তুমি বিশ্বেশ্বরী।

মা, বিশ্বেশ্বরী হইয়া যদিও তুমি সকলকে শাসন করিতেছ, তথাপি তোমার শাসন মঙ্গলশাসন। তুমি মন্দকে ভাল করিবার জন্যই দণ্ড বিধান কর। তোমার এমনই স্নেহ যে জঘন্য ব্যক্তিকেও তুমি ঘৃণা কর না। মা মহাকৃপা, পাপীয়সীকেও তুমি কোলে করিয়া বসিয়া আছ।

মা, তোমার তুল্য কিংবা তোমা অপেক্ষা গরীয়সী আর কেহ নাই। তুমি একাকিনী অসংখ্য সন্তান সৃষ্টি করিতেছ এবং একাকিনী সকলকে পালন করিতেছ।

মা, তুমি ধর্ম্মবীরপ্রসবিনী। তুমি নিজেই পূর্ণ পবিত্রতা, তোমাকে দেখিলে অসৎ সৎ হয়, অসতী সতী হয়।

মা, তুমি শান্তি ও সর্ব্বসুখপ্রদায়িনী আনন্দময়ী জননী। তুমি পরমসুন্দরী, বিশ্ববিমোহিনী, যোগিচিত্তবিনোদিনী, ভক্তহৃদয়রঞ্জিনী, মধুরহাসিনী। তোমার ভাল ছেলে মেয়েরা তোমার সুখস্বরূপে ডুবিয়া রহিয়াছেন। শোকদুঃখহারিণী পুণ্যশান্তিদায়িনী জননী, তোমাকে দেখিলে মনে কেবলই সুখ, শান্তি ও সৌন্দর্য্য বাড়িতে থাকে। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করি, তোমাতে আত্মসমর্পণ করি, তোমাকে বিনীত শান্ত ভাবে প্রণাম করি।

মা, আমি তোমায় ভালরূপে ধ্যান মনন করি না; কিন্তু তুমি সর্ব্বদা আমাকে নয়নে নয়নে রাখিয়াছ। মা যোগেশ্বরি, তোমার ইচ্ছা আমার ইচ্ছা হউক এই আশীর্ব্বাদ কর।

"বড় আশায় কথা শুনেছি মা,কি দিব আজি তোমারে। সকল আশা পূর্ণ হবে স্বর্গে যাব সশরীরে। শুনেছি সব ভক্তজনে, গোপনে নির্জ্জন সাধনে হৃদে পেয়ে তোমা-ধনে, ডোবেন আনন্দসাগরে; তেম্নি প্রেমে মত্ত হয়ে, তোমার সব দুঃখিনী মেয়ে, কবে তোমায় হৃদে পেয়ে স্বর্গপাবে এসংসারে?"

"আমার মাকে কি দেখিছিস্ তোরা বল্ সত্যকোরে? যাঁর নব নব রূপে নানারূপে মন হরে।

আদর্শ ব্রহ্মকন্যা।

১ আমি পুরুষকে ব্রহ্মপুত্র জানিয়া সম্মান এবং শ্রদ্ধা করি এবং তাঁহার প্রতি পবিত্র ভাব এবং ইচ্ছা পোষণ করি।

২ আমি রাগ করি না এবং আমার শত্রুকে ক্ষমা করি।

৩ আমি কোন বস্তু কিম্বা কোন লোকের প্রতি আসক্তি পোষণ করি না, এবং লোভকে ঘৃণা করি। আমি ধন কামনা করি না, কেবল যাহা বিধাতা দান করেন তাহাই কৃতজ্ঞহৃদয়ে গ্রহণ করি।

৪ আমি আলস্যে এবং মোহে বৃথা সময় নষ্ট করি না; কিন্তু আমার হৃদয়ের স্বামী প্রভু পরমেশ্বরের আদেশ পালন করিয়া জীবন সার্থক ও পবিত্র করি।

"আমার ভক্ত কন্যা পিতা মাতারূপ এই দুটী বৃক্ষতলে বসিয়া ভক্তি শিক্ষা করেন। পিতা মাতাই তাঁহার আদি-ভক্তিগুরু। সংসার বাগানে পিতা মাতা আমার প্রতিনিধি হইয়া আমার কন্যাকে আমি যে জগতের পিতা মাতা এই দুইটী ভাব শিক্ষা দেন। আমার কন্যা 'পিতা মাতা তরুতলে, বসি সুখে কুতূহলে, ভক্তি নির্ভর সহিষ্ণুতা শিক্ষা করেন অনুক্ষণ।' আমার কন্যার নিকট এই সংসার একটী সুন্দর বিদ্যালয় এবং একটী স্বর্গীয় সাধন কানন। এই বিদ্যালয়ে আমার কন্যা অনেক সত্যরত্ন লাভ করেন এবং এই সাধন কাননে তিনি অনেক প্রকার ভক্তি-পুষ্প এবং পুণ্যফল অর্জ্জন করেন। আমার কন্যা যতই তাঁহার পিতা মাতাকে ভক্তি করিতে শিক্ষা করেন, ততই তিনি আমাকে ভক্তি করিবার জন্য এবং আমার সন্তানবাৎসল্য ভোগ করিবার জন্য প্রস্তুত হন।"

৫ আমি নম্র-প্রকৃতি; আমার অন্তরে রূপ যৌবনের, কি ধন জনের, কি বিদ্যার কি ধর্ম্মের, কোন প্রকার অহঙ্কার নাই।

৬ পরশ্রীকাতরতাকে আমি ঘৃণা করি। আমি পরের সুখে সুখী হই; তাঁহার উন্নতি দেখিয়া আনন্দিত হই, হিংসা বা ঈর্ষা করি না।

৭ আমি সত্য ও সরলতা ভালবাসি এবং সত্য ভিন্ন কিছু বলি না, সকল প্রকার মিথ্যা প্রবঞ্চনা আমি ঘৃণা করি।

৮ আমি দয়া ও নিঃস্বার্থপরতাকে অতি উচ্চ ধর্ম্ম মনে করি। সঙ্গতি ও সমার্থ্য অনুসারে আমি পরের দুঃখ মোচনে যত্নবতী।

৯ আমি ন্যায়কে উচ্চতম ধর্ম্ম মনে করি। আমি যথা সময়ে দাস দাসীর বেতন এবং দ্রব্যাদির মূল্য দিয়া থাকি এবং প্রত্যেককে তাহার প্রাপ্য প্রদান করি।

১০ পবিত্রতা, ক্ষমা, বৈরাগ্য, উৎসাহ, বিনয়, পর-সেবা, সরলতা, দয়া; ন্যায়পরতা এই নব লক্ষণ আমি পবিত্রাত্মার নবরত্ন জানিয়া অতি যত্নের সহিত জীবনে পোষণ করি।

১১ আমি এক পরমাত্মাস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।

১২ প্রত্যেক মানবাত্মা অমর ইহাও আমি বিশ্বাস করি।

১৩ স্বর্গরাজ ঈশ্বর কাহাকেও অনন্ত নরকে নিক্ষেপ করেন না; কিন্তু পাপীকে তাহার পাপের উপযুক্ত দণ্ড দান করিয়া অনন্ত স্বর্গরাজ্যের অধিকারী করেন, আমি দৃঢ়রূপে ইহা বিশ্বাস করি।

১৪ আমি বিশ্বাস-নয়নে নিরাকার ঈশ্বরকে দেখি, এবং বিবেক কর্ণে তাঁহার নীরব স্বরব শুনি, ও ভক্তি-রসনায় তাঁহার পবিত্র প্রেমরস পান করি। এবং তাঁহাকে "মা" বলিয়া ডাকি।

ফুলের সৌন্দর্য্য সকলেরই মন হরণ করে। ফুলের সৌরভ সকলকেই আমোদিত করে। বন উপবন এবং উদ্যানের ফুল সকলেই ভোগ করিতে পারে; কিন্তু মনের ফুল অতি অল্প লোকেই দেখিতে পায়। সাধারণ লোকের অদৃষ্টরূপ গহন মনোবনের ভিতরে যে কত সুগন্ধ ও বিচিত্র সুন্দর ফুল সকল ফুটে তাহা কেবল ভাবুক কবি এবং প্রেমিক ভক্তেরাই দেখিতে পান। হৃদয় বাগানের পুষ্পচয় ভোগ করিতে পারিলে মানুষের মনে ইন্দ্রিয়-বিকার থাকিতে পারে না। আবার ইহাও সত্য যে মানুষের মন কিয়ৎ পরিমাণে নির্ম্মল না হইলে হৃদয়-বাগানে প্রবেশাধিকার জন্মে না। আজ আমরা আমাদের প্রিয় পাঠক পাঠিকাগণকে একটী ফুলের কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি। সেই ফুলটীর নাম ভক্তিকুসুম। জগতে এই ফুল কোথায় ফুটিয়াছে? ইহার সৌন্দর্য্যে জগত মুগ্ধ। ইহার সৌরভে জগত মেতেছে। এই জগত্মোহন পদ্ম কোন্ সরোবরে ফুটেছে? জগতের উচ্চতম স্থান যোগ-গিরিরূপ হিমাচলের শৃঙ্গে মানস-সরোবরে এই জগন্মোহিনী ভক্তি বিকসিতা। স্বয়ং ব্রহ্মাণ্ডের পতি শ্রীহরি এই আশ্চর্য্য কুসুমের সৌন্দর্য্যরস পান করিতেছেন, এবং ইহার সৌরভে আমোদিত হইতেছেন। যে ফুল ভগবানের প্রিয় এবং তাঁহার বিহারস্থান তাহা সামান্য নহে। পাঠক কিম্বা পাঠিকা, তুমি কি এই ফুল দেখিতে চাও? ফুল দেখিতে কাহার না ইচ্ছা হয়; কিন্তু কোথায় গেলে এই ফুল দেখিতে পাইবে? বাহিরে জড় জগতে এই ফুল ফুটে না; সাধারণ মানবপুঞ্জের মধ্যেও এই ফুল দেখা যায় না। সত্য সত্যই যদি এই ফুল দেখিতে চাও তবে ভগবানের অসাধারণ অথবা বিশেষ প্রেম উদ্যানে প্রবেশ করিতে হইবে। ঐ অতীন্দ্রিয় অজ্ঞেয় বাগানে পবিত্র প্রেম সূর্য্যোদয়ে এই দুর্লভ ভক্তি-কুসুম প্রস্ফুটিত। দিব্য চক্ষুই কেবল ইহার সৌন্দর্য্য দেখিতে পায়; এবং দিব্য নাসাই কেবল ইহার সুঘ্রাণ গ্রহণ করে। পৃথিবীর বন উপবন ও বাগানে যে সকল

মধুময় ফুল ফুটে, নানা জাতীয় মধুকর সকল আসিয়া সেই মধু পান ও আহরণ করে। বিষয়ের কীট অথবা পৃথিবীর পোকাস্বরূপ সংসারাসক্ত পুরুষ এবং সংসারপরায়ণা নারীসকল এই স্বর্গীয় ভক্তিকুসুমের মধুপান করিতে পারে না। ইহার পবিত্র মধু ভগবানের ভোগ্য; এবং স্বয়ং ভগবান দয়া করিয়া তাঁহার যে সকল প্রিয় ভক্ত পুত্র এবং প্রিয়া সতী কন্যাদিগকে এই কুসুমের রসামৃত পান করিতে অধিকার দেন, তাঁহারাই ঐ অমৃত পান করিয়া অমরত্ব লাভ করেন। ভক্তিফুলের মধু না খাইলে কেহই অমর হইতে পারে না। বিষয়বিষ খাইয়া যাহারা হতচেতন হইয়াছে, এই মৃত্যুঞ্জয় নবজীবনপ্রদ ভক্তিকুসুমের মধুপান ভিন্ন তাহাদের চৈতন্যলাভের দ্বিতীয় উপায় নাই!

কেশবজননী সাধ্বী শারদাদেবী।

(১৫শ ভাগ, ৭ম সংখ্যা,
৩৪ পৃষ্ঠার পর।)

নবীন খুব তেজা ছিলেন, কিন্তু কেশব আর কৃষ্ণবিহারী ছোট বেলা থেকে বড় অভিমানী ছিলেন। কেশবের ছোটবেলাকার আর দুই একটী কথা মনে হইল। আমি কখনও কখনও কেশবকে বলিতাম "তোমার জ্যেঠার কাছ থেকে টাকা চেয়ে নিয়ে এস" তিনি কিছুতেই টাকা চাহিবার জন্য যাইতে চাহিতেন না। অনেক বলার পর যদিবা যাইতেন ত ঐ সিঁড়ির কাছটীতে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতেন। আমাকে বলিতেন "মা আমি গিয়া টাকা চাইব, তিনি বলবেন কশরা? তা আমি পারব না।" এই অভিমানের জন্য দুই ভাইই জীবনে অনেক ভুগিয়াছেন। কেহ তাঁহাদের নিজের উপর অন্যায় অত্যাচার করিলে তাঁহারা একেবারে গম্ভীর হইয়া চুপ করিয়া থাকিতেন। আপনার পক্ষে একটী কথাও বলিতেন না। এইজন্য কেশব ছেলেবেলা আর একবার ভুগিয়াছিলেন। ছোট বেলায় যখন পড়িতেন সেই সময় আর একটী ছেলে কেশবের কাছ থেকে কি একটা আনিবার জন্য জিদ্ করিতেছিল। মাষ্টার টের পায়। কিন্তু যে ছেলে জিজ্ঞাসা করিতে ছিল সে বেশ চেপে গেল কেশব কেই মাষ্টার দোষী মনে করিলেন। ইহাতে কেশবের অভিমান হইল তিনি একটী কথাও বলিলেন না। নিজে শাস্তি লইলেন তবুও নিজে যে নির্দ্দোষী তাহা একটীবার বলিলেন না। কৃষ্ণবিহারী কেশবের কথামত জয়পুরের কাজ ছাড়িয়া দিয়া এলবার্ট-স্কুলে গেলেন। তাঁর জয়পুরের চাকুরী ছাড়িবার আর একটী উদ্দেশ্য যে কেশবের সঙ্গে সব সময় থাকা। ভাইকে এমন ভাল বাসিতে কেউ পারে না। রাম লক্ষ্মণ ছাড়া এমন ভালবাসার কথা শুনি নাই। লক্ষ্মণ যেমন ভাইএর সঙ্গে সমুদায় সুখ সম্পদ ছাড়িয়া বনবাসী হইলেন, আমার কৃষ্ণবিহারীও সেই রকম ভাইএর সঙ্গে সঙ্গে এ সোণার সংসার থেকে বেরিয়ে এসে ধর্ম্মের জন্য জীবন উৎসর্গ করিলেন। যখন আমাদের বাড়ী ভাগ হয় তখন কৃষ্ণবিহারী তাঁর এই বাড়ীটী অতি সুন্দর করিয়া মেরা-

মত করিয়া নূতন নূতন জিনিষ দিয়া ঘর সাজাইয়া একদিন ছোট বৌকে জিজ্ঞাসা করিলেন "বল দেখি এ ঘর কেন সাজাইলাম?" বৌ জিজ্ঞাসা করিলেন "কি জন্য সাজাইলে?" কৃষ্ণবিহারী বলিলেন ছোট দাদা এসে যখন বাড়ী দেখবেন বলিবেন "বাঃ কৃষ্ণবিহারী বেশ সুন্দর বাড়ী করিয়াছে।" কৃষ্ণবিহারী ভাইকে এত ভাল বাসিতেন যে ভাই এর মুখে ঐ "বেশ" কথাটী শুনিবার জন্য তিনি বাড়ী ঘর সাজাইলেন। গাড়ী ঘোড়াও কিনিয়াছিলেন রোজ ভাইকে দেখিবার জন্য। কৃষ্ণবিহারী কেশবের ভিতরই তাঁর ধর্ম্ম কর্ম্ম সার করিয়াছিলেন। তাঁর তীর্থ সঙ্গীতের এই গানটী তিনি গাহিতেন এবং এইটী তাঁর সাধনের অঙ্গ।

"কিবা চাব হরি, করযোড় করি,
এই মিনতি করি তোমার দুয়ারে,
কেশব চরিত, পবিত্র শোণিত,
কর প্রবাহিত হৃদয় মাঝারে।
এ পাপ নয়ন, অন্ধ হয়ে যাবে,
কেশব নয়ন ললাটে বসিবে,
কেশব নয়নে আনন্দিত মনে,
দিবস রজনী হেরিব তোমারে।
এই কর্ণ মোর, বধির হইবে,
কেশব কর্ণ আসি এ কর্ণে বসিবে,
শুনিব তোমার, সুমধুর স্বর,
আমি নিরন্তর অন্তর বাহিরে।

ভাই ভাই ক'রে তিনি জীবন দিলেন। একে ছোট বেলা থেকে তাঁর শরীর খারাপ, তার উপর কেশবের কাগজের জন্য অনবরত রাত জেগে পরিশ্রম করা, এদিকে তোমাদের ব্রাহ্মসমাজ থেকে গালাগালি, এই সব নানা কারণে এবং নবীন ও কেশবের শোকে তাঁর শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। আমার এমন ছেলের প্রতি কি ঘরের কি বাহিরের কেহ ভাল ব্যবহার করিলেন না। এক এক দিন কৃষ্ণবিহারীর কষ্টে আমার বড় যন্ত্রণা হইত। আমি বলিতাম "তুমি আর কোনও কাজ করিও না এবং কোনও কথায় থেকো না। যদি এসব কর তাহা হইলে আমি তোমার সঙ্গে কথা কহিব না।" কৃষ্ণবিহারী আমার এ কথা শুনিয়া বলিতেন "মা আমি কি পৃথিবীর অপমানের ভয়ে ছোটদাদার কাজ ছাড়িয়া দিব। আমাকে যদি হাজার রকমে অপমান করে তবুও আমি প্রাণ থাকিতে ছোটদাদার কাজ ছাড়িব না, আমাকে যত রকম অত্যাচার আছে করুক তবুও ছোটদাদার কাজ আমি ছাড়িব না।" কৃষ্ণবিহারী যে বুদ্ধের বিষয় লিখিয়াছিলেন, তিনিও যাইবার আগে একেবারে নিষ্কাম হইয়া গিয়াছিলেন। কোনও বিষয়ে ভাবিতেন না। জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন মা, আমি কিছু না ভেবে আছি এখন আমি কিছুই ভাবছি না। কৃষ্ণবিহারী একেবারে নিষ্কাম হইয়া গিয়াছিলেন, মৃত্যুর জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন। সংসারের কোনও কথা বলিতে গেলে চুপটী করে থাকিতেন। ইংরাজী খুবই জানিতেন। ফরাসী ও পালিভাষায় বেশ বিদ্বান ছিলেন। তিনি ফরাসী ও পালিভাষা থেকে যত ভাল ভাল বিষয় পড়িয়া আমাদের সকলকে শুনাই-

তেন। শেষে যাইবার কিছুদিন আগে জর্ম্মানির ভাষা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাঁর বিশ্বাস ছিল জর্ম্মানির ভাষা তিনি শেষ করিতে পারিবেন না। তার আগেই তাঁর মৃত্যু হইল। মহারাণী যে বড় দুরবিণ দিয়াছিলেন, সেই দুরবিণ লইয়া তিনি কত রাত্রি পর্য্যন্ত ছাদে বসিয়া থাকিতেন। কোন দিন, কোন নক্ষত্র, কোথায় থাকিবে আগে অঙ্ক করে দেখিতেন তারপর আমাদেরা বুঝাইয়া দিয়া শেষে তাহা দুরবিণ দিয়া দেখাইতেন। বড় লোকেরা যেমন বৎসরের টাকা পয়সার হিসাব করিতেন, কৃষ্ণবিহারীও সেই রকম বৎসরে কত নূতন নূতন বই পড়িবেন তাহার আগে থেকে হিসাব রাখিতেন। হিসাবের সঙ্গে সঙ্গে মাঝে মাঝে মিলাইয়া দেখিতেন। এই রকমে তিনি নানা ভাষার নানা দেশের বই পড়িতেন। এই রকমে তিনি অনেক ভাষার নূতন নূতন বই বৎসরে প্রায় ১০০।১৫০ পড়িতেন। দীনবাবু, রামেশ্বর, মুক্তেশ্বর ও রাজমোহন অনেক রাত পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে নানা রকম ভাল ভাল কথা বলিতেন। দীনবাবু ও মুক্তেশ্বর কৃষ্ণবিহারীর আগেই যান। এ কয়জন তাঁর শেষ সময়ের বন্ধু ও ইহারা সকলে কেশবের পরম ভক্ত ছিলেন। জ্যোতি ঠাকুরের সঙ্গে কৃষ্ণবিহারীর খুব বন্ধুত্ব ছিল। দুই জনে ভাইএর মতন ছিলেন। কৃষ্ণবিহারীর ভালবাসা বাহিরে প্রকাশ পাইত না। কত লোককে যে মাসে মাসে লুকিয়ে দান করিতেন, তাহা কেহ জানিত না, শুধু নরেশ জানিত, কারণ নরেশের কাছেই টাকা থাকিত। দানের ভিতরে ছোট বেলায় যাঁহাদের সঙ্গে পড়িতেন, তাঁহারাও অনেকে ছিলেন। নরেশ চিরকাল ছোট মামাকে দেবতার মত জানে।

পান্না যাওয়ার পর কৃষ্ণবিহারী বড় কাঁদিয়াছিলেন পান্না যাওয়ার এক বৎসর পর কৃষ্ণবিহারী গেলেন। শেষে যখন তিনি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁর যাওয়ার সময় হইয়াছে, তখন আমি যদি তাঁর কাছে কখনও যাইতাম, তিনি আমার দিকে তাকাইতেন না, কথা কহিতেন না, চোক বুঁজে পড়ে থাকতেন। তাঁর যাওয়ার পর মহারাণী ও মহারাজা কৃষ্ণবিহারীর পরিবারের খুবই উপকার করিয়াছেন।

এখন আমার শোক তাপের সময়, কৃষ্ণবিহারীর কত যে গুণ ছিল তাহা আর আমি বলিতে পারিতেছি না, ভাল মনেও আসছে না। তবে উমানাথ যে কৃষ্ণবিহারীর যাওয়ার পর শ্রাদ্ধের সময় একটী বই লিখিয়াছিলেন, সেইটী পরে আমাকে কে একজন পড়িয়া শুনাইয়াছিল। তাহাতে উমানাথ লিখিয়াছিলেন যে কৃষ্ণবিহারী সকল বিষয়েই কেশবের ছোট ভাই। উমানাথ কৃষ্ণবিহারীকে ঠিকই বুঝিয়াছেন। কৃষ্ণবিহারী বাস্তবিকই কেশবের ছোট ভাই।

মহারাণী সুনীতি কেশবের বড় কন্যা। মহারাণী যখন আঁতুড়ে তখন ভয়ানক ঝড় হয়। মহারাণী ছেলে বেলা থেকে বেশ ভাল ছিলেন। পড়া শুনা করিতে

ভাল বাসিতেন। তিনি কাহারও সঙ্গে ঝগড়া করিতেন না, সকলের সঙ্গে ভাব রাখিতেন। ছেলে বেলা থেকে তাঁর দয়ার ভাব বেশী ছিল। গরিব দেখিলেই দান করিতেন। ছেলেবেলা থেকেই বেশ ধর্ম্মে কর্ম্মে মন ছিল। কেশবের কুটীরের কথা যে তোমাকে বলিয়াছি, সেই কুটীরে কেশব যখন রাঁধিতে রাঁধিতে পাঠ করিতেন, সুনীতি সেই সময় তাঁর কাছে বসিয়া শুনিতেন। কেশবের খাওয়া হইয়া গেলে মহারাণী তাঁর পাতের প্রসাদ প্রায় খেতেন। মহারাজাও কেশবকে এত ভক্তি করিতেন যে এক দিন কেশব খেয়ে উঠে গেলে তাঁহার পাতে খাইতে বসিলেন।

✓কুচবিহারের বিবাহ ;—যাদব চক্রবর্ত্তী বিয়ের সম্বন্ধ আনেন। কেশব রাজাকে দেখিতে চাহিলেন, দেখলেন, কি কি কথাবার্ত্তা হইল, তাহা আমি ঠিক জানি না। আর একদিন যখন রাজা একলা এলেন, সেদিন রাজা সুনীতি আর আমি ছিলাম। রাজা মহারাণীকে পড়া শুনার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া চলিয়া গেলেন। তারপর বিয়ের ঠিকঠাক এবং গোলযোগ আরম্ভ হইল। বিবাহের ঠিক হইলে জুড়ুনি এল। কলুটোলার বাড়ীতেই জুড়ুনি এল। কেশব এর আগে কলুটোলার বাড়ী হইতে যাইয়া নারিকেল ডাঙ্গায় বাড়ী করিয়াছিলেন। কেশব বলিয়াছিলেন জুড়ুনি আমার মার নিকট হইবে। জুড়ুনি দেওয়ার কিছুদিন পর আমরা কুচবিহার যাত্রা করিলাম। আমি ফুলেশ্বরী, কৃষ্ণবিহারী ও কৃষ্ণবিহারীর ছেলে কুমুদ, নবীনের দুই ছেলে, সেজ মেয়ের ছেলে নরেশ ও সুরেশ, ফুলেশ্বরীর ছেলে হেম সুর্য্যি ও ব্রজ নরেন্দ্র ও তার ছেলে সত্যেন্দ্র! আমরা এই কয়জন কলুটোলা হইতে গেলাম। মহারাণী ও কেশবের পরিবার আমার সঙ্গে ছিলেন। আমরা কুচবিহারে পৌঁছিলে আমাদের থাকিবার জন্য দুইটী বাড়ী দেওয়া হইল, একটীতে মেয়েরা থাকিত, অপরটীতে পুরুষেরা থাকিতেন। গায়ে হলুদ হইয়া গেল। তখন মহারাণীর বয়স তের বৎসর ছয় মাস। খুব ঘটা হইল। অধিবাসের দিন সকালে আমরা খেয়ে দেয়ে বিয়ে বাড়ীতে গেলাম। বিয়ের জন্য একটী আলাদা বাড়ী ছিল। সেইদিন রাত্রে সেইখানে রহিলাম। তারপর দিন বিয়ে। মহারাজার নান্দীমুখের যোগাড় হইল, সারি সারি সিন্দুর মাখান মাছ, সেখানে রাখা হইয়াছে দেখিলাম, মহারাণী বরাবর আমার সঙ্গে ছিলেন। নান্দীমুখ মহারাজা করিয়াছিলেন কি না আমি জানি না। কিন্তু সুনীতি করে নাই, সে আমার আঁচল ধরিয়া সমস্তক্ষণ বসিয়া ছিল, আমাকে স্নান করিতে পর্য্যন্ত দেয় নাই। সে ভয়েতে জড় সড় হইয়া বলিতে লাগিল, "ঠাকুমা তুমি আমার কাছে থাক ওরা নিশ্চয় আমাকে কি করিবে।" আমি রহিলাম। নান্দিমুখের কাছে তাহাকে লইয়া গেল। রাজার ঠাকুর মা এলেন, এসে পুরোহিতকে ডাকিলেন। তিনি পুরোহিতকে ডাকিতেই আমি বলিলাম

"পুরুত এখানে এসে কি করিবে?" তিনি একটী মোহর দেখাইয়া বলিলেন, এই মোহরটী আর ঐ জল তুলসী ইত্যাদি কতকগুলি জিনিষ পুরোহিতের হাতে কনেকে দিতে হইবে। এই বলে তিনি সে সব রাণীর হাতে তুলে দিলেন। আমি তৎক্ষণাৎ সে সমস্ত রাণীর হাত থেকে লইয়া ফেলিয়া দিলাম। আমি বলিলাম, তোমাদের একি নিয়ম? এ সব কুলক্ষণ করিতে নাই, ইহাতে তোমাদেরও অমঙ্গল আমাদেরও অমঙ্গল। আমি এ সব বলাতে তিনি বুঝিলেন এবং বল্লেন অচ্ছা থাক্, কিন্তু রাণীকে বলিলেন তুমি মোহরটী পুরোহিতকে দাও, আমি মোহর দিতে দিলাম না, বলিলাম আপনিই দিন। কিন্তু তিনি শুনিলেন না, মোহরটী সুনীতির হাতে ছোঁয়াইয়া পুরোহিতকে দিলেন। তারপর আর কিছু হয় নাই, আমি বাড়ী গেলাম। খেয়ে দেয়ে বিকালে এলাম। রাত্রে বিয়েতে বড় গোল, সে সব কথা অনেকে বলিয়াছেন আর বলিবার দরকার নাই।

কেশবের মত কেশব উপাসনা করিয়া রাজারাণীর বিবাহ দিলেন। রাজাকে এনে ওরা আবার হোম ইত্যাদি করিয়াছিল। যদি রাজা হোমটী না করিতেন তবে এইটীকে খাঁটী ব্রাহ্মবিবাহ বলা যাইতে পারিত।

ব্রাহ্মমতে বিবাহ হইয়া যাইবার পরেই রাণীকে তুলিয়া আনা হইয়াছিল। বিবাহের পর রাজা যে হোম করিয়াছিলেন, রাণী তাহাতে একেবারে যোগ দেন নাই। আমরা বিয়ের দুই দিন পরেই রাণীকে লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসি। কলিকাতায় আসার পর চারিদিক হইতে কেশবের উপর অত্যাচার আরম্ভ হইল। আমরা যে দিন এখানে আসি তার পরদিনই মহারাজা বিলাত চলিয়া গেলেন। রাণীর সঙ্গে আর দেখা হয় নাই। এই বিবাহের জন্য কেশব যাহা সহ্য করিয়াছেন, লোকে তাহা পারে না। যে উদ্দেশ্যে কেশব এত সহ্য করিলেন কুচবিহার রাজ্যে তাহা পূর্ণ হোক্।

বৌরা সব ভাল, আমার সন্তানরা সব ভাল ছিলেন। বৌরা পরের মেয়ে, আমার ছেলেদের সঙ্গে একত্র হইয়া তাঁহাদের গুণে, সমস্ত ভাল হইয়া গেলেন। আমার যে ছেলের যে গুণ ছিল বৌরা ক্রমে ক্রমে সেই সব গুণের অংশ পাইয়াছিলেন।

প্রচারক ;—প্রচারক হইয়া যখন বাবুরা আসিতে লাগিলেন, আমি মনে করিতাম ইঁহারা দেবতা না আর কি? মনে হইত ইঁহারা সব মা বাপ ছাড়িয়া ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিতে আসিয়াছেন, ইঁহাদের যাহাতে ধর্ম্মের পথে ভাল হয় আমার তাই করা উচিৎ। আমি প্রচারকদের লুকিয়ে লুকিয়ে অনেক সময় ভাত রাঁধিয়া দিতাম। আমি ইঁহাদের চিরকালই ছেলের মতন দেখিয়া আসিতেছি। ইঁহাদের ঝগড়া ঝাটি দেখিয়া মনে হয় ছেলেরা নিজেদের ভিতর সামান্য তুচ্ছ বিষয় লইয়া ঝগড়া করিতেছেন। তাহাতে আমি মা, আমার মায়া কি স্নেহ কিছু মাত্র

করে নাই। তাঁহারাও বোধ হয় আমাকে মার মতন দেখেন। বিজয় ও শিবনাথ কেশবকে ছাড়িয়া গেল বলিয়া আমার মনে তাহাদের প্রতি কখনও অন্য ভাব আসে নাই।

নাত্‌বৌরা ;—কৃষ্ণবিহারীর ছেলে কুমুদের বিবাহেতে এবং প্রফুল্লের বিবাহেতে আমার মনে প্রথম বড় কষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু যখন বিবাহ হইয়া গেল এবং বৌরা ঘরে আসিল তখন ক্রমে ক্রমে বৌদের গুণ দেখিয়া আমি মোহিত হইয়া গেলাম। প্রফুল্লের বৌ ও কুমুদের বৌকে আমি জাতের বৌএর চেয়ে কিছু কম ভাল বাসি না। মোহিনী সুকোর চেয়ে বয়সে বড় ছিল, তাহাতে মেজ বৌএর অমত হইলেও আমি কিছু ভাবি নাই। মোহিনীর গুণে ও ধর্ম্মভাবে তাহাকে সকলেই ভালবাসত, কিন্তু অল্প দিনের ভিতর কুমুদের বৌ সরযূর পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে কিংবা ধর্ম্মের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক না রাখিয়াও কি করিয়া অত ধর্ম্মে মতি হ'ল ইহাই আশ্চর্য্য। মোহিনীর চিরকাল আকাঙ্ক্ষা ছিল আমার মতন হয়। মোহিনী কিম্বা সরযূর মুখে আমি কখন কাহারও নিন্দা শুনি নাই। মোহিনী কেশবকে সাক্ষাৎ দেবতার মতন দেখিতেন, সেই জন্য তাহার একান্ত ইচ্ছা ছিল যে, কেশবের পরিবারের সঙ্গে এক হয়, তাহার যে সম্বন্ধ এসেছিল সেখানে বিবাহ করিলে সে রাজসুখে থাকিতে পারিত. কিন্তু মোহিনী তাহা তুচ্ছ করিয়া কেশবের সঙ্গে এক হ'ল। এই বিবাহে মোহিনীর বাবা, প্রতাপ প্রভৃতি সকলের অমত ছিল। কিন্তু মোহিনীর কেশবের প্রতি ভক্তি ও মোহিনী করুণার বিবাহের ইচ্ছা দেখিয়া আমি কেশব ও মহারাণী এই বিবাহ দিই। মোহিনীকে আমি খুবই ভাল বাসিতাম বলিয়াই তোমার (সরলার) বিবাহও আমি দিই।

পরমহংস ;—রামকৃষ্ণ পরমহংস মহাশয় একদিন আদিসমাজ দেখিতে গিয়াছিলেন। সেখানে তিনজন উপাসনা করিতেছিলেন। পরমহংস উপাসনার পর বলিলেন, এই তিন জনের ভিতর এক জনকে দেখে বুঝিতে পারিলাম ইহারই হইয়াছে। তারপর তিনি কেশবের সঙ্গে ভাব করেন। তারপর থেকে আমাদের বাড়ীতে আসিতেন, ঐ তেতলার ঘরে প্রথম আমি তাঁহাকে দেখি। কেশবের কাছে এসে তিনি কেশবের হাত ধরে নাচিতেন ও গান গাহিতেন। আর একদিন কমল কুটীরে মাঘোৎসবের সময় বরণের দিন. সংকীর্ত্তনের পর আমি বলিলাম "আপনি কিছু খান" তিনি খানিকক্ষণ ভাবিয়া বলিলেন. হাঁ; মা বলিয়া দিয়াছিলেন, কেশবের বাড়ী থেকে এক খানি জিলিপী খেয়ে আসিস্।' আমি এক খানি জিলিপি দিলাম. তিনি হাত কাত করিয়া লইয়া খাইলেন, (তিনি হাত সোজা করিতে পারিতেন না) তারপর যখন চলিয়া যান কেশবকে বলিলেন, দেখ কেশব আমি যখন আসি মা বলিয়া দিয়াছিলেন কেশবের বাড়ীতে যাইতেছ একটি কুলপী বরফ খেয়ে এসো। তখন সেখানে

কুল্‌পিওয়ালা ছিল না, কেশব কুল্‌পী কোথায় পান ভাবিতেছেন এমন সময় হঠাৎ একজন কুল্‌পীওয়ালা আসিল একটি কুল্‌পী কেশব দিলেন, তিনি খুব অহ্লাদ করিয়া খাইলেন। সেই বরণের দিন সংকীর্ত্তনের সময় কেশব ও পরমহংস অনেকক্ষণ হাত ধরাধরি করিয়া নাচিলেন। কীর্ত্তন শেষ হইয়া গেলে তিনি আমায় বলিলেন "দ্যাখ্‌ মা তোর যত নাড়িভুঁড়ি নিয়ে পৃথিবীর লোকে এর পরে নাচ্‌বে তোর ঐ ভাণ্ড থেকে এই ছেলে বেরিয়েছে।"

তাঁহাকে আমার বড় ভাল লাগিত আমি প্রায়ই দক্ষিণেশ্বরে যাইতাম। তিনি কত যে ভাল ভাল কথা বলিতেন তাহা এখন আমার সব মনে নাই। একবার বলিয়াছিলেন—"দেখ মা ভায়ে ভায়ে দড়ি ধরে মাপে আর বলে এই দিকটা তোর আর ঐ দিকটা আমার। কিন্তু কার যায়গা মাপ্‌ছে আর কেই বা নেয় সেটা কিছু ঠিক করে না।" আর একদিন দক্ষিণেশ্বরের বাগানে আমি ও কেশব যাই, তিনি অনেক কথার পর আমায় বলিলেন "দ্যাখ্‌ মা আমি অনেক কষ্টে মাকে ধরেছি কিন্তু কেশবের সঙ্গে মিশে সেটুকু যায়, বুঝি আমি শেষে এসে নিরাকারে পড়ি।" এই রকম যে কত কথা হইত তার শেষ নাই। কিন্তু এখন সব মনে আসিতেছে না।

লেডি ডফারিণ;—কমলকুটীরে তাঁহার সঙ্গে দেখা হয়, মহারাণী যত ফুলের গহনা আনাইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে সমস্ত গহনা এক একটী করিয়া পরাইয়া দিলাম, সমস্ত দেশী খাবার ইত্যাদি খাইলেন। লেডি ডফারিণ যে আমার কত যত্ন করিলেন তাহা বলা যায় না। তাঁর কথার ভাবে বুঝা গেল আমাকে দেখে বড় খুসী হইয়াছেন।

আর একদিন তাঁর নিমন্ত্রণ মত মহারাণী সকলকে লইয়া বড়লাট সাহেবের বাড়ীতে গেলেন, আমার সঙ্গে সরলা ও বুলবুলি মহারাণীর কথামত গেল। সেখানে লেডি ডফারিণের আমার প্রতি এবং সমস্ত পরিবারের প্রতি কি আদর কি যত্ন তাহা বলা যায় না। মহারাণীকে যে লেডি ডফারিণ কত ভাল বাসিতেন তাহা তাঁর যত্নে আদরে বুঝা গেল।

মাঝে মাঝে বোম্বাই মাদ্রাজ ও এমেরিকা থেকে অনেক লোক আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিতেন। তার ভিতর সাণ্ডারলেণ্ড, হারউড্‌, ধর্ম্মপাল আরও কে কে সব মনে নাই। ধর্ম্মপাল এবং আরও ।৪ জন সাধুকে আমি নিজে রাঁধিয়া খাওয়াইয়াছিলাম।

আমার এখনকার অবস্থা তুমি জানিতে চাহিতেছ। আমার শ্বশুর দেওয়ান রামকমল সেনের পরিবার শুদ্ধ একত্র করিলে সমুদায় পরিবারের প্রায় ২০০ শতেরও অধিক হইবে, আমার নিজের পরিবারও প্রায় ১০০শত, এই বৃহৎ পরিবারের প্রতিদিন কোন স্থানে শোক দুঃখ বা কোনও স্থানে আনন্দোৎসব হইতেছে। এই সমস্ত শোক দুঃখ আনন্দোৎসবের খবর প্রায় রোজই আমার নিকট আসিতেছে। ভগ-

বান্ আমাকে একেবারে আনন্দে কিম্বা একেবারে দুঃখে থাকিতে দিতেছেন না। সুখে এবং দুঃখে তিনি আমায় পোড়াইতে পোড়াইতে সুখ দুঃখের বাহিরে লইয়া যাইতেছেন। আমার এক অংশ যেমন রাজসিংহাসনের উত্তরাধিকারী আর এক অংশ গৃহশূন্য, অর্থহীন প্রায় পথের ভিখারী, সুতারং সুখ সংবাদেও আমি উতলা হই না এবং দুঃখের সংবাদেও আমাকে কাতর করিতে পারে না। এই সমস্ত লীলাময় হরির খেলা মনে করি, এখন আমি এই প্রকাণ্ড পরিবারের মধ্যে বসিয়া, ভাই, এক চোখে হাসি এক চোখে কাঁদি।

ব্রতকথা।

হিন্দুরমণী চিরদিন ব্রতপরায়ণা, তাই হিন্দু সমাজে নানাপ্রকার ব্রতানুষ্ঠান দেখিতে পাওয়া যায়। পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা হইতে অশীতিপর বৃদ্ধা পর্য্যন্ত সকলের জন্যই ব্রত নির্দ্দিষ্ট আছে। হিন্দুমহিলাগণ প্রতিমাসে কোন না কোন প্রকারের ব্রত অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত পালন করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মসমাজে নারীগণের জন্য কোন প্রকার বিধিবদ্ধ ব্রত নাই। কারণ ব্রাহ্মগণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কোন প্রকার বিধিবদ্ধ নিয়মের অধীন হইয়া চলা ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করেন। প্রকৃতি যে সময়ে যে প্রকার ব্রতগ্রহণ করিতে নির্দ্দেশ করিবেন, তাহাই গ্রহণ করিতে হইবে। অনেকে ব্রতগ্রহণ করা প্রয়োজনীয় মনে করেন না। আমি এ মতের পক্ষপাতী নহি, কারণ পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, ব্রতের দ্বারা চরিত্রের অনেক প্রকারের দোষ, ত্রুটি এবং দুর্ব্বলতা অপনীত হয়। মনকে ধর্ম্মভাবাপন্ন করিবার জন্য ব্রতগ্রহণ বিশেষ প্রয়োজন। হিন্দু রমণীগণ বাল্যে পুণ্যপুকুর, যমপুকুর, সেঁজুতি, গোকল প্রভৃতি ব্রতানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যৌবনে মঙ্গলবার, বৈশাখ মাসে ফলদান এবং প্রৌঢ়াবস্থায় তালনবমী, দুর্ব্বাষ্টমী, অনন্ত চতুর্দ্দশী ও আরও অনেক প্রকারের ব্রতপালন করেন। ব্রাহ্মসমাজের বালক বালিকাদিগের জন্য নববিধানাচার্য্য কেশব চন্দ্র চিরসাধন ব্রত নামক একটি ব্রতের ব্যবস্থা করিয়াছেন। বর্ত্তমান প্রবন্ধে ব্রাহ্মসমাজের বালক বালিকাদিগের কোমল মনকে কোন প্রকারে বিকৃত হইতে না দিয়া যাহাতে তাহাদের মনে অল্পে অল্পে সদ্ভাবের বীজ অঙ্কুরিত হইতে পারে তাহারই আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া যাইতেছে।

প্রত্যহ প্রাতে শয্যা হইতে উঠিয়া অল্পবয়স্ক বালক বালিকাগণ যাহাতে সরলভাবে ও ভাষায় ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে ও তাঁহার চরণে প্রণাম করে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। আমাদের জনৈক প্রচারক বন্ধু তাঁহার কন্যাকে এইরূপ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। বন্ধু অতি প্রত্যূষে উঠিয়া ব্রহ্মের অষ্টোত্তরশত নাম পাঠ করেন তাহার পর তাঁহার বালিকা কন্যা নিম্ন লিখিত প্রার্থনাটি পাঠ করে।

মা আমায় ভাল কর এই বর চাই।
ভাল যদি হই ভাল বাসিবে সবাই॥
দুই বেলা ভক্তিভাবে গাব তব নাম।
পিতা মাতা গুরুজনে করিব প্রণাম।
গুরু কিম্বা রাজা রাজপ্রতিনিধি যাঁরা।
নমি সবে জানি পিতামাতা সম তাঁরা।
ভাই ভগ্নী আদি সবে ভালবাসা দিব।
দাস দাসী সবাকেই আদর করিব॥
দীন দুঃখী সবে সদা সদয় হইব।
পশু পক্ষী আদি জীবে পালন করিব॥
প্রত্যুষে উঠিয়া নিজ কার্য্যে মন দিব।
ভাল করে মন দিয়া লিখিব পড়িব॥
আলস্যে সময় বৃথা নষ্ট না করিব।
রাগ দ্বেষ মারামারি কভু না করিব॥
কব সদা সত্য কথা মিথ্যা না কহিব।
ছাই কথা কদাপিও মুখে না আনিব॥
কদাপি কাহারও মনে ব্যথা নাহি দিব।
লক্ষী মেয়ে হয়ে সুখী সকলে করিব॥
দিবসেতে কাজ করি রাত্রে ঘুমাইব।
স্মরিয়া তোমার দয়া ধন্যবাদ দিব॥
দাও বর করিতে প্রতিজ্ঞা পালন।
বার বার নমি মাগো ধরিয়া চরণ॥

ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ ভাবে নববিধান মণ্ডলীর লোকেরা যদি এই প্রথাটি গ্রহণ করেন তাহা হইলে মন্দ হয় না। আমি মণ্ডলীর বালক বালিকাগণের পিতামাতা ও অভিভাবকবর্গকে এ বিষয়ে চিন্তা করিতে অনুরোধ করিতেছি। আমাদের জীবন ব্রতধারীর জীবন হইবে, কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারিতা অথবা ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাব তাহাতে স্থান পাইবে না। কিন্তু অনেক সময়ে আমরা আমাদের জীবন ও দৈনন্দিন কার্য্যকলাপের মধ্যে ধর্ম্মবিরুদ্ধ ভাবের আভাষ প্রাপ্ত হই। ইহার কারণ কি? ইহার কারণ আর কিছুই নয়, বাল্যকাল হইতে আমরা ব্রতধারীর জীবন যাপন করিতে শিক্ষিত অথবা অভ্যস্ত হই নাই। সেই জন্য আমার মনে হয় বালক বালিকাদিগকে তাহাদের বয়সোপযোগী ব্রতাদিপালন করিতে শিক্ষা দেওয়া উচিত। আমাদের উপরোক্ত প্রচারক বন্ধু তাঁহার বালিকা কন্যাকে প্রতিদিন পারিবারিক দেবালয়ে উপাসনার আসন পাতা, ঝাঁট দেওয়া ধূনা দেওয়া ইত্যাদি সমস্ত কাজ করিতে শিখাইয়াছেন। বালিকা যখন প্রতিদিন প্রাতে অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত দেবালয়ে কাজ করে, তখন তাহা দেখিয়া আমার প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হয় এবং ইচ্ছা হয় যদি সমস্ত মণ্ডলীর পিতামাতাগণ এইরূপে তাঁহাদের কন্যাকে উপাসনাগৃহের প্রতি নিষ্ঠাব্রতপালনে শিক্ষা দেন তবে অত্যন্ত সুখের বিষয় হয়। আমার মাতৃদেবী প্রতিদিন শিবপূজা করিতেন। বাল্যকালে আমি প্রতিদিন প্রাতে ফুলের সাজী হাতে লইয়া প্রতিবেশীদিগের বাগান হইতে তাঁহার পূজার জন্য ফুল বিল্বপত্রাদি চয়ন করিয়া আনিতাম। মাতৃদেবী যখন আমার আনীত পুষ্পাদি দ্বারা তাঁহার ইষ্টদেবতার পূজা করিতেন, তখন আমার মনে অত্যন্ত আহ্লাদ হইত। ব্রাহ্মপিতামাতাগণ যদি তাঁহাদের অল্পবয়স্ক পুত্রকন্যাগণকে এইরূপে পুষ্পাদি সংগ্রহ করিয়া উপাসনার গৃহ সাজাইতে শিক্ষা দেন, তবে তাহার দ্বারা তাঁদের মনে

বিশেষভাবে একটি পবিত্র ভাবের সঞ্চার হইতে পারে।

যদিও আমরা কোনপ্রকার বাহ্য পূজা অথবা ব্রতানুষ্ঠান পালন করি না, কিন্তু যাহাতে আমাদের পুত্রকন্যাগণ নীতি এবং সাধুভাব দ্বারা বর্দ্ধিত হয় তাহার জন্য আমাদিগকে সর্ব্বদা যত্নশীল হইতে হইবে। বালকবালিকাদিগের মনে প্রথমতঃ পিতা মাতা ভাই ভগ্নী, প্রতিবেশী এবং সহপাঠী ও খেলার সাথীদিগের ব্যবহারের একটি সংস্কার অঙ্কিত হয় এবং যদি বিশেষরূপ বাধাপ্রাপ্ত না হয় তবে সেই সংস্কার অনুসারেই তাহার ভাবী জীবন গঠিত হইতে থাকে। বালকবালিকাদিগকে সাধুভাবাপন্ন করিতে হইলে এবং সকল প্রকার কুসংস্কারের হাত হইতে রক্ষা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পিতামাতাকে নানাবিষয়ে সংযমী ও ব্রতপরায়ণ হইতে হইবে। আমি একটি পরিবারে দেখিয়াছি, গৃহস্বামী ক্রুদ্ধ হইয়া স্বীয় পত্নীকে তিরস্কার করেন। তিরস্কারের সময় তিনি যে সকল ভাষা ব্যবহার করেন, তাঁহার বালক পুত্রও এক দিন ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার জননীর প্রতি সেই সকল বাক্য প্রয়োগ করিতেছে। তাহা দেখিয়া আমি গৃহস্বামীকে বলিলাম, "আপনি স্বয়ং আপনার এই পুত্রটিকে নষ্ট করিতেছেন। যাহাতে পরিবার মধ্যে কোন প্রকারের দুর্নীতির লেশমাত্র না থাকে তাহার জন্য বিশেষভাবে যত্ন করিতে হইবে। নীতিশিক্ষা এবং নীতিপালন ইহাই বালকবালিকাগণের ব্রত। পিতামাতা এবং অভিভাবকগণ স্বীয় পুত্রকন্যাগণের রুচি, প্রকৃতি এবং সামর্থ্যানুসারে তাহাদিগকে নীতিশিক্ষা দিতে চেষ্টা করিবেন। অনেক সময়ে কঠোর নীতির অবলম্বনে কুফল ফলিয়া থাকে। হিন্দুপরিবারে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায়, পুত্র কন্যাগণ কোন প্রকার মন্দ আচরণ করিলে পিতা মাতা অথবা অভিভাবকগণ তাহাদিগকে তাহাদের মন্দ আচরণের অনিষ্টকারিতা বুঝাইতে চেষ্টা করেন না অথবা তাহা জানেন না; কিন্তু প্রহার করিতে জানেন। তাহার ফলে পুত্র কন্যাগণ অনেক সময়ে কপটাচরণ শিক্ষা করে। পিতা মাতা অথবা গুরুজনদিগের অসাক্ষাতে মন্দাচরণ করে এবং ধরা পড়িলে মিথ্যা কথা বলিয়া তাহা গোপন করিতে চেষ্টা করে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন "সর্ব্বদা পুত্রকন্যাগণের উপর হস্তক্ষেপ করিও না, কিন্তু যথোপযুক্ত যত্ন প্রভাবের অধীনে তাহাদিগের হিতকর উন্নতিলাভ করিতে দাও।

বালক বালিকাদিগকে নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে সর্ব্বদা সাধন ও পালন করিতে অভ্যাস করাইতে হইবে। সত্যবাদিতা, হিংসা না করা, পরিচ্ছন্নতা, ইতর প্রাণীগণের প্রতি দয়া, পরোপকার এবং সৎসঙ্গ। বালক বালিকাদিগের মনে যাহাতে অসত্যের প্রতি বিজাতীয় ঘৃণার উদ্রেক হয়, তাহার জন্য অসত্যের অপকারিতা এবং সত্যের উপকারিতা সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আখ্যায়িকা বর্ণনা করা ভাল। তদ্ভিন্ন যখনই তাহাদের বাক্যে অথবা কার্য্যে কোন প্রকার অসত্যভাব প্রকাশ পাইবে, তখনই তাহাদিগকে সতর্ক করিয়া

দেওয়া উচিত। কোন কোন বালক বালিকা হিংসাপরায়ণ হয়। আপন ভাই ভগ্নী অথবা কোন আত্মীয় স্বজনের পুত্র কন্যা বাটীতে আসিলে তাহারা খাওয়া দাওয়া অথবা অন্যান্য বিষয়ে তাহাদের প্রতি হিংসা করে। পিতামাতা অথবা অভিভাবকগণ স্বীয় পুত্র কন্যাগণের এরূপ কোন ব্যবহার দেখিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সংশোধন করিতে যত্ন করিবেন। তাহাদের কোমল মনে যাহাতে বাল্যকাল হইতেই ভ্রাতৃভাবের সঞ্চার হয় তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। আমাদের দেশে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার অভাব বিশেষভাবে দৃষ্ট হয়। আমার মনে হয় ইহা প্রাচ্যজাতির একটি প্রকৃতিগত দোষ। এবিষয়ে আমরা পাশ্চাত্যজাতের বহুদূর পশ্চাতে পড়িয়া আছি। অনেকে বলেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বিলাসিতার পরিচয়। পাশ্চাত্যজগতে তাহা কতক পরিমাণে সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু আমাদের দেশে তাহা সাধারণতঃ একেবারেই অসম্ভব। কারণ আমাদের দেশে দরিদ্রলোকেরই সংখ্যা অধিক। কিন্তু তাহা বলিয়া অনেকে যেমন দরিদ্রতার ভান করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাকে উপেক্ষা করিয়া থাকেন তাহাও ঠিক নহে। ইচ্ছা থাকিলে এবং চেষ্টা করিলে অতি অল্প ব্যয়েও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া যায়। পুত্র কন্যাগণকে বহুমূল্য বস্ত্রালঙ্কার দ্বারা সজ্জিত করিবার প্রয়োজন নাই, সাদাসিদা মোটামুটী কাপড়ই যথেষ্ট। কিন্তু সেগুলি যাহাতে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয় তাহার জন্য যত্ন করিতে হইবে। অনেকে শীঘ্র ময়লা করিয়া ফেলিবার ভয়ে পুত্র কন্যাগণকে পরিষ্কার বস্ত্র সর্ব্বদা পরিধান করিতে দেন না, কেবল কোথাও যাইতে হইলে অথবা নিমন্ত্রণাদি রক্ষা করিবার জন্য কেবল শুভ্র পোষাকী বস্ত্র পরিধান করিতে দেন। আমি এ প্রথার অনুমোদন করি না। সত্য বটে বালক বালিকাগণ ধূলাখেলা করিয়া বস্ত্র মলিন করিয়া ফেলে। কিন্তু যাহাতে তাহারা যে প্রকার খেলার দ্বারা বস্ত্র মলিন হয়, সে প্রকার খেলা না করে, তাহাই তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। ইংরাজ বালক বালিকাগণও খেলা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা তাহাদের বস্ত্রাদি মলিন হইতে দেয় না। আমার মনে হয়, আমাদের দেশে যে সকল প্রাচীন ধরণের খেলা আছে তাহা আর বালক বালিকাগণকে না খেলিতে দেওয়া ভাল। খেলার প্রধান উদ্দেশ্য অঙ্গচালনা দ্বারা পরিপাক শক্তির বৃদ্ধি এবং তদ্দ্বারা শারীরিক বলবৃদ্ধি। আমরা যেরূপ আহার করি তাহাতে আমাদের পক্ষে ভ্রমণ ও ডন ভাঁজা প্রভৃতি শারীরিক অঙ্গচালনার ব্যাপারই যথেষ্ট বলিয়া মনে হয়। ইহা ব্যতীত গৃহসংলগ্ন পুষ্প অথবা ফলের উদ্যানে বালক বালকাদিগকে সময়ে সময়ে অথবা নিয়মিতরূপে কিছু কিছু কাজ করিতে দেওয়া ভাল। তাহাতে ব্যায়াম ও শিক্ষা একাধারে হইতে পারে। এই সকল বিষয়ের দ্বারা বস্ত্রও মলিন হয় না এবং পরিপাকশক্তিও বর্দ্ধিত হয়। বালক বালিকাদিগকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বস্ত্র

পরিধান করিতে দেওয়া এবং যাহাতে তাহারা উহা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে তদ্বিষয়ে তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া উচিত। প্রয়োজন হইলে যাহাতে তাহারা সাবান দ্বারা আপনাদিগের পরিধেয় বস্ত্র প্রত্যহ ধৌত করে তদ্বিষয়েও তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়া ভাল, কারণ তাহার দ্বারা পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা এবং মিতব্যয়িতা একাধারে রক্ষিত হইতে পারে।

ইতর প্রাণিগণের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করা যেন বালক বালিকাগণের একটি প্রকৃতিগত আমোদ। অনেক সময়ে দেখা যায় বর্ষাকালে কোন পুষ্করিণীতে ভেক ডাকিতেছে, আর কতকগুলি বালক তীরে দাঁড়াইয়া ঢেলা মারিতেছে অথবা পথের ধারে অনাহারক্লিষ্ট কুক্কুর দাঁড়াইয়া আছে, হঠাৎ কোথা হইতে একটি লোষ্ট্র খণ্ড আসিয়া তাহাকে আঘাত করিল, বেচারা যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া চিৎকার করিতে করিতে পলায়ন করিল। পথের ধারে একটি কাঁচপোকা উড়িতেছে, বালিকা অতি সতর্কতার সহিত তাহার প্রাণবধ করিবার জন্য কৌশল করিতেছে এবং তাহার প্রাণবিনাশ করিয়া তাহার অঙ্গ বিশেষের দ্বারা টিপ প্রস্তুত করিয়া স্বীয় কপোলের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। পুত্রকন্যাগণ যাহাতে এ প্রকার নিষ্ঠুরাচরণ না করে তাহার জন্য পিতামাতাগণ যেন স্বীয় সন্তানসন্ততিকে বিশেষভাবে শিক্ষা দেন। ব্রাহ্মসমাজের বালকবালিকাগণ এ সকল নিষ্ঠুরাচরণ করে না সত্য, কিন্তু তাহাদিগের মনে পশু পক্ষী প্রভৃতি ইতর-প্রাণীদিগের প্রতি সদয় ব্যবহার করিবার ভাব এখনও পূর্ণমাত্রায় ফুটিয়া উঠে নাই। প্রতিদিন নিয়ম করিয়া ইতর প্রাণীদিগকে খাদ্যদ্রব্য দান করা একটি ব্রত হইতে পারে। শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র প্রতি দিন চড়াই পক্ষীদিগকে কড়াই দিতেন। তাঁহার রচিত একটি কবিতা আছে, তাহার কতকাংশ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

আয়রে চড়াই, খাওরে কড়াই,
আপন বুদ্ধিতে যে করে বড়াই,
তার গালে খুব কসে চড়াই,
চড়াই রে চড়াই, যেন তোর
হরির চরণ পাই।

ইতর প্রাণীদিগকে খাদ্য দ্রব্য দান প্রভৃতি ব্রতসাধনে পিতামাতাদিগের স্বীয় পুত্র-কন্যাগণকে উৎসাহদান ও সাহায্য করা উচিত। তদ্ভিন্ন কোন দুষ্ট বালক কোন ইতর প্রাণীর প্রতি অত্যাচার করিতেছে দেখিলে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্যও যত্ন করিতে হইবে। সকল প্রাণীই ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব, তাহাদিগেরও সমান যাতনা বোধ আছে, এই শিক্ষা বিশেষভাবে তাহাদিগের অন্তঃকরণে মুদ্রিত করিয়া দিতে হইবে।

সকল ব্রতের শ্রেষ্ঠ ব্রত পরোপকার। যাঁহারা পরের সেবায় জীবন উৎসর্গ করেন তাঁহারাই ধন্য। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "ধন্য তাঁহারা যাঁহারা একটিরও মুখে অন্ন তুলিয়া দেন।" এই পরোপকার ব্রত বাল্যাবস্থা হইতে অভ্যস্ত না হইলে, পরিণত বয়সে ইহা পালন করা অত্যন্ত দুরূহ হইয়া পড়ে। কারণ যৌবন

ও বার্দ্ধক্যে অনেকেই স্ত্রী, পুত্র, পরিবার লইয়া এরূপ বিব্রত হইয়া পড়েন যে, ইচ্ছা সত্ত্বেও আর অপরের উপকার করিবার অবকাশ হইয়া উঠে না। পিতা মাতাকে পরোপকারব্রতপালনে রত দেখিলে সন্তানগণও সহজে তদ্ভাবাপন্ন হইতে পারে। বালক বালিকাগণ যাহাতে তাহাদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চেষ্টা দ্বারা পরোপকারব্রত পালন করে সে বিষয়ে পিতামাতার উৎসাহ দেওয়া প্রয়োজন।

সঙ্গদোষ ভয়ানক সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় বালক বালিকাদিগকে আক্রমণ করে। অতএব তাহাদিগকে সংক্রামক ব্যাধির হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য পিতামাতা যেরূপ যত্ন করেন, সঙ্গদোষ হইতে স্বীয় পুত্র কন্যাগণকে রক্ষা করিবার জন্য সেইরূপ যত্ন করিবেন। বালকবালিকাগণ দাস দাসী, খেলার সাথী এবং বিদ্যালয়ের সহপাঠীদিগের নিকট হইতে নানাবিধ অসৎবাক্য এবং অসদাচরণ সাধারণতঃ শিক্ষা করে। অসচ্চরিত্র দাস দাসীদিগকে গৃহ হইতে বিদায় করিয়া দিয়া, অসচ্চরিত্র বালকবালিকাদিগের সহিত মিশিতে না দিয়া কোন উপায়ে অসৎসঙ্গের প্রভাব হইতে বালকবালিকাদিগকে রক্ষা করা যায়; কিন্তু বিদ্যালয়ে নানাপ্রকার বিভিন্ন চরিত্রের বালকবালিকাদিগের সহিত সংমিশ্রণে কোমল স্বভাব বালকবালিকাদিগের চরিত্র বিশুদ্ধ থাকা কিম্বা তাহাতে কোন প্রকার অসৎ সংস্কার মুদ্রিত না হওয়া একেবারেই অসম্ভব। আমাদের গ্রামে জনৈক শিক্ষিত ভদ্রলোক তাঁহার পুত্র কন্যাকে পাছে তাহারা অসৎ সংসর্গে পতিত হয় এই ভয়ে কখনও বাটীর বাহির হইতে দেন না অথবা গ্রামের কোন বালক বালিকাকে তাঁহার বাটীতে যাইতে দেন না। কিন্তু একদিন আমি তাঁহার এক পুত্রকে তাহার কোন সহপাঠীর সহিত বিদ্যালয় হইতে গৃহে প্রত্যাগমনকালে কোন অসৎ বিষয়ে প্রসঙ্গ করিতে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেলাম। ইহার দ্বারাই প্রমাণিত হইতেছে যে গৃহে অসৎসঙ্গের প্রভাব হইতে কোনরূপে রক্ষা পাইলেও বাহিরে ইহার প্রভাব হইতে রক্ষা পাওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার। যাহাতে বালকবালিকাদিগের মনে অসৎসঙ্গের প্রতি আন্তরিক ঘৃণার উদ্রেক হয় তাহার জন্য সর্ব্বথা যত্ন করিতে হইবে। সদুপদেশাদি দ্বারা তাহাদের মনকে এ বিষয়ে বিশেষরূপে প্রস্তুত করিতে হইবে।

এই প্রবন্ধে ব্রতের কথা লিখিতে গিয়া অনেক কথাই লেখা হইল। হিন্দুসমাজে বালকবালিকাগণ যে সকল ব্রতপালন করে তাহার দ্বারা তাহাদের কোন প্রকার নৈতিক উন্নতি হয় না। অনেক স্থলে তাহারা সেই সকল ব্রতপালনের অর্থ ও উদ্দেশ্য কি তাহাও জানে না, তাহাদের পিতামাতা ও অভিভাবকগণও তাহাদিগকে তাহা বুঝাইয়া দিতে যত্ন করেন না। এরূপ স্থলে ব্রতপালন কেবল অনুষ্ঠানমাত্রেই পর্য্যবসিত থাকিয়া যায়। তাহা না করিয়া বালক বালিকাগণের পক্ষে যাহা অতীব প্রয়োজনীয়,

যাহার দ্বারা তাহাদের ভবিষ্যৎ জীবন উন্নত হইবে, এরূপ সকল নিয়ম যাহাতে তাহারা নিয়মিতরূপে পালন করে তাহার জন্য পিতা মাতার যত্ন করা উচিত। এই প্রবন্ধে যে সকল নিয়ম ও প্রণালী বর্ণিত হইল তাহা কেবল ব্রাহ্মসমাজ কেন সকল সমাজের ব্যক্তিগণের পক্ষেই গ্রহণীয় হইতে পারে। এই প্রবন্ধে কেবল বালক বালিকাগণের সম্বন্ধে কিছু বলা হইল। বারান্তরে যুবক যুবতী এবং প্রৌঢ় ও প্রৌঢ়গণের ব্রতগ্রহণ এবং পালন সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা যাইতে পারে।

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

আমাদের পারিবারিক সমিতি।

আমাদের পরিবারের একটী সভা আছে, তাহার নাম আমরা "পারিবারিক সমিতি" রাখিয়াছি। পরিবারে যাহারা একটুকু বোঝে সোজে এরূপ সকলেই সেই সমিতির সভ্য। মাসে একবার করিয়া অধিবেশন হওয়ার ব্যবস্থা আছে। বালক বালিকা, যুবক যুবতী, বৃদ্ধ বৃদ্ধা সকলকেই উপস্থিত থাকিতে হয়। পরিবারের কর্ত্তা যিনি তিনিই সভাপতি। আমরা সকলেই প্রাণ খুলিয়া এখানে কথা বার্ত্তা কহিয়া থাকি। মাসের প্রথম রবিবার মধ্যাহ্নে সমিতির অধিবেশন হইয়া থাকে। বাড়ীর একটী প্রশস্ত প্রকোষ্ঠে সভার স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সভাপতি সভাগৃহে আসিয়া ঘণ্টা বাজাইয়া সভার সময় সূচিত করেন। কেহ বা আগে, কেহ বা পরে সভাগৃহে আসিয়া মিলিত হই। সকলেরই স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে। মেয়েরা সভাপতির দক্ষিণদিকে এবং পুরুষেরা বাম দিকে বসিয়া থাকেন। গৃহকর্ত্রী সভাপতিরই মুখামুখী হইয়া বসেন; সুতরাং মেয়েদিগকে তাঁহার বামদিকে এবং পুরুষদিগকে তাঁহার ডানদিকে বসিতে হয়। প্রথমে একটী সঙ্গীত হয়; যিনি যিনি পারেন, সঙ্গীতে যোগদান করেন। সঙ্গীত সমাপ্ত হইলে সভাপতি পরিবারের কল্যাণ কামনা করিয়া গৃহদেবতার নিকটে প্রার্থনা করেন। প্রার্থনান্তে সম্পাদিকা কার্য্য-লিপি পুস্তক হইতে গত সভার কার্য্যবিবরণ পাঠ করেন। আমাদের বাড়ীর বড় বউ এখন সম্পাদিকা, সমিতি স্থাপনের সময়ে কিছুকাল একটী বয়স্কা কন্যা সম্পাদিকা ছিলেন। সভা স্থাপনের দিনে সভাপতি সমিতির উদ্দেশ্য এই ভাবে বলিয়াছিলেন;—

আমাদের সমাজের পারিবারিক ব্যবস্থা অনুসারে গৃহকর্ত্তাই সর্ব্বেসর্ব্বা ছিলেন। গৃহকর্ত্রী তাঁহারই অনুগতা হইয়া অন্দরমহলে কর্ত্তৃত্ব করিতেন। সকলের ভাব, চরিত্র ও স্বভাব বুঝিয়া এই উভয়কে কার্য্য করিতে হইত। পারিবারিক মান মর্য্যাদা ও কল্যাণকামনার ভার ইহাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ইচ্ছায় অনিচ্ছায় পরিবারের সকলকেই ইহাদের অনুগত হইয়া চলিতে হইত। অন্যান্যকে মানসিক যাতনা সহ্য করিয়াও নীরবে বিবিধ কষ্ট বহন করিতে হইত। এই কষ্ট যন্ত্রণার ফলস্বরূপ

একান্নভুক্ত পরিবারের সকলেই সৌভাগ্য ও মানমর্য্যাদার সমান অধিকারী হইতেন। এখন আমাদের পুরাতন সমাজ সূর্য্য অস্তাচলের আড়ালে পড়িয়াছে, তাহাকে পুনরায় উদিত করিবার চেষ্টা বা তজ্জন্য অপেক্ষা করা বিড়ম্বনা মাত্র। আমরা সে বৃথা চেষ্টা করিব না, অপেক্ষাও করিব না।

এইকাল কেবল আমাদের নয়, কেবল ভারতেরও নয়, সমগ্র পৃথিবীর শঙ্কর-যুগ শঙ্কর-যুগ এইজন্য বলিতেছি এখন সর্ব্বত্রই মিলেমিশে একটা নূতন সমাজ সৃষ্টি হইতেছে। কি আসিয়া, কি ইউরোপ, কি আফ্রিকা, কি আমেরিকা, কোথাও আর সেই চিরাগত সভ্যতা বা তাহারই ক্রমবর্দ্ধনজাত সমাজ বা পরিবার নাই। নানা জাতির সংস্রবে এবং নানা জাতির জাতীয় সাহিত্যের প্রভাবে প্রত্যেক জাতির মধ্যেই নানা বহির্দিক হইতে তরঙ্গ আসিয়া এক গণনাতীত মহা তরঙ্গ উঠাইয়াছে। যাহারা জাতীয় সভ্যতার পাঁজি খুলিয়া এক এক জাতির সভ্যতার সীমানির্দ্ধারণ-উত্থান পতন স্থির করিতেছিলেন, তাঁহাদের সে গণনা লগ্নাচার্য্যের গণনার ন্যায় নিষ্ফল হইতেছে। তাঁহারা "কি হইল, কি হইল" বলিয়া আতঙ্কে কাঁপিয়া উঠিতেছেন। আমি বলি "ভয় নাই, ভয় নাই, ভূতভাবন ভগবান্ রহিয়াছেন। তোমার গণনা আমার গণনা, সর্ব্বপ্রকার গণনা পরাহত করিয়া ভগবানের রাজ্য ও সভ্যতা, সমাজ ও পরিবার সর্ব্বত্র এক নূতন ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাই বিশ্বাস কর, তাহাই দর্শন কর।"

এই যুগ ব্যক্তিগত স্বাধীনতার যুগ। এই যুগে সকলেই স্ব স্ব প্রধান। এই স্বাধীনতার অপব্যবহারে স্বেচ্ছাচারিতা, পরস্পর দ্বন্দ্ব কলহ, সমাজে অশান্তি ও পরিবারে অপ্রেম আসিয়াছে, এবং আসিবে। শঙ্কর-যুগে এই সকল বিপৎপাত অবশ্যম্ভাবী হইলেও তন্নিবারণার্থ আমাদিগকে নানা চেষ্টা ও বিবিধ উপায় গ্রহণ করিতে হইবে। আমাদের পরিবারের কল্যাণার্থ তোমাদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা, আমার কর্ত্তৃত্ব ও গৃহিণীর বহুদর্শিতামূলক প্রভাবের সমন্বয় করিতে হইবে। ইহার একটীরও অসম্মান হইলে পরিবারে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় হইবে, অপ্রেম ও অশান্তি আসিবে। এই কাল যেমন শঙ্কর-যুগ, তেমনি সমন্বয়ের যুগ। তোমরা সর্ব্বদাই সর্ব্বকার্য্যে এই সত্য স্মরণ রাখিবে এবং অনুসরণ করিবে। পরিবারের সকলের ইচ্ছার সমন্বয় করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। ইহাতে গৃহদেবতা সন্তুষ্ট হইবেন, তাঁহার আশীর্ব্বাদে পরিবারের শান্তি ও বিবিধ উন্নতি হইবে।

তোমরা সর্ব্ব-প্রযত্নে মঙ্গলময় গৃহদেবতাকে বিশ্বাস করিবে, এবং তাঁহারই প্রীত্যর্থ সমস্ত কার্য্য সম্পাদন করিবে। পরস্পরের প্রতি অমায়িক সরল ব্যবহার করিবে। প্রেম ও সেবা পরিবারের বন্ধন মধুময় বন্ধন। তোমরা এই রাখি-বন্ধন-ব্রত প্রতিদিন প্রতিপালন করিবে। এই সমিতিতে তোমরা প্রাণ খুলিয়া সমুদয় কথা বলিবে, কিছুই চাপা

দিয়া রাখিবে না, প্রতিজনকেই আপনার জন বলিয়া বিশ্বাস করিবে, সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী বলিয়া জানিবে। তোমরা কোন কথা চাপা দিয়া গেলে সেখানেই বিষবৃক্ষের বীজ উপ্ত হইবে। কালে তাহা পরিবাররূপে সুখসম্মিলনের প্রাণনাশ করিবে। সমন্বয়ের ইচ্ছা থাকিলে তোমরা নিঃস্বার্থ বিরোধী ভাবের মধ্যেও সম্মিলনের সূত্র পাইবে। ব্যক্তিগত বা ব্যষ্টিগত ও সমষ্টিগত স্বাধীনতা ও ইচ্ছার সম্মিলন হইবে বলিয়াই এই যুগের এত মাহাত্ম্য! তোমরা পরিবার মধ্যে এই যুগধর্ম্ম রক্ষা করিতে সর্ব্বদা যত্নপর হও, ভগবান্ তোমাদের সহায় হউন এবং এই সমিতিকে আশীর্ব্বাদ করুন।

সভাপতির বক্তব্য শেষ হইলে সেইদিন এবং তৎপরবর্ত্তী কয়েক অধিবেশনে কতকগুলি নিয়ম নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। সেই নিয়ম গুলির মর্ম্ম এইরূপ ;—

১। আমাদের মধ্যে একটী "আদর্শ পরিবার" গঠন করা সমিতির লক্ষ্য।

২। পরিবারের প্রতিজনের ব্যক্তিত্ব স্বীকার এবং সকলের ইচ্ছার সমন্বয় করিয়া সমিতির সমুদয় নির্দ্ধারণ সর্ব্ব সম্মতিমতে স্থিরীকৃত হইবে।

৩। গৃহ ও পরিবারের সমস্ত কার্য্য বিভাগ করিয়া এক একজন এক বা ততোধিক কার্য্যের ভার গ্রহণ করিবেন।

৪। এতদর্থে এই বিভাগগুলি হইল; (ক) আয়, (খ) ব্যয়, (গ) দ্রব্য ক্রয় ও বিক্রয়, (ঘ) ভাণ্ডার, (ঙ) পাক ও তৎসম্পর্কীয় কার্য্য, (চ) গৃহ ও গৃহদ্রব্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা, (ছ) সমস্ত বাড়ীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা রক্ষা, (জ) আয় ব্যয়ের যথাযথ হিসাব বা জমা খরচ রাখা, (ঝ) শিশুদের তত্ত্বাবধান, (ঞ) পরিবারের প্রত্যেকের লেখাপড়ার উন্নতির চেষ্টা ও বন্দোবস্ত করা, (ট) প্রতিজনের নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষার বন্দোবস্ত করা, (ঠ) সমবেত পূজা ও পূজার ঘরের পবিত্রতা রক্ষা করা, (ড) রোগীর সেবা ও শুশ্রূষা করা, (ঢ) পরিবারের প্রত্যেকের জন্য সঞ্চিত অর্থ রক্ষার বন্দোবস্ত করা এবং (ণ) সাময়িক উৎসবাদির ভার।

আবশ্যক মতে আরো বিভাগ সংযোজিত হইতে পারিবে।

৫। গৃহকর্ত্তা ও গৃহিণী আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া সমুদয় বিভাগের তত্ত্বাবধান করিবেন। সমিতির কার্য্য বিবরণীতে তাহা লিপিবদ্ধ থাকিবে।

৬। প্রতি ৬ মাসে বিভাগগুলির ভার নূতনরূপে দেওয়া হইবে। সমর্থদিগকে সকল কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করাই এইরূপ পরিবর্ত্তনের উদ্দেশ্য থাকিবে।

৭। গৃহকর্ত্তা ও গৃহিণী সকলকেই আদেশ করিতে পারিবেন। জ্যেষ্ঠেরা কনিষ্ঠদিগকে সাহায্যার্থ আদেশ করিতে পারিবে। রুগ্নেরা সকলকেই আবশ্যকীয় কার্য্যের জন্য আদেশ করিতে পারিবে।

৮। কাহাকে কোন কার্য্যের জন্য আদেশ করিলে তিনি সেই কার্য্যের জন্য আবার অন্যকে আদেশ করিতে পারিবেন না। আবশ্যক হইলে অন্যের সহায়তা গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৯। সম্পাদিকা নিয়মিতরূপে সভার কার্য্য বিবরণ সভাপতিকে দেখাইয়া কার্য্য-পুস্তকে লিখিয়া রাখিবেন এবং সভাপতি তাহাতে সই দিবেন।

১০। সকলেই সর্ব্বপ্রযত্নে পরিবারে শান্তি ও শুদ্ধতা রক্ষা করিবেন।

১১। কোন দরকারী বিষয় সমিতিতে মীমাংসিত না হওয়া পর্য্যন্ত গৃহ-কর্ত্তার ইচ্ছানুসারেই তাহা সম্পন্ন হইবে। তদ্রূপ কোন আকস্মিক বিষয় ও তাঁহারই ইচ্ছানুসারে সম্পাদিত হইবে। তিনি পরিবারের ইচ্ছা ও রুচিবুঝিয়া গৃহদেবতার অভিপ্রায় অনুসারে কার্য্য করিবেন।

"সকলেই শান্তভাবে যথাসম্ভব নীরবে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিবেন।" প্রথম অধিবেশনে সেই বিষয়ে নানা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। ক্রমে কে কোন কার্য্যের ভার লইবেন ৩,৪ সভায় তাহা স্থির হইল।

প্রতি সভায় নিয়মিত কার্য্যান্তে সভাপতি ক্ষুদ্র একটী প্রার্থনা করিয়া সভার কার্য্য পরিসমাপ্ত করিতেন।

শ্রীরাজেশ্বর গুপ্ত।

মহিলার রচনা।

চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজে পঠিত।

বিশ্বাস।

(১ম)

বিশ্বাসহীনতাই জীবনকে অন্ধকারে নিমগ্ন করে। যখন আমরা বিশ্বাস হারাইয়া ফেলি, তখন দেখিতে পাই, হৃদয় অন্ধকারে হাবুডুবু খাইতেছে, চিত্ত কিছুতেই স্থির হইতেছে না, হৃদয় অধীর হইয়া অসহ্য যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। কিন্তু সেই মুহূর্ত্তে যদি ভগবানে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি এবং তিনি মঙ্গলময় ইহা উপলব্ধি করিতে সমর্থ হই, তবে তখনই দেখিতে পাই তিনি তাঁর শীতল হস্ত হৃদয়ে বুলাইয়া দিতেছেন, হৃদয় সান্ত্বনালাভ করিতেছে এবং দুঃখ যন্ত্রণা দূরে চলিয়া যাইতেছে। পৃথিবীতে থাকিতে হইলে আমাদিগকে প্রতি পদ-ক্ষেপে পরীক্ষায় পড়িতে হইবে। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিলে আমরা তাঁর সেই শান্তিময় ক্রোড় লাভ করিতে পারিব। কিন্তু আমরা কেমন করিয়া এই মহাপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব? যখন এক একটী বিপদ আসিয়া আমাদিগকে ঘেরিয়া ফেলে আমরা অধীর হইয়া পড়ি, অন্ধকারে হাবুডুবু খাই, তখন আমরা কেমন করিয়া হৃদয়ে সান্ত্বনালাভ করিব? একমাত্র বিশ্বাসই কি তখন আমাদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবে না। তাঁর প্রতি যদি আমরা অটল বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারি এবং যথার্থই যদি আমাদিগের নির্ভর থাকে, তাহা হইলে আমরা অতি সহজে সমুদায় দুঃখ বিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তাঁরই চরণে উপনীত হইতে সমর্থ হইব, এবং সমুদায় দুঃখ বিপদ তৃণের ন্যায় ভাসিয়া যাইবে, কিছুই হৃদয়কে আঘাত করিতে পারিবে না। তিনিই আমা-দিগকে রক্ষা করিবেন। তিনিই আমা-দিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিবেন ও আমা-দের চিরসহায় হইয়া থাকিবেন।

দয়াময়ী মা, তুমি ত দেখিতেছ আমরা কত দুর্ব্বল; তুমি আমাদিগকে শক্তি প্রদান কর। তোমার প্রতি যেন আমাদের বিশ্বাস সর্ব্বদা জাগ্রত থাকে। আমরা যেন তোমাতে নির্ভর করিয়া থাকিতে পারি। করুণাময়ী মা, তুমি আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর।

শ্রীরেণুকণা দাস।

(২য়)

আমরা কিরূপে ভগবানকে পাইব?

ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া আমরা যে উচ্চ অধিকার লাভ করিয়াছি তাহাতে সফলতা লাভের উপায় কি? আমরা দুর্ব্বল অজ্ঞান, তাই কি আমরা তাঁহাকে পাইব না? মা কি কখনও অন্ধ আতুর কুসন্তানটীকে ভাল না বেসে পারেন? সে যখন পরিশ্রান্ত হয়ে এসে মা বলে ডাকে তখনই মার প্রাণ ব্যাকুল হয়ে ছুটে এসে তাহার দুঃখ দূর করিতে ব্যস্ত হয়। জগজ্জননীকেও আমরা ডাকিলে তিনি আর স্থির থাকিতে পারেন না। তিনি করুণাময়ী মা. ধনী. নির্ধন. জ্ঞানী অজ্ঞান সকলেরই তাঁহাকে পাইবার অধিকার আছে, সকলের জন্যই তাঁর প্রেমহস্ত প্রসারিত। তিনি সর্ব্ব শক্তিমান, কিন্তু তিনি অত্যাচারী পিতা নন, স্নেহময়ী মা। তিনি জোর করিয়া আমাদিগের পূজা গ্রহণ করেন না। আমরা আদর করে ভালবেসে যাহা দেই তাহাই গ্রহণ করেন। এবং তাহার প্রতিদানে আমাদের অন্তর পরিপূর্ণ করিয়া দেন। আমরা সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে ডাকিলেই তিনি প্রাণে প্রকাশিত হন। আমরা তাঁহাকে প্রাণের সহিত চাই না, তাঁহাকে কিছু দিতে আমাদের প্রাণ চায় না। যদি আমরা আমাদের হৃদয় তাঁহাকে কোনরূপে দিতে পারি. তবেই আমরা তাঁহাকে লাভ করিয়া ধন্য হইব। সরলতার সহিত দৃঢ় বিশ্বাসে তাঁহার কাছে যাহা চাই, তাহাই পাই। সর্ব্বদাই আমাদের জন্য তিনি প্রতীক্ষা করেন এবং যখনই আমাদের হৃদয়ে একটু সরল প্রার্থনার ভাব জাগরিত হয় তখনই তাঁহার করুণাতে হৃদয় পূর্ণ হইয়া যায়। প্রকৃত সরল বিশ্বাস এবং অন্তরের ব্যাকুলতাই তিনি চান। ধনী নির্ধন জ্ঞানী অজ্ঞান তাঁহার নিকট ভেদাভেদ নাই। পাঁচ বছরের বালক ধ্রুবও সরল বিশ্বাসে তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন। বালক প্রহ্লাদ বিশ্বাসের দৃঢ়তাতেই পিতাকে স্ফটিকস্তম্ভের ভিতর হরি দেখাইয়াছিলেন। হরিভক্তির বলেই অর্জ্জুন-পুত্র সুধন্বাকে তৈলে সিদ্ধ করিয়াও কিছু করিতে পারে নাই। আমাদিগকে সেই সরল বিশ্বাস ও ভক্তি লাভ করিতে হইবে তাহা হইলেই আমরা তাঁহাকে পাইব। তাঁহাকে যতই উপলব্ধি করিতে পারিব আমাদিগের রিপুজয় করা ততই সহজ হইবে। একটু সরল প্রার্থনার ভাব যখন প্রাণে আসে তখনই আমাদের অজ্ঞাতসারে কত পাপ ক্ষয় হয়। আমাদিগকে বিশ্বাস এবং নির্ভররূপবর্ম্মে আচ্ছাদিত হইয়া প্রেম পবিত্রতা, দয়া,

বিনয়, সরলতা প্রভৃতি অস্ত্র দ্বারা কাম ক্রোধ লোভ প্রভৃতি শত্রু জয় করিতে হইবে। উপাসনা ও প্রার্থনা দ্বারা আমরা সেই শক্তি লাভ করিতে পারিব। যতই আমরা বিশ্বাসিনী ও নিষ্ঠাবতী হইব ততই তাঁহার প্রভাব আমাদের জীবনে বিস্তারিত হইবে। এবং যতই আমরা তাঁহার ইচ্ছার অধীন হইয়া চলিব ততই আমাদের জীবন সুন্দর ও পবিত্র হইবে।

চৈতন্যের ভক্তি পেয়েতেই জগাই মাধাই উদ্ধার হইয়াছিল। আমাদের চরিত্রে যতই তাঁহার প্রকাশ হইবে যতই আমরা সুন্দর ও পবিত্র হইব ততই ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতি লোকের শ্রদ্ধা হইবে, এবং তাঁহার মহিমা গান করিয়া আমরা ধন্য হইব।

করুণাময়ী মা, দয়া করিয়া তুমি আমাদিগকে যে অধিকার দিয়াছ আশীর্ব্বাদ কর আমরা তাহার উপযুক্ত হই। নিষ্ঠা বিশ্বাস ও ভক্তির দ্বারা আমাদের আসক্তি প্রলোভন প্রভৃতি জয় করিয়া তোমাকে প্রাণে প্রতিষ্ঠিত করি এবং হৃদয়ে তোমার করুণা সম্ভোগ করি। মন প্রাণ তোমার চরণে সমর্পণ করিয়া ধন্য হই, পবিত্র হই, ইহাই তোমার নিকটে প্রার্থনা।

শ্রীসাবিত্রীবালা বিশ্বাস।

প্রার্থনা।

হৃদয় আনন্দ মোর করুণা আলয়,
দীন হীন এই মোর ক্ষুদ্র হৃদি পরে,
বিশ্বাসের নব বল যেন দয়াময়,
ফুটে থাকে চিরদিন চির হর্ষ ভরে।
যেন অবিশ্বাস ছায়া পড়ে না কখন,
স্বচ্ছ সলিলের বুকে মেঘ ছায়া প্রায়,
কুয়াসার অন্ধকারে বিমল গগন;
তার জ্যোতি রবি আলো যেন না হারায়।
সুখে হোক্, দুঃখে হোক্, ত্রিভুবন পতি,
তোমারি চরণে রহে অটল বিশ্বাস,
এ চঞ্চল চিত্তে প্রভু জাগাও সুমতি,
দুঃখ ঝটিকায় কভু হয় না নিরাশ।
যেন প্রভু কখন না টলে এ চরণ,
বিশ্বাসে থাকুক মগ্ন মোর প্রাণ মন।

***

তোমার মঙ্গল নামে,
বেঁধেছি হৃদয় মন,
তোমারি চরণে বিভু,
করিয়াছি সমর্পন,
যা কিছু সর্ব্বস্ব মোর,
যখন যে ভাবে থাকি,
রেখ সুখে স্নেহ ভরে,
তোমার স্নেহের আঁখি।
সংসার বিদেশ মোর,
রাখিয়াছ যেই স্থানে,
সেই তব দত্ত গৃহ,
আছি সেথা সুখ মনে।
যখন যেথায় যাই,
তুমি থেক সাথে সাথে,
ঘিরিয়া রাখিও তব,
সুমঙ্গল আশীর্ব্বাদে।
যে পেয়েছে এ ধরাতে,
তোমার করুণা কণা,

পাইয়া অতুল শান্তি,
তৃপ্ত আছে সেই জনা।
তুমি হৃদয়েতে থাক,
তুমি জাগ আঁখি পরে,
এ বিশ্ব সংসার যেন,
তোমাতেই যায় ভরে।
তোমারেই ডাকি সদা,
প্রভু পিতা দয়াময়,
কল্যাণ মঙ্গল রূপে,
পূর্ণ হোক এ হৃদয়।

শ্রীসরোজকুমারী দেবী।

সংবাদ।

যে সকল লেখক ও লেখিকা প্রবন্ধাদি যোগাইয়া মুমূর্ষপ্রায় মহিলার জীবন রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছেন এই অনুগ্রহের জন্য তাঁহাদিগকে শত শত ধন্যবাদ। মহিলা প্রেরিত দরবারের পত্রিকা। শ্রদ্ধাস্পদ ভাই গিরিশচন্দ্র সেন দরবার হইতে উহা সম্পাদনের ভার প্রাপ্ত হইয়া প্রায় চৌদ্দ বৎসর নানা বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া তাহা সম্পাদন করিয়া আসিয়াছেন। এক্ষণ তিনি দুঃসহ রোগে আক্রান্ত হইয়া উহা সম্পাদনে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছেন। মহিলা কিরূপে সম্পাদিত হইবে তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা এখনও হয় নাই, প্রেরিত-দিগের দরবার তাহার ব্যবস্থা করিবেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেনের রোগ ইতিমধ্যে বৃদ্ধি হইয়াছিল, জীবনের আশা কিছুই ছিল না। অনেক দিন পর্য্যন্ত তিনি শয্যাগত হইয়া এক পার্শ্বে শয়ন করিয়া মহাকষ্টে জীবনযাপন করিয়াছেন, এক্ষণ তিনি শয্যাগত আছেন। নিজ হস্তে দুই ছত্র লিখিতে পারেন না। একদিন নাড়ীর গতিরোধ হইয়া চৈতন্য বিলুপ্ত হইয়াছিল, ডাক্তারগণ ভীত হইয়াছিলেন। অনেক যত্নে ও কষ্টে এবং উত্তেজক ঔষধ সেবনে নাড়ী পরে সতেজ হইয়াছিল। এখনও একটীর পর একটী উপসর্গ বৃদ্ধি হইতেছে, কত দিনে যে আরোগ্যলাভ করিবেন তাহার স্থিরতা নাই। ঈশ্বর-কৃপায় আরোগ্যলাভ করিলেও দীর্ঘকাল সাপেক্ষ। যে সকল নারী হীতৈষী বন্ধু দয়া করিয়া মহিলার জীবন রক্ষা ও উন্নতির জন্য প্রবন্ধাদি যোগাইতেছেন, ভাই গিরি-শচন্দ্র সেন তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ দিতেছেন।

ভিক্টোরিয়া কালেজ। অনেক দিন আমরা এই কালেজের বিশেষ কোন সংবাদ পাঠিকাদিগকে দিই নাই। মেয়ে-দের শিক্ষা সম্বন্ধে ইহাতে বেশ উত্তম ব্যবস্থা আছে। শিক্ষয়িত্রীগণ বেশ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে শিক্ষা প্রদান করিতে-ছেন। অধ্যক্ষগণ মেয়েদের ইংরাজী বাঙ্গলায় যাহাতে উচ্চ শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন। এক্ষণে বালিকা সংখ্যা প্রায় ১০০ এক শত হইবে। গাড়ি প্রভৃতির ব্যয় অধিক হওয়ায় ছাত্রীদিগের বেতন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু বৃদ্ধি করা হইয়াছে। অভিভাবক-গণ যদি আপনাদিগের অধিনস্থ বালিকা-দিগকে এই স্কুলে পড়াইতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে স্কুলের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রজগোপাল নিয়োগী মহাশয়ের নিকট অনুসন্ধান লইলেই সঠিক সংবাদ প্রাপ্ত হইবেন। বয়স্থা মহিলাদিগের জন্য পূর্ব্বমত বক্তৃতা যোগে বিবিধ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া হইতেছে। অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ সেন, অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক, অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র মহালনবীশ, ডাক্তার সত্যেন্দ্রনাথ সেন, বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনিয়ার শরতকুমার দত্ত প্রভৃতি মহোদয়গণ উপদেষ্টারূপে কার্য্য করিতে-ছেন। পূজার ছুটীর পর ১৫ই নভেম্বর হইতে পুনরায় স্কুলের কার্য্য আরম্ভ হইয়াছে।

সূচী।

কলিকাতা
৫ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "বঙ্গবাসী মেশিন প্রেসে"
শ্রী [illegible] নাথ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৫শ ভাগ] কার্ত্তিক, ১৩১৬, নভেম্বর ১৯০৯। [৪র্থ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে প্রেমময় পরমেশ্বর, তোমার শুদ্ধ প্রেমের রাজ্য পৃথিবীতে আসুক, ইহাই তোমার সাধুগণের চিরদিনের প্রার্থনা। তুমি অনন্ত মঙ্গলময় সত্য, তুমি সর্ব্বক্ষণ সকলকে প্রেম করিতেছ তাহাও সত্য, কিন্তু মানুষ মানুষকে প্রেম করিতে পারে না, বা প্রেম করিলেও মলিন প্রেম করে ইহাতেই পৃথিবী শুদ্ধ প্রেম দেখিতে পায় না। জ্ঞানঘন গুরুদেব, তুমি আমাদিগকে জীবন্ত ও শুদ্ধ প্রেমের দৃষ্টান্ত দেখাইতে নারীর হৃদয়ে মাতৃভাব স্থাপন কর। পৃথিবীর সামান্য নারীর অন্তরে স্বর্গের জীবন্ত ভালবাসা তুমি অবতীর্ণ করিয়া তাহাকে তোমার প্রেমের প্রত্যক্ষ অবতার প্রস্তুত কর। আমরা মাতার অন্তরের জীবন্ত জাগ্রত প্রেম দেখিয়া আশ্চর্যান্বিত হই এবং তোমাকে ধন্যবাদ দান করি। কিন্তু প্রেমঘন পরমদেবতা, দেখ, তোমার কন্যাগণ পৃথিবীতে অসামান্য জীবন্ত প্রেম দেখাইয়াও, স্বর্গের প্রেম, তোমার প্রেম দেখাইতে পারিলেন না। পৃথিবীর জননীগণ, সত্য প্রেম পাইলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের প্রেম আপন আপন সন্তানেই আবদ্ধ রহিয়া গেল। তোমার কন্যাগণ আপন গর্ভজাত সন্তান, অথবা ঘনিষ্ঠ আপনার লোককে যে প্রেমদান করেন তাহাতে স্বর্গের ভাব আছে কিন্তু তাহাদিগের প্রেমের সংকীর্ণতা দেখিয়া মনে হয় যে তাহাতে স্বর্গ নাই তাহা কেবলই পার্থিব ভাব। প্রেমঘন দেবতা, তোমার কন্যাগনকে তুমিই স্বর্গীয় প্রেম দিয়া এমন প্রেমপূর্ণ কর। যদি এত করিলে তবে প্রার্থনা করি তোমাকে আরও কৃপা করিতে হইবে। তোমার কন্যাগণের প্রেমকে তুমি উদার করিয়া দেও। যিনি এক শিশুর জননী হইতে তোমা কর্ত্তৃক শিক্ষা পাইয়াছেন, তিনি সকল শিশুর জননী হউন। মঙ্গলময়, তোমার কন্যা-

গণের প্রেমের সংকীর্ণতা হইতে পৃথিবীতে যে দুঃখ ও অবিচার হইতেছে তাহা হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি স্বার্থপর নারীকে যেমন প্রেমময়ী জননী প্রস্তুত কর, তেমনই সংকীর্ণ হৃদয়া জননী-দিগকে উদার হৃদয়া দীন-জননী প্রস্তুত করিয়া দেও। সকল নারীর হৃদয়ে তোমার শুদ্ধ ও উদার প্রেম জয়যুক্ত হউক।

পতি পত্নীর পরস্পর শারীরিক, মানসিক এবং আত্মিক সম্বন্ধ ও ব্যবহার।

পতি পত্নী সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মমূলক সম্বন্ধ। ইহা কোন প্রকার লিখিত একেরারনামা (agreement) বা বাচনিক বা প্রতিজ্ঞামূলক সম্বন্ধও নহে। পূজ্যপাদ জ্ঞানগভীর আর্য্যগণের ব্যবস্থাপিত পরিণয় সম্বন্ধ বর্ত্তমান তথাকথিত সভ্যতাভিমানী প্রতীচ্য দেশ সমূহের প্রচলিত সম্বন্ধের ভাব হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। আর্য্যগণ মানবজাতির ক্রমবিকাশের সঙ্গে, অতঃপর তাহাদের তপস্যা অর্জ্জিত গভীর জ্ঞানে পশুস্বভাবগত প্রবৃত্তি নিচয়ের হাত হইতে মানবের পতি-পত্নী সম্বন্ধকে এক অতি উচ্চতর এবং পবিত্রতম স্তরে রাখিয়া ইহাকে আগাগোড়া পূর্ণ মাত্রায় ধর্ম্ম ও অনুশাসন বিধির অন্তর্ভূত করিয়াছেন। এই সম্বন্ধে ধর্ম্মতঃ ইহজীবনে এবং জীবনান্তেও বিচ্ছেদ নাই। পত্নীর অন্য নাম "সহধর্ম্মিণী" এবং "সহমরণ গামিণী"। একমাত্র এই উভয় নামেই ইঁহাদের অক্ষুণ্ণ বন্ধন বুঝাইয়া দিতেছে। [এই স্থানে 'সহমরণ' অর্থে নবযুগের নবধর্ম্ম বিধানের ভাবানুসারে পতিসহ পত্নীর চিতানলে দগ্ধ হইয়া মরণ নহে, কিন্তু পতি বিয়োগান্তে তৎসঙ্গে পত্নীর সর্ব্বপ্রকার বাসনা, কামনা সুখভোগাদির সহমরণ বুঝিতে হইবে।] এতাবৎ কারণে বিপত্নীকের দ্বিতীয় পত্নী এবং বিধবার দ্বিতীয় পতি গ্রহণ ধর্ম্মতঃ সম্মত নহে। বিশেষ, ব্রহ্মসাধনার্থী কিম্বা তাঁহার উদ্দেশে ধর্ম্মাচরণে ব্রতী উভয় নরনারীর পক্ষে সম্পূর্ণ অবৈধ। তবে নিঃসন্তান কিম্বা বালবিধবা এবং বিপত্নীকের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। এতদ্ভিন্ন একাধিক পতি বা পত্নী গ্রহণের দ্বারা প্রকৃতরূপে পরিণয় অনুষ্ঠানের অতি উচ্চ এবং পবিত্র আদর্শকে খর্ব্ব করা হয়। ইহা মানবস্বভাবের একান্ত দুর্ব্বলতার পরিচয়। ধন্য সেই পতি যিনি স্বীয় পত্নী বিয়োগান্তে দ্বিতীয় পত্নী গ্রহণের সকল বাসনা পরিত্যাগ করেন, এবং ধন্যা সেই পত্নী যিনি স্বীয় পতি বিয়োগান্তে দ্বিতীয় পতি গ্রহণের সকল বাসনা পরিত্যাগ করেন. এবং উভয়ে তদবস্থায় পরস্পরকে আত্মায় ধারণকরতঃ পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যাব্রত-ধারী-ব্রতধারিণী হন।

পতি পত্নীর শারীরিক ব্যবহার।

পতি-পত্নী পরস্পরের প্রতি শারীরিক ব্যবহার সম্বন্ধে বৈধ পবিত্রতা রক্ষা করিবার বিষয়ে দেবচরিত ঈশা বলিয়াছেন, "Beware that thou committeth adultery with your wife" 'সতর্ক

হও যে তুমি তোমার পত্নীর প্রতি ব্যভিচারী না হও'। ইহার অর্থ এই যে একমাত্র পশুপ্রকৃতি প্রাণোদিত হইয়া প্রবল কামনা প্রবৃত্তির অযথা ব্যবহারে রত থাকিলে স্বীয় পত্নীর প্রতিও ব্যভিচার দোষ হয় জানিবে। পুণ্যচরিত ব্রহ্মানন্দ শ্রীকেশবও এই যুগে বলিয়াছেন, 'নারীকে ব্রহ্মকন্যা বলিয়া জানিবে, এই বচনের দ্বারা তাঁহাদের সহ পাত্র নির্ব্বিশেষে সর্ব্বাঙ্গীণ পবিত্রতা রক্ষা করিয়া ব্যবহার করিবার জন্যই ইঙ্গিত করিয়াছেন। অতঃপর আমাদের পূর্ব্বপুরুষ পরম ধর্ম্মপরায়ণ তপশ্চরণ রত পূজ্যপাদ আর্য্যঋষীগণ এই শারীরিক ব্যবহারে, এবং ধর্ম্মার্থ সাংসারিক সকল প্রকার কার্য্যকলাপে যেমন বিশেষরূপ সংযতচিত্ততা রক্ষা করিতে বলিয়াছেন, এখানেও তেমনি সংযতচিত্ত হইতে বলিয়াছেন।

আর্য্যগণের জীবনধারণ বিষয়ক ইতিহাস অধ্যয়ন কালে জানিয়াছিলাম আর্য্য মনীষীগণ কখন হিতাহিত বিবেচনা বিহীন হইয়া অবিচারে কালে, অকালে পত্নীঅঙ্গ স্পর্শ করিতেন না, তাঁহারা তৎবিষয়ে দিন, কাল, তিথি নক্ষত্রাদিযোগে বিশুদ্ধ সময় নিরূপণ পূর্ব্বক এবং উভয়ের শারীরিক, মানসিক, পবিত্রতা চিত্তের প্রফুল্লতাদির প্রতি দৃষ্টি রক্ষা করিয়া চলিতেন। এমন কি সন্তানের জন্ম আত্মজন্ম [আত্মজ] এইরূপ মনে ধারণাপূর্ব্বক তাঁহারা সন্তানের সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ উদ্দেশে দেবনামাদি শ্লোকে নিবদ্ধ মন্ত্র অন্তরে অন্তরে উচ্চারণ করিতেন, ইহাতেই আর্য্যগণ তখন প্রায়তঃ বীর্য্যবান্, বলিষ্ঠ, ধর্ম্মপরায়ণ এবং দীর্ঘায়ু সন্তান লাভ করিয়াছেন। এইরূপ সকল বিষয় অতি গুরুতর চিন্তাসহকারে এই শারীরিক ভোগেও পবিত্রতার দিকে তীব দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন। কত প্রকারে কত যত্নে কত সতর্কতাসহকারে এই মানবসাধারণ সুলভ পশুপ্রকৃতিকে তাঁহারা দেবপ্রকৃতিতে পরিণত করিবার উপায় এবং সাধন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ইহা যতই অধ্যয়ন করা যায় ততই তাঁহাদের প্রতি ভক্তি ও কৃতজ্ঞতায় প্রণতঃ হইতে হয়। এই অতি গুরুতর বিষয়, সম্পূর্ণ চিন্তাহীন বর্ত্তমান শিক্ষিত কি অশিক্ষিত জনসাধারণ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যবহার —পান আহারের মত অবহেলা পূর্ব্বক জীবনের সার ও কার্য্যের কাল, যৌবনের অবিহিত ব্যবহারে বা অত্যাচারে অকালে ধ্বংশাবশেষে পরিণত করে। সন্তান সন্ততিগণ যদি মনুষ্যজীবনের সার্থকতা, ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া চলিতে চাও তবে উল্লিখিত অভিজ্ঞান উপেক্ষা করিবে না। যথা সাময় পতি-পত্নী শারীরিক ব্যবহারে শুদ্ধতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া চলিবে।

মানসিক ব্যবহার।

পতি-পত্নীর শারীরিক ব্যবহারেও মন সদা পরিলিপ্ত [involved] থাকে। শরীরের উপরে মনেরই ক্রিয়া, মনের ইঙ্গিত ভিন্ন শরীর ক্রিয়াহীন। তবে পতি-পত্নীর শরীর এবং তৎ রক্তমাংস সম্বন্ধ ছাড়াও এক প্রকার একমাত্র মনের ব্যবহার আছে। অভিজ্ঞতায় জানিয়াছি

এই সংসারে অতি অল্প পরিবারে পতি-পত্নী এক অভিন্ন মন ধারণ করিয়া থাকেন। নরনারী স্বতন্ত্র বংশসম্ভূত, এবং বংশ সংক্রামিত প্রকৃতিলাভ করিতেই প্রায় দেখা যায়। এ জন্য অন্তঃকরণগুলিও বিভিন্ন উপাদানে গঠন পাইয়া থাকে, কিন্তু যখন যথাসময় নরনারীর পতি-পত্নী সম্বন্ধ-পাত হয়, তখন উভয়ে এক অভিন্ন ভাবগত চিত্ত লাভের জন্য সতঃই লালায়িত হন। ইহা অতি স্বাভাবিক। মানুষ ভালবাসার ফলে পরস্পর চিন্তায়, আনন্দে, দুঃখে, শোকে, বিপদ সম্পদে একভাবাপন্ন হইতে ইচ্ছা করে। নরনারীর দাম্পত্য প্রণয়গত ভালবাসায় চিরঅভিন্ন বা এক দেহগত ভাবাপন্ন হইতে চাহে। কার্য্যতঃ অতি সৌভাগ্য এবং পুণ্যবলে অতি অল্প নরনারীর ভাগ্যেই ইহা আংসিক কি পূর্ণ পরিমাণে সম্ভাবিত হইতে দেখা যায়। এতদবস্থায় পতি-পত্নী সংসার ধর্ম্মে, সুখ দুঃখে, হর্ষে কি বিষাদে, দেব আনন্দভোগে কি অভোগে কেহ কাহাকে অতিক্রম করিবার পথ থাকে না। পরস্পরের ভিতর সর্ব্বপ্রকারের আমিত্ব লীন হয়। পতি পত্নী তখন 'তুমি যা চাও, আমি তাই চাই'—'তুমি যা ভাব আমি তাহাই ভাবি' তোমার প্রফুল্লতা আমার প্রফুল্লতা,' এমন কি 'তোমার দোষ আমার দোষ'—'তোমার গুণ আমার গুণ'—এইরূপ একই ভাব সাগরে যেন দুজন ডুবিয়া এক হইয়া গিয়াছে। আন্তরিক ভিন্নতা ব্যবহার গুণে বা দোষে বাহিক ভিন্নতা ব্যবহারগুণে বা দোষে বাহিক ভিন্নতা উপস্থিত হইলে বাহিক চেহারাতেও তাহা ধরা পড়িয়া যায়। এ জন্য সর্ব্বাগ্রে পতিপত্নীকে অতি ধীরতা এবং সতর্কতাসহকারে অধ্যয়ন করিবে। (Study thoughts, study attitude of mind and study points disagreeeble) পরস্পরের মেজাজ সম্যকরূপে অধ্যয়ন করিবে, এবং তদনুসারে বুঝিয়া ভিন্নভাব গুলির সংবর্দ্ধন অসম্ভব করিবে।

মানসিক ব্যবহারে পতি-পত্নী পরস্পরের দোষ গুণ সহিষ্ণুতা সহকারে মার্জ্জনা এবং গ্রহণ না করিতে পারিলে উভয়ের প্রথম মিলন অবধি আন্তরিক গোল বাঁধিয়া যায়। মনের দ্বারা ব্যবহারে পরস্পরকে পাইবার জন্য সর্ব্বপ্রধান অবলম্বনীয় পূর্ণ সরলতা। পতি-পত্নী অনেক সাংসারিক কর্য্যকলাপে পরস্পরকে ঢাকাঢাকি করিয়া চলিতে দেখা যায় শুধু এইজন্য হয়তঃ চানক্য বলিয়াছিলেন—'বিশ্বাসনৈব কর্ত্তব্যং স্ত্রীষু রাজকুলেষ্'। বস্তুতঃ এই ক্ষেত্রে পরস্পরে বিশ্বাস বিপন্ন হয়। যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ যে কোন কালেই হউক এইরূপ কোন বিষয়ে ঢাকাঢাকি করিয়া চলিবার মন—কিম্বা কোন কারণে বাধ্য হইলেও ধীরে ধীরে সরলতায় মলিনতা ধরিয়া সর্ব্বশেষে জীবনকে দুঃখময় বা কলঙ্কময়ও করিতে পারে। শুনা আছে অনেক বিষয়মগ্ন সাংসারিকতায় পূর্ণ পরিবারে পতি-পত্নী প্রচ্ছন্ন কোন স্বার্থ সাধন কল্পে চালাকী, চাতুরী, ধূর্ত্ততা বহু পরিমাণে রক্ষা করিয়া এক ফাঁকা পতি-পত্নী-ধর্ম্মাচরণ করিয়া

জীবনপাত হয়। এতৎস্থলে ধর্ম্মের স্থানে অতি দ্রুতবেগে অধর্ম্মের অধিকার পাওয়া অবশ্যম্ভাবী হয়। পতি-পত্নী মনের আদান প্রদান জনিত নির্ম্মল এবং মানসিক অতি উচ্চ ভাবযুক্ত ব্যবহার রক্ষা করিতে হইলে পতি-পত্নী পরস্পর একেবারে অন্তর্যামী বা অন্তরদর্শী হইয়া চলিতে হইবে। কোন ঘড়ির যন্ত্রগুলি যেমন স্বচ্ছ কাঁচের আবরণে আবৃত, তাহার প্রত্যেক চাকাটীর ঘূর্ণন, গতি, আঘাত ইত্যাদি বাহির হইতে অতি পরিষ্কার এবং স্পষ্টভাবে দেখা যায়.—ঠিক সেইরূপ উভয় হৃদয়ের সর্ব্ববিধ ভাব পরস্পরের নিকট অনাবৃত বা মুক্ত থাকা চাই, এখানে আর ঢাকাঢাকি নাই। কোন শিক্ষিত সচ্চরিত্র পতি একবার আমায় বলিয়াছিলেন "প্রায় ১৭ বৎসর পত্নীসহ বসবাস করিলাম—কিন্তু আমি এখনো তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে চিনিতে পারিলাম না"! পারিবারিক জীবন ইহা অপেক্ষা আর কি শোচনীয় হইতে পারে? পরস্পর মুক্ত অন্তর না হইলে কখনো কি পরস্পরকে পাইবার অন্য পথ আছে? যদি কোন পতি এই অন্তর ঢাকাঢাকির অবস্থায় কোনরূপ ঘুণাক্ষরেও পর নারীর প্রতি লক্ষ্য করিয়া অনুমানেও মনে করেন—"এমন সুন্দর মধুর প্রকৃতিযুক্ত নারীই আমার গৃহিণী হওয়া বড়ই বাঞ্ছনীয় ছিল"—তবে জানিবে তৎক্ষণাৎ তাহার সততার পতন হইল। তিনি বৈধ পত্নীর নিকট ধর্ম্মতঃ অপরাধী হইলেন; এবং পত্নীও কখনো কোন মিষ্টভাষী, শান্ত মধুর প্রকৃতি নরের প্রতি লক্ষ করিয়া চিন্তাও করেন এমন সুপুরুষই আমার পতি স্থানের উপযোগী"—তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তিনি ধর্ম্মতঃ অসতী হইলেন। সুতরাং অতি সাবধানে এমন অনন্যমনগত নির্ম্মল, নিখুত, দাম্পত্য সম্বন্ধ রক্ষা করিবে যেন মানসিক ব্যবহার সর্ব্বপ্রকারে নিষ্কলঙ্ক থাকে।

আত্মিক ব্যবহার।

পতি-পত্নীর শারীরিক এবং মানসিক ব্যবহারের ফলের উপর আত্মিক ব্যবহার নির্ভর করে। উল্লিখিত উভয় শারীরিক এবং মানসিক ব্যবহারের পবিত্রতা এবং অপবিত্রতার ফলে পতি-পত্নীর আত্মার ভাবসমূহ বিকশিত অথবা বিনষ্ট হয়। আত্মায় আত্মায় ব্যবহার যেন সকল বহির্বিষয়ের অতীত অন্তঃপুরে। সুতরাং উভয়ে এক মিলিত ঘন মধুর খাঁটী ব্রহ্মোপাসনার ভিতরে এই আত্মায় আত্মায় পরিচয়ের সূত্রপাত হইবে। একমাত্র ভগবানের পদতলে উভয়ের মিলন ভিন্ন পতি-পত্নী আত্মার আত্মার যোগ-সম্বন্ধ বুঝিয়া লইবার আর অন্য সদুপায় নাই। আত্মার সর্ব্ববিধ ব্যাপার একমাত্র পরমাত্মাকে লইয়া, পরমাত্মার সংস্পর্শ ভিন্ন আত্মা নিষ্ক্রিয়, সুতরাং উভয়ে সেই দেব-পদতলে বসিয়া তাঁহার জীবন্ত সত্বা অনুভবে হৃদয়ের পূর্ণ অনুরাগে সরল উপাসনা করিবে এবং এই উপাসনালব্ধ আত্মার ভাব বিনিময়ে পরস্পর আত্মার যোগসাধনে প্রবৃত্ত থাকিবে। আত্মার "এই যোগমূলক অবস্থায় পতি-পত্নীর আত্মিক ব্যবহারের ভাব সমুহ বিকশিত হইবে।

পতি-পত্নীর মিলিত উপাসনাকালে প্রথমে অন্তরকে এক অবিচলিত দেব বিশ্বাসের বিন্দুতে (focus) উপস্থিত করিবে, অনন্যমনে উপাস্য দেবতাকে শরীরে অনুভব, মনে উপলব্ধি, অতঃপর আত্মায় ধারণা, এই ত্রিবিধ ভাবে পতি-পত্নী একে একে ধীরে গম্ভীরে অভিভূত হইতে চাহিবেন এতদবস্থায় উপাসনায় দেব আবির্ভাব, দেব সত্বাতে বেষ্টিত এবং দেব সান্নিধ্য [কল্পনায় নহে] পূর্ণ বিশ্বাস জ্ঞান ও ভক্তিতে দর্শন করিবেন [দর্শন বলিতে আত্মার দর্শন বুঝিবে, সে দর্শন ভাষাতে ব্যক্ত করা যায় না]। এইরূপ উপাসনায় পতি-পত্নী আত্মাতে অভিন্নতা প্রাপ্ত হন ; পত্নী দেখেন তৎসময়ে উপাস্য দেবতার যে স্বরূপ নিচয় তাঁহার ভিতরে প্রকাশ পাইতেছিল তাঁহার পতি ঠিক সেই স্বরূপ আরাধনায় ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই ভাবে পতি দেখেন পত্নীর বাহ্যিক প্রকাশে তিনি তাঁহার নিবেদিত আরাধনায় অনন্য চিত্ততা সহকারে ভোগ মগ্ন হইয়া পতিসহ ভিন্নতা হারাইয়াছেন। প্রার্থনান্তে নিত্য এইরূপ হইবে যে উভয়ে এক সঙ্গে একই সঙ্গীত ধরিয়া ফেলিয়াছেন, এবং প্রার্থনা এমনি হইবে যে পতির চাওয়া পত্নীর এবং পত্নীর চাওয়া পতির একই হইতেছে। এই অবস্থায় আত্মার পরম সৌভাগ্য বুঝিবে। এই পরম গুপ্তধন উপাসনা সকলি দান করিবে। এই অবস্থায় পতি পত্নীর আত্মিক ব্যবহার সংসারের সর্ব্ববিধ প্রচলিত ব্যবহারের অতীত এক উচ্চতম স্তর লাভ করে। ইহা হইতেই চরমে পতি পত্নীর আধ্যাত্মিক বিবাহ সংঘটিত হয়।

পতি পত্নীর পরস্পর আত্মায় আত্মায় যোগযুক্ত হইলে কি লক্ষণ প্রকাশ করে ? ইহাতে উভয়ের স্থান কালের বর্ত্তমানতা কি অবর্ত্তমানতার দূরতা কি নিকটবর্ত্তীতা বিদূরিত করে। দিবানিশি ২৪ ঘণ্টাকাল পরস্পরের মন অধিকার করিয়া যাপিত হয়। চলা ফেরা, উঠা বসায়, পান আহারে শয়নে স্বপনে, নিদ্রায় জাগরণে পরস্পর পরস্পরে তন্ময়। একটি নিমেষ ও "উনি কোথায়" সে প্রশ্ন মনে উদিত হইতে পাইবে না। ব্রহ্ম সন্নিধানে কিম্বা তাঁহার ভিতরে উভয় এক। যিনি যেথানেই থাকুন উভয়ের শরীরগত ব্যবধান দূর করিয়া পরস্পরে মন-মনোময়, আত্মা পরমাত্মার সত্বাময়, এই ভাবে পরস্পর হইতে এক নিমেষেও খসিয়া থাকিবার যো নাই। তখন আত্মায় আত্মায় ব্যবহার কিরূপ ? উভয়ে পরস্পরকে অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক বিষয় সকল আলোচনা করিতে নিয়ত ইচ্ছা প্রকাশ করে—যথা, 'যাজ্ঞবল্ক মৈত্রেয়ীর' কথোপকথন। এইরূপ অবস্থায় প্রতিনিয়তই বাহ্যিক সর্ব্বপ্রকার সাত্বিকতা রক্ষা করিয়া চলিতে ব্যাকুলতা প্রকাশ করে। তৎঅবস্থায় পরস্পরের শরীর স্পর্শ কর, শরীর রোমাঞ্চিত হইবে, মন স্পর্শ কর জাগ্রত হইবে, আত্মা স্পর্শ কর স্বর্গের তাড়িৎ সঞ্চারিত হইবে। সংসারের কাজকর্ম্ম অলৌকিক, কথাবার্ত্তা অলৌকিক, হাসি কান্না অলৌকিক সকলই দেবস্পর্শাধীন হইয়া প্রকাশ

পাইবে। সন্তানেরা সংসারে এইরূপ পারিবারিক জীবন পাইয়া ধন্য হও।

শ্রীআনন্দচন্দ্র দত্ত।

কার্য্যকৌশল।

Tact means thinking about others. It means considering what others will think, instead of considering only what we think ourselves. It means acting in concert with others, instead of acting oniy for ourselves. Imitation tact may be insincere, and selfish in its purposes. But real tact is unselfishness in action, and that is why it gains so much and wins so many hearts.

স্ত্রীলোকের পক্ষে কার্য্যকুশলতা একান্ত প্রয়োজন। কার্য্যকুশল না হইলে কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া অসম্ভব। ইহা যেন একটী ঐন্দ্রজালিক শক্তি, ইহা দ্বারা মানুষকে মুগ্ধ করা যায়। কার্য্যকুশল ব্যক্তি, অন্যকে সুখী করিতে পারেন, অন্যকে মনকষ্ট, ভুলধারণা অসন্তোষ হইতে বাঁচাইতে পারেন। ব্যবহারে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি, অন্যের মনে কষ্ট দেন, লোকের মনে ভুলধারণা জন্মাইয়া দেন। কার্য্য-কুশলতা মানুষের হৃদয়দ্বারকে উন্মুক্ত করে, আত্মীয়তা বন্ধুতা স্থাপিত করে। ধাতু তৈলাক্ত থাকিলে, যেমন সংঘর্ষণ ও অগ্নি উৎপন্ন হইতে পারে না, তেমনি, কার্য্যকুশলতা থাকিলে পরস্পরের সহিত ব্যবহারে সংঘর্ষণ হয় না, অর্থাৎ মনোবাদ, মনোকষ্ট ক্রোধ হিংসা উপস্থিত হয় না।

কার্য্যকুশলতা কি তাহা বুঝাইয়া দেওয়া সুকঠিন। কিন্তু কোনটী কার্য্য-কুশলতা কোনটী নয় তাহা বলা যাইতে পারে। কার্য্যকুশলতার কয়েকটী দৃষ্টান্ত দেখাইলে বুঝিতে পারিবেন, যে ইহা সুশিক্ষা, বিশুদ্ধপ্রীতি, ও অন্যের অবস্থা বুঝিবার ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। ভদ্রতা ও সদয়ব্যবহার, ইহার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। জ্ঞান, সুরুচি, সহানুভূতি, উদারতা, ধৈর্য্য, ক্ষমা, সুবিবেচনা, প্রভৃতি নানা গুণের সমষ্টি, বা ফল কার্য্যকুশলতা। ইহাদের মধ্যে একটীরও অভাব হইলে, কার্য্যকুশলতা অন্তর্হিত হন। কার্য্যকুশ-লতা অত্যন্ত সুকুমার, ইহার সহজে অনিষ্ট হবার সম্ভাবনা। যদি লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিতে গিয়া, একটু অধীর হই বা উদাসীন হই, আর কার্য্যকুশলতাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না। অতি যত্নের ধন, অল্পেতেই নষ্ট হয়। বৃদ্ধ, অক্ষম; বধির বা অঙ্গহীন ব্যক্তিদিগের সহিত, ব্যবহার করিতে কার্য্যকুশলতা একান্ত আবশ্যক। সকলেই বৃদ্ধ ও অক্ষমদিগকে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক; কিন্তু অতি অল্পেতেই ইহাদিগের মনে আঘাত লাগি-বার সম্ভাবনা। যিনি অঙ্গহীন তাঁর অঙ্গ-হীনতার কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া ও অপরদিকে তাঁর অসহায় অবস্থার বিষয়ে উদাসীন না হইয়া তাঁহার সহিত ব্যবহার করিতে হইবে। যিনি বধির হইয়াছেন, তাঁর সম্মুখে আস্তে আস্তে কথা বলা

উচিত নয়, কিন্তু তাঁকে লক্ষ্য করে উচ্চৈঃস্বরে কথা বলাও অন্যায়। যিনি বৃদ্ধ বা অক্ষম, তাঁ'র দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত নয় ও অবহেলা করাও ঠিক নয়। যখন কোনও বৃদ্ধ বা অক্ষম ব্যক্তিদের সহিত ব্যবহার করিবে, তখন মনে মনে ভাবিয়া দেখিবে, তুমি এরূপ অবস্থাপন্ন হইলে, অন্যের নিকট হইতে কিরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা করিতে, তাঁহাদের প্রতি সেরূপ ব্যবহার করিবে। সার কথা এই কার্য্যকুশল লোক সর্ব্বদা অন্যকে সুখী করিতে চেষ্টা করিবে।

লোকের সহিত ব্যবহারে যেমন আমরা নিজের ইচ্ছা রুচি সুখ সুবিধার কথা ভাবি, তেমনি অন্যের ইচ্ছা সুবিধার বিষয় ভাবিতে হইবে।

অসরল, কার্য্যকুশলতা দ্বারা কিছু-কালের জন্য লোকের মনকে আকৃষ্ট করিতে পারে বটে, কিন্তু অনতিবিলম্বে তাহার শূন্যতা প্রকাশিত হয়, তাহার স্বার্থপর স্বরূপ, দেখা দেয়।

— —

সক্রেটিস।

পাঠিকাগণ আপনারা অবশ্যই মহাত্মা সক্রেটিসের নাম শুনিয়াছেন, আজ তাঁর মৃত্যুর পূর্ব্বের কয়েক ঘণ্টাতে যে সকল বাক্যালাপ করিয়াছিলেন, তাহাই বলিতে চাই। তিনি কেমন অকুতোভয়ে, আপনার অন্তর্নিহিত, স্বাভাবিক জ্ঞান ও আলোকের জন্য প্রাণ দিলেন, সেরূপ দৃষ্টান্ত জগতে বিরল। কুসংস্কার, পৌত্তলিকতা পাপ স্বার্থপরতার মধ্যে উর্দ্ধ-প্রেরিত জ্ঞান ও আলোকের বশবর্ত্তী হইয়া, নিস্বার্থপ্রেমে পরশুভানুধ্যায়ী হইয়া বিষপানে, প্রাণত্যাগ করিলেন। বিষ পয়োগের পূর্ব্বে তাঁহাকে কিছুদিন, কারা-রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, তখন তাঁর আত্মীয় বন্ধুগণ তাঁহাকে পলায়ন করিবার পরামর্শ দিয়াছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অনায়াসে পলায়ন করিতেও পারিতেন। যখন তাঁ'র স্ত্রী তাঁকে বলিলেন, এইরূপে নিরপরাধে, অবিচারে তোমার প্রাণ যাইবে তাহার উত্তরে সক্রেটিস বলিয়া-ছিলেন, তুমি কি ইচ্ছা কর আমি অপরাধী হইয়া প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হই।

খ্রীষ্টের জন্মের কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সক্রেটিস গ্রীসদেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বলিতেন, যে আমার অন্তরে একজন কে কথা বলেন, সেই বাণীর অনুসারে আমি চলি। তিনি যুবকদের সহিত, নীতিচরিত্র বিষয়ে নানারূপ আলোচনা করিতেন, কেবল উপদেশ দিতেন না, কিন্তু তাহাদের সহিত আলোচনা করিতে করিতে সত্যকে, সুনীতিকে বুঝাইয়া দিতেন, যাহাতে যুবকগণ সে সকল গ্রহণ না করিয়া থাকিতে পারিত না। সে সময়ে তাঁর মত জ্ঞানী আর কেহ ছিলেন না। তাঁহার সমকালীন অনেক লোকের খুব পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁহারা উঁহাকে দ্বেষ করিতেন। কথিত আছে একদা তাঁহারা ডেলফাই মন্দিরে (Oracle of Delphi) জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, এখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিক জ্ঞানী কে? দৈববাণী হইল,

সক্রেটিস্। একথা যখন সক্রেটিসের কর্ণগোচর হইল, তখন তিনি বলিলেন, আমাকে এই জন্য অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলা হয়েছে যে, আমি জানি যে আমি কিছুই জানি না। কারণ যিনি যত কেন পণ্ডিত জ্ঞানী হউন না, কেহই কিছু জানেন না, ইঁহারা সকলে পণ্ডিত জ্ঞানী বলিয়া অভিমান করেন, কিন্তু আমি একথা জানি যে আমি কিছুই জানি না, তাই আমি সর্ব্বাপেক্ষা জ্ঞানী। তিনি যুবকদের অনিষ্ট সাধন করিতেছেন ও তিনি প্রচলিত দেব দেবীকে স্বীকার করেন না, এই অপরাধে তিনি প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হন। তিনি কয়েকজন অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু ও শিষ্য পাইয়াছিলেন, তাঁহারা তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। জগদ্বিখ্যাত জ্ঞানী প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্য ছিলেন, তিনিই সক্রেটিসের জীবনের শেষ কয়েক ঘণ্টার বিষয়ে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহাই এখানে লিখিত হইল।

আমরা কারাগারে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, সক্রেটিসকে শৃঙ্খলমুক্ত করা হইয়াছে, তাঁর স্ত্রী জ্যান্টিপি ছোট ছেলেটীকে নিয়ে তাঁর পাশে বসে আছেন। আমাদের দেখিবামাত্র জ্যান্টিপি উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, স্ত্রীজাতিসুলভ নানা প্রকার বিলাপ করিতে লাগিলেন। জ্যান্টিপি বলিলেন, "সক্রেটিস, তোমার বন্ধুরা তোমার সঙ্গে শেষ আলাপ করবেন, তুমিও বন্ধুদের সহিত শেষবার কথা বলিয়া লইবে।" সক্রেটিস ক্রিটোকে বলিলেন, তোমরা উঁহাকে গৃহে লইয়া যাও। জ্যান্টিপি বক্ষে করাঘাত করিতে করিতে উঁহাদের সঙ্গে গৃহে গেলেন। সক্রেটিস বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন "মানুষ যাকে সুখ বলে, সেই সুখ কি আশ্চর্য্য পদার্থ, ইহার বিপরীত বস্তু দুঃখের সঙ্গেই বা ইহার কি আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। যদিও তাহারা একই সময়ে একজন লোকের নিকট উপস্থিত হয় না, কিন্তু যেখানে ইহাদের মধ্যে একটী স্থান পায়, সেখানে অপরটীকে আশ্রয় দিতে বাধ্য।"

এই কথার পর সক্রেটিস বলিলেন, "যদি ইসপ (Æsops Fable যিনি লিখেছেন) ইহা লক্ষ্য করিতেন, তাহা হইলে তিনি ইহা লইয়া একটী উপকথা লিখিতেন।" ভগবান্, এই দুইটী বিপরীত বস্তুকে মিলাইতে চাহিলেন, কিন্তু কোনরূপেই মিলিত করিতে না পারিয়া, তিনি তাহাদের মস্তকদ্বয়কে সংযুক্ত করিলেন। এই জন্য যাহার নিকটে একজন আসিয়া উপস্থিত হন, অনতিবিলম্বে আর একজনকেও দেখা যায়। যেমন আমার পায়ের ব্যথা হইয়াছে, শৃঙ্খলাবদ্ধ হইবার পূর্ব্ব হইতেই আমি পায়ের ব্যথায় কষ্ট পাইতেছিলাম কিন্তু এখন আরাম আসিয়াছে।

পারিবারিক ধর্ম্মকথা।

ভারতবর্ষ এবং অন্যান্য দেশেও এখন সকল বিষয়েই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যভাবের মিলন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে। যদিও

কোন কোন স্থলে পাশ্চাত্যভাব প্রাচ্যভাবকে অতিক্রম করিয়া আপনার প্রাধান্য বিস্তার করিতেছে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে এক ভাব অন্য ভাবকে সাক্ষাৎভাবে বিনাশ করিবার উপক্রম করিলেও পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হইয়া এক নবভাবে পরিণত হইয়া বিধাতার ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে।

ব্রাহ্মসমাজ বিধাতা কর্তৃক আদিষ্ট হইয়া এক মহান্ কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। এই কার্য্যভার পূর্ব্ব ও পশ্চিমের মিলন সাধন করা। পূর্ব্বদেশের ব্রহ্মজ্ঞান পশ্চিমের কর্ম্মসাধনের সঙ্গে মিলিত হইবে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "ইংলণ্ড ভারতকে তাহার বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্প, বাণিজ্য এবং কর্ম্মোদ্যম দান করুক এবং ভারত ইংলণ্ডকে তাহার ব্রহ্মবিদ্যা শিক্ষা দান করুক। পাশ্চাত্যসভ্যতা ঈশ্বরের নামে আমাদের দেশে আসিতেছে, কোন্ গর্ব্বিত ব্যক্তি ইহাকে অস্বীকার করিয়া বলিবে, আমরা এই পর্য্যন্ত অগ্রসর হইব আর অধিক হইব না।"

প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যভাবের একত্র সমাবেশ সাধন করিবার পূর্ব্বে, প্রত্যেক ভাবের বিশেষত্ব কি তাহা বিশ্লেষণ করিয়া দেখা প্রয়োজন। প্রাচ্য জগত ধর্ম্মপ্রধান, পাশ্চাত্য জগত কর্ম্মপ্রধান। ভারত প্রাচ্যভাবের বিকাশস্থল এবং ইংলণ্ড পাশ্চাত্যভাবের বিকাশস্থল। আধ্যাত্মিক রাজ্যের যত সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতত্ত্ব ভারতে প্রকাশিত হইয়াছে, এরূপ আর কোন্ দেশে হইয়াছে এবং বিজ্ঞান জগতের সূক্ষ্মাদপিসূক্ষ্মতত্ত্ব যত পাশ্চাত্যপ্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে, এপ্রকার আর কি কোন জাতির দ্বারা এপর্য্যন্ত হইয়াছে! বিধাতার বিশেষ বিধানে এই দুই জাতি একত্র সম্মিলিত হইয়াছে। ইহাদিগের সম্মিলনে এক নবজাতির উৎপত্তি হইবে, যাহাদের ধর্ম্ম হইবে নববিধান। এক্ষণে যাঁহারা বিধাতার আলোকে এই নববিধান গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারাই এই নবজাতির আদিপুরুষ হইবেন। কিন্তু আমরা কি এই নবধর্ম্মের উপযুক্ত হইয়াছি? আমাদের জীবনে কি প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যভাবের, ধর্ম্মের এবং কর্ম্মের একত্র মিলন হইয়াছে? আমাদিগকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বলিতে হইবে আমরা এখনও তাহা জীবনগত ভাবে সাধন করিতে পারি নাই। কিন্তু আমরা এই মহান্ আদর্শকে সম্মুখে রাখিয়া তাহারি দিকে অগ্রসর হইতেছি। দোষ, ত্রুটি এবং দুর্ব্বলতাজনিত উত্থান ও পতনের মধ্য দিয়া যাইতেছি; কিন্তু আশা এবং বিশ্বাস পোষণ করি যে ব্রহ্মকৃপাবলে আমরা সেই আদর্শ লাভ করিতে সমর্থ হইব। অনেকে বলিয়া থাকেন ব্রাহ্মসমাজের ধর্ম্ম এখনও নারীজাতির মধ্যে বিশেষ ভাবে বদ্ধমূল হয় নাই। ইহা অনেক পরিমাণে সত্য। তাহার প্রমাণ পুরুষদিগের মধ্যে যত অধিক সংখ্যক ধর্ম্মপ্রাণ সাধক ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় তাহার তুলনায় নারীর সংখ্যা অত্যন্ত কম।

একটি প্রধান বিষয় এই যে সমগ্র

ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে একজনও মহিলা প্রচারিকা নাই। যদিও কোন কোন পরিবারের কোন কোন মহিলা বিশেষ ধর্ম্মপরায়ণা, কিন্তু সেভাব এত অধিক হয় নাই যাহার অনুরোধে তিনি আর সকল বিষয়কে তুচ্ছ করিয়া কেবল ব্রহ্মসর্ব্বস্ব জীবন হইতে পারিয়াছেন। আমাদের মণ্ডলীর কোন শ্রেষ্ঠ এবং সাধক ব্যক্তি একদিন বলিতেছিলেন, "আমরা উপাসনার সময় আরাধনাযোগে যে প্রকার ব্রহ্মসম্ভোগ করি, আমাদের স্ত্রী সন্তানগণ সেরূপ পারেন না।" বস্তুতঃ দেখা যায়, স্বামী হয়ত নিষ্ঠাবান সাধক এবং ব্রহ্মপিপাসু, তিনি প্রতিদিন উপাসনার সময় নব নব ভাবে ব্রহ্মদর্শন এবং সম্ভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল, কিন্তু স্ত্রী সেরূপ নহেন। এপ্রকার ভাব নববিধানের ভাব নহে এবং আমাদের মহিলাদিগের এরূপ ভাব হওয়া কোন মতেই বাঞ্ছনীয় নহে। শাস্ত্রে আছে সস্ত্রীকো ধর্ম্মাচরেৎ অর্থাৎ সস্ত্রীক ধর্ম্মসাধন করিবে। স্ত্রীকে পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মসাধন করা নববিধানের ধর্ম্ম নহে। বিবাহকালে স্বামী স্ত্রী উভয়েই প্রতিজ্ঞা করেন, আমার হৃদয় তোমার হউক, তোমার হৃদয় আমার হউক, আমাদের উভয়ের হৃদয় ঈশ্বরের হউক। এই যে স্বামী ও স্ত্রী পরস্পরের হৃদয়ের ও আত্মার যোগ ইহা ধর্ম্মসাধন ব্যতীত আর অন্য কোন উপায়ে স্থাপিত হইতে পারে না। নববিধানবিশ্বাসীর দাম্পত্য সম্বন্ধ কেবল দৈহিক নহে, ইহা আত্মিক। প্রত্যেক নববিধান বিশ্বাসীরই স্বীয় স্ত্রীকে সহধর্ম্মিণী করিয়া লইতে যত্ন করা একান্ত কর্ত্তব্য এবং প্রত্যেক মহিলাও যাহাতে আপনার স্বামীর সহধর্ম্মিণী, সহকর্ম্মিণী এবং সহযোগিনী হইতে পারেন, তাহার জন্য বিশেষ যত্ন ও সাধন করা উচিত।

ব্রাহ্মসমাজে পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং ভাবের প্রাধান্যই এখন অধিক। ইহার জন্য নারীগণের মধ্যে বিলাসিতা সাংসারিকতা এবং ধর্ম্মবিহীনতারই আধিক্য দৃষ্ট হইতেছে। পক্ষান্তরে প্রাচ্যজাতির, বিশেষভাবে ভারতীয় মহিলাদিগের ধর্ম্মপরায়ণতা, সাধন ভজন প্রভৃতি চরিত্রের বিশেষত্ব অনেক পরিমাণে বিলুপ্ত হইয়া যাইতেছে। অনেক ব্রাহ্মপরিবারে পারিবারিক উপাসনা প্রতিদিন নিয়মিতরূপে হয় না। কোন কোন পরিবারে হয়ত গৃহস্বামী তাঁহার সময়ানুসারে উপাসনা করেন, গৃহিণী সুযোগ হইলে যোগদান করেন, কখনও করেন না। পুত্র কন্যাগণ অথবা পুত্রবধূগণের অবস্থাও সেইরূপ। ইহা কখনও নববিধানোচিত নহে। নববিধান পরিবার এবং দলের ধর্ম্ম। আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার কোন প্রার্থনার মধ্যে বলিয়াছেন, "পরিবার এবং দল এ দুই লইয়া ভগবানের কাছে না যাইলে তিনি সন্তুষ্ট হন না।" অতএব পরিবারের মধ্যে উপাসনা যাহাতে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কোন বিশেষ নির্দ্দিষ্ট সময়ে হয় এবং তাহাতে, যাহাতে পরিবারের সকলে সমানভাবে যোগ দিতে পারেন, তাহার জন্য সর্ব্বাগ্রে যত্ন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত যাহাতে পরিবারের

সকলেরই সাধন, ভজন করিবার জন্য প্রবৃত্তি ও আগ্রহ জন্মে এবং সকলেই স্বীয় শক্তি অনুসারে প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কিছু কিছু সাধন ভজন করেন, তদ্বিষয়ে গৃহস্বামীর বিশেষ দৃষ্টি রাখা এবং সহায়তা করা প্রয়োজন। বিবাহিত পুত্র এবং পুত্রবধূগণ যাহাতে প্রতিদিন একত্র মিলিত হইয়া নির্জ্জনে উপাসনা, ধ্যান, প্রার্থনা, সঙ্গীত ও প্রসঙ্গাদি করিতে পারেন তাহারও ব্যবস্থা প্রত্যেক পরিবারে হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন "স্বামী স্ত্রী যখন নির্জ্জনে একত্র মিলিত হইয়া ঈশ্বরের পূজা বন্দনা করেন, তখনকার দৃশ্য স্বর্গীয়।" আমাদিগকে সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে স্বর্গে ঈশ্বরের প্রেম পরিবারে আমরা যেভাবে তাঁহার প্রেমে মগ্ন ছিলাম, এখানেও সেই আদর্শ পরিবার গঠন করিতে হইবে. সেই পরিবারে বাস করিতে হইবে। যদি আমরা সংসার-সর্ব্বস্ব হইয়া কেবল তাহাতেই ডুবিয়া থাকি, তবে আমাদের মত কৃপাপাত্র আর কে? স্বর্গের বিধানলাভ করিয়া, ব্রহ্মের অবতরণ দর্শন ও সম্ভোগ করিয়া যদি আবার আমরা তাহার প্রতি বিমুখ হই, তবে আমরা ব্রহ্মকৃপার অপব্যবহারের জন্য নিতান্ত অপরাধী। আমাদিগকে ব্রহ্মকে লাভ করিয়া ব্রহ্মগত এবং ব্রহ্মসর্ব্বস্ব জীবন হইতে হইবে। যদি আমাদের জীবনের গতি সেদিকে না হয়, তবে আমাদের শিক্ষা, দীক্ষা, ধর্ম্মসাধন সকলই বিফল। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন, "কেবল চাহিলেই হইবে না, পাইতে হইবে। যদি তোমরা কেবল দিবসের পর দিবস প্রার্থনাই করিতে থাক কিন্তু প্রার্থিত বস্তু না পাও তবে তাহার দ্বারা তোমাদের কি লাভ হইবে।" প্রতিদিন পরিবারে উপাসনা হইতেছে, কিন্তু উপাসকগণের জীবন কিছুমাত্র সাধন পথে অগ্রসর হইতেছে না, ভক্তি, বিশ্বাস বিনয় ও ব্যাকুলতার মাত্রা বৃদ্ধি পাইতেছে না, প্রমত্ততা বাড়িতেছে না, এরূপ নির্জীব উপাসনায় কি ফল হইবে। ব্রহ্মই আমাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহারই গৌরবোদ্দেশ্যে আমরা জীবনধারণ করিব। ইহা যদি না হয়, তবে আমরা জীবন্মৃত। শাস্ত্র বলিতেছেন "বৃক্ষ-লতা সকল জীবনধারণ করে, মৃগপক্ষীরাও জীবনধারণ করে, কিন্তু যিনি ব্রহ্মমনন দ্বারা জীবিত তিনিই যথার্থ জীবিত। ব্রহ্মমনন দ্বারা ব্রহ্মবান ও ব্রহ্মবতী হইতে হইবে। ব্রহ্মবান ও ব্রহ্মবতী হইবার অর্থ ব্রহ্মকে লাভ করিবার উদ্দেশ্যে এবং তাঁহারই গৌরবার্থে জীবনযাপন করা। আমরা সাধ্যানুসারে আমাদিগের পুত্রকন্যাগণকে শিক্ষিত করিতেছি। কিন্তু আমরা তাঁহাদিগকে প্রকৃত ব্রহ্মবান ও ব্রহ্মবতী করিয়া তুলিতেছি না। আমরা তজ্জন্য অনেক সময়ে পুত্র কন্যাগণের প্রতিই দোষারোপ করি, কিন্তু বাস্তবিক কি তাহাদেরই সমস্ত দোষ? আমরা কি দোষী নহি? আমার মনে হয় আমরাই সম্পূর্ণ দোষী। আমরা সাধন ভজন করিব না, ব্রহ্মনিষ্ঠ হইব না, যোগ বৈরাগ্যাদি সাধন করিব না, আর আমাদিগের পুত্র কন্যাগণের নিকট হইতে

কিরূপে, যাহা আমরা নহি তাহা হইবার জন্য আশা করিতে পারি? আমাদের অনেক প্রাচীন প্রচারক বন্ধু প্রায়ই বলিয়া থাকেন যে আমাদিগকে এমন ভাল হইতে হইবে, যাহার দৃষ্টান্তে হাজার হাজার লোক ভাল হইয়া যাইবে। ইহা অতি সত্য কথা। আমাদিগকে দুই প্রকারই করিতে হইবে, আপনাদিগকেও ভাল হইতে হইবে এবং পুত্র কন্যাগণকে ভাল করিবার জন্য যত্ন করিতে হইবে।

বর্ত্তমান যুগে বিধাতার বিশেষ বিধান এই যে সংসারে থাকিয়া স্ত্রী পুত্র এবং পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ধর্ম্ম-সাধন করিতে হইবে। সংসারের যাহা বাহ্য প্রকাশ তাহা বজায় থাকিবে, কিন্তু উদ্দেশ্য হইবে শ্রীভগবানকে লাভ করা। আমরা প্রায়ই যে উদ্দেশ্যে ভগবান্ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া সংসারে স্ত্রী পুত্র এবং পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়াছি, তাহা ভুলিয়া গিয়া বাহ্য বিষয়েই আবদ্ধ হইয়া পড়ি। যদি বিচার করিয়া দেখি, তবে দেখিতে পাই, প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত যাহা কিছু করি তাহা প্রায় শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য করিয়া থাকি। ইহার ফলে আমরা ভগবানকে ভুলিয়া যাই এবং সংসারসর্ব্বস্ব হইয়া পড়ি। আমাদের সংসার একটি আশ্রমস্বরূপ হইবে। যোগীর যোগ সাধনের নিমিত্ত নির্ব্বাচিত পর্ব্বত-গুহা যেমন, ভক্তের ভক্তিসাধনের স্থান যেমন, আমাদের সংসার আশ্রমও ঠিক সেইরূপ হইবে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন "আমাদের বাড়ীই তীর্থ।" আমাদের পারিবারিক দেবালয় আমাদের চক্ষে, হিন্দুর চক্ষে কাশী, বৃন্দাবন যেরূপ পবিত্র, মুসলমানের চক্ষে মক্কা যেরূপ পবিত্র, খ্রীষ্টিয়ানের নিকট জেরুজালেম যেরূপ পবিত্র, ঠিক সেইরূপ পবিত্র বলিয়া প্রতীয়-মান হইবে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার দেবালয় উৎসর্গকালীন শেষ প্রার্থনার মধ্যে বলিয়াছেন, "ইহাই আমার কাশী, ইহাই আমার বৃন্দাবন, ইহাই আমার মক্কা, ইহাই আমার জেরুজালেম। এস্থান ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব।" একথা বলিবার অর্থ কি? নববিধান বিশ্বাসীর দেবালয় সামান্য স্থান নহে। ইহা তাঁহার সাধনের ক্ষেত্র, এই স্থানে বসিয়া তিনি স্বর্গ এবং পৃথিবীর অধিপতি পরমেশ্বরকে দর্শন ও সম্ভোগ করিবেন, তাঁহার সহিত আলাপ করিবেন। এই জন্যই আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন "পারিবারিক দেবা-লয়ের প্রতি সর্ব্বোচ্চ দৃষ্টি রাখিবে এবং সমধিক শ্রদ্ধা অর্পণ করিবে।" ইহা ব্রহ্ম-ধামে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় অনেক নববিধান বিশ্বা-সীর গৃহে পারিবারিক দেবালয় নাই। অনেকে ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন না। অনেকে আবার ঈশ্বর সকল স্থানেই আছেন, অতএব সকল স্থানেই তাঁহার পূজা হইতে পারে, ইত্যাদি বলিয়া নানা প্রকার তর্ক ও যুক্তি প্রয়োগ করিয়া থাকেন। মহিলার পাঠকপাঠিকাগণ, আপ-নারা এপ্রকার তর্কযুক্তির আশ্রয় লইয়া আত্ম-প্রবঞ্চিত হইবেন না। আমাদের ঈশ্বর নিত্য নবরূপধারী এবং ভিন্ন ভিন্ন

স্থানে তাঁহার বিভিন্ন প্রকাশ। রন্ধনশালায় তিনি অন্নদায়িনী, ভাণ্ডারে তিনি গৃহলক্ষ্মী, শয়নাগারে তিনি মাতৃরূপিনী এবং দেবালয়ে তিনি আমাদের ইষ্টদেবতা। অতএব যথেচ্ছাচার করিয়া ভাবের বিপর্য্যয় সাধন করিয়া ধর্ম্মভ্রষ্ট হইবেন না। যদি গৃহ নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হয়, যদি একখানি গৃহেই তোমাকে সমস্ত কার্য্য সঙ্কুলান করিতে হয়, তবে সেই গৃহেরই স্থানবিশেষ উপাসনার জন্য নির্দ্দিষ্ট রাখিও এবং অন্য কার্য্যের জন্য তাহা ব্যবহার করিও না। পল্লীগামে দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থের বাড়ীতেই দেবালয় আছে এবং তাহাতে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে। সেই দেবালয়ের প্রতি হিন্দুর কি প্রগাঢ় নিষ্ঠা। প্রতিদিন কত প্রকারে দেবালয়ের পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য তাঁহার প্রাণগত যত্ন। নববিধান বিশ্বাসী হইয়া আমরা কি এই প্রকার নিষ্ঠা সাধনে পশ্চাৎপদ হইব। ঈশ্বর করুন যেন এরূপ না হয়।

অনেকে বলিয়া থাকেন সংসারে ধর্ম্মসাধন অতি কঠিন ব্যাপার; কারণ সংসার অতি প্রলোভনপূর্ণ স্থান। দুর্ব্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে সংসারধর্ম্ম অক্ষুন্ন রাখা অসম্ভব। নববিধান ইহার বিপরীত কথা বলিতেছেন এবং সংসারেই ধর্ম্মসাধন প্রশস্ত জানিয়া তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। কিন্তু মৌখিক কথাতে ত হইবে না, কার্য্যগত জীবনে তাহা প্রমাণ করিয়া দিতে হইবে। এক্ষণে নববিধান কোন্ সাহসে এই গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ পন্থা অবলম্বন করিতে বলিতেছেন তাহাই দেখা যাউক। নববিধান বলিতেছেন "ওহে গৃহস্বামী, তুমি আপন বুদ্ধিতে স্বীয় সংসার চালাইতে যাইও না। কিন্তু সর্ব্বান্তকরণে প্রভু পরমেশ্বরের উপর নির্ভর কর। তাঁহার হাতে ভার দিলে বড় বড় রাজ্য সুশৃঙ্খলে চলিয়া যায়। তুমি অবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহাকে বুদ্ধিহীন মনে করিও না। তিনি বিশ্বসংসার চালাইতেছেন, তোমার সংসারও চালাইতেছেন; তুমি বিশ্বাসী হইয়া তাঁহাকে দেখ ও তাঁহার হস্তে আত্মসমর্পণ কর।"

"ব্রহ্মের আদেশ ও আশীর্ব্বাদ না লইয়া কোন গুরুতর কার্য্যসাধনে হস্তক্ষেপ করিও না। কোন কার্য্যের দায়িত্ব পূর্ণ মাত্রায় আপনার উপর লইও না; মনে রাখিও তুমি ঈশ্বরের দাস, অতএব তাঁহারই আজ্ঞাবাহী ভৃত্য হইয়া তাঁহারি আদিষ্ট কার্য্য সম্পাদন কর।" "যেখানেই থাক না কেন, যে কার্য্যই কর না কেন, স্মরণ রাখিও তুমি পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের সন্নিধানে থাকিয়া তাঁহারই সেবাব্রতসাধনে নিযুক্ত আছ। তোমার প্রত্যেক গৃহকার্য্যই ঈশ্বরের সেবা।" এই ভাব দ্বারা প্রণোদিত হইয়া এবং জ্ঞানময় গুরু ঈশ্বরের আদেশে প্রত্যাদিষ্ট হইয়া সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কর, স্ত্রী পুত্র পরিবার প্রতিপালন কর। সংসার তোমার অধীন হইবে, তুমি ব্রহ্মানন্দ লাভ করিবে।

প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় সংসারে নানাবিধ বিশৃঙ্খলা, অশান্তি, উত্তেজনা আসিয়া গৃহস্থকে বিব্রত করিতেছে; গৃহস্থ

চারিদিক অন্ধকার দেখিতেছেন। কন্যার বিবাহ দিতে হইবে পাত্র পাওয়া যাইতেছে না, পুত্রকে বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে, অর্থসংস্থান নাই, সাংসারিক নানাবিধ অভাব মোচন করিতে হইবে যথোপযুক্ত উপায় অবলম্বিত হইতেছে না; এসকল চিত্তের উদ্বেগজনক অবস্থার প্রতিরোধক উপায় কি? ইহার একমাত্র প্রতিকারের উপায় প্রার্থনা। আমরা যদি ঈশ্বরকে আমাদের দয়ালু পিতা ও মাতা জানিয়া তাঁহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করি, সকল প্রকার অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে তাঁহার ইঙ্গিতানুসারে সংসার পথে চলি, তবে আর আমাদের ভয় কি? আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন 'যে গৃহে প্রার্থনা আছে, সে গৃহে কিসের অভাব? ভাই বন্ধুগণকে বলি, প্রার্থনা কর, তাঁহারা করেন না, তাই দুঃখ পান।" প্রার্থনা এবং ব্রহ্মকৃপাই আমাদের একমাত্র সহায়। আমরা সংসারের সকল প্রকার বিপদ পরীক্ষার মধ্যে ব্রহ্মকৃপাবলে স্থির থাকিব এবং প্রার্থনাবলে উত্তীর্ণ হইব। প্রতিদিন প্রতি অবস্থায় ব্রহ্মের আদেশ শুনিয়া তাঁহার আদিষ্ট পথে চলিতে চেষ্টা করিব। তাঁহার আদেশ শুনাও কিছু অলৌকিক ব্যাপার নহে। তিনি অতি জঘন্য পাপীর সঙ্গেও কথা বলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র তাঁহার কোন প্রার্থনার মধ্যে বলিয়াছেন "মন তুই দুরাত্মা, সদাত্মা নোস্; তোর প্রত্যাদেশ হয় তুই বলিস্, হয় না। ব্রহ্ম তোর সঙ্গে কথা বলেন, তুই বলিস্, বলেন না।" আমাদের পরম সৌভাগ্য যে আমরা ব্রহ্মের আদেশ শুনিবার অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা যেন ইহার সদ্ব্যবহার করিতে পারি। ইহাই নববিধানের বিশেষ বিশেষত্ব। ইহারই জন্য ভক্ত ব্রহ্মানন্দ কতই না নির্য্যাতন সহ্য করিয়াছেন।

প্রত্যাদিষ্ট ব্যক্তির জীবন বিপদ পরীক্ষায় কিরূপে অচল অটল থাকে তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আমরা শ্রীঈশার জীবনে দেখিতে পাই। তিনি ক্রুশারোপিত হইবার পূর্ব্বে ভূমিতে অবলুণ্ঠিত হইয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন এবং যখন ঈশ্বরের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিলেন তখন তাঁহার শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "সময় আগত প্রায়, তোমরা নিদ্রা যাও" এবং স্বয়ং মরিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া রহিলেন। ইহাইত আমাদের আদর্শ। সংসার মারিবার জন্য উপক্রম করিতেছে, আর ঈশ্বরের সন্তান প্রার্থনাবলে ব্রহ্মকৃপাবলে বলীয়ান হইয়া নির্ভীক হৃদয়ে দণ্ডায়মান। প্রত্যেক নববিধান বিশ্বাসী বিশ্বাসিনী এরূপ বিশ্বাসের পরিচয় দিবার জন্য বিধাতা কর্ত্তৃক আদিষ্ট। আমরা আপনাদিগকে বিশ্বাসী-নামে অভিহিত করিতে চাই, কিন্তু আমাদের জীবন এখনও বিশ্বাসের রাজ্য হইতে অনেক দূরে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র বলিয়াছেন "বিশ্বাস পর্ব্বতকেও স্থানান্তরিত করিতে পারে।" মহর্ষি ঈশা বলিয়াছেন যদি তোমাদের সর্ষপ কণার ন্যায় বিশ্বাস থাকে, তোমরা পর্ব্বতকে বলিবে স্থানান্তর হও এবং তখনি তাহা স্থানান্তরিত হইবে, এবং তোমাদের পক্ষে কিছুই অসম্ভব

থাকিবে না। আমাদিগকে জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় বিশ্বাসের এই অলৌকিকতার পরিচয় দিতে হইবে। কেবল পরিবারের মধ্যে কোন এক বিশেষ ব্যক্তি বিশ্বাসী হইলে চলিবে না, সমগ্র পরিবারকে বিশ্বাসী পরিবার হইতে হইবে। যাহাতে আমাদের পরিবারে কেবল ঈশ্বরই মহিমান্বিত হন, আমরা যেন সর্ব্বদা তাহাই করিবার জন্য যত্নবান্ ও যত্নবতী হই। কারণ ইহাই আমাদের জীবনের লক্ষ্য, ইহাই আমাদের পরিবারের লক্ষ্য এবং ইহাই আমাদের সমাজের লক্ষ্য। *

শ্রীযঃ—

জীবন।

(বামাবোধিনী পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।)

জীবন কি? আমার যাহা কিছু আছে, তৎসমুদায়ের মধ্যে আমার সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ও মূল্যবান্ এবং আদরের সামগ্রীই আমার জীবন। কাল-সমুদ্রের একটী তরঙ্গই আমার জীবন, ইহাই শুনিতে পাই। গুরুজনেরা আশীর্ব্বাদ করিয়া বলেন—"শতং জীব।" কালের এক স্থান হইতে অন্য এক স্থান পর্য্যন্ত ব্যাপ্তি, ইহাই জীবন। জড়জীবন, পশুজীবন, মনুষ্যজীবন কালের ব্যাপ্তিমাত্র। ইহা বর্ষ, দিন, মাস, যুগ প্রভৃতি দ্বারা গণনা করা যায়। যদি জীবন কেবল তাহাই হয়, তবে এত রোদন, এত হা হন্ত, হা হতোস্মি, বৃথাই মনে হয়। কেবল কালের বক্ষে ক্ষুদ্র বা দীর্ঘ একটা রেখার জন্য এত ক্লেশ কেন? ইহা না থাকিলেই বা ক্ষতি কি? ইহা থাকিলেই বা লাভ কি? জলের রেখা, বালুকার রেখার মত, উহা উঠিয়া গেলেই বা এত রোদন কেন?

সূচাগ্রে যে শুক্র থাকে, তাহাতে কোটি কোটি জীবাণু রহিয়াছে। উহারই একটীমাত্র মাতৃজরায়ুর মধ্যে প্রবেশ করিয়া, ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইয়া লালা, পরে মাংসপিণ্ড, পরে নরনারী আকারে পরিণত হইয়া ও গতিশীল ইন্দ্রিয়শক্তিসম্পন্ন হয়। এই প্রকারেই মানবজীবনের আরম্ভ হয়, দেহবিজ্ঞান বলেন। এই তত্ত্ব বিস্ময়কর সন্দেহ নাই। মানবের এই প্রকার অণু হইতেও অণুর উৎপত্তি বলিয়াই মানবের বুঝি এত অহঙ্কার! এক সূচাগ্রে যে বীর্য্য থাকে, তাহাতে একটি দেশের সমুদায় লোকের উৎপত্তি হইতে পারে। এক বিন্দু শুক্রমধ্যে কোটি কোটি মানব, কোটি কোটি দিল্লীশ্বর, ঈশা, মুসা, কালিদাস, হোমর থাকিতে পারে। ইহাই মানবজীবনের দৈহিক ও পার্থিব উৎপত্তির ইতিহাস। ইহা স্মরণ থাকিলে প্রকৃত

---

* এই প্রবন্ধ লেখক বন্ধু অতি ভাল ভাবে গৃহস্থের গৃহে নবধর্ম্ম সাধনের বিষয় উপদেশ লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাবের প্রতি সম্মান করিয়া আমরা প্রবন্ধটি পত্রস্থ করিলাম। তাঁহার হয়ত জানা নাই যে 'মহিলা' সাক্ষাৎভাবে ধর্ম্ম প্রচার বা নববিধান প্রচারের পত্রিকা নহে, ইহাতে সাধারণ ভাবে নারীজাতির জ্ঞান ও ধর্ম্মোন্নতির বিষয় ও অন্যান্য হিতকর বিষয় লিখিত হইবে, ইহাই উদ্দেশ্য।

সম্পাদক।

বিনয় জন্মে। আমরা ছোট লোক বলিলে অহঙ্কারে, ক্রোধে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠি। কিন্তু শুক্র শোণিত হইতে ও কীটাণুকীট হইতে উদ্ভব যদি সত্য হয়, তবে আপনাকে বড়লোক, অভিজাত ভাবিয়া কে আত্ম-প্রতারিত হইতে চাহেন? এত দিনে দেখিতেছি,—হিন্দু সাধকেরা কেন দেহ-তত্ত্বের এতই গৌরব করেন। আরও দেখিতেছি যে, এই মানবজীবন কীটাণু-কীট হইতে জাত বলিয়া, অন্য আর একটী শক্রতাভাবাপন্ন কীটাণুকীট হইতে ইহার এত ভয়। একটী কীট আর একটী কীটকে পরাজিত করিবে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে 'চীত' করিবে, তার আর বিস্ময় কি? আমরা রক্ত, লালা, অস্থি, চর্ম্ম, মাংসপেশী দ্বারা জড়িত হইয়া স্থূলাকার দেখাইতেছি;—নিজের চক্ষে ভ্রান্ত ও মনে মনে বড় লোক হইয়াছি বলিয়া আমাদের জাতির ভ্রাতারা ভ্রান্ত ও ভীত হইবে কেন? তাই ম্যালে-রিয়া, বসন্ত, প্লেগ, প্রভৃতি রোগের "ভায়াদকীটেরা (Microbe) ভায়াদি করিয়া আমাদিগকে এত বিপন্ন করে। তাহারা এত ছোট যে বহুমূল্য সূক্ষ্ম যন্ত্রের সাহায্য ব্যতীত তাহাদিগকে দেখা যায় না। তুমি ও আমি এত ছোট, কিন্তু আমরা আমাদের চক্ষে কত বড়।

এই মানবের জীবন মনুষ্যদেহে অব-তীর্ণ হইবার পূর্ব্বেও বর্ত্তমান রহিয়াছে, অর্থাৎ অদৃশ্য জীবাণু বা কীটাণুরূপে মানব কাল-সমুদ্রে লীলা করিতেছে, জীবনতরী-খানি বাহিয়া চলিয়াছে। জড়-বিজ্ঞান-চক্ষু এই জীবাণু হইতে আরম্ভ করিয়া মানব-দেহের ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত দেখিতে পায়। এই দৈহিক ধ্বংসকে মানবজীবনের শেষ বলিয়া থাকে। এই ধ্বংসকে মানবজীবনের শেষ মনে করিতে মানব প্রস্তুত নহে। মানব মরণের উপকথা শুনিতে চাহে না। তাহার কারণও আছে। মানবদেহরূপে জন্ম হইবার পূর্ব্বে যদি অদৃশ্য আকারে আমি-রূপ জীবাণুর অস্তিত্ব সত্য হয়, তবে ঐ দেহের উপকরণসমূহের বিকৃতি, বিশ্লেষ প্রভৃতির পরেও, ঐ জীবাণুর পূর্ব্ববৎ অদৃশ্য সত্তার অস্তিত্ব না থাকিবে বা কেন? তাই, মানবহৃদয় তাহার অস্তিত্বে একবার দখলীকার হইয়া পুনঃ সত্বর বেদ-খল হইতে রাজি নহে। তাই সে কথা মানিতেও রাজি নহে, সে মত স্বীকার করিতেও ইচ্ছা করে না।

তাই মানব "মরণ" দেখিয়াও জানে, আমি অমর। মানবজীবনের অনন্তত্ব বিষয়ে দর্শনশাস্ত্র নানা প্রমাণ দ্বারা মানবের জীবনস্বত্ব স্থাপনা করে। ইহার প্রধান উকিল মহাত্মা সক্রেটীস। ইহা ইতিহাসের বিষয়। এই সমুদায় চিন্তা ও ঘটনা হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে, চট্ করিয়া কোন রোগের বা স্বাভাবিক দেহক্ষয়ের জীবাণু, আমাকে জীবন হইতে বেদখল করিতে পারিতেছেন না। মানব মরণের এ ছেলে ভুলানো ছড়া বা ভূতের ভয় করে না।

ব্যবহার-শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন যে, যে স্বত্ব একবার বর্ত্তে, তাহা আর নষ্ট হয় না। সংসারের ব্যবহারাজীবেরা যাহাই বলুন, অধ্যাত্মরাজ্যের প্রধানেরা এড্-ভোকেট্ জেনারেলগণ, ঋষি মহর্ষিগণ

বলিয়াছেন যে, মানব-আত্মা অবিনাশী। ইহা কতই বিজ্ঞানের, দর্শনের, আইনের, আশার ও জোরের কথা। আমাকে তোমরা কেহ এ জীবন হইতে বেদখল করিতে পার না, কখনও পারিবে না। আমি ছিলাম, আমি আছি, এবং আমি থাকিব। বিজ্ঞান বলেন, যন্ত্রে দেখ। সাধক বলেন, দেহতত্ত্বে দেখ, সক্রেটীস বলেন, আপনাকে জান। হিন্দু মহর্ষিগণ বলেন, আত্মবিৎ হও।

এই প্রকারে দেখিলাম যে, কাল-দেহের উপর মানবজীবনরূপ যে সরল রেখা রহিয়াছে, উহার অন্ত নাই। অন্ততঃ অন্ত আছে ভাবিবার কোন কারণও নাই; এবং বিপরীত সত্যটীই নিত্য বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু ইহা বুঝিয়াও, জীবন কি বুঝিলাম না। আত্মা তৃপ্ত হইল না। এমন থাকা, না থাকা প্রায়ই তুল্য; কেবল থাকিয়া কি হইবে? কিরূপে থাকা উচিত, ইহার মীমাংসার প্রয়োজন। এবং সেই মীমাংসানুযায়ী কালযাপন করা, আমার জীবনতরীটী তদনুরূপ চালিত করা প্রয়োজন।

শিশুকালে জানিতাম যে, জননীর স্নেহক্রোড়ে অশেষভাবে বসিয়া থাকাই জীবন। মাতৃস্তন্য ত্যাগ করাই মরণ। পরে ভাবিতাম, দিবানিশি ক্রীড়াসক্ত থাকাই জীবন। ক্রমশঃ দেখিলাম, দেহের বল উপার্জ্জন করাই জীবন। পরে জানিলাম, নানা বিদ্যায় পারদর্শী হওয়া জীবন। কেহ কেহ বলিলেন, জীবনের প্রধান লক্ষ্য বড় হওয়া। কেহ বলিলেন, গৌরব উপার্জ্জন করাই জীবন। শাস্ত্র বলিলেন, "কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।" আত্মীয়স্বজনেরা, বন্ধুবান্ধবেরা বলিলেন,—"উকিল হও, হাইকোর্টে যাও। ইহাই উত্তম জীবন।" কেহ বলিলেন, "বড় পদ লাভ কর। হাকিম হও। ইহাই জীবন।" এই সমুদয় পরামর্শে হৃদয় তৃপ্ত হইল না।

দেশহিতৈষী বলিলেন,—"স্বদেশ-প্রেমই জীবন।" পরোপকারী বলিলেন, "দয়াই জীবন।" সাধু বলিলেন, "ধর্ম্মই জীবন।" প্রেমিক বলিলেন, "প্রেমই জীবন।" কবি বলিলেন, "কবিত্বরসে সিক্ত থাকাই জীবন।" গায়ক বলিলেন, "শব্দমাধুর্য্যে মগ্ন থাকাই জীবন।" সংসারের বড় লোকেরা বলিলেন, "টাকাই জীবন। যার টাকা নাই, সে ছোট লোক। তার মরা উচিত।" কিন্তু মরা উচিত, মৃত্যু আছে, এ কথা মানবহৃদয় কখনও স্বীকার করে নাই, করিবে না। "জ্যোতির্ব্বিৎ ও বৈজ্ঞানিক বলেন, নব নব গ্রহ আবিষ্কার করা, নব নব সত্য দেখাই জীবন।"

ঐ গোলাপ বৃক্ষটীর জীবন এক প্রকার। ঐ সরোরুহের জীবন এক প্রকার। ঐ কুসুমকলিকার, ঐ জ্যোতিষ্কের, ঐ কীটের, এবং ঐ বিহঙ্গমের জীবন এক প্রকার। সাগরগর্ভমগ্ন প্রবালদ্বীপের, আগ্নেয়গিরিগর্ভস্থ শক্তিপুঞ্জের, শশাঙ্ককিরণের, সৌর জ্যোতির জীবন এক প্রকার। সেনাপতির জীবন যুদ্ধে জয়লাভ করা, সেনা চালন করা ব্যূহ রচনা করা—অগণ্য মানবজীবন

সহজে ও অনায়াসে নাশ করাই তাঁহার জীবন। মহাপ্রাণ ঈশার জীবন, মানব-পাপতাপে বিদীর্ণহৃদয় হওয়া। শাক্যসিংহের জীবন বাসনার নির্ব্বাণ করিয়া, ক্লান্ত ও পরিশ্রান্ত জীবকে শীতলহৃদয়ের ছায়াতলে আশ্রয় দেওয়া। জীবন নানা প্রকার। কিন্তু প্রকৃত জীবন কি? একটীও ইহার পূর্ণ উত্তর হইল না।

মহাসমুদ্রে বৃহদায়তন তিমি মুখ ব্যাদান পূর্ব্বক, চক্ষু প্রসারণ করিয়া বলিলেন, এই প্রকার জল-ক্রীড়াই প্রকৃত জীবন। বসন্ত সমীরণ, দোলিত বৃক্ষলতার নব কিশলয়ের মরমর ঝুরঝুর রাগিণীর মধ্যেই প্রকৃত জীবন বলিয়া প্রকাশ করিলেন। স্ফীততরঙ্গ অচলভেদী নদপ্রবাহ দম্ভের সহিত বলিলেন, "বহিয়া যাওয়াই জীবন।" কিন্তু মানব-আত্মা সে কথা মানিতে চাহে না। এ প্রকার কালসমাপন করা, "বহিয়া যাওয়া," "নরকে যাওয়া" প্রভৃতি প্রচলিত শব্দের ভাব প্রকাশ করে।

শাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, যে যাহা জানেন, বলিলেন, গণিতবেত্তা, জ্যোতির্ব্বিদ্, কবি, দার্শনিক, গায়ক, আত্মীয়, বন্ধু, ধনী নির্ধন, বিজ্ঞ ও মূর্খ আপন আপন জীবনের সংস্করণ দেখাইলেন, মানব-আত্মা বলিতেছেন, "উহা নহে।"

বিজ্ঞান (Biology) আরও বলিতেছেন যে, পার্শ্ববর্ত্তী সত্তার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করাই জীবন। অথবা, ঐ বন্ধুতা, বা সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারাই মরণ। যথা, যতক্ষণ মীন বারির ধর্ম্মে নিজধর্ম্ম মিলাইয়া কাল যাপন করে, ততক্ষণই তাহার জীবন। তাহাতে অপটু হইলেই তাহার মরণ। বারি হইতে উত্তোলন করিয়া ভূমির উপর উহাকে রাখিলে, নবসহচর স্থলের সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে অক্ষম হয় বলিয়াই মৎস্যের মৃত্যু হয়। মানব নানা অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আপনাকে পরিবর্ত্তিত অবস্থার উপযোগী করিয়া লইতে সক্ষম হয় বলিয়াই নিম্নশ্রেণীস্থ জীব হইতে অধিক ক্ষমতাপন্ন এবং উৎকৃষ্ট। যিনি যত অধিক পরিমাণে অবস্থার পরিবর্ত্তনের সহিত ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম, তিনি ততই উচ্চ শ্রেণীর; তাঁহার জীবন ততই অধিক মূল্যবান্ বা উচ্চতর। সংসারে যিনি পাঁচজন লোকের সহিত মিলিয়া মিশিয়া চলিতে সক্ষম, তিনি ততই অধিক সাংসারিক কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে সমর্থ। নচেৎ নানা সদ্গুণরাশি থাকিলেও, তিনি অকর্ম্মী লোক বলিয়া সাধারণের চক্ষে বিবেচিত হয়েন। (ক্রমশঃ)

(হে)

মহিলার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের রাজ্যে বাস করিয়া মানুষ স্বর্গের অধিকার লাভ করে। যখন মানুষ তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছার সহিত ইচ্ছা মিলাইয়া আপনার শক্তি, জ্ঞান, ধন ইত্যাদি ব্যয় করিতে থাকে, মানুষ ক্ষুদ্র জীব, জগতের জনসংখ্যা অত্যন্ত অধিক, ঈশ্বরের মঙ্গল স্বরূপ অনন্ত। যখন মানুষ আপনার ক্ষুদ্র প্রেমশক্তি দ্বারা মহা অভাব-

পূর্ণ-জগতের কোন এক অংশকে ধারণ করিতে প্রবৃত্ত হয় তখন সে অদৃশ্য অনন্ত মঙ্গল শক্তির স্পর্শ অনুভব করে ও অভয়-বাণী শ্রবণ করে। ইহাই তাহার পুরস্কার, ইহাই চিরদিনের সম্বল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় আপনার স্বাভাবিক নারীহিতৈষণা ও নারীশিক্ষা কার্য্যে দেব প্রেরণা দ্বারা চালিত হইয়া প্রথম জীবন হইতে বিবিধ উপায়ে এই কার্য্য করিয়াছেন। সাধারণত অন্য লোকে যে বয়সে পৃথিবীর পরিশ্রমসাধ্য ও দায়িত্বপূর্ণ কার্য্য হইতে অবসর লয় তাহা অপেক্ষাও অধিক বয়সে শ্রীদরবারের আশীর্ব্বাদ ও সম্মতি ল'য়া সেন মহাশয় এই মহিলা পত্রিকার সম্পাদন কার্য্য আরম্ভ করেন। ক্রমাগত চৌদ্দবৎসর সুস্থতায়, অসুস্থতায়, অর্থের অনাটন ও নানাবিধ বিঘ্ন বাধা অতিক্রম করিয়া তিনি মহিলাকে অতি আদরের সহিত পাঠিকাগণের নিকট উপস্থিত করিয়াছেন। তাঁহার এই কার্য্যে নিষ্ঠা," কষ্ট স্বীকার, উৎসাহ ও আনন্দ যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারা অবশ্য একবাক্যে বলিবেন যে ব্রহ্ম প্রেরণায় ব্রহ্ম কন্যাগণের মঙ্গল সাধনের জন্য আপনাকে ব্যয় করা কি, তাহা এই দীর্ঘকাল মহিলা সম্পাদন কার্য্যে প্রকাশিত হইয়াছে। নববিধানে সর্ব্ব শাস্ত্রের মহা সমন্বয় সাধন কার্য্যে যাঁহার উপর এক অতি গুরুভার ন্যস্ত আছে, অর্থাৎ যিনি একা আরব্য ও পারস্য ভাষা হইতে মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্রের অমূল্য ধন সকল বঙ্গভাষায় অনুবাদ ও সঙ্কলন করিবার ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি, তিনি যে নারী-জাতির শিক্ষা ও উন্নতি কল্পে এত দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সহিত কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন ইহা আমাদিগের দেশে একরূপ অলৌকিক ব্যাপার। এই মঙ্গল কার্য্যে মঙ্গলময়ের প্রসন্ন বদন দর্শন করাই তাঁহার তৃপ্তির বিষয় ও পুরস্কার লাভ নিঃস্বার্থ হইয়াছে। প্রেমের দ্বারা পরিচালিত হইয়া যিনি এত দীর্ঘকাল এই কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন এখন তাঁহার শরীর বার্দ্ধক্য ও রোগে অক্ষম হইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার পবিত্র অভিপ্রায়ের প্রিয় কার্য্য মহিলা প্রকাশিত হওয়া এজন্য বন্ধ হইতে পারে না। তিনি শ্রীদরবারকে আপনার বর্ত্তমান দৌর্ব্বল্যের জন্য অক্ষমতার বিষয় অবগত করাতে দরবার অন্য হস্তে সম্পাদকের কার্য্যভার দান করিয়াছেন কিন্তু যদি শ্রদ্ধাস্পদ সেন মহাশয় ভগবানের কৃপায় অপেক্ষাকৃত বল লাভ করেন হয়ত শ্রীদরবার পুনরায় তাঁহার হস্তেই মহিলার সম্পাদকতা অর্পণ করিবেন।

মহিলার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক স্বাধীন ভাবে আপনার মত প্রকাশ করিয়া আসিয়াছেন, এবং প্রকৃত বিশ্বাসীর ন্যায় আপনার অন্তরের আলোকে চিরদিনই এই কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। যাঁহারা মহিলার মতের প্রতি শ্রদ্ধা করিতে পারিতেন না, তাঁহারাও মহিলার সম্পাদকের মঙ্গলেচ্ছার প্রতি সন্দেহ বা অশ্রদ্ধা পোষণ করিতে পারিতেন না। বর্ত্তমানে যাঁহাদিগের প্রতি সাময়িক ভাবে মহিলা সম্পাদনের ভার পড়িল তাঁহাদিগেরও এই

একমাত্র উচ্চ আকাঙ্ক্ষা ও প্রার্থনা থাকিবে যে সহস্র মতভেদ ও তীব্র সমালোচনা হইলেও আপনাদিগের অন্তরে প্রকাশিত ও সমাজের ও জগতের সাধু সজ্জনগণের জীবনে প্রকাশিত নারীজাতির হিতকর সত্য যথাসাধ্য প্রচার করাই মহিলার চিরদিনের কার্য্য। মতের সহিত মতের অনৈক্য চিরদিন হইবে, দুই জনের এক রুচি এক ভাব হয় না, কিন্তু অন্তরের নিঃস্বার্থ মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা অচল থাকিলে শত দোষ ত্রুটি সত্ত্বেও মহিলা বঙ্গমহিলাগণের পরিচর্য্যা কার্য্য করিয়া মঙ্গলময়ী জগজ্জননীর ইচ্ছা পূর্ণ করিতে পারিবে, ইহাই বিশ্বাস।

নিবেদন।

সবিনয় নিবেদন,

বর্ত্তমান সময়ে নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সকলেই অনুভব করিতেছেন এবং বালিকাবিদ্যালয়, নারীশিক্ষার জন্য বিশেষ কলেজ ও শিল্পবিদ্যালয় স্থাপিত হইতেছে। এ সকল শিক্ষালয়ই ভবিষ্যৎ গৃহিণীগণের শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত ও পরিচালিত হইতেছে। ঠিক বর্ত্তমান সময়ে যে সকল মহিলা শিশু পালন করিতেছেন, রোগীর শুশ্রূষা করিতেছেন, গৃহের শত প্রকারের কার্য্য করিতেছেন তাঁহাদিগের দৈনিক জীবনের কার্য্যসম্পাদন বিষয়ে সাহায্য দান করিবার ও তাহাদিগের জ্ঞানোন্নতি সাধন করিবার একমাত্র বিদ্যালয় ভিক্টোরিয়া মহিলা বিদ্যালয়। ইংরাজ সমাজে গৃহিণীদিগের স্থান ও কার্য্যকৌশল ইত্যাদি শিক্ষা দানের জন্য কি কি ব্যবস্থা আছে আমরা জানি না, কিন্তু দেশীয় অন্য কোন বিদ্যালয়ে সেরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা নাই। এই বিদ্যালয়ে মহিলাগণ বিনাব্যয়েও অবসর সময়ে কৃতবিদ্য সুযোগ্য বক্তাগণের মুখে অতি প্রয়োজনীয় বিষয় সকল শিক্ষা করিতে পারেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র এইরূপ প্রয়োজনীয় নারীশিক্ষা প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। গত ৮।৯ বৎসর এই শিক্ষাকার্য্য সদাশয় বন্ধুগণের সাহায্যে চলিয়া আসিয়াছে। এক্ষণেও অনেক গুলি কৃতবিদ্য অধ্যাপক ও শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে বিশেষ পরিশ্রমসহকারে উপদেশ প্রদান করিতেছেন। নূতন নূতন মহিলাগণ সুবিধা পাইলে এই বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতে আসিতে অভিলাষী আছেন। এই মহৎ কার্য্যের জন্য গবর্ণমেণ্ট মাসিক ৭৫৲ টাকা করিয়া সাহায্য করিতেছেন, কয়েকটী দাতা বন্ধুও ইহার সাহায্যের জন্য কিছু কিছু দান করিয়া থাকেন। সম্প্রতি শেষোক্ত দান সংখ্যা নানা কারণে কমিয়া গিয়াছে। এ জন্য সকল দেশহিতৈষী, নারীজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ভদ্রমহোদয় ও মহিলাগণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে এই মহৎ কার্য্যের সাহায্যের জন্য তাঁহারা মুক্তহস্তে দান করিতে অগ্রসর হউন। যে সকল দাতাবন্ধু এই কার্য্যের সাহায্যের জন্য এখন মাসিক দান করিতেছেন তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া যদি দানের মাত্রা যথাসম্ভব

বৃদ্ধি করিয়া দেন এবং যে সকল বন্ধুগণ এ পর্য্যন্ত এ কার্য্যে মাসিক দান করেন নাই, তাঁহারা যদি মাসিক সাহায্য দান করিতে আরম্ভ করেন তাহা হইলে স্কুলের বর্ত্তমান অভাব ১২৫৲ টাকা মাসিক সংগ্রহ হওয়ার কিছুই কঠিন হয় না। ১২৫৲ টাকা মাসিক চাঁদা পাইলেই কার্য্য চলিবার পক্ষে সুবিধা হয়। কোন কোন বন্ধুর মনের সংস্কার যে বালিকাগণকে অন্যান্য পাঠশালার ন্যায় শিক্ষা দেওয়াই এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য। ফলে তাহা নয়। মাতৃগণকে, ভগ্নীগণকে, গৃহিণীগণকে প্রয়োজনীয় ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ে উপদেশ দেওয়া এবং যে সকল বালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন না তাঁহাদিগের উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করাই এই বিদ্যালয়ের মুখ্য উদ্দেশ্য। এই সঙ্গে যে বালিকাবিদ্যালয় আছে, তাহার জন্য সাধারণের সাহায্যের অধিক প্রয়োজন নাই। বালিকাগণের বেতন ও সরকারী সাহায্য দ্বারাই তাহা প্রায় চলিয়া যায়। পরিশেষে সাধারণ সকল দাতাগণের নিকটে নিবেদন করিতেছি যে এই অতি প্রয়োজনীয় নারীশিক্ষার সাহায্যার্থ উপযুক্তরূপ দান করিয়া কার্য্যনির্ব্বাহক সভাকে সাহায্য করুন।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়,
৬৪।২ মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

নিবেদক
শ্রীপ্রমথলাল সেন,
শ্রীব্রজগোপাল নিয়োগী
সম্পাদক।

মহিলার রচনা।

ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

(১)

আজি কি সুখের দিন প্রতি ঘরে ঘরে।
আজি কি মঙ্গল বাদ্য বাজিছে সমীরে॥
আজি কি হাঁসির ছটা ফুল্ল শতদলে।
সমীর আসিয়া কাণে কত কথা বলে॥

(২)

বসেছ দ্বিতীয়া তুমি স্বর্ণ সিংহাসনে।
আশীর্ব্বাদ লয়ে করে এমধুর দিনে॥
ভাই ফোঁটা দিবে বোন ভায়ের কপালে।
ভ্রাতারে করিবে স্নেহ ভগ্নীদল মিলে॥

(৩)

ধন্য গো কৌশল তব ধন্য তব মায়া।
এস ভাই এস বোন মিলিয়া মিশিয়া॥
গাও গো মঙ্গল গান দাও হুলুধ্বনি।
তোষিছে আদরে আজি ভ্রাতায় ভগিনী॥

(৪)

এস গো ভগ্নীর ভাই এস ত্বরা করি।
দুর্ব্বল ভগিনীর কর দুটী ধরি॥
বড় শুভদিন—এযে ভ্রাতৃ সম্মিলন।
দুঃখ তাপ দূরে গেছে শান্তি-পূর্ণ মন॥

(৫)

স্বরগে উল্লাস ধ্বনি করে দেবগণ।
মরতে দ্বিতীয়া আজি স্নেহ সম্মিলন॥
পারিজাত তুলি আনি দেবতা যোগায়।
করিছে সকলে পূজা দেবী দ্বিতীয়ায়॥

(৬)

এসেছে ভগিনী ওই হাতে লয়ে ডালা।
নির্জ্জনে বসিয়া গাঁথি এই চারুমালা।
গ্রহণ করিবে তাই হৃদয়ে উল্লাস।
মনের আনন্দ মুখে হতেছে প্রকাশ॥

(৭)

এই শুভদিনে বিভু প্রণমি তোমায়।
হেন ভালবাসা স্থায়ী হউক ধরায়॥

শ্রীমতী প্রিয়বালা সেন।

সংবাদ।

ইংলণ্ডে লিবারপুল নগরে পাঁচ সপ্তাহ বয়সের একটি শিশুর মুখের উপরে একটা বিড়াল শুইয়া ছিল। শিশুটির শ্বাসরোধ হইয়া মারা গিয়াছে।

যে সকল ইংরাজ মহিলা পার্লিয়ামেণ্ট সভায় মেম্বর হইয়া রাজ্য শাসন বিষয়ে অধিকার লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছেন, তাঁহাদিগের বাড়াবাড়ির বিষয় অবশ্য অনেক মহিলাই সংবাদ পত্রে পড়িতেছেন। তাঁহারা অধিকার লাভ বিষয়ে বাড়াবাড়ি করিতেছেন বলিয়া বঙ্গমহিলাগণ কোন বিষয়েই যে অধিকার প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করিবেন না একথা সঙ্গত নয়।

শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার হালদার মহোদয় শান্তিপুর শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ৫৲ পাঁচ টাকা সাহায্য প্রদান করিয়া বিদ্যালয়টির রক্ষা বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করিতেছেন। এ জন্য এই বিদ্যালয়ের পরিচালকগণ ইঁহার নিকট আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

দক্ষিণ আফ্রিকায় শ্বেতাঙ্গদিগের উপনিবাসে ভারতবাসীদিগের প্রতি যে অত্যাচার ও কঠোর শাসন হইতেছে তাহা লইয়া সর্ব্বত্র আন্দোলন হইতেছে। বোম্বাই মান্দ্রাজে এ বিষয়ে অনেক সভা হইতেছে। সে দিন কলিকাতাতেও এই বিষয়ে এক বিরাট সভা হইয়া গিয়াছে। গরিব ভারতবাসী দক্ষিণ আফ্রিকাতেও ইংরাজ সাম্রাজ্যের সাধারণ প্রজার অধিকার পাইতে মাত্র অভিলাষী, কিন্তু শ্বেতাঙ্গগণ তাহাও দিতে প্রস্তুত নহেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতবাসীকে কত কষ্ট ও লজ্জাস্পদ অবস্থায় থাকিতে হয় তাহা ভারতবর্ষের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিয়া জানাইতে পোলক সাহেব এ দেশে আসিয়াছিলেন। অনেকগুলি বঙ্গমহিলা সিটিকলেজ গৃহে সভা করিয়া পোলক সাহেবের মুখে সে দেশের অবস্থা শুনিয়াছেন এবং দক্ষিণআফ্রিকা প্রবাসী ভারতবাসীদিগের সাহায্যের জন্য একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন, ইহা অতি আহ্লাদের বিষয়। (মহিলাগণ রাজনৈতিক বিষয়ে আন্দোলন করিবেন, তাহার আমরা পক্ষপাতী নহি, কিন্তু মনুষ্যের দুঃখের অবস্থা উপযুক্তরূপে জ্ঞাত হইয়া দুঃখের সহিত সহানুভূতি করা ও তাহা দূর করিতে চেষ্টা করা ইহা সকল মানুষের পক্ষে কর্ত্তব্য। বিশেষ আমাদিগের দেশের মহিলাগণ যদি অন্যের নানারূপ মহা দুঃখের সহিত সহানুভূতি করিয়া তাহার নিবৃত্তির চেষ্টা করেন আপনারা দেবকন্যার অধিকার পাইবেন এবং পৃথিবীকে স্বর্গের দিকে লইয়া যাইবেন।)

ইউরোপে মধ্যে মধ্যে এক একটি

নূতন ফ্যাশন আসিয়া যেন এক একটা খণ্ড প্রলয় উপস্থিত করে। কিছুদিন হইল নাকি এক ফ্যাশন উঠিয়াছে যে নারীগণের বর্ণের সৌন্দর্য্য রক্ষার ও উন্নতির জন্য তাঁহাদিগের বসিবার ঘরের দেয়াল ঘন কৃষ্ণবর্ণ কাগজে মুড়িয়া রাখিতে হইবে। গৃহসামগ্রী লোহিতাভবর্ণের হইবে। অতএব সুন্দরী হইতে হইলে এই সকল কর। এ জন্য অনেক সৌখিন গৃহে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গিয়াছে। এই সকল সৌখিন মেয়েদের কাল্পনিক সুখ ও দুঃখ সকল বুদ্ধিমতি মহিলাকে শিক্ষা দেয় যে বিলাস স্পৃহার হাতে আপনাকে যাহারা ছাড়িয়া দেয় তাহারা অতি কৃপাপাত্রী।

বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা আপনাদিগের উচ্চ জ্ঞানে সাধারণ লোকদিগকে মধ্যে মধ্যে নূতন কথা বলিয়া সুখী করেন এবং নূতন ভয় দেখাইয়াও উদ্বিগ্ন করেন। মহিলার পাঠিকাগণ শুনিয়া হয়ত ভয় পাইবেন যে কেমিলী ফ্লেমোরিয়ান নামক একটি বড় জ্যোতির্বিদ গণনা করিয়া দেখিয়াছেন যে কোনও ধূমকেতু আগামী মে মাসে আমাদিগের পৃথিবীর নিকটে আসিবে এবং সম্ভবতঃ উহা যে আমাদিগকে আপনার বিশাল লেজ দ্বারা আচ্ছন্ন করিবে। এই পুচ্ছ স্পর্শ পৃথিবীর পক্ষে কি কল্যাণকর হইবে তাহা বলা যায় না। তবে পণ্ডিতেরা আশঙ্কা করিতে-ছেন যে পৃথিবীর প্রাণীপুঞ্জ বিশেষ মানুষগুলি অল্পক্ষণ মধ্যেই সকলে একে মৃত্যুমুখে পড়িতে পারে। পণ্ডিতগণ এ বিষয়েও একটুকু অনিশ্চিত জ্ঞানলাভ করিয়াছেন। কেহ কেহ বলেন যে ঐ দিন আমরা নিশ্বাস বন্ধ হইয়া কষ্টে মরিব, কাহারও মতে ঐ ধূমকেতুর কেতুতে অনেক অক্সিজেন আছে তাহা দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া আমরা সুখে নৃত্য করিতে করিতে মরিব। কিন্তু অনেকে বলেন যে আমরা সেই কেতুর স্পর্শ জানিতেও পারিব না। পাঠিকাগণকে ভয় পাইতে হবে না কারণ যদি সকল মানুষ এক সঙ্গে মরিয়া যায় তাহা হইলে কাহারও শোক পাইতে হইবে না, আর মঙ্গলময় ঈশ্বরের রাজ্যে যাঁহারা বাস করেন তাঁহা-দের পক্ষে পৃথিবী ত্যাগ করিতে হইলেও মঙ্গলরাজ্য হইতে বহিষ্কৃত হইতে হইবে না ইহাই সান্ত্বনা ও আশার কথা। পণ্ডিতগণ সময় সময় এরূপ ভয় দেখাইয়া ভালই করেন, পৃথিবীর ও জীবনের অনিত্যতা দেখান ভাল, কিন্তু নিত্যের সঙ্গে নিত্য সম্পর্কের কথাও বলা প্রয়োজন।

মহিলা লেখক ও লেখিকার প্রতি বিশেষ নিবেদন। মহিলা পত্রিকা সময়ে বাহির না হওয়ায় আমরা নিতান্তই দুঃখিত আছি, যে সকল মহোদয় ও মহোদয়া মহিলাতে পূর্ব্বে প্রবন্ধ সকল প্রদান করিয়া সম্পাদককে বিশেষ সাহায্য করিতেন, তাঁহারা সকলে কৃপা করিয়া প্রবন্ধ সকল পুনরায় লেখেন এইটী বিশেষ অনুরোধ। আমরা অগ্রহায়ণ ও পৌষ মাসের পত্রিকা এক সঙ্গে বাহির করিতে ইচ্ছা করিয়াছি, আশা করি মহিলা-হিতৈষী লেখক ও লেখিকাগণ আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিতে বিশেষ মনযোগী হইবেন।

সূচী।

ডাকমাশুল সহ অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৫শ ভাগ] অগ্রহায়ণ ও পৌষ ১৩১৬, ১৯১০। [৫।৬ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে পরম মঙ্গলময়ী জননী, তোমার ধরাতলে তোমার রাজ্য স্থাপিত হইবে, সকল সংসার তোমার সংসার হইবে, ইহাই তোমার অভিপ্রায়। তুমি তোমার মঙ্গলবিধানে নানা দেশে নানা অবস্থার ভিতরে তোমার প্রেম প্রকাশ করিয়া পরিবার সকলকে অল্পে অল্পে তোমার পরিবার করিয়া লইতেছ। পৃথিবীতে তোমার কন্যাগণ তোমার শিক্ষা, শাসন ও আশীর্ব্বাদ সর্ব্বক্ষণ লাভ করিতেছেন সত্য, কিন্তু তোমার অতি অল্প সংখ্যক কন্যাই বিশ্বাস করেন ও অনুভব করেন যে তুমি তাঁহাদিগের সঙ্গে বর্ত্তমান থাকিয়া তাঁহাদিগকে সকল বিষয়ে পরিচালিত ও নিয়মিত করিতে চাহিতেছ। হে মঙ্গলময়, তোমারই মঙ্গল ইচ্ছাতে আজ কাল, তোমার কন্যাগণের কতরূপে উন্নতি হইতেছে এবং তাঁহারা তোমার রাজ্যে আপনাদিগের উচ্চ স্থান ও মহান দায়িত্ব অনুভব করিয়া কৃতজ্ঞ ও বিনীত হইতেছেন। আমাদিগের দুর্ব্বল পতিত জাতিতেও তোমার কন্যাগণের উচ্চ জীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা দিন দিন প্রবল হইতেছে। এই সকল শুভ লক্ষণ দেখিয়া প্রাণে অত্যন্ত আনন্দ হয়, এবং চারিদিকে কেমন তোমার মঙ্গলরাজ্য আসিবার পূর্ব্বপ্রকাশ দেখা যাইতেছে তাহাই বিশ্বাস-চক্ষে নীরবে দেখিতে ইচ্ছা হয়। নারী জীবনের কত মহৎ আদর্শ ও দৃষ্টান্তের কথা পুস্তক ও পত্রিকাদিতে পাঠ করিয়া এবং আমাদিগের পরিচিত মহিলাগণের মধ্যে উচ্চ ও শুদ্ধ জীবনের আকাঙ্ক্ষা দেখিয়া মনে হয় এ সকল বিষয়ে আমরা আর মহিলাগণের শিক্ষা ও উন্নতি কল্পে কি করিতে পারিব? কিন্তু তুমি আমাদিগকে নীরব থাকিতে দিতেছ না। তুমি অন্য সকল দেশে মণ্ডলীতে ও পরিবারে যেমন নূতন নূতন মঙ্গল নিয়ম প্রকাশ

করিতেছ এবং মঙ্গলালোক দান করিতেছ তেমনই আমাদিগের গৃহে পরিবারে ও মণ্ডলীতেও করিতেছ, তোমার সেই সকল দান গোপন করিয়া রাখিবার অধিকার তুমি দেও নাই। তুমি কৃপা করিয়া তোমার একটি পুরাতন দাসের দ্বারা যে মহিলা পত্রিকা স্থাপন করিয়াছ তাহাকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতে তুমি আপনি ব্যবস্থা করিবে। তোমার যে সকল কন্যাগণ ইহা হইতে উপদেশ, দৃষ্টান্ত, সুশিক্ষা, পবিত্র আমোদ, প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রভৃতি পাইতে আশা করেন, তাঁহাদিগের আশা অবশ্যই তুমি পূর্ণ করিবে, তুমি তোমার উপযুক্ত পুত্রকন্যাগণ দ্বারা যে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু যোগাইবে। তাই তব পাদপদ্মে বিনীত প্রার্থনা করি যে মহিলার পাঠিকাগণের সংসারকে তোমার সংসার করিয়া লও। এ দেশের মহিলাগণের প্রতি যে তোমার বিশেষ আশীর্বাদ রহিয়াছে, তাঁহাদিগের মঙ্গল সাধনের বিশেষ ব্যবস্থা যে তুমি করিতেছ, তাহা সকলকে বুঝাইয়া দেও যে, সকলে তোমাকে গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা জানিয়া তোমার পূজা বন্দনা করিয়া ও তোমার ইচ্ছা অনুসারে জীবনের ও সংসারের সকল কার্য্য করিয়া পাপ, দুঃখ ও মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারেন। তোমার সংসার সর্ব্বত্র প্রতিষ্ঠিত হউক। তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

কুসংস্কার।

বিংশশতাব্দীর সভ্যতার আলোকের মধ্যেও অনেক দেশে বহু নরনারী কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। বিশেষতঃ নারীগণ এখনও কুসংস্কারের হাত হইতে মুক্ত হন নাই। কেবল যে বঙ্গদেশের নারীগণ কুসংস্কারগ্রস্ত তাহা নহে, ইংলণ্ড প্রভৃতি সুসভ্য দেশের নারীগণও ইহার হাত হইতে রক্ষা পান নাই। কুসংস্কার যে কত দুঃখ ভয় ভাবনা, অসুবিধা বৃদ্ধি করে তাহা বলা যায় না।

প্রথমতঃ আমরা আলোচনা করিয়া দেখি সংস্কার কাহাকে বলে? পাঠিকাগণ আপনারা একবার ভাবিয়া লউন। আমরা বিশ্বাস ও সংস্কার দুটী কথা ব্যবহার করি। দুইটী শব্দকে যদিও আমরা একই অর্থে ব্যবহার করি, কিন্তু একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিব, দুটীর অর্থের একটু ভিন্নতা আছে। আমরা অনেক বিষয় বিশ্বাস করি,—যেমন আমরা বলি, আমরা ভগবানে বিশ্বাস করি, কিন্তু সে বিশ্বাস কিরূপ, তাঁর উপরে কি কোন বিষয় ছেড়ে দি, বা তিনি আমাদের নিকটে সাক্ষাৎ বর্ত্তমান, তাহা কি সর্ব্বক্ষণ উপলব্ধি করি, কিন্তু বলি ভগবানে বিশ্বাস করি অর্থাৎ তাহা আমাদের হৃদয় গ্রহণ করে নাই, তাহা আমাদের সংস্কার হয় নাই। সকলে ভাবিয়া দেখুন বুঝিতে পারিবেন, এই রকম আরও অনেক বিষয় আছে, যে বিষয়ে আমরা বলি, আমরা বিশ্বাস করি, কিন্তু সে বিশ্বাসের কোন গভীরতা নাই, তাহা আমাদের অন্তরের অন্তরে প্রবেশ করে নাই। সে বিশ্বাস গুলি ভাসাভাসা, অল্পেতেই তাহা নষ্ট

হইবার সম্ভাবনা। যে বিশ্বাস আমাদের অন্তরে প্রবেশ করে না, তাহা আমাদের কোন কাজে আসে না, তাহা আমরা ব্যবহার করি না, বিপদে পরীক্ষায় স্বভাবতঃ সে দিকে দৃষ্টিপাত করি না, সে বিশ্বাসগুলি অচল, জড়পিণ্ডাকারে আমাদের মধ্যে থাকে। আমরা কাহারও সহিত আলোচনা করিতে বা তর্ক করিতে বলি আমি ইহা বিশ্বাস করি বা আমি ইহা উচিত মনে করি, পরে একাকী স্থির হয়ে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারি, আমার সে সকল বিশ্বাস বা মতের কোন গভীরতা দৃঢ়তা, সুস্পষ্ট ভাব নাই। কার্য্যকালে লোকের সহিত ব্যবহারে বা বিপদে পরীক্ষাতেও প্রকাশ পায় যে যাহা আমরা বিশ্বাস করি, সেরূপ কাজ করি না, অর্থাৎ সে বিশ্বাস সংস্কারে পরিণত হয় নাই। সংস্কারে পরিণত না হইলে আমরা তাহাকে ব্যবহার করি না। বিশ্বাস যতক্ষণ না সংস্কারে পরিণত হয় ততক্ষণ তাহা থাকা না থাকা প্রায় সমান। বিশ্বাস যখন এরূপ হয় যে তাহার অনুযায়ী কাজ করি, তখন তাহা সংস্কারে পরিণত হয়। একবার কোন বিষয়ে সংস্কার হইলে, তাহা কিছুতেই মন থেকে যায় না। কুসংস্কার তাহাকেই বলা হয়, যখন একটা ভুল বিশ্বাসের অনুযায়ী কর্ম্ম করি। যখন কোন বিষয়ে সংস্কার হয়, তখন তাহা হইতে সহজে কেহ টলাতে পারে না। সেখানে কোন যুক্তি তর্ক, এমন কি, জ্ঞান বুদ্ধির আলোকও প্রবেশ করিতে দিই না। যাহা একবার ভাল বলিয়া মনে স্থান দিয়াছি, তাহাকে সহজে ছাড়ি না। এই জন্য কোনও কুসংস্কার জন্মিলে, তাহা উৎপাটিত করা অত্যন্ত কঠিন, তাহার ফলও ভয়ানক। সেই প্রকার কোন সুসংস্কার জন্মিলে তাহা অতিশয় হিতকর। যখন কোন বিষয় সংস্কার জন্মে, তখন আমরা সেই সংস্কারকে সুবলেই জানি, তা না হলেত সংস্কার হতেই পারে না, কিন্তু যে সংস্কারই থাক না কেন, তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত, তাহার বিশুদ্ধতা, দৃঢ়তা, জ্ঞান ও বিবেচনার আলোকে পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে, যদি সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারে, তবেই আমাদের গ্রহণীয়। কিন্তু আমরা আমাদের সংস্কারগুলিকে পরীক্ষার আগুন হইতে দূরে রাখিতে চাই, লোকে যতই ভুল দেখাক আমরা তাহা ছাড়তে চাই না। সংস্কারের বিষয়ে এরূপ দৃঢ়তা থাকা নিতান্ত প্রয়োজন, তা নাহলে মানুষের মনুষ্যত্ব থাকে না। সকল জাতির সকল নরনারীর কতকগুলি সংস্কার আছে, তাহা ভালও হইতে পারে, মন্দও হইতে পারে। সংস্কার ছাড়া মানুষ হইতে পারে না। যাহাদের বাল্যকাল হইতে কতকগুলি সুসংস্কার জন্মে, তাহাদেরই ভবিষ্যতের জীবন মহৎ হয়।

মিথ্যা সংস্কার আমাদের কিরূপ কষ্ট দেয় তাহা নিম্নলিখিত বৃত্তান্তটী পাঠ করিলে অনুভব করিতে পারিবেন। ইংলণ্ডের কোন ভদ্রলোক লিখিয়াছেন,—একবার তিনি একজন বন্ধুর গৃহে নিমন্ত্রিত হন। তিনি বন্ধুর গৃহে উপস্থিত হইলে

সেখানে সকলকে অত্যন্ত বিষণ্ণ দেখিতে পান। এই বিষাদের কারণ কি জিজ্ঞাসা করাতে জানিতে পান যে, বন্ধুর পত্নী গত রাত্রিতে একটী আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিয়াছেন. সেই স্বপ্নের অর্থ সকলে এইরূপ বুঝিয়াছেন যে, শীঘ্রই তাঁহাদের দুজনের মধ্যে কাহারও বা সন্তানগণের মধ্যে কাহারও কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে। গৃহিণী ভোজনাগারে প্রবেশ করিলে তাঁহার মুখে গভীর বিষাদের ছায়া দেখিলাম। আহার করিতে বসিয়া পারিবারিক নানা বিষয়ে আলাপ হইতেছিল, এমন সময়ে তাঁহাদের একটী শিশুপুত্র বলিয়া উঠিল, আমি বৃহস্পতিবার দিন যুক্তবর্ণ লিখিতে শিখিব। মাতা বলিয়া উঠিলেন, বৃহস্পতিবার! না বৎস, সে দিন আরম্ভ করা হইবে না, তোমার শিক্ষককে বলিও, শুক্রবারে আরম্ভ করিলেই হইবে। আমি সেই মহিলার এই কথাগুলি ভাবিতেছিলাম, এমন সময় তিনি আমাকে একটু লবণ দিতে বলিলেন, অতিশয় ব্যস্ততাবশতঃ লবণের পাত্রটী পড়িয়া গেল, ইহাতে তিনি চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন, ইহা, আমার দিকে পড়েছে। এই ব্যাপারে আমি অত্যন্ত অপ্রতিভ হইলাম, (লবণ পড়িয়া যাওয়া অশুভ লক্ষণ)। মহিলাটী একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন, বিপদ কখনও একাকী আসে না। আমি শীঘ্র শীঘ্র আহার সম্পন্ন করিয়া বসিয়া আছি, গৃহস্বামিনী আমাকে বলিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক কাঁটা চামচা পাশাপাশি রাখুন, একটার উপরে আর একটা রাখিবেন না। ওরূপ ভাবে কাঁটা রাখিলে কি অর্থ হয়, আমি জানিতাম না, কিন্তু তাঁহার সন্তুষ্টির জন্য পাশাপাশি রাখিলাম। বুঝিতে পারিলাম আমি মহিলার বড় কুদৃষ্টিতে পড়িয়াছি।

জ্ঞানীদের চেষ্টা দর্শন যুক্তিদ্বারা জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশা দূর করা, কিন্তু নির্ব্বোধের কুসংস্কার দ্বারা জীবনের দুঃখ আরও অনেকগুণ বাড়াইতে চেষ্টা করিতেছেন। আমার মনে হয় যদি আমি সত্য সত্যই ভবিষ্যতে যাহা ঘটিবে তাহা বলিয়া দিতে পারিতাম, তবুও আমি সে শক্তি চাই না, তাহাতে আমাকে ভয়ানক উদ্বিগ্ন হইয়া থাকিতে হইত। কোনও সুখ ও দুঃখ ঘটিবার পূর্ব্বে সেই দুঃখের পূর্ব্বাভাস পাইতে বা দুঃখের জন্য উদ্বিগ্ন হইতে চাই না। এই সমস্ত অজানিত দুঃখ ভাবনা হইতে আমার আত্মাকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় এই জানি যে যিনি ভবিষ্যতকে নিয়মিত করেন সকল ঘটনা ঘটান, নিজেকে সেই পরমাত্মার আশ্রয়ে রাখা। তিনি এক দৃষ্টিতে আমার সমস্ত জীবনসূত্রকে দেখিতেছেন, কেবল যে অংশ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি তাহা নহে, কিন্তু অনন্তের গর্ভে যাহা সম্মুখে রহিয়াছে, তাহাও দেখছেন। যখন আমি রাত্রিতে শয়ন করি, তখন আপনাকে তাঁর হাতে ছেড়ে দি, যখন আমি জাগি তখন নিজেকে তাঁর চালনায় ছেড়ে দি। যত কিছু বিপদের আশঙ্কা করি, আমি সে সকল হইতে রক্ষা পাইবার জন্য তাঁহার দিকে চাহিব, কিছু জিজ্ঞাসা করিব না. কারণ

আমি জানি, তিনি সে সকল বিপদকে অপসারিত করিবেন, কিংবা সে সকলকে আমার মঙ্গলে পরিণত করিবেন। আমি আমার মৃত্যুর সময় বা অবস্থা জানি না, সে সকল বিষয় জানিতে আমি কিছুই ব্যস্ত নই, কারণ আমি জানি তিনি সমস্তই জানেন, সেই সময়ে তিনি আমাকে আশ্রয় দিতে ভুলিবেন না।

পাঠিকাগণ! আপনাদের ইহা পাঠ করিয়া কি মনে হইল, কথাগুলি কি, আপনাদের হৃদয়ে প্রতিধ্বনিত হইল না? যে দুঃখ বিপদ যখন আসিবে তাহা আসিবেই। কিন্তু আমরা বৃথা কতকগুলি ভুল সংস্কারাবদ্ধ হইয়া আমাদের জীবনকে দুঃখময় করি। সম্ভব, বা হইতে পারে, এরূপ দুঃখ বা অমঙ্গলের আশঙ্কায় আমরা বর্ত্তমান মুহূর্ত্তের জীবনকেও দুঃখময় করি। এই জাতীয় লোকদের দুঃখের আর সীমা নাই। সর্ব্বদাই ভয়ে অস্থির, অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বদাই সংক্ষিত। একটা টিক্‌টিকী পড়িলে বা একটা বিড়াল ডাকিলে আমরা অমঙ্গলের আশঙ্কায় সশঙ্কিত হই। ভাবিয়া দেখুন, প্রকৃত অমঙ্গল কি? মৃত্যু রোগ শোক ইহারা কি অমঙ্গলজনক। আপনাদের মনে এই সংস্কার বদ্ধমূল হউক, প্রেম, ক্ষমা, বিশ্বাস, সরলতা, পরদুঃখ-কাতরতা, পরের জন্য কষ্ট স্বীকার, এই সকল শুভ মঙ্গলকর কল্যাণপ্রদ। অপ্রেম, অক্ষমা, অবিশ্বাস, কপটতা, স্বার্থপরতা, এ সকল অশুভ অমঙ্গল, তদ্ব্যতীত আর কিছুই অমঙ্গল অশুভ নাই।

টাঙ্গাইলের ভূতপূর্ব্ব মোক্তার স্বর্গীয় জগবন্ধু রায় মহাশয়ের জীবনের একটী সত্য ঘটনা।

(দয়াবতী রমণী দ্বারা একটী বিদেশী বালকের জীবন রক্ষা।)

সে আজ ৬০ বৎসরের অধিক দিনের কথা, তখন আমার বয়স ১৫।১৬ বৎসর হইবে। আমি রাজসাহীতে আমার এক জন উচ্চ পদস্থ আত্মীয়ের বাসায় থাকিয়া পড়াশুনা করিতাম। কোন কারণে তাহার প্রতি আমার বিরাগ উপস্থিত হইল। ভাবিলাম এখানে আর থাকিব না। এই মনে করিয়া একটী ব্যাগে কিছু কাপড় চোপড় ও অর্থাদি লইয়া আমি একদিন রাজসাহী হইতে পলায়ন করিলাম। আমার বাড়ী ঢাকা জেলার অন্তর্গত মানিকগঞ্জ মহকুমার মধ্যে ছিল। সুতরাং আমি উত্তর বঙ্গের অবস্থা সবিশেষ অবগত ছিলাম না। তবে মুর্শিদাবাদ যাইব মনে করিয়া বাসা হইতে বাহির হইলাম। পথ ঘাট সকলি অপরিজ্ঞাত, তখনও ইংরেজ শাসন ভালরূপে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দস্যু তস্করের উপদ্রব যথেষ্টই ছিল। এই অবস্থায় আমি উদ্‌ভ্রান্ত ভাবে একাকী মুর্শিদাবাদের দিকে চলিলাম। একদিন যাইতে যাইতে প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত হইল, আমি একটী বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইলাম। ভাবিলাম এই খানেই রাত্রি যাপন করিব। বাড়ীটা কতকটা

বড় মানুষের বাড়ীর মতন। আমি গিয়া দেখিলাম বাহির বাড়ীর আঙ্গিনায় একটী বৃদ্ধ বসিয়া আছে। তাহার মূর্ত্তি কালো এবং কদাকার। তাহার নিকটে কয়েকটী যুবক অন্য এক আসনে বসিয়া আমোদের সহিত তাশ কি পাশা খেলিতেছিল। যুবকদের সহিত আমি কথা বলিতে লাগিলাম। যুবকেরাও আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া বৃদ্ধটী বলিল বিদেশী লোকের সঙ্গে এত আলাপ কেন, এবং আমাকে বলিল তুমি ঐ দালানের কোঠায় গিয়া বসে থাক। আমি তাহার কথানুসারে দালানের কোঠায় গিয়া বসিলাম। ক্রমে অন্ধকার হইয়া আসিল। বাহির বাড়ীতে কোন লোক জন নাই, আলোও নাই। দণ্ড চারি রাত্রি হইয়াছে, এমন সময়ে ৯।১০ বৎসরের একটী মেয়ে একটী প্রদীপ লইয়া আমার কুঠরীর কাছে আসিয়া উপস্থিত হইল. কেন কি উদ্দেশে আসিল বলিতে পারি না, অল্পক্ষণ থাকিয়া মেয়েটী পুনরায় বাড়ীর ভিতরে চলিয়া গেল। কিছুকাল পরে একটী বৃদ্ধা মহিলাকে লইয়া আবার আমার কাছে আসিল। বৃদ্ধা আমাকে কিছু জলখাবার দিয়া বলিলেন.—বাবা তুমি কোথায় এসেছ, এ যে ডাকাতের বাড়ী, এখনি এরা তোমাকে মারিয়া ফেলিবে। এই ভীষণ কথা শুনিয়া আমার মস্তকে যেন সহসা বজ্রপাত হইল। আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা চলিয়া গেল. আমি ব্যাকুলভাবে বলিলাম এখন আমার উপায় কি হইবে? বৃদ্ধা বলিলেন. তোমার কোন ভয় নাই, আমরাই তোমাকে রক্ষা করিব। কিন্তু ইঁহাদের কথায় আমার প্রাণে শান্তি আসিল না। যাহা হউক মেয়ে দুইটী চলিয়া গেলেন, এবং রাত্রি কিছু গভীর হইলে পুনরায় দুজনে আমার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রজনী অন্ধকাময়, বৃদ্ধা চুপে চুপে আমাকে বলিলেন, আমার সঙ্গে এসো, আমি ছায়ার ন্যায় তাঁহাদের অনুগমন করিতে লাগিলাম। তাঁহারা আমাকে জঙ্গলাবৃত একটী স্থানে লইয়া গেলেন। সেখানে একটি নিম্নশ্রেণীর স্ত্রীলোক বাস করিতেন। তাঁহার বাড়ীতে দুই তিন খানি ছোট ছোট কুটীর ছিল। বৃদ্ধা তাঁহার গৃহে গিয়া বলিলেন, এই বালকটীকে তোমার হস্তে অর্পণ করিলাম। তুমি ইহার জীবন রক্ষা করিবে। তিনিও প্রতিজ্ঞা করিলেন আমি যেরূপে পারি ইহার জীবন রক্ষা করিতে চেষ্টা করিব। নিম্নশ্রেণীর মহিলাটী বর্ষীয়সী, তিনি আমাকে লেপের নীচে লুকাইয়া রাখিলেন এবং ঘরের প্রদীপটী নির্ব্বাণ করিলেন। রজনী ক্রমে গভীর হইতে গভীরতর হইতে লাগিল। তখন দস্যুগণ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া বাহির হইল। প্রথমতঃ আমি যে কুঠরীতে ছিলাম সেখানে আমাকে না পাইয়া আমার জন্য নানাস্থানে অনুসন্ধান করিয়া অবশেষে আমার আশ্রয়দাত্রীর বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং মশাল লইয়া তাঁহার এ ঘর ও ঘর খুঁজিতে লাগিল। আমার আশ্রয়দাত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি খুঁজিতেছ? তাহারা বলিল আমাদের একটী ছাগ

হারাইয়াছে। কিন্তু কোথাও আমাকে না পাইয়া মনে করিল বোধ হয় আমি আশ্রয়দাত্রীর গৃহেই আছি। এই মনে করিয়া আমার আশ্রয়দাত্রীকে বলিতে লাগিল তুমি দরজা খুলে দাও আমরা একটু তামাক খাব, আমার আশ্রয়দাত্রী বলিলেন, আমার জ্বর হয়েছে উঠিতে পারিব না। কিন্তু দস্যুগণ কিছুতেই মানিল না। অগত্যা আমার আশ্রয়দাত্রীর একটী ছোট মেয়ে উঠিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। দস্যুগণ ঘরে প্রবিষ্ট হইল। তখন আমি মৃতবৎ পড়িয়া আছি। ভাবিলাম এইবার রক্ষা নাই। কিন্তু ভগবানের কি অপার করুণা! দস্যুগণ আমার আশ্রয়দাত্রীর গৃহ তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল। কিন্তু কোথাও আমাকে পাইল না। আমি যে আমার জননীরূপিনী আশ্রয়দাত্রীর লেপের নীচে থাকিতে পারি দস্যুগণ এরূপ সন্দেহ মনেও স্থান দেয় নাই। সুতরাং তাহারা নিরাশ হইয়া আমার আশ্রয়দাত্রীর গৃহ হইতে ফিরিয়া গেল! আমার প্রাণে বল আসিল, ভাবিলাম এবার ভগবানের কৃপায় জীবন পাইলাম। আমি নিশ্চিন্ত হইয়া শয়নে আছি। রাত্রি প্রভাতের কিছু পূর্ব্বে আবার সেই দেবকন্যা বালিকাটী এবং করুণাময়ী বৃদ্ধা মহিলা আমার আশ্রয়দাত্রীর গৃহে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, এবং আসিয়া বলিলেন দস্যুরা যদি টের পায় যে ছেলেটী তোমার গৃহে আছে, তাহা হইলে তোমারও বিপদ এবং ছেলেটীরও ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হইবে। এই বলিয়া তাঁহারা আমাকে গৃহ হইতে বাহির করিয়া আনিলেন। এবং গ্রামান্তরে আমাকে লইয়া চলিলেন। এইরূপে তাঁহারা অনেক দূর আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিলেন। এবং আমি একটী গ্রামের নিকটবর্ত্তী হইলে দেবীগণ এখন তুমি যাও বলিয়া তাঁহারা গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। আমি নিরাপদে পুনরায় গম্যস্থানে যাইবার জন্য অগ্রসর হইলাম। এইরূপে ভগবান্ আমাকে বিদেশে অপরিচিত স্থানে তাঁহার তিনটী কন্যার সাহায্যে রক্ষা করিলেন। ধন্য তাঁহার করুণা! আহা দস্যুগৃহে তিনি কি আশ্চর্য্যরূপে এই ৩টী দেবকন্যা রচনা করিলেন। পঙ্কের ভিতর যেমন পদ্মের জন্ম হয়, তেমনি নরঘাতক রাক্ষসের গৃহে এমন অনুপম দেবচরিত্রের বিকাশ।

টাঙ্গাইল।

অশীতিতম মাঘোৎসবে

ব্রাহ্মিকা উৎসবের উপদেশ।

(শ্রীযুক্ত প্রমথলাল সেন প্রদত্ত)

দীক্ষিতিনীদের প্রতি, ১৩ই মাঘ।

তোমরা দুজন যে আজ দীক্ষা গ্রহণ করলে, এক মহা সৌভাগ্যের দিন, আজ এই শুভ দিনে ব্রাহ্মিকা উৎসবের দিনে ইহা এক মহা সৌভাগ্যের কথা, কৃতজ্ঞতার সহিত এই কথা স্মরণ করতে হবে। শুধু সৌভাগ্য বল্‌লে হবে না, বাস্তবিক আজ কত বড় এক দায়িত্বের ভিতর প্রবেশ করা হল এই কথা আরও ভা

করে মনে কর্‌তে হবে। এই শুভদিনে তোমরা দুজন যে শুধু দীক্ষা নিলে তা নয় তোমাদের সঙ্গে আমাদেরও দীক্ষা গ্রহণ করা হল। আজ সকলের পক্ষেই এক মহাদিন, শুভদিন সৌভাগ্যের দিন আর সেই সঙ্গে সঙ্গে এক মহা দায়িত্ব গ্রহণের দিন বলতে হবে।

সাধারণ কথায় বলা যেতে পারে মানুষের তিন অবস্থার ভিতর দিয়ে আনন্দ ও শোক প্রকাশিত হয়, যেমন যথন মানুষ জন্মায়, বিবাহ হয় ও মৃত্যু হয়, এই তিন অবস্থায় পুরোহিতের প্রয়োজন, এই তিনটী জীবনের বিশেষ দিন বলে ধরা হয়। কিন্তু হে ব্রহ্মকন্যা, তোমরা জীবনে কেবল এই তিন দিন বিশেষ দিন, আনন্দের দিন, সৌভাগ্যের দিন বলিয়া মনে করিবে না, ব্রহ্ম উপাসকের নিকট প্রত্যেক দিন প্রতি ঘটনা এক স্বতন্ত্র বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় এই কথা স্বীকার করতে হবে, আজ থেকে আরও ভাল করে বুঝতে হবে নববিধানের দেবতা এক জীবন্ত, সত্য, দেবতা এ কথার কথা নয় জীবনে তাঁর শক্তি, বল, প্রাণ সঞ্চারিত হবে। এই এত কথা বলা হল, বৎসরের পর বৎসর এখানে কত কথা বলা হচ্ছে, দিনেরও শেষ নাই, বলারও শেষ নাই, কিন্তু যাহা সত্য, যাহা জ্ঞান তাহার শেষ নাই, অন্ত নাই, কখনও ফুরবার নয়, সকলের পক্ষে তাহা শিক্ষার বস্তু হয়ে চিরদিন রয়েছে। তাই বলি প্রতিদিন প্রতি ঘটনা এক সৌভাগ্যের দিন। সেই যে চার হাজার বছর পূর্ব্বে মৈত্রেয়ী প্রশ্ন করিয়াছিলেন, সেই প্রশ্ন ও তার উত্তর সকলের জন্য আজও জীবন্ত ভাবে শিক্ষা দিচ্ছে, তার ভিতর কত জ্ঞান রয়েছে, অতীত জ্ঞানের পরিচয় পাচ্ছি। সেই কবে সুজাতা বুদ্ধদেবকে সেবা করেছিলেন, সেই সেবা সেই সুজাতার সাধুভক্তি আজও জীবন্ত ভাবে প্রতিজনকে শিক্ষা দিচ্ছে। ধন্য হলেন সুজাতা, সেই সাধুকে ভক্তি করিয়া কৃতার্থ হইলেন। কবি অন্য চিত্রে চিত্রিত করলেন, বুদ্ধ বল্‌লেন, সুজাতা তুমি ধন্য, আজ দেখলাম তোমার ভিতরে সহজে যে সরল জ্ঞান এসেছে, আমি এত তপস্যায় তা পাই নি, তুমি সহজে সেই জ্ঞান পেয়েছ আজ ধন্য তুমি, এই জ্ঞানে জ্ঞানী হও, এই দিব্যজ্ঞান লাভ করে আপনাকে ভাগ্যবতী বলে জান, শান্তিলাভ কর যে সৌভাগ্য হবে। সাধুভক্তির ভিতর দিয়ে সেই সুজাতা কি এক মহা জ্ঞান লাভ করলেন। নববিধান আর এক নূতন কথা বল্‌লেন শিষ্য বড় হলেন, একি আনন্দের আশার কথা নয়, ঈশার শিষ্যেরা কত বড় হলেন কত কাজ করলেন, ঈশা চলে গেলেন, তাঁর শিষ্যেরা এক শত গুণ হ'ল, কত কাজ করলেন, নির্জ্জীব হয়ে ঘুমিয়ে থাক্‌লে চল্‌বে না, ছোট হ'ক বড় হক কাহারও নিরাশ হবার কথা নেই, সকলেই একদিন মহা উৎসাহে জেগে উঠবেন, ঘুমিয়ে থাক্‌লে আর চল্‌বে না এ এক কম আশার কথা নয়। এই আশার সংবাদ সকলের জন্য এসেছে।

বছরে একদিন সকলে এখানে এসে

বেশ উপাসনা হ'ল, সকলের সঙ্গে আলাপ পরিচয়, কথা বার্ত্তা, খাওয়া দাওয়া হ'ল বেশ আনন্দে দিন কেটে গেল, তারপর বাড়ী চলে গেলে, আর সব ভুলে গেলে, তা করলে চল্‌বে না, ভাল করে সব বুঝতে হবে, মৈত্রেয়ীর সেই জ্ঞান, সুজাতার সাধুভক্তি গুরু শিষ্যের সম্বন্ধ নববিধানের ভিতর সব নূতন করে বুঝতে হবে। ইহা কল্পনা নয়, মিথ্যা নয়, শিষ্যভাবে রোজ তাঁর নিকট যাও, নরনারী সকলে মিলে প্রতিদিন যাও, তাহলে দেখবে নূতন আকারে সকল সত্য তোমাদের অন্তরে প্রকাশিত হবে, সেই অনন্ত জীবনের দেবতা কত সহজ সরল ভাবে দেখা দেবেন, কত নূতন ভাব সহজভাবে আপনা হতে প্রকাশিত হবে, তখন তিনি বুকে ধরে কত শিক্ষা দেবেন, মা যেমন করে ডাকেন, তেমনি করে পরমা-জননী তোমাদের আহ্বান করলে ব্রহ্মজ্ঞান, দর্শন কত সহজ হয়।

সহজ সরল ভাবে যে জিনিস পেলে তা আর ফুরবার নয়, তুমি যে কাজই কর না সংসারে যখন যে অবস্থায় থাক না কেন কিছুতেই দুঃখ নেই তাঁর দাসী হয়ে সব করতে হবে এই বিশ্বাস চাই এই দাসীত্বেই পরিত্রাণ হবে, মুক্তি হবে।

সব কাজের ভিতরে আনন্দ উৎসাহ চাই, শুধু উপাসনা নয়, পৃথিবীতে মানুষকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়, এই সব অবস্থাতে অবসন্ন হইও না, সকল অবস্থায় উৎসাহের সহিত তাঁকে দেখে শান্তি লাভ করতে হবে।

নববিধান এই সৌভাগ্যের কথা বলছেন, যিনি যে অবস্থায় থাকুন না, কেউবা সাহিত্যের আলোচনা কচ্ছেন, কেউবা বিষয় কর্ম্ম কচ্ছেন, আবার সংসারের রান্না বান্না অন্যান্য কাজ কর্ম্ম যাই বল এই সকলের মধ্যে যদি এমন জিনিস না পান এমন উত্তর না পান যাতে আপনাকে ধন্য কৃতার্থ মনে করতে পারেন তবে কিসের উৎসব, কিসের আনন্দ।

আজ আর পর নেই সকলেই আত্মার আত্মীয় আজ দিব্যচক্ষে ইহা দেখতে হবে, এই যে পরমা-জননী তিনি সকলকে আপনার কোলে নেবার জন্য ডাকছেন, কেমন করে আর আমরা পর হই, এখন এই বিশ্বাসে পূর্ণ হয়ে ঘরে যেতে হবে আপনার তা হারাতে হবে ভুলে যেতে হবে, তার বুকে আমরা সকলে, হিংসা দ্বেষ, অহঙ্কার এসব থেকে মুক্ত হয়ে সেই সুন্দর স্বভাব যা জননী দিয়েছেন, প্রত্যেককে স্বতন্ত্র স্বভাব যা তিনি দিয়েছেন তাহা লাভ করতে হবে, সকল নীচ ভাবের অতীত হতে হবে।

এমন সরল জ্ঞান দর্শন হবে যে প্রত্যেকে আপন আপন নিয়তি কর্ত্তব্য স্বতন্ত্রভাবে দেখতে পাবেন।

প্রত্যেক কাজে অবস্থায় নিজের সৌভাগ্য ভাল করে দেখতে হবে। তাহলে আর কোন ক্ষোভ থাকবে না, সেই বিশ্বজননী প্রত্যেকের জন্য যে এই উচ্চ সৌভাগ্য রেখেছেন। হিংসা দ্বেষ ঈর্ষা সব অসম্ভব হবে। এ কথা বলা সহজ কিন্তু বাস্তবিক জীবনে ঐ অবস্থা

লাভ না হলে কখনই জীবন সত্য ভাবে চলে না, এই সব নীচ ভাব, হিংসা দ্বেষ ক্রোধ অভিমান সব থাকবে অথচ তাঁকে ডাকবো ভাববো তা কখনই সম্ভব নয়। মানুষের মধ্যে সর্ব্বদা দুই প্রকৃতি বর্ত্তমান আছে, যে পরিমাণে একটির হ্রাস হবে সেই পরিমাণে অপরটির বৃদ্ধি পাবে। কিন্তু ২টী ভাব এক সঙ্গে পোষণ করিলে কখনই সত্যভাবে জীবন চলে না, যেমন সাধুসেবা করিছ তার ভিতরে যদি ফাঁকি দিতে চেষ্টা করি, খাঁটি ভক্তির ভাবে না করি, একটা বাহিরের লোক চক্ষে সেবা হবে বটে কিন্তু এ সেবার ভিতর দিয়ে কখনই মুক্তি পরিত্রাণ হবে না। এই সকল সৎকাজই যদি সত্যভাবে করা না হয় তবে বিপদ্ পরীক্ষার সময় সেই কল্পনার ধর্ম্ম দাঁড়াতে পারে না। তাই বলি হে ব্রহ্ম-কন্যা সকল পুরোণো ভাব ছেড়ে দিয়ে নববিধানে সব নূতনভাবে সত্য খাঁটি ভাবে দেখতে হবে। নিত্য নূতন ভাবে তাঁর পূজা করে ভিতরে বাহরে যখন যে অবস্থায় যেখানে থাক না কেন সত্যভাবে সরলভাবে জীবন কাটাতে হবে।

উৎসব শেষ হয়ে গেল আমাদেরও পূজা শেষ হ'ল নববিধান একথা বলেন না, নিত্য নব ভাবে সেই নব দেবতার পূজা করে কত শক্তি কত সাধুভক্তি নূতন ব্রহ্মপ্রাপ্তি লাভ হবে, তাই বলি প্রত্যে-ককে ভাগ্যবতী না বলে পারি না। নূতন ভক্তি সেবা না করলে নববিধান সাধন হয় না। তাঁর জীবন্ত অনন্তশক্তি দেখে ধন্য হও।

আজ সকলেই আমাদের নিকট পূজনীয়, সকলকে অন্তরে স্থান না দিলে যথার্থ ব্রহ্মে ভক্তি হয় না। সকলে নিজ নিজ সৌভাগ্য দর্শন করে বিনীত হৃদয়ে সাধুভক্তদের প্রণাম কর, সকলের চরণে মস্তক অবনত হউক।

ধৈর্য্য।

পৃথিবীতে জীবনধারণ করিলেই মধ্যে মধ্যে বিপদের সঙ্গে দেখা হয়। পুরুষ নারী, ধনী দরিদ্র, সাধু অসাধু, বালক বৃদ্ধ সকলকেই সময়ে সময়ে বিপদে পড়িতে হয়। বিপদের সময় ধৈর্য্য না থাকিলে মানুষের কি মহাক্লেশ ও গভীর অশান্তি উপস্থিত হয় তাহা আমরা যখন তখন দেখিতে পাই। সংবাদ পত্রে প্রায়ই দেখিতে পাই যে সামান্য বিপদে অধিক ব্যস্ত হওয়াতে মহা অনিষ্ট ঘটন হইয়াছে। ঝড়ে নৌকা একদিকে কাত হইল, সকল আরোহী অধীর হইয়া বিপরীত দিকে গেল এবং নৌকা জলমগ্ন হইল। বাড়ীতে আগুন জলিয়া উঠিল, স্থির সাহসের সহিত তাহা নিবাইতে চেষ্টা না করিয়া চীৎকার করিয়া লোক ডাকিতে যাওয়াতে ততক্ষণ অগ্নি প্রবল হইয়া মহা অনিষ্ট করিল। এমনও দেখা যায় যে হঠাৎ কোন শোকের কারণ উপস্থিত হওয়াতে অধীর হইয়া আত্মহত্যা করা হইল অপরদিকে সময়ে একটু ধৈর্য্য থাকিলে মহা উপকার হয় ইহাও সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন লোক স্বভাবত ধৈর্য্যশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোকের স্বভাবে

ধৈর্য্য বড়ই অল্প। যখন মানুষের জীবনে ধৈর্য্যের প্রয়োজন সর্ব্বদাই হয় তখন যেমন পুত্র কন্যা প্রভৃতিকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় গুণ ও বিদ্যা অভ্যাস ও শিক্ষা করাইয়া দেওয়া হয় তেমনই ধৈর্য্যও শিক্ষা বা সাধনের ব্যাপার করিয়া দেওয়া উচিত। নারী জীবনে বোধ হয় ধৈর্য্যের প্রয়োজনীয়তা অত্যন্ত অধিক। নারীকে অনেক সময়ে ভয়ানক অবস্থাতেও ধৈর্য্যধারণ করিতে হয় এবং ধৈর্য্যের অভাব হইলে মহা অনিষ্ট ঘটন উপস্থিত হয়। এজন্য নারী জীবনের মঙ্গলের জন্য ধৈর্য্য অভ্যাস করা অত্যন্ত প্রয়োজন। হাঁটিতে শিখিতে হইলে যেমন টলিয়া পড়িয়া গেলেও পুনরায় উঠিয়া হাঁটিতে হয়, ধৈর্য্য অভ্যাস করিতেও তেমনই করা প্রয়োজন। কোন কোন নারীর ব্যবহার দেখিয়া মনে হয় যেন তাঁহারা মনে করেন যে অধীর হওয়াই নারীর বিশেষত্ব, যেন ধৈর্য্যের সহিত ব্যবহার করা নারীর পক্ষে ভাল দেখায় না, এজন্য যতদূর সম্ভব ব্যস্ততা, অধীরতা প্রকাশ করেন। ফলে ধৈর্য্যের অভাব অতি লজ্জাকর অভাব এবং যিনি ধৈর্য্যধারণ করিতে পারেন তিনি অবশ্যই সাধারণ সকলের মান্য প্রাপ্ত হন ও গৃহে সুখ শান্তি রক্ষা করেন। ধৈর্য্যধারণ করা কর্ত্তব্য এবং অভ্যাস করিলে অনেক পরিমাণে ধৈর্য্যলাভ হইতে পারে ইহাতে বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকিলেই মানুষ ধৈর্য্য শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিবে। ধৈর্য্য যে অত্যন্ত প্রয়োজন, ধৈর্য্য না থাকিলে যে অনেক অনিষ্ট ঘটে, ধৈর্য্যের অভাব হইলে অনেক গুণের বিকাশই হয় না ইহা সর্ব্বপ্রথমে মনে স্থিররূপে জানা প্রয়োজন। আমরা সাধারণত উন্মত্ত অথবা প্রমত্ত অবস্থাকে বিকৃত অবস্থা বলি, সেরূপ অবস্থার কার্য্যের জন্য সেই সেই ব্যক্তিকে দোষী বলিতেও যেন কুণ্ঠিত হই ; সেইরূপ অধীর হইয়া মানুষ যাহা করে তাহা যেন স্বাভাবিক অবস্থার কার্য্য নহে, মনের একরূপ বিকৃত অবস্থার কার্য্য,ইহাই বলিতে পারি। মনের স্থির, ধীর অবস্থাই স্বাভাবিক, সেই অবস্থায় যে কার্য্য হয় তাহাই সেই ব্যক্তির যথার্থ কার্য্য। তাহার বিপরীত সকল অবস্থাই মন্দ অবস্থা বলিতে হইবে। কোন ব্যক্তিকে পাগল বলিলে যেমন তাহা হইতে স্বাভাবিক মনুষ্যের মহৎ গুণ সকল বিয়োগ করা হইল, অথবা কাহাকেও মাতাল বলিলে যেমন তাহার বুদ্ধির বিকৃতির কথা বলা হইল, তেমনই কোন মানুষকে অধীর বলিলেও বলা হইল যে সে মনের স্বাভাবিক স্থিরতা হারাইয়াছে। এরূপ দোষারোপ সামান্য দোষারোপ কখনও বলা যাইতে পারে না। যেমন পাগল হওয়া দুঃখের বিষয়, যেমন মাতাল হওয়া লজ্জা ও ঘৃনার বিষয় তেমনই অধীর হওয়া আক্ষেপের বিষয়। ফলে অনেক সময়ে আমরা যে বিষয়ের জন্য ধৈর্য্য হারাই, অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠি, সে বিষয়ের অপেক্ষা আমাদের মনের ধৈর্য্য বা স্থিরতার মূল্য অত্যন্ত অধিক। যেমন ধর্ম্মশাস্ত্রের উপদেশ শুনিতে পাই যে আত্মা বিনষ্ট হইল তবে সংসারের সুখ লইয়া কি করিব? তেমনই ইহা স্থিররূপে

জানিয়া রাখা প্রয়োজন যে যদি ধৈর্য্য নষ্ট হইল, যদি আমার মনই বিকৃত বা বিকল হইল তাহা হইলে সামান্য লাভালাভ লইয়া কি করিব। এক ধৈর্য্যকে হারান মহাক্ষতি, তাহার পর দেখা যায় যে ধৈর্য্য হারাইয়া যাহা করা যায় তাহা প্রায়ই ভাল করিয়া করা হয় না তাহাতেও ক্ষতি এবং একবার কোন কারণে ধৈর্য্য হারাইলে পুনরায় হয়ত তাহা অপেক্ষা সামান্য কারণেও ধৈর্য্য হারাইতে হয়। এইরূপে অশেষ অনিষ্ট হয়। এজন্য মনে স্থির করিয়া রাখা উচিত যে কিছুতেই অধীর হওয়া হইবে না। যে সকল বিষয়ে মানুষের হাত নাই তাহাতে ধৈর্য্যধরা ভিন্ন আর কি হইতে পারে? যখন মেঘ ডাকে, বা বজ্রপাত হয় তখন সকলেরই ভয় হয় কিন্তু তাহাতে দৌড়াদৌড়ি করা বা চীৎকার করাতে কিছু লাভ নাই। যদি পূর্ব্ব হইতে মনকে স্থির করিয়া রাখা হয় যে এসকল অবস্থাতে ধৈর্য্য ধরিয়াই থাকিব, তাহা হইলে সেই সময়ে প্রথমে মন একটু চঞ্চল হইতে পারে, কিন্তু পরক্ষণে ধৈর্য্যধারণ করা কঠিন হয় না। যেমন অন্য সকল বিষয় ক্রমে ক্রমে শিক্ষা করিতে হয়, ধৈর্য্যধারণ বিষয়ও তেমনই শিক্ষা বা অভ্যাস করিতে হইবে। নারীজীবনে এই গুণের ব্যবহার অনেক সময়ে করিতে হয় এজন্য নারীর পক্ষে ধৈর্য্যধারণ করিতে শিক্ষা করা অত্যন্ত প্রয়োজন। একটি সংবাদ জানিতে অত্যন্ত ব্যস্ত কিন্তু সংবাদটি পাওয়া গেল না, একটি প্রিয়জনের আসিবার কথা ছিল কিন্তু সময় গেল সে আসিল না এই সকল বিষয়ে অধীর হইয়া নারীর জীবনের অনেক অংশ মিথ্যা চলিয়া যায়, কখনও অধীর হইয়া অত্যন্ত ব্যয়সাধ্য কার্য্য করিয়া ফেলা হয়, কখনও বা কষ্টসাধ্য কার্য্য আরম্ভ করা হয়। কখনও দেখা যায় যে একটা অনিষ্ট ঘটিয়াছে সন্দেহ করিয়াই অধীর হইয়া একটি সাংঘাতিক ঘটনা ঘটিয়া যায়। মানুষ সকল সময়ে ধৈর্য্যধারণ করিতে পারে না সত্য, এবং নারীর কোমল প্রাণ অল্পেই ধৈর্য্য হারায় তাহাও সত্য, কিন্তু শিক্ষা বা অভ্যাসে যেমন অন্যান্য অনেক স্বাভাবিক দুর্ব্বলতার অনেক প্রতিকার হয় তেমনই ধৈর্য্যলাভ বিষয়েও অনেক অগ্রসর হওয়া যাইতে পারে। কেহ হয়ত মনে করিবেন যে ধর্ম্মবল অধিক হইলে, যোগী সাধু হইলে, ধৈর্য্য সাধন হইবে তাহা না হইলে ধৈর্য্যধরা সম্ভব নয়। প্রকৃত সত্য তাহা নয়, মানুষকে সকল বস্তুই অভ্যাস বা সাধন দ্বারা লাভ করিতে হয়, অনেকক্ষণ ধ্যান করিতে অভ্যাস করা হইলেই যে বিপদে ধৈর্য্যধারণ করা সহজ হইবে তাহা নয়। যিনি ধৈর্য্যধারণ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন তিনি উচ্চধর্ম্ম জীবন লাভ না করিয়াও ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিবেন। সাধারণতঃ ধৈর্য্যধারণ করা মনের বলের কার্য্য। দৃঢ় ইচ্ছার সহিত স্থির অচল হইয়া থাকাই ধৈর্য্যধারণ। প্রথম প্রথম ইহা অভ্যাস করিতে মনের বলই যথেষ্ট। ধৈর্য্য অভ্যাস করিতে করিতে একদিকে মনের বল বাড়িয়া যায়, মনের বলে ধৈর্য্যধারণ হয়। কিন্তু ভিতরে ভিতরে মনের

দুর্ব্বলতাও ধরা পড়ে। মনে বল করিতে ভিতরে আর একটা বল চাই, অপর একটা কিছুর উপর নির্ভর করিয়া মন বল করিতে পারে। যাহারা কঠিন শ্রমসাধ্য কার্য্য করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে তাহাদের ধৈর্য্যের মূলে অর্থ লাভের আশার বল থাকে। যে ব্যক্তি আফিসে কেরাণীগিরিতে পঞ্চাশ টাকা বেতন পাইতে পারে সে গরমের দিনে রেলগাড়ীর ইঞ্জিন চালাইয়া ধৈর্য্যের সহিত গ্রীষ্মের উত্তাপ সহ্য করে তাহার মনের বল মাসিক দুই শত টাকা লাভের আশা। কিন্তু যে ব্যক্তির কোন লাভ নাই, অথবা লাভ ক্ষতির কোন ভাব নাই কেবল কষ্ট সহ্য করা বা উপস্থিত বিপদের ভয় আসিয়া আক্রমণ করিতেছে সে ধৈর্য্যধারণ করিবে কোন্ বলে? সর্ব্বপ্রথমে তাহাকে জানিতে হইবে যে অধীর হওয়াতে কোন লাভ নাই, অধীর হওয়া মনের একটা বিকৃত অবস্থা মাত্র। যেমন শরীরে জ্বর হইলে শরীরের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই তেমনই মনে অধৈর্য্য আসিলে মনের ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই, অতএব কোন অবস্থাতে ধৈর্য্যকে হারাইব না। কিন্তু এরূপ তত্ত্বদর্শীর জ্ঞানের বল অত্যন্ত অল্প। এরূপ ভাব মনে রাখিয়া ধৈর্য্য সাধন অত্যন্ত কঠিন। এই ভাব মনে উপস্থিত হইলে ক্রমে দৃষ্টি পড়ে যে কোন্ বল লাভ হইলে ধৈর্য্যকে সকল অবস্থায় রক্ষা করা যায়। যখন যুক্তিতর্ক দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, যখন ইচ্ছার বল থাকে না, তখন যাঁহারা মঙ্গলময় ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা করিতে অভ্যস্ত তাঁহারা ধৈর্য্য রক্ষার জন্য প্রার্থনার বলকে আহ্বান করিয়া থাকেন। যখন কেহ দেখিতে পাইবেন যে অধীর হওয়া কেবল দুঃখ ও ক্ষতির কারণ ও আপনার বলে ধৈর্য্য রক্ষা করা যায় না তখন অবশ্য বিপন্ন হইয়া মঙ্গলময় ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে থাকিবেন যে তিনি কৃপা করিয়া ধৈর্য্য বল দান করুন। যাহার মনে যে উপায় আসে তিনি তাহা গ্রহণ করিতে পারেন, এবং যাঁহার অন্য কোন উপায় নাই তিনি ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন, যেন ধৈর্য্য না যায়। যাঁহারা মনোবিজ্ঞানের নিয়মানুসারে পুরুষ ও নারীর মনের ধৈর্য্যের বিষয় আলোচনা করেন তাঁহারা বলেন যে সাধারণতঃ পুরুষের মন অধিক ধৈর্য্যশীল হইলেও বিশেষ বিশেষ কঠিন অবস্থাতে নারীর মনের ধৈর্য্যবল অত্যন্ত অধিক। বিশেষতঃ উচ্চ চরিত্র সাধ্বী নারীগণের ধৈর্য্য অত্যন্ত অধিক। নারীজাতির মধ্যে যাহাদিগের গতি অধোদিকে হয় তাহারা অত্যন্ত অধীরা হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে যাঁহারা যত উচ্চ চরিত্র ও উচ্চ ধর্ম্মাদর্শ লইয়া জীবনধারণ করেন তাঁহাদের ধৈর্য্যবল তত আশ্চর্য্য ও বিস্ময়কর। এই সত্যটিকে প্রত্যেকেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। যদি একথা সত্য হয় যে, যে নারী যত উচ্চ ধর্ম্মশীলা তিনি তত ধৈর্য্যশীলা ও স্থির স্বভাবা হইয়া থাকেন এবং যিনি যত সহজে অধীর ও চঞ্চল হন তিনি সেই পরিমাণে ধর্ম্মহীনা ক্ষুদ্র প্রকৃতির লোক তাহা হইলে বলা যাইতে পারে যে মহিলাগণের পক্ষে

অতি সাবধানে ধৈর্য্যধারণ অভ্যাস করা প্রয়োজন। ফলে আমরা দেখিতেছি যে আমরা যে ভাবেই সংসারের সুখ দুঃখকে গ্রহণ করি না কেন তাহারা ক্ষুদ্র ও বৃহৎ আকারে ক্রমাগত আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে, হইতেছে এবং হইবে। সুখ দুঃখ আসা নিবৃত্তি হইবে না, ইহা যেমন সত্য তেমনই ইহাও আমরা জানি যে যিনি সুখ দুঃখ পাঠাইতেছেন তিনি আমাদের মঙ্গলময় পরমেশ্বর। তিনি আমাদের অমঙ্গল কখনও করিবেন না। আমাদের মঙ্গলের জন্যই এসকল পাঠাই-তেছেন এবং এখানকার সুখও যেমন চিরদিন থাকিবে না তেমনই দুঃখও চিরদিন থাকিবে না। এ বিশ্বাস আমরা সহজেই মনে ধরিয়া রাখিতে পারি। এইটুকু মনে স্থির রাখিয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করিয়া ধৈর্য্যধারণ করিতে শিখিতে হয়। যদি ধৈর্য্য সুখ শান্তির হেতু হয়, যদি ধৈর্য্যে সকল প্রকার লাভ হয়, যদি অধৈর্য্য দুর্ব্বলতার পরিচয় হয় তবে কেন মহিলাগণ অধৈর্য্য ত্যাগ করিয়া ধৈর্য্য শিক্ষা করিবেন না? যাঁহারা সংসার করিতেছেন তাঁহাদিগের প্রতিদিন প্রতি দণ্ডে প্রায় নূতন নূতন অবস্থায় ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে হয় এবং প্রায়ই দেখা যায় অতি প্রবীণা গৃহিণীও সামান্য বিষয়ে ধৈর্য্য হারাইয়া লোককে কষ্ট দেন, বা শিশুদের প্রতি অত্যাচার করেন, অথবা আপনি দুঃখ পান। নারীজীবনে ধৈর্য্যসাধন অত্যন্ত প্রয়োজন।

———

বালিকাদের নীতিবিদ্যালয়ের বার্ষিক কার্য্যবিবরণ।

ভগবানের আশীর্ব্বাদ বহন করিয়া এই ক্ষুদ্র নীতিবিদ্যালয় তিন বৎসর সকলের সেবার জন্য আপনার সামান্য শক্তিকে নিয়োজিত রাখিয়াছে। আবার নূতন বর্ষ সমাগত। বিগত কয় বৎসরে যে সকল পরিচিত মুখ এই আনন্দোৎসবের মধ্যে দেখিয়াছিলাম, আজ তাঁহাদের অনেককেই দেখিতে পাইতেছি না। কিন্তু যাঁহাদের সহানুভূতি ও ভালবাসা, যাঁহাদের আশীর্ব্বাদ আমাদের কর্ত্তব্যকে সরস, মধুর করিয়াছিল, তাঁহাদের সহানুভূতি তাঁহাদের আশীর্ব্বাদ চিরদিনই আমাদের জীবনের পথকে সুন্দর উজ্জ্বল করিয়া রাখিবে।

গত বৎসরে অনেক বাধার ভিতরে নীতিবিদ্যালয়ের কার্য্য ঠিকভাবে সুনির্ব্বাহ হইতে পারে নাই। যাঁহারা নীতিবিদ্যালয়ের কার্য্য করেন তাঁহাদের মধ্যে ২।৩ জনের পরিবারে ভগবান্ রোগ ও মৃত্যু দূতকে প্রেরণ করিয়া অন্য ভাবে অন্য কার্য্যে তাঁহাদের ব্যাপৃত রাখিয়াছিলেন, তাঁহারা সকল সময়ে বিদ্যালয়ের কার্য্যে যোগদান করিতে পারেন নাই। বোধ হয় সেই কারণে কার্য্যের বিশৃঙ্খলার জন্য বৎসরের আরম্ভে যতগুলি বালিকা লইয়া কার্য্য আরম্ভ করা গিয়াছিল, বৎসরের শেষে তাহাদের সংখ্যা কিছু কমিয়া গিয়াছে। অন্য অনেক বালিকা আসিবার জন্য আগ্রহান্বিত, কিন্তু সকলকে গাড়ী করিয়া আনা আরও অর্থসাপেক্ষ, সেই

জন্য অনেককে আনিতে পারা যায় না। তারপরে ছোট ছোট বালিকাদের জন্য সহজ শিক্ষাপ্রদ গল্পপুস্তক, জীবনী প্রভৃতি ক্রয় করা, তাহাদের আমোদের জন্য দুচার রকম বন্দোবস্ত করাও প্রয়োজন।

সাধারণতঃ নীতিবিদ্যালয়ের বালিকাগণকে তিনটী শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া লওয়া হয়। নিতান্ত শিশু বালিকাগণকে ছবি দেখান হয় ও সহজ গল্প বলা হয়। তাহাদের অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক বয়স্কা বালিকাদিগের দুইটী বিভাগ থাকিলেও সাধারণতঃ তাহাদের এক সঙ্গেই শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহাদের গল্প, সহজ বোধ্য কবিতা ও শ্লোক এবং সাধু সাধ্বীদিগের জীবন অবলম্বন করিয়া বলা হয়; এবং অধিক বয়স্কা বালিকাদিগের দুইটী বিভাগে একই সঙ্গে শিক্ষা দেওয়া হয়; তাহাদের ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থ হইতে শ্লোক আবৃত্তি করান হয় এবং মহাপুরুষদিগের জীবনী ও ধর্ম্মোপদেশ অবলম্বন করিয়া শিক্ষা দেওয়া হয়। গত বৎসর ঈশা ও বুদ্ধদেবের জীবনের দু চারিটী বিষয় লইয়া বলা হইয়াছে। ইংরাজী, বাঙ্গলা কবিতাও তাহাদের এমন ভাবে পড়ান হয় যে, তাহারা সেই কবিতার যথার্থ রসটুকুর আস্বাদন পায়, তাহার ভিতরকার কথাটী গ্রহণ করিতে পারে। উদ্দেশ্য এই যে, যে আনন্দ, যে সৌন্দর্য্যবোধ চিরদিন মানব হৃদয়ের মধ্যে স্পন্দিত হইতেছে, তাহারাও সেই স্পন্দনটুকু অনুভব করে, মানব ইতিহাসের সঙ্গে তাহাদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ উপলব্ধি করিতে পারে।

আজকাল বালিকারা অধিক বয়স পর্য্যন্ত বিদ্যালয়ের ছাত্রীজীবন যাপন করে; কিন্তু তাহাদের যেরূপ অসম্পূর্ণ শিক্ষালাভ হইতেছে তাহাতে তাহাদের জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশ হয় না। কালে একটী একটী বালিকা এক এক পরিবারের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী হইবে। যে নিজে ভগবানের চরণের উপর নির্ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে না, সে অপর পাঁচ জনকে স্থির রাখিবে কি করিয়া? গৃহের শ্রী, আনন্দ রক্ষার ভার যার উপরে, সে যদি শ্রীকে না চিনিল, মানব পরিবারের এই শত সহস্র তরঙ্গ আন্দোলনের মধ্যে যে আনন্দ আপনাকে নিত্য প্রকাশ করিতেছেন সেই চিরন্তন আনন্দকে অন্তরের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিল, তবে গৃহ রক্ষা করিবে কে? যে শক্তি, যে জ্ঞান তাহাদের জীবনকে পূর্ণ বিকশিত করিয়া তুলিবে, নানা অবস্থায় আন্দোলনের মধ্যে তাহাদের লক্ষ্য স্থির রাখিবে, সংসারের ঘাত প্রতিঘাতের ভিতরে সেই নিত্য আনন্দে তাহাদের হৃদয়কে শান্ত রাখিবে, সে শক্তির চালনা কোথায় হয়. সে জ্ঞানলাভের পথে কতটুকু তাহাদের সুযোগ দেওয়া হয়? যাহাতে তাহারা সহজে এই সুযোগ লাভ করে, এবং তাহাদের অন্তরনিহিত দেবশক্তির পরিচালনায় জীবনকে সার্থক ও সুন্দর করিতে পারে সেই সহায়তা করাই নীতিবিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ উদ্দেশ্য। সাধারণ বিদ্যালয়ের পাঠে পরিশ্রম ক্লান্ত বালিকাদিগের কোমল হৃদয়ের সম্মুখে কেবল কতকগুলি কঠিন ধর্ম্মকথা

উপস্থিত না করিয়া যাহাতে তাহারা সহজে ধর্ম্মকে গ্রহণ করিতে পারে; সত্য শিব সুন্দরের প্রকাশে সমুদয় জগৎ যে সুন্দর, তাঁর মঙ্গল আলোকে বিশ্ব প্রকৃতির মুখ যে উদ্ভাসিত তাহাই নয়ন উন্মীলন করিয়া দেখিবার জন্য যে নির্ম্মলদৃষ্টি, যে সহজ জ্ঞানের প্রয়োজন তাহাই দিবার জন্য এই বিদ্যালয়ের যত্ন।

যে উচ্চ আদর্শ সম্মুখে লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করা গিয়াছিল, সে আদর্শ কতটুকু কার্য্যের ভিতরে ফুটাইয়া তুলিতে পারা গিয়াছে জানি না। এ কার্য্যে সকলের সহায়তার আবশ্যক। এইআনন্দোৎসবের দিনে তাই সাধারণের নিকটে নীতিবিদ্যালয়ের কয়েকটী নিবেদন আছে। ভগবান্ যাঁহাকে যে শক্তি দিয়াছেন তিনি তাহাই দিয়া যেন ইহার কার্য্যে সহায়তা করেন। ইহার জন্য যেমন অর্থের প্রয়োজন, তেমনি কার্য্যকারিণী নারীগণেরও প্রয়োজন। যাঁহার অন্তরের মধ্যে অন্তর দেবতা তাঁহার ধ্রুব আলোককে উজ্জ্বল করিয়াছেন, তিনি ছোট ভগ্নীদের জন্য সে আলোককে অগ্রসর করিয়া ধরুন। যিনি কোন কলাবিদ্যায় পারদর্শিনী হইয়াছেন, তিনি তাহারই সাহায্যে ছোট ছোট ভগ্নীদের মনে নূতন নূতন জ্ঞানার্জ্জনের স্পৃহা ও আনন্দ জাগাইয়া দিন। অভিভাবকগণের নিকট নিবেদন এই তাঁহারা যেন বালিকাগণকে নীতিবিদ্যালয়ে আসিবার জন্য উৎসাহ দান করেন; এবং সকলের নিকট বিনীত নিবেদন এই যে তাঁহারা নীতিবিদ্যালয়ের কার্য্যে সহায়তা না করিলেও, ইহার কার্য্যের সঙ্গে যোগ না রাখিলেও যেন তাঁহারা ছোট ছোট বালিকাগণের সম্মুখে ইহার কার্য্যপ্রণালী অথবা ইহার কার্য্যে অক্ষমতা লইয়া আলোচনাদি না করেন।

নিম্নলিখিত কয়েকটী মহিলা বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ অর্থ সাহায্য করিয়া ইহাকে জীবিত রাখিয়াছেন;—প্রথম বৎসরে আরও দুই এক জন মহিলা অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন।

আমাদের স্নেহের ভগ্নী স্বর্গগতা সাধ্বী "প্রিয়তমার" নামে তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত বাবু শরৎকুমার লাহিড়ী মহাশয় দুইটী পাঁচ টাকা করিয়া পুরস্কার প্রদান করিয়াছেন। প্রথম শ্রেণীর দুই বিভাগের দুইটী বালিকা রচনার জন্য এই দুইটী পুরস্কার লাভ করিয়াছেন।

দাতাগণ নীতিবিদ্যালয়ের গভীর
কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন।

বৎসরের কার্য্যে যাহা কিছু শৈথিল্য হইয়াছে, উচ্চ আদর্শকে যতটুকু খর্ব্ব করা হইয়াছে, সকল ত্রুটির জন্য ভগবানের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া আমরা যেন আবার নূতন আশা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করি। বিশ্বাস ও ভালবাসার সহিত কার্য্য করিলে জননী আমাদের সেবা গ্রহণ করিয়া কৃতার্থ করিবেন।

গত বৎসরে দানপ্রাপ্ত (১৯০৯ ফেব্রুয়ারী হইতে ১৯১০ জানুয়ারী পর্য্যন্ত)।

মহারাণী শ্রীমতী সুচারু দেবী,	২৪৲
শ্রীমতী স্নেহলতা দত্ত	২৪৲
" কিরণময়ী সেন	১১৲

শ্রীমতী সুষমা সেন,	৯৲
„ সরলা সেন,	৭৲
„ কৃষ্ণভাবিনী সেন,	২॥০
„ শকুন্তলা সেন,	১৫৲
	———
ব্যয়।	৯২॥০
গত বৎসরের গাড়ীভাড়া	৬৮৲
পুরস্কার বিতরণের পুস্তক ও দ্রব্যাদি ক্রয়	২০৲
১৯০৯ জানুয়ারী মাসের গাড়ীভাড়া	৪॥০
	———
	৯২॥০

"ভগ্নী-সমিতি"র প্রথম বার্ষিক কার্য্য-বিবরণী।

(খ্রীঃ ১৯১০, ১৬ই ফেব্রুয়ারিতে আহুত বার্ষিক সাধারণ সভায় গৃহীত)।

মঙ্গলময় পরমেশ্বরের কৃপায় আজ এই ক্ষুদ্র সমিতির এক বৎসর পূর্ণ হইল। গত বৎসর (১৯০৯) ১৬ই ফেব্রুয়ারি এই গৃহে ইহার প্রথম অধিবেশন হয়! সেই অধিবেশনে ইহার নাম "ভগ্নীসমিতি" রাখা হয় এবং ইহাও স্থিরীকৃত হয় যে—

জাতি ও চরিত্র নির্ব্বিশেষে নারী, শিশু ও বালক বলিকাগণের যথাসম্ভব অভাবমোচন করাই ইহার উদ্দেশ্য এবং অন্নদান, বস্ত্রদান, বিদ্যাদান, চিকিৎসা, সেবা ও অর্থদান প্রভৃতি উপায় দ্বারা এই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে।

সেই সভায়, সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা সৌদামিনী মজুমদার মহাশয়া সভাপতি, শ্রীমতী হেমকুসুম মল্লিক সম্পাদিকা এবং কুমারী চারুবালা নিয়োগী সহকারী সম্পাদিকা মনোনীত হন এবং নিম্নলিখিত নিয়মাবলী গৃহীত হয়।

নিয়মাবলী।

১ম। প্রতি মাসের প্রথম মঙ্গলবারে সমিতির অধিবেশন হইবে।

২য়। মাসিক অধিবেশনের সংবাদ সম্পাদিকা প্রত্যেক সভ্যাকে সময়মত জানাইবেন।

৩য়। যদি কোন সভ্য সম্পাদিকাকে বিশেষ সভা আহ্বান করিতে অনুরোধ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব বিশেষ সভা আহ্বান করিতে হইবে।

৪র্থ। অন্ততঃ ৫ জন সভ্য উপস্থিত না থাকিলে সভার কার্য্য চলিতে পারিবে না।

৫ম। কোন নূতন নিয়ম বিধিবদ্ধ কিম্বা পুরাতন নিয়ম পরিবর্ত্তন করিতে হইলে উপস্থিত সভ্যাগণের দুই তৃতীয়াংশের সম্মতি না হইলে তাহা হইতে পারিবে না।

৬ষ্ঠ। মাসিক অধিবেশনে সভার বিশেষ উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রয়োজনমত আলোচনার পর সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষতঃ নারীজাতির উন্নতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনাদি হইতে পারিবে।

৭ম। যে কোন সভ্য ইচ্ছা করিলে সমিতির মাসিক অধিবেশনে কোন নূতন সভ্যের নাম প্রস্তাব করিতে পারিবেন এবং যদি সে প্রস্তাবে কাহারও আপত্তি না থাকে তবে সেই দিন হইতেই প্রস্তাবিত মহিলা সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইবেন।

৮ম। প্রত্যেক সভ্যাকে যথাসাধ্য

মাসিক চাঁদা দিতে হইবে এবং এই চাঁদা প্রত্যেক মাসিক অধিবেশনের দিন সম্পাদিকার নিকট দিবেন কিম্বা পাঠাইয়া দিবেন।

৯ম। বিশেষ আবশ্যক হইলে সমিতির সম্মতি গ্রহণ না করিয়াও সম্পাদিকা ৫৲ পর্য্যন্ত ব্যয় করিতে পারিবেন কিন্তু পরবর্ত্তী অধিবেশনে এ সম্বন্ধে সমিতির সম্মতি গ্রহণ করিতে হইবে।

বলা বাহুল্য, প্রথমাবস্থায় যত অল্পসংখ্যক নিয়মাবলী প্রয়োজন, তাহাই বিধিবদ্ধ হইয়াছে এবং শীঘ্রই ইহাদের সংশোধন ও পরিবর্ত্তন প্রয়োজন হইবে।

এ বৎসর সমিতির ৯টি অধিবেশন হইয়াছে। মে, জুন অক্টোবর, নবেম্বর মাসে কোন অধিবেশন হয় নাই।

এই বৎসরে (জানুয়ারি, ১৯১০ পর্য্যন্ত) মোটের উপর সমিতির আয় ৮০৸৶, ব্যয় ৬৯।১০ হস্তে স্থিত ১০॥/১০।

এক্ষণে সমিতির সভ্যসংখ্যা ৩১ জন। মাসিক আয় ১৩৷৵০, মাসিক ব্যয় ১১৲।

এই বৎসরে পাঁচটি স্ত্রীলোককে মাসিক ।০ করিয়া ও একটি স্ত্রীলোককে মাসিক ॥০ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের জন্য নিকটেই যে একটি নৈশ বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে তাহাতে মাসিক ২৲ টাকা করিয়া চাঁদা দেওয়া হইতেছে। একটি ছাত্রকে কলেজে জমা দিবার জন্য ৫৲ ও আর একটিকে পরীক্ষার টাকা জমা দিবার জন্য ১৲ টাকা সাহায্য করা হইয়াছে। এতদ্ব্যতীত কয়েক মাস হইতে ৪টি বালককে মাসিক ১৲ টাকা হিসাবে সাহায্য করা হইতেছে। ইহাদের মধ্যে দুইজন কলেজের একজন মেডিকেল স্কুলের ও আর একজন আর্ট স্কুলের ছাত্র।

ভিক্টোরিয়া বিদ্যালয়েই সমিতির অধিবেশন হইতেছে। বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষগণ এখানে সমিতির অধিবেশনের অনুমতি দিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। কোন মুদ্রাযন্ত্রের অধ্যক্ষ মহাশয় অনুগ্রহ করিয়া বিবরণী ইত্যাদি মুদ্রাঙ্কণের ব্যয়ভার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে বড়ই উপকৃত করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

সমিতির কার্য্যক্ষেত্র যেরূপ বিস্তৃত এবং উদ্দেশ্য যেরূপ মহৎ তাহাতে ইহার সামান্য কার্য্য ও ক্ষুদ্র অস্তিত্ব উল্লেখযোগ্য বলিয়াই মনে হয় না। তথাপি আমাদের আশা ইহা মহিলামাত্রেরই সহানুভূতি ও আনুকূল্য লাভ করিবে এবং তাহা হইলেই ভবিষ্যতে ইহাদ্বারা অনেক কার্য্য হইতে পারিবে। এই বিশ্বাসেই আমরা সাহস করিয়া ইহাকে সাধারণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে ও মহামান্যবরা মহারাণী প্রমুখ আপানাদের নিকট ইহার সামান্য কার্য্যবিবরণী পাঠকরিতে সাহসী হইয়াছি।

গাইকওয়াড় রাজকুমারী ইন্দিরা দেবী।*

ভারতবর্ষে স্ত্রীশিক্ষার ইতিহাসে গাই-

* মিঃ জি, এস্ সর্দেশাই লিখিত ইংরাজী প্রবন্ধ হইতে অনুদিত।

কওয়াড় রাজকুমারী ইন্দিরা দেবীর বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলিতে হইবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্বন্ধে ভারতীয় রাজ-কন্যাগণেরমধ্যে কুমারী ইন্দিরাই প্রথম দৃষ্টান্ত দেখাইলেন। সংক্ষেপে ইঁহার জীবনবৃত্তান্ত দেওয়া যাইতেছে, আশা করি তোমরা সকলেই আনন্দের সহিত পাঠ করিবে।

রাজকুমারী ইন্দিরা বরোদার মহা-রাজা গাইকওয়াড়ের একমাত্র কন্যা। ১৮৯২ খ্রীঃ অব্দে ফেব্রুয়ারি মাসে ইনি জন্মগ্রহণ করেন. ছয় বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই ইঁহার বিদ্যা শিক্ষা আরম্ভ হয় এবং ৫ বৎসরের পরিশ্রমের পর তাঁহার মাতৃভাষায় অর্থাৎ মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তৎপরে মাতৃ-ভাষার সহিত ইংরাজি ভাষাও শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। রাজপ্রাসাদেই রাজার পুত্র কন্যাদের জন্য একটী স্কুল বিদ্যালয় আছে। আরও ৫ বৎসরের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম পরীক্ষার জন্য যাহা যাহা দরকার তাহা শিখিয়াছিলেন এবং গত ডিসেম্বর মাসে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এখন তিনি উচ্চ শিক্ষা পাইবার জন্য কলেজে পড়িতেছেন।

আধুনিক ইউরোপীয় শিক্ষাপ্রণালী পূর্ব্বকালের ভারতবর্ষে প্রচলিত রাজকুমা-রীদিগের শিক্ষাপ্রণালীর সহিত সুন্দররূপে সংযুক্ত করিয়া ইঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হই-য়াছে। পূর্ব্বকালের ইতিহাসে আমরা জানিতে পারি যে সে সময়ে বালিকা-দিগকে, বিশেষতঃ রাজকন্যাদিগকে, সঙ্গীত, চিত্রকলা, সংসার পরিচালন ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সমস্তই শিক্ষা করিতে হইত। রাজকুমারী ইন্দিরার শিক্ষাও এই প্রকারেই চালিত করা হইয়াছে, সঙ্গীত ইত্যাদি সমস্তই সুন্দররূপে শিক্ষা করিয়া-ছেন, এবং এই সমস্ত কলাবিদ্যায় তাঁহার সুন্দর জ্ঞান জন্মিয়াছে। তিনি ইতিহাস ও সংস্কৃত পড়িতেও খুব ভালবাসেন। এই সমস্ত শিক্ষার সহিত তিনি অশ্বারোহণ, শীকার ইত্যাদিতেও খুব পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, এবং এসকলে অত্যন্ত আন-ন্দানুভব করেন। বস্তুতঃ এই অল্পবয়সেই তিনি পুরাকালের ভারতবর্ষের নারীদিগের শিক্ষা ও আধুনিক সময়ে ইউরোপীয় রাজ-পরিবারের শিক্ষা দুইই লাভ করিয়াছেন।

কিন্তু তোমরা মনে করিও না যে ইঁহার শিক্ষা কেবল পুস্তকগত হইয়াছে। ইনি ইতিমধ্যেই পৃথিবীর নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং এই ভ্রমণে বহুদর্শিতা লাভ করিয়া যথেষ্ট জ্ঞানোপার্জ্জন করিয়া-ছেন। বিদেশ ভ্রমণের উপকারিতা সমস্তই ইনি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইনি দুই-বার ইংলণ্ড, ফ্রান্স এবং অন্যান্য ইউরো-পীয় দেশ ঘুরিয়া আসিয়াছেন। দ্বিতীয় বার ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে যখন ইনি ইঁহার পিতা মহারাজ গাইকোয়াড়ের সহিত ইংলণ্ডে গমন করেন তখন কিছুদিনের জন্য ইষ্টবোরন্ নামক স্থানে একটী বালিকা বিদ্যা-লয়ে থাকিয়া কিছুদিন শিক্ষা লাভ করেন। ঐ সময়ে ইংলণ্ডের ভদ্রপরিবা-

রের বালিকাদিগের সহিত মিশিয়া সেখানকার আচার ব্যবহার বিষয়ে ও বালিকাশিক্ষা বিষয়ে অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেন। শুধু বিদেশ ভ্রমণ নয়, তিনি ভারতবর্ষেরও কাশ্মীর হইতে আরম্ভ করিয়া মাদ্রাজ পর্য্যন্ত সমস্ত প্রধান প্রধান স্থান ও নগর দর্শন করিয়াছেন।

তাঁহার শিক্ষা কেবল একটী বাহিরে চাকচিক্য নহে, যাহাতে তাঁহার স্বভাব-চরিত্র দৃঢ়ভাবে গঠিত হয় সেই ভাবেই তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। রাজকন্যার উপযুক্ত সসম্ভ্রম ব্যবহারের সহিত তাঁহার মধ্যে একটী চরিত্রের সরলতা, আমায়িকভাব এবং কোমল প্রকৃতি আছে, এবং এই জন্য তাঁহার স্বাভাবিক সুন্দর আকৃতি আরও সুন্দর দেখায়। যখনই কোন সুযোগ উপস্থিত হয় তখনই তিনি অন্যান্য সাধারণ বালিকাদিগের সহিত যোগদান করেন এবং তাহাদিগের সহিত প্রীতিপূর্ণ কোমল ব্যবহার দ্বারা সন্তুষ্ট করেন। দরিদ্রদিগের প্রতিও তাঁহার যথেষ্ট দয়া আছে, এবং সর্ব্বদাই তাহাদের দুঃখ দূর করিতে চেষ্টা করেন।

অবশ্য এই সকল গুণ থাকিলেই যে সকলে প্রশংসার্হ হয় তাহা নহে, কিন্তু সকল অবস্থা ও সুযোগ অনুসারে কর্ত্তব্য সম্পাদন দ্বারাই প্রশংসা ও নিন্দা ভাজন হইয়া থাকে; এবং যখন কেহ এই কর্ত্তব্যসম্পাদনে সমর্থ হয় তখনই সে প্রশংসাভাজন হয়। রাজকুমারী ইন্দিরা এ পর্য্যন্ত তাঁহার কর্ত্তব্য সাধন করিয়াছেন এবং তিনি যে উচ্চ রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন সে বংশের তিনি একটী রত্ন হইতে চেষ্টা করিয়াছেন, এবং এ বিষয়ে সন্দেহ নাই যে ক্রমে এদেশের সকলেই তাঁহাকে আনন্দে সম্মান প্রদান করিবে।

রাজকুমারীর পিতা মহারাজা গাইকোয়াড় স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতির অত্যন্ত পক্ষপাতী। তিনি নিজের মত নিজের পরিবারে প্রচলিত করিয়া কার্য্যদ্বারা মতের সমর্থন করিয়াছেন। এই কারণেই রাজকুমারী ইন্দিরা এখনও অবিবাহিতা। রাজকুমারীর মাতা মহারাণী চিম্নাবাইও একজন অসাধারণ স্ত্রীলোক। তাঁহার শারীরিক আকৃতির গঠন অতীব সুন্দর। আরবী ভাষা, ইংরাজী ভাষা, ইতিহাস, অর্থনীতি, রাজনীতি, এ সকল বিদ্যাই তিনি বিশেষ ভাবে অর্জ্জন করিয়াছেন। বহুকার্য্যের ব্যস্ততার ভিতরেও তিনি প্রতিদিন নিয়মিতরূপে কয়েক ঘণ্টা পাঠাভ্যাসে অতিবাহিত করেন। তদুপরি তিনি সঙ্গীতপটু ও শীকারেও দক্ষহস্ত। রাজকুমারী ইন্দিরা এইরূপ পিতামাতার উপযুক্ত সন্তানই হইয়াছেন। আমরা আশা করি যে তাঁহার শিক্ষার জন্য তাঁহার পিতার এই বহুল যত্ন ও চেষ্টা সফল হইবে, ও তিনি বিবাহিতা হইয়াও তাঁহার দেশের কার্য্যে নিজেকে অধিকতররূপে দান করিয়া দেশকে উপকৃত করিবেন।

"প্রকৃতি"

দাস দাসী।

পিতামাতা পুত্রকন্যার ন্যায় দাস দাসী লইয়াও এক একটী পরিবার গঠিত। দাস দাসীদের সেবা ও সাহায্য বিনা

আমাদের চলে না, তাহারা আপনাদের পরিবারবর্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া বিদেশে আসিয়া আমাদের পরিবারের মধ্যে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছে। প্রিয়জনের স্নেহ ভালবাসা যত্ন ছাড়িয়া আসিয়া অপরিচিত অজ্ঞাত পরিবারের মধ্যে আসিয়া বাস করিয়া, তাহাদের সেবায় জীবন অতিবাহিত করিতেছে। তাহারা যাহা হইতে বঞ্চিত হইয়া এখানে আসে, আমরা কি সেই ক্ষতি পূরণ করিতে পারিতেছি? হায়! প্রিয়জনের স্নেহ ছাড়িয়া আসিয়া আমাদের নিকট কত নির্দ্দয় ব্যবহার, অত্যাচার অবিচার, অযত্ন অনাদর অবজ্ঞা ঘৃণা ভোগ করিতেছে। তাহারা অশিক্ষিত নিম্নশ্রেণীর লোক বলিয়া তাহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিয়া থাকি।

দাস দাসীদের সহিত ব্যবহারের বিষয় আমাদের আমূল সংস্কার করা দরকার। বিংশ শতাব্দীর বিশেষত্ব এই যে এই সময়ে প্রত্যেক বিষয়কে নূতন ভাবে পরীক্ষা করা হইতেছে। পৃথিবীর সকল সভ্যজাতির কার্য্যপ্রণালী দেখিয়া ও স্বদেশীয় বিদেশীয় বহু চিন্তাশীল বহুদর্শী ব্যক্তিদের জ্ঞান অভিজ্ঞতা পাঠ করিয়া আলোচনা করিয়া ও আপনার অন্তরের আলোকে সকল বিষয় পরীক্ষা করিতে হইবে। বহুসংগ্রাম বহু যত্ন ও পরিশ্রমের পর অল্পদিন হইল, সভ্যজাতির মধ্যে দাস ব্যবসায় রহিত হইয়াছে। কিন্তু দাস দাসীদের প্রতি ব্যবহার ও কর্ত্তব্য বিষয়ে কোন সংস্কার সংশোধন হয় নাই, সে বিষয়ে সকলের দৃষ্টি পড়ে নাই। যে পর্য্যন্ত না কোনও পাপ, কুপ্রথা অতিশয় ভীষণ আকার গ্রহণ না করে ততদিন আমাদের দৃষ্টি সে দিকে পড়ে না, তাহার সংস্কার সাধনে তৎপর হই না। কিন্তু দাসদাসীদের প্রতি কর্ত্তব্যের শিথিলতা, ব্যবহারে ঔদাসীন্য আমাদের সমাজের অন্তরে অন্তরে থাকিয়া তাহার মহা অনিষ্ট সাধন করিতেছে। আমাদের অনেক সুচেষ্টা, সুসংকল্প, মহৎ আদর্শকে বিফল করিতেছে, ব্যর্থ করিতেছে, আমরা সামাজিক উন্নতি বিষয়ে আশানুরূপ ফল পাইতেছি না। কারণ দাসদাসীগণ আমাদের সমাজের আমাদের পারিবারিক জীবনের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত। তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য করা হয় নাই বলিয়া অনেক সময়ে আমাদের জীবনে পরিবারে শান্তি শুদ্ধতা থাকে না। সচরাচর ভৃত্যদের সহিত যেরূপ ব্যবহার করা হয়, সে সকল পুরাতন অভ্যাস নিয়ম ভুলিয়া গিয়া, মন হইতে একেবারে পূর্ব্ব সংস্কার সমস্ত দূর করিয়া দিয়া, সহজ জ্ঞানে, পরিষ্কার দৃষ্টিতে এ বিষয় ভাবিয়া দেখিতে হইবে। আমাদের মন নানা পূর্ব্ব সংস্কারাবদ্ধ, মোহে মুগ্ধ অভ্যাসের দাস নূতন করিয়া ভাবিতে চায় না। সহজ জ্ঞানের প্রথম কথা হইল আমরাও মানুষ, তাহারাও মানুষ, আমাদের ন্যায় তাহাদেরও সুখ দুঃখ বোধ আছে আমাদের ন্যায় তাহাদের আত্মাও চির উন্নতিশীল। তাহারাও আমাদের সহিত স্বর্গমর্ত্ত্যের সকল সম্পদে তুল্য অধিকারী। কিন্তু আমরা দাসদাসীদের সহিত, মানুষের মত ব্যবহার করি না, যাহারা আমাদের সম-

অধিকারী বা সহঅধিকারী, তাহাদের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করা উচিত তাহা করি না। তাহাদের অসুবিধা ক্লেশ দেখি না আপনার, স্বার্থ ও সুবিধা দেখি। সরল শিশুরা যাহারা পৃথিবীর কুটীল রীতিনীতি শেখে নাই, তাহারা আমাদের আচরণ দেখিয়া অবাক হয় পরে ক্রমশঃ সব শিখিতে আরম্ভ করে। একবার কোনও পরিবারে একটী পরিচারিকাকে কোনও অন্যায় ব্যবহারের জন্য কর্ম্মচ্যুত করা হয়, এবং তৎপরিবর্ত্তে আর এক জনকে নিযুক্ত করা হয়, সেই পরিবারস্থ একটী শিশু, একদিন কোনও একটী অন্যায় কর্ম্ম করিবার পরে বলিল, "তোমরা কি আমাকে ছাড়িয়ে দিয়ে আর একজন ছেলে নিয়ে আসবে?" সে দেখিল যে সামান্য একটী অপরাধের জন্য দাসীকে ছাড়াইয়া দেওয়া হইল, তাহাকেও বুঝি ছাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাই বলি, মানুষের প্রতি মানুষের যে ব্যবহার তাহা করা হয় না। সে শিশু সংসারের আচার শেখে নাই, সে সেই ভৃত্যকে ও আপনাকে সমান ভাবিয়াছিল। একটু ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারি যে এই প্রকারে "লোকে করে" "ইহা না করিলে উপায় নাই" ইত্যাদি অসার বাক্যে মনকে বুঝাইয়া দি; যাহা সরল সোজা স্বাভাবিক, তাহা আমাদের নিকট ভয়ানক কঠিন, দুঃসাধ্য অসম্ভব অস্বাভাবিক হইয়াছে। তাই মনে হয় সকল সীমা, শৃঙ্খল কাটিয়া সহজে অনুভূত সরল মুক্তপথে চলিতে হইবে।

সর্ব্বপ্রথমে এই প্রথম ও প্রধান কথাটি শিখিতে হইবে, "লোকের নিকট হইতে যেরূপ ব্যবহার প্রত্যাশা কর লোকের প্রতি সেরূপ ব্যবহার কর ও যাহা লোকের নিকট হইতে পাইতে ইচ্ছা কর না, সেরূপ ব্যবহার লোকের সঙ্গে করিও না।" আমাদের সকল ব্যবহার কাজ যদি ইহার অনুমোদিত হয়, তবেই ঠিক পথে চলিতে পারি।

ভৃত্যের কোনও অপরাধের জন্য কে অধিক দায়ী ভৃত্য না প্রভু? পাঠিকাগণ, আপনারা কাহাকে অধিক অপরাধী মনে করেন। প্রভুর অপরাধ কি বেশী নয়? প্রভু কি ভৃত্য অপেক্ষা অধিক, জ্ঞানী শিক্ষিত নন? যার জ্ঞান শিক্ষা অধিক তার দায়িত্ব তত অধিক, পাপও সেই পরিমাণে নির্দ্ধারিত হয়। ভৃত্য যদি পাপাচরণ করে তজ্জন্য কি ভগবান্ প্রভুকে দণ্ড দিবেন না? ভগবান্ যেমন পুত্রকন্যার ভার পিতামাতার উপরদিয়া তাহাদের হিতাহিতের জন্য দায়ী করেন সেইরূপ ভৃত্যের হিতাহিতের জন্য প্রভুকে দায়ী করেন। ভৃত্যের সুস্থতা, আরাম, শিক্ষা ও আনন্দ যাহাতে বৃদ্ধি হয় যাহাতে সে পাপ প্রলোভন হইতে সুপথে, সুসঙ্গে বাস করিতে পারে, ইত্যাদি সকল ব্যবস্থা করিতে হইবে। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেনের নবসংহিতায় দাসদাসী বিষয়ক প্রবন্ধে, তাহাদের প্রতি কর্ত্তব্য বিষয়ে নানা উপদেশ ও ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাকে সামান্য বিষয় বলিয়া আর অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। আমরা প্রতিদিন বিনা বিচারে কত কি করিয়া যাইতেছি, কিন্তু ইহা

অতি গুরুতর বিষয়। আশা করি আপনারা সকলে পুনরায় সংহিতা হইতে এ বিষয়টী পাঠ করিবেন, ও এ বিষয়ে নূতনরূপে গভীর ভাবে অনুভব করিবেন। আমাদের এ বিষয়ে নূতন লোকের সহিত নূতন মন লইয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া দরকার। আমেরিকার একটী মহিলার রচিত টম-কাকার কুটীর নামক পুস্তকে যে পুস্তকের দ্বারা দাসব্যবসায় রহিত হইল সেই পুস্তকে সেলবির গৃহে টম ইলাইজা প্রভৃতি দাস-দাসীগণ অত্যন্ত সুখে বাস করিত। প্রভু প্রভুপত্নী তাহাদের পিতা মাতার ন্যায় ছিলেন। তাহারা সকলে পুস্তকাদি পাঠ করিতে পারিত তাহাদের অবসর সময় দেওয়া হইত যে সময় তাহারা ইচ্ছামত পাঠে সঙ্গীতে বন্ধুগৃহে বা উপাসনালয়ে গমন করিয়া কাটাইত। তাহাদের জন্য সকল সুখ সুবিধার ব্যবস্থা ছিল তাহাদের সকল সংবাদ লওয়া হইত। সেলবীরপত্নী পুত্র কন্যা দাসদাসী লইয়া একটী আদর্শ সুখী পরিবার গঠন করিয়াছিলেন, তাহাদের সুখ সুবিধা আমোদ আহ্লাদ শিক্ষা ধর্ম্ম-নীতি সকল বিষয় তত্ত্বাবধান করিতেন। পিতা মাতার ন্যায় তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্ব প্রকারের সুখ বিধান করিতে হইবে। আমরা তাহাদের বিষয়ে উদাসীন, যতদিন আমাদের গৃহে বাস করিল, সেবা করিল, ততদিন সম্পর্ক, সে কে, কিরকম লোক, তাহার সুখ দুঃখ বা অবস্থা বিষয়ে কোন সংবাদ করি না, কেবল তাহার ত্রুটী অপরাধ দেখিতে পাইলে ভয়ানক তিরস্কার করি শাসন করি আমরা কি তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া তাহার দোষ সংশোধনের জন্য তিরস্কার করি? না তাহা নয়। কেবল, সে আমার কোনও ক্ষতি বা অসুবিধা করিলে তাহার জন্য তিরস্কার করি। আমরা কেবল চাই ও তাহা মুখেও বলিয়া থাকি, সে আমার কোন ক্ষতি অসুবিধা না করি-লেই হইল, সে নিজে কি অবস্থায় আছে, কি করছে তা দিয়ে আমার দরকার কি?

আচার্য্যের "মাঘোৎসব" নামক পুস্তকে উৎসবের জন্য প্রস্তুত হইতে উৎসবের পূর্ব্বে সকলের উপকার স্মরণ করিয়া, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। তাহা-দের মধ্যে ভৃত্যেরাও একটী উচ্চ স্থান। তিনি ভৃত্যের মূল্য ও মহত্ত্ব জানিতেন, তাই এত সম্মান করিয়া গেলেন। ভৃত্য হওয়া সহজ ব্যাপার নয় প্রভু হওয়া সহজ কিন্তু বহু সাধনার ফলে ভৃত্য হওয়া যায়। অনেক দীনতা বিনয় সেবায় ভূষিত হইলে ভৃত্য নাম পাওয়া যায়। পাঠিকাগণ ভাবিয়া দেখুন, এক এক বার কি অবাক হইতে হয় না কেন ইহারা আমাদের এত সেবা করছে, আমাদের সকল প্রস্তুত করিয়া দিতেছে, আমাদের হইয়া আমা-দের সকল কাজ করিয়া দিতেছে। আর আমরা কি করিতেছি সর্ব্বদাই নিপুণতার সহিত দোষ ত্রুটী বাহির করিতেছি। আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে এত উপকা-রের জন্য কৃতজ্ঞ হইতে পারিলাম না। অকৃতজ্ঞ মানুষ সকলের অধম এ বিষয়ে আমরা সেই অধম। এত সেবা যত্ন পাইয়া ভুলিয়া গেলাম তাহার যে সামান্য

দোষ ত্রুটী তাহা লইয়া বিচারে প্রবৃত্ত হইলাম। অন্য কেহ আমাদের কোন উপকার করিলে আমরা তাহার কাছে কত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করি। কিন্তু দিবানিশি যাহারা আমাদের সেবায় সকল শক্তি ব্যয় করিল তাহাদের কাছে কৃতজ্ঞ হইতে পারিলাম না। কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে লজ্জা বোধ হইল। তাহাদের বেতন দাও তাহাতেই কি সকল ঋণ পরিশোধ হইল। তাহাদের হৃদয় আমাদের নিষ্ঠুর ব্যবহারে ভাঙ্গিয়া গেল। তাহারা বলে, শরীর নষ্ট করিয়া এত যে করিলাম তাহার কথা একবারও বল না, যাহা কিছু অন্যায় অপকর্ম্ম করিয়াছ, তাহাই শুধু বল। আমরা আমাদের কঠোর ব্যবহারে অবিশ্বাসে সন্দেহে ঘৃণায় তাহাদের মনে, কঠোরতা মিথ্যা কপটতা স্বার্থপরতা জাগাইয়া দিলাম। তাহাদের মন্দ হইতে আমরা কি সাহায্য করিলাম? ভগ্নিগণ ভাবিয়া দেখুন, একথা সত্য কি না? আমরা কি ভয়ানক অপরাধে অপরাধী নই?

আজকাল আমাদের দেশেও পতিত উপেক্ষিত জাতির উন্নতির জন্য সকলে ভাবিতেছেন, তাহাদের শিক্ষার জন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল পরিশ্রম করিতেছেন, এখনও দেশব্যাপী পাপ অজ্ঞানতার অন্ধকার রহিয়াছে। বহুসংখ্যক উৎসাহী যুবাকে আমাদের ভৃত্য নামক সেবক মণ্ডলীর সেবা করিতে হইবে। তাহাদের ইচ্ছা, রুচি, গৃহ পরিচ্ছদ আচার ব্যবহার উন্নত করিতে হইবে।

আমরা আজকাল, সকলেই স্বদেশজাত বস্ত্র ও দ্রব্য সকল ব্যবহার করি ও আমাদের ভৃত্যদিগকে অধিক মূল্যে স্বদেশজাত বস্ত্র ক্রয় করিতে বলি, কিন্তু তাহারা গ্রহণ করে না। কেন তাহারা আমাদের এই অনুরোধ রক্ষা করিবে? আমরা কি কোনও দিন, তাহাদের শিক্ষা উন্নতির জন্য কিছু করিয়াছি? আজ কেন তাহারা আমাদের হিতোপদেশ গ্রহণ করিবে? তাহারাত আমাদিগকে শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ভাবে না, কিন্তু জানে আমরা তাহাদিগকে পদদলিত করিয়া রাখিতে চাই, উন্নত, জাগ্রত হইতে দি না। যদিও কদাচিৎ কোনও বিষয়ে সতর্ক সাবধান করিয়া দি তাহারা তাহা গ্রহণ করে না, তাহার কারণ আমাদিগকে বিশ্বাস করে না। যদি তাহারা বিশ্বাস করিত, আমরা তাহাদের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল চাই তাহারা কখনই অবিশ্বাস করিত না। অনেকেই আক্ষেপ করেন এখন ভৃত্যেরা স্থায়ী হয় না, বিশ্বাসী হয় না তেমন দয়ামায়া থাকে না। পূর্ব্বে এক একজন পুরাতন ভৃত্য পরম উপকারী বন্ধু, আত্মীয়স্বজনের ন্যায় স্নেহশীল ও পরম বিশ্বাসী হইত। এ রকম অনেক ভৃত্যরত্নের বৃত্তান্ত, আমাদের পিতামাতার মুখে শুনিতে পাই। ইহার অপরদিক দেখা দরকার। সে সময়ের প্রভুগণই বা কেমন ছিলেন। ভৃত্যেরা প্রভু প্রভুপত্নী ও তাঁহাদের পুত্রকন্যাগণের নিকট হইতে কত স্নেহ যত্ন সম্মান ভালবাসা ক্ষমা পাইত। ভৃত্যকে ক্ষমা করা ও তাহাকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করা আবশ্যক।

ক্ষমা না করিলে কাহারও সঙ্গে বাস করা সম্ভব নয়, পিতামাতা ভাই বোনে সকলে ক্ষমা করেন তাইত পরিবারে সুখ শান্তি। একত্রে বাস করার পক্ষে পরস্পরকে বিশ্বাস করাও একটী অত্যাবশ্যকীয় গুণ। পুত্র কন্যা পিতামাতাকে পিতামাতা পুত্র কন্যাকে বিশ্বাস করেন, অর্থাৎ জানেন, আমার অহিত করিবেন না। যেখানে এই বিশ্বাস না থাকে সেখানে ঘোর অশান্তি অসুখ। কিন্তু ভৃত্যদের সামান্য দোষ ক্রুটীও ক্ষমা করিতে পারি না। তাহারা কি অধিক ক্ষমার পাত্র নয়? কারণ তাহাদের জ্ঞান বিবেচনা কম। আর একটী কথা ভাবিয়া দেখা উচিত, অধিকাংশ লোকেই আপনার সুখ্যাতি শুনিতে ভালবাসে। যদিও এমনও অনেক লোক আছেন, আপনার সুখ্যাতি শুনিতে চান না, কিন্তু অতি অল্প লোকেই আপনার নিন্দা প্রশান্ত মনে শুনিতে পারেন, লোকে দোষ দেখাইয়া দিলে ভালভাবে গ্রহণ করিয়া আপনাকে সংশোধন করিতে চেষ্টা করেন। দোষ প্রদর্শন করিলে যে লোককে সংশোধন করা যায় না, তাহা আমরা প্রতিদিন দেখিতেছি। গুণের উল্লেখ করিয়া, উৎসাহ আশা দিয়া, ক্রমশঃ সংশোধন করিতে হয়। অল্প কথায় ক্রোধ শূন্য হয়ে দোষ দেখাইয়া দিতে হইবে, যাহাতে সে স্থিরভাবে আপনার দোষটী বুঝিতে পারে। অধিক তিরস্কার করিলে, দোষী আপনার দোষটা বুঝিতে পারে না, যে তিরস্কার করে তাহার উপর ক্রুদ্ধ হয়। আমরা যে অনেক সময় বলে থাকি, দোষ করছে, আবার উল্টে রাগ, তার কারণ এই।

সাধনপথের পরীক্ষা।

(পন্থা হইতে উদ্ধৃত)

বিস্তীর্ণ উপবন। সন্ধ্যা-সমাগমে ভগবান্ মরীচিমালী পশ্চিমগগনে ডুবু ডুবু হইয়াছেন। তিমির রাশি আস্তে আস্তে সেই বনরাজির বৃক্ষলতায় প্রবেশ লাভ করিতেছে। বিচিত্রবর্ণের বিহগকুলের কূজন থামিয়া আসিতেছে। কোকিলের কুহুধ্বনি এবং বুলবুলের মধুর তান আর শ্রুতিগোচর হইতেছে না। বিজন বন গভীর নিস্তব্ধভাব ধারণ করিয়াছে। কোন কোন পাখী স্বীয় সঙ্গিনীর আগমন প্রতীক্ষায় কাতরকণ্ঠে কুলায়ে বসিয়া অস্ফুটধ্বনিতে মাঝে মাঝে সেই নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিতেছিল।

সেই তাল-তমাল-সুশোভিত মনোহর বনরাজির সানুদেশে বহুদূরব্যাপী, অসংখ্য শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত এক প্রকাণ্ড অশ্বথ বৃক্ষ উন্নত মস্তকে অতীতের সাক্ষি-স্বরূপ দণ্ডায়মান আছে; তাহার পাদদেশে পুণ্যপ্রেমের আধার ভগবান্ বুদ্ধদেব যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। ধ্যান-স্তিমিত-লোচন, স্থির পদ্মাসন, জানুপ্রদেশে স্থাপিত হস্তদ্বয়, সমুন্নত শিরোগ্রীবা! মহাযোগীর মহাধ্যাননিমগ্ন শ্রীমূর্ত্তি যেন নির্ব্বাত-নিষ্কম্প প্রশান্ত মহাসাগরবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। সেই বনবীথিকা মাঝে নিস্তব্ধতা এত গভীর ভাব ধারণ করিয়াছে যে, তাহাতে

প্রবেশলাভ করা মাত্র মনে এক অপূর্ব্ব ভক্তি রসের সঞ্চার হয়, কি এক গুহ্য আকস্মিক মঙ্গলের প্রত্যাশায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া যায়। অধিক কি, যদি কোন অবিশ্বাসী নাস্তিকও ঘটনাক্রমে তাহার পার্শ্ব দিয়া গমন করে, তবে তাহার এমন সাধ্য নাই যে, প্রগাঢ় ভক্তিভরে সেই প্রেমাধার মহাযোগীর পদপ্রান্তে প্রণাম না করিয়া স্থির থাকিতে পারে! পবিত্রতা ও মধুরতার জ্বলন্ত অবতার! করুণার অনন্ত আকর! সেই সৌম্য মূর্ত্তি সন্দর্শনে অতি বড় পাষাণ-হৃদয়ও দ্রবীভূত হয়, হিংস্র বন্য পশুগণ যুগপৎ ভয় ও ভক্তিরসে আভভূত হইয়া, তাঁহার পদপ্রান্তে আশ্রয় গ্রহণ করে।

তখন একটী কুরঙ্গী সেই মহাযোগীর পরিচ্ছদের ছায়ায় বসিয়া, তাহার নবজাত শাবককে স্তন্য পান করাইতেছিল। হঠাৎ কি যেন এক আকস্মিক শব্দ শুনিয়া সে চমকিয়া উঠিল। বহু দূরে অস্ফুট মর্ম্মর শব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ক্রমশঃ সেই শব্দ নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিল। প্রথমতঃ অস্পষ্ট মনুষ্যকণ্ঠস্বর, তাহার পর দ্রুত-বিক্ষিপ্ত পদশব্দ কর্ণগোচর হইল, পরিশেষে ক্ষুদ্র একটী সৈন্যদল দৃষ্টিপথে পতিত হইল। বহুমূল্য রত্নরাজিখচিত মনোহর বেশভূষাধারী রূপলাবণ্যময় এক সুন্দর যুবক সেই সৈন্যদলের অগ্রে অগ্রে আসিতেছিলেন।

তাহার সঙ্গীদিগকে অঙ্গুলি সঙ্কেতে নিরস্ত করিয়া, তিনি একা আস্তে আস্তে ভগবান্ বুদ্ধদেবের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। নিকটে আসিয়াই তিনি প্রগাঢ় ভক্তিভরে সেই শ্রীমূর্ত্তির পদপ্রান্তে নিপতিত হইলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে যুবক গাত্রোত্থান করিয়া, অবনতমস্তকে অঞ্জলি বদ্ধ করিয়া অনতিদূরে নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধদেব পূর্ব্ববৎ নীরব নিস্তব্ধ। কিন্তু সেই যুবকের প্রতি তিনি যে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে করুণার আভা স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইল।

যুবক মস্তক উন্নত করিয়া মৃদুভাবে বলিতে লাগিলেন। 'ভগবন্! আমি ভবদীয় শ্রীপাদপদ্মে প্রণাম করিতেছি, অনুকম্পা বিতরণে এই অকিঞ্চনের অভিবাদন গ্রহণ করুন। আমি বহুদূর দেশ হইতে আসিয়াছি। আমি কঞ্চন রাজার পুত্র, আমার নাম জেতা। আমি আমার পিতার রাজসিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী। আমি কৃপা ভিখারী হইয়া আজ ভবদীয় সকাশে উপস্থিত হইয়াছি। ভগবন্! ভবদীয় যশের গৌরবকাহিনী আমার কর্ণগোচর হওয়ার পর হইতে আমি বিশ্রাম-শান্তিসুখে একেবারে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার পিতার অতুল ঐশ্বর্য্যের প্রতি আমি আসক্তিশূন্য হইয়াছি। বন্ধুবর্গের অকৃত্রিম ভালবাসায়, প্রিয়তমা প্রণয়িনীগণের সাদরসম্ভাষণে আমার মনে আর সুখ উপজাত হইতেছে না। আমি উন্নত আধ্যাত্মিক জীবনলাভে অভিলাষী হইয়াছি। কৃপাপূর্ব্বক আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন। আমি আপনার একান্ত ভক্ত, আমাকে নিরাশ করিবেন না।"

এই বলিয়া যুবক ভূমিতে পড়িয়া পুনঃ প্রণাম করিলেন।

ভগবান্ বুদ্ধদেব যুবরাজের প্রতি শান্ত মৃদু দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু একটী কথাও বলিলেন না। তিনি প্রশান্তচিত্তে তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

যুবরাজ পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"ভগবন্! কৃপা পূর্ব্বক আমার প্রশ্নের উত্তর দেওয়া কি সঙ্গত বোধ করিতেছেন না? ভগবন্! আমি কি ভবদীয় শিষ্যরূপে গ্রাহ্য হওয়ার যোগ্য নহি? আমি কি এই গৌরব লাভে বঞ্চিত হইব?

প্রভো! বাল্যকাল হইতে আমি অসৎপথ পরিত্যাগ করিয়া সৎপথে বিচরণ করিয়াছি, যথানিয়মে পুণ্যকার্য্য ও ধর্ম্মালোচনা করিয়াছি, সর্ব্বদাই শাস্ত্রোক্ত বিধিবিধান অনুসরণ করিয়াছি, দেশাচার এবং নীতিধর্ম্ম কখনই লঙ্ঘন করি নাই, সাধ্যানুসারে ধর্ম্মগ্রন্থাদি অধ্যয়ন করিয়াছি। ইহাতেও ভবদীয় কৃপাকর্ষণে অসমর্থ হইলাম? আপনার শিষ্য হওয়ার পক্ষে এই সকল কি প্রচুর নহে? আমি কি আপনার শিষ্য হইতে পারিব না?"

"না," এইমাত্র উত্তর হইল।

"ভগবন্! অবনত মস্তকে আমি আপনার আদেশ পালন করিব। এই মহৎ অধিকার লাভ করিতে হইলে আমাকে কি করিতে হইবে, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক বলিতে আজ্ঞা হউক।"

"অনুসন্ধান কর, তবেই পাইবে।"

"পাইব! কি পাইব?" যুবরাজ উৎকণ্ঠার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন। গৌতম বুদ্ধ এই কথার কোন উত্তর না দেওয়াতে যুবরাজ পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

"তাহাই হউক। আমি অনুসন্ধান করিব। বুঝিলাম, ইহাও এক পরীক্ষা। আপনি কি আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন?"

"হাঁ, বৎস তাহাই।"

"কখন পুনরায় এখানে আসিব?"

"বর্ষা ঋতুর পর সপ্তচন্দ্রের অবসানে পুনরায় এখানে আসিও।"

জেতা মস্তকাবনত করিলেন। আর কথাটীমাত্র ব্যয় না করিয়া, তিনি সাষ্টাঙ্গে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। এই অবস্থায় বহুক্ষণ থাকিয়া, পরে আস্তে আস্তে গাত্রোত্থান করিলেন এবং নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে তথা হইতে প্রস্থান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেই ছোট সৈন্যদলও রজনীর অন্ধকারে মিশিয়া দৃষ্টি শক্তির বাহিরে গেল। তাহাদের পদধ্বনি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া যখন আর শ্রুতিগোচর হইল না, তখন সেই সরল-প্রাণা হরিণী উপাধান স্বরূপ বুদ্ধদেবের জানুর উপর মস্তক রাখিয়া, তাহার শাবকের পার্শ্বে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়িল।

ভগবান্ বুদ্ধদেব পুনরায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

* * * *

বর্ষা ঋতুর পর সপ্তচন্দ্রের (সপ্ত পূর্ণচন্দ্রের) অবসান হইয়াছে। সেই বন-

বীথিকার উপকণ্ঠে, সেই অশ্বত্থতরু-মূলে ভগবান্ বুদ্ধদেব যোগাসনে সমাসীন।

সন্ধ্যা সমাগমে সূর্য্যদেব অস্তমিত হওয়াতে পশ্চিম গগন রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইয়াছে। আসন্ন ঝঞ্ঝাবাতের দূত স্বরূপ বড় বড় কাল মেঘ আকাশের গায়ে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। কষ্টকর উষ্ণবায়ু প্রবাহিত হইতেছে।

সেই বিশাল বনভূমিতে কি এক অভূতপূর্ব্ব বিষাদের ছায়া পতিত হইল। বন্য পশুগণ আশ্রয় লাভের জন্য উৎকণ্ঠিত-চিত্তে দৌড়িয়া আসিয়া সেই মঙ্গলালয় মহাত্মার চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তরুশাখায় পাখীকুল নীড়ে বসিয়া আকুল প্রাণে কলরব করিয়া উঠিল। উপস্থিত বিপদের দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া এক বলিষ্ঠ চিতাবাঘ লেজ নাড়িয়া তাঁহার পদপ্রান্তে পড়িয়া গড়াগড়ি দিয়া খেলা করিতে লাগিল।

আকাশে ঘনঘটা আরম্ভ হইল। গভীর মেঘ গর্জ্জনে বনভূমি প্রকম্পিত হইল। প্রবল বেগে ঝঞ্ঝাবাত বহিতে লাগিল। অশনি-সম্পাতের উচ্চ নিনাদে বনভূমি প্রতিধ্বনিত হইল। তাহাতে কাণ যেন ফাটিয়া যাইতে লাগিল। মুষলধারায় জল পড়াতে বনভূমি প্লাবিত হইল। কিন্তু সেই অশ্বত্থ তরুটী কেবল অক্ষত রহিল। ঝড় তুফান অশনি প্রভৃতি কিছুই সেই বৃক্ষটিকে স্পর্শ মাত্র করিল না। একটীমাত্র জল ফোঁটাও ভগবান্ বুদ্ধদেবের দেহে পতিত হইল না।

ঝঞ্ঝাবাতের তুমুল নিনাদে চারিদিক মুখরিত। পশু পক্ষীর কোলাহল ধ্বনিতে বনভূমি কম্পিত। কিন্তু হইলে কি হয়, স্থিরপ্রতিজ্ঞের গতি কি এই সব নৈসর্গিক উৎপাতে রোধ করিতে পারে? সন্ধ্যা-সমাগমে যুবরাজ জেতা আসিয়া মহাত্মা বুদ্ধদেবের চরণে প্রণাম করিলেন। পরে গাত্রোত্থান করিয়া বলিতে লাগিলেন :—

"ভগবন্! আমি উৎকণ্ঠিত-চিত্তে এত-দিন যে সময়ের প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তাহা এখন উপস্থিত। দিনের পর রাত্রি, রাত্রির পর দিন পুনঃ আসিয়াছে, পুনঃ গিয়াছে। এইরূপ চক্রবৎ দিবারাত্রির পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আমি যে শুভক্ষণের আশায় অধীর ছিলাম, তাহা এখন উপস্থিত হইয়াছে। ভগবন্! আপনি আমাকে যে পরীক্ষায় ফেলিয়াছিলেন, তাহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়াছি বলিয়া আমি মনে করি। আমি এত কাল কঠোর বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক উপবাসাদি দ্বারা সর্ব্ববিধ কৃচ্ছ্রসাধন করিয়াছি। কামিনীকাঞ্চন-স্পৃহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিয়া রাজপ্রাসাদের নিভৃত কক্ষে ধ্যান নিরত থাকিয়া এতকাল সংযম অভ্যাস করিয়াছি। আপনি কি আমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেন না?"

"না!" জলদগম্ভীর স্বরে এই উত্তর হইল।

এই নির্ঘাত উত্তর যুবরাজের অন্তঃকরণে শেলসম বিদ্ধ হইল। তিনি মর্ম্ম যাতনায় কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। পরিধেয় বসনাঞ্চল চক্ষে দিয়া রোদন করিতে লাগিলেন, উষ্ণ অশ্রুপাতে তাঁহার বক্ষঃ ভাসিয়া যাইতে লাগিল। এইরূপ

শোকাভিভূত হইয়া তিনি বহুক্ষণ নীরবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

তৎপরে বাষ্পাকুল-লোচনে, গদ্‌গদ-বচনে মৃদুভাবে তিনি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন।

"মহাত্মন্! অনুকম্পা-পুরঃসর এ দাসে প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর প্রদান করিতে আজ্ঞা হউক। শরণাগত ভৃত্যকে এরূপভাবে প্রত্যাখ্যান করার কারণ কি?

এই প্রশ্নে প্রভুর যোগাসন টলিল। যুবরাজ জেতাকে দেখিয়া সেই যুবা চিতাবাঘ এতকাল ঘোঁ ঘোঁ করিতেছিল। ভগবান্ বুদ্ধদেব তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া তাহাকে শান্ত করিলেন। বজ্রের নির্ঘোষ থামিয়া গিয়াছে, প্রবল ঝড়ের প্রকোপ প্রশমিত হইয়াছে, পবনদেব কর্ণকুহর দ্বারা সেই মহাত্মার বাক্যসুধা পান করিবার জন্যই যেন স্থিরভাব ধারণ করিয়াছেন।

"বৎস! বহির্জগতে যে সকল পরীক্ষা প্রচলিত আছে, লোক-সমাজ যাহাকে ধর্ম্মজীবনের পরীক্ষা বলিয়া সাধারণতঃ গ্রহণ করিয়া থাকে, তোমার জন্য সে পরীক্ষা নহে। স্ত্রী পুত্র, বিষয় বিভব, আমোদ প্রমোদ পরিত্যাগ করিবার জন্য তোমাকে বলি নাই, উপবাসাদি দ্বারা কঠোর কৃচ্ছ্রসাধন করিতেও তোমাকে আদেশ করি নাই। আমি যে পরীক্ষার কথা বলিতেছি, বিন্দুমাত্র আপত্তি না করিয়া অম্লানবদনে নিজকে যে পরীক্ষায় ফেলিয়াছ, তাহা তোমার পূর্ব্ব কর্ম্মার্জ্জিত, তাহা তোমার স্বীয় স্বভাবজাত। সেই সকলের মধ্যে তুমি একটী পরীক্ষায়ও উত্তীর্ণ হইতে পার নাই। তুমি রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া ধর্ম্মপথে বিচরণ করিতে থাক, তুমি শিষ্য হওয়ার এখনও উপযুক্ত হও নাই।"

এই কথায় যুবরাজ নিতান্ত অপ্রতিভ হইলেন। তাঁহার গণ্ডস্থল রক্তিমাকার ধারণ করিল। তিনি ব্যগ্রভাবে বলিলেন:—

"ভগবন্! যে সব পরীক্ষার কথা বলিলেন ও যাহাতে আমি উত্তীর্ণ হইতে পারি নাই, তাহা কি কৃপাপূর্ব্বক স্পষ্ট ও বিস্তারিতভাবে আমাকে বলিবেন? ইহা প্রকাশে যদিও আমার লজ্জা শতগুণে বৃদ্ধি হইতে পারে বটে, তথাপি জ্ঞানালোকলাভের জন্য আমি তাহা জানিতে ব্যস্ত হইয়াছি।

ভগবান বুদ্ধদেব বলিলেন, "যদি জানিতে চাও ত মনোযোগপূর্ব্বক শুন।"

"তোমার প্রথম পরীক্ষা ছিল মিথ্যাপবাদ সম্বন্ধে। বৎস! তুমি জান, তোমাদেরই রাজধানীতে, তোমার পিতার বিচারালয়ে তোমার বিরুদ্ধে এক অমূলক মিথ্যা অভিযোগ উপস্থিত হইল। যে অপরাধ ভ্রমেও তোমার মনে স্থান পায় নাই, এমন অপরাধে তুমি অভিযুক্ত হইলে। কিন্তু ধীরভাবে সময়ের প্রতীক্ষা না করিয়া, এই অভিযোগ যে ভিত্তিহীন, কালে জনসাধারন তাহা জানিতে পারিয়া গতসন্দেহ হওয়ার অপেক্ষা না করিয়া, অথবা তোমার উপর এই অভাবনীয় অপবাদ উঠাতে তুমি যে সমাজে লাঞ্ছিত ও

অপদস্থ হইয়াছ, তাহাতে তোমার অবশুদেয় পূর্ব্বঋণ পরিশোধ হইল বলিয়া মনে না করিয়া তুমি আত্মসমর্থনে ও স্বীয় নির্দ্দোষিতা সপ্রমাণে ব্যতিব্যস্ত হইলে। এমন কি, তাহার প্রতিশোধ লওয়ার জন্য তুমি বদ্ধপরিকর হইলে। ইহাই ছিল তোমার প্রথম পরীক্ষা। কিন্তু ইহাতে তুমি উত্তীর্ণ হইতে পার নাই।”

এই কথা শুনিয়া জেতার মুখ ম্লান হইল।

“অভিযোগ সত্য হইলে অবাধে তাহা সহ্য করিতে পারিতাম। আমি নিশ্চয় জানিতাম, আমি সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ।”

“সত্য বটে, যিনি সৎ ও ধার্ম্মিক, তাহার পক্ষে আত্মসমর্থন ও নির্দ্দোষিতা প্রমাণের প্রয়াস পাওয়া সঙ্গত ও স্বাভাবিক। কিন্তু যে দুর্গম সাধনমার্গে প্রবেশ লাভের প্রয়াসী, যে আমার শিষ্য হওয়ার অভিলাষী তাহাকে আত্মসমর্থনে বাক্যটি-মাত্র ব্যয় না করিয়া ধৈর্য্যসহ অম্লান বদনে অবিচার অপবাদ সহ্য করিতে হইবে। যশো-গৌরব-প্রতিভাত উজ্জ্বল কিরীটই হউক বা নিন্দাবাদের ভারি বোঝাই হউক, তুল্যরূপে অব্যাকুল-চিত্তে তাহা বহন করিতে হইবে। স্তুতি নিন্দা, মানাপমানকে সমান জ্ঞান করিতে হইবে। এইরূপ করিলে সাধন পথের শিষ্যত্ব গ্রহণে অধিকার জন্মে।”

জেতা মস্তকাবনত করিলেন। ভগবান বুদ্ধদেব পুনরায় বলিতে লাগিলেন :—

“আত্মানুরাগ তোমার দ্বিতীয় পরীক্ষার বিষয় ছিল। অত্যধিক ভালবাসা সম্বন্ধে স্বার্থপরতাই তোমার অন্তরায় ও পতনের কারণ হইল। তোমার বন্ধু যচসকে তুমি প্রাণের অধিক ভালবাসিতে। ঘটনাক্রমে তোমার পিতার রাজধানীতে এক জন অভ্যাগত আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহার কোন এক কার্য্যোদ্ধারের জন্য যচসের দরকার হইল। সে ক্রমশঃ যচসের মন অধিকার করিয়া বসিল। তোমার ও যচসের সুদৃঢ় প্রণয়বন্ধন ছিন্ন হওয়ার উপক্রম হইল। ধীর ভাবে তুমি তাহা সহ্য না করিয়া, তোমার হৃদয়-নিহিত প্রণয়রূপ আগাছা সমূলে উৎপাটন না করিয়া, তুমি দারুণ ঈর্ষানলে জ্বলিয়া উঠিলে। তোমার ভালবাসা যচসের সুখের জন্য না হইয়া তোমার স্বীয় সুখসাধন মানসে তাহাকে ভাল বাসিতে গিয়া ভল্লিকের প্রণয় পণ্ড করার জন্য তুমি প্রাণপণ যত্ন করিতে লাগিলে। তোমার হৃদয়-কন্দর হইতে তাহার প্রতি অবিরত বিদ্বেষ স্রোত প্রবাহিত হইতে লাগিল।

জেতা বলিলেন, “আমি বেশ জানি, যচসের প্রতি ভল্লিকের প্রণয় স্বার্থ প্রণোদিত। যচসকে সাবধান করা, ভল্লিকের শর জাল ছিন্ন করিয়া আমার বন্ধুকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করা কি আমার উচিত ছিল না?”

“বৎস! তুমি কি মনে কর ভল্লিকের স্বার্থপ্রণোদিত ভালবাসা কালে নিঃস্বার্থ ও নির্ম্মলভাব ধারণ করিতে পারিত না? সময়ে কি ইহা পবিত্র সরল প্রণয়ে পরিণত হইতে পারিত না? প্রণয় ভালবাসার

ভাব মনে পোষণ করিতে সৎ ও ধার্ম্মিক লোকের কোন বাধা না থাকিতে পারে, তিনি আত্মমর্য্যাদা, আত্মসম্মান বজায় রাখিতে যত্নপর হইতে পারেন, কিন্তু যিনি দুরারোহ সাধনমার্গে পদার্পণ করিয়া আমার শিষ্যত্ব-লাভে প্রয়াসী, তাঁহার মন হইতে অশেষ ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিতে হইবে, তাহার হৃদয় হইতে ঈর্ষা ও আত্মম্ভরিতার মূল নিঃশেষে উৎপাটন করিতে হইবে; এমন কি তাহার অনুরক্ত বন্ধু যদি বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহার অনিষ্ট সাধনে তৎপর হয়, তাহাও তাহাকে অকাতরে সহ্য করিতে হইবে।"

"যুবরাজ! তোমার পিতার অতুল বিভব, অপরিসীম ভোগবিলাসের সামগ্রী, প্রচুর যশোগৌরবের অভিমান ইত্যাদি কিছুই তোমাকে মুগ্ধ করিতে পারে নাই সত্য, কিন্তু ইহাতে তোমার বিশেষ কিছু কৃতিত্ব বা পৌরষ নাই। প্রকৃত ত্যাগ-স্বীকারের কালে, জলন্ত পরীক্ষার সময় তোমার সাহস ভগ্ন হইল! প্রকৃত ত্যাগের, প্রকৃত প্রেমের রুধিরসিক্ত বসন পরিধান করার সময় যখন উপস্থিত হইল, তখন তুমি ভয়বিজড়িতভাবে পশ্চাতে সরিয়া পড়িলে। এই ত্যাগের বশে, এই প্রেমের টানে অযাচিতভাবে সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন দিতে হয়, এমন কি, প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতে হয়! কিন্তু কৈ বৎস! তুমি সেই পরীক্ষায় জয়লাভ করিতে পারিলে কৈ? নিয়তি বশে তোমার সমক্ষে সেই পরীক্ষা উপস্থিত হইল, কিন্তু ভাগ্যদোষে তুমি তাহাতে পরাভূত হইলে।"

জেতা এই কথা শুনিয়া নিতান্ত অপ্রতিভের ন্যায় মস্তক নত করিলেন এবং ইতিকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া নিঃশব্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। পরে মহাত্মার দিকে দৃষ্টিপাতপূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন:—

"ভগবন্! স্পষ্ট করিয়া বলুন। তাহাতে আমি পুনঃ অপমান ও লজ্জায় ম্রিয়মাণ হইতে পারি, ক্ষতি নাই, কিন্তু আপনি সত্বর আমার মনের ক্ষোভ দূর করুন। রজনীর গাঢ় অন্ধকার অপেক্ষা আমার হৃদয় গাঢ়তর অন্ধকারে আবৃত হইয়াছে। কৃপা বিতরণে তাহা দূর করুন।"

মহাত্মা বুদ্ধদেব বলিলেন:—

"রাজকুমার! প্রণয়ের অভাব বশতঃ তুমি তৃতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পার নাই। নন্দা নামিকা তোমার জনৈক স্ত্রী একদা এক গুরুতর অপরাধ করায়, তুমি তাহাকে রাজবাটী হইতে তাড়াইয়া দিয়াছ। তাহার তরুণ বয়স বা অপরিপক্ক বুদ্ধির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তোমার মনে একটু দয়ার সঞ্চারও হইল না।"

"ভগবন্! এ সম্বন্ধে আমি যাহা করিয়াছি, তাহার ব্যতিক্রম করা যায় কিরূপে? চঞ্চলস্বভাবা একটা কুলটা রমণীকে কাছে রাখিয়া আমার স্বীয় সম্ভ্রম ও রাজবাটীর মর্য্যাদা নষ্ট করা কি আমার পক্ষে সঙ্গত হইত? এই কুকাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিলে কি আমি সমাজের ও দেশের নিকট নীতিধর্ম্ম ভঙ্গ দোষে দোষী হইতাম না? আমার পবিত্র কুলে কি কলঙ্ক আরোপ হইত না? ইহাতে কি

আমার আদর্শ পবিত্রতার মর্য্যাদা রক্ষা হইত ?”

“যুবরাজ। আমাকে কি একই কথার পুনরুক্তি করিতে হইবে ? বিষয়ী লোক যদি সৎ এবং ধার্ম্মিক বলিয়া সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে চায়, তবে তাহারা নিজের অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য স্বীয় মর্য্যাদা রক্ষার জন্য যত্নপরায়ণ হইতে পারে। সে বিচার করিতে পারে, দণ্ড-বিধান করিতে পারে, তাহার নিকট হইতে দোষীকে তাড়াইয়া দিতে পারে। কিন্তু সাধু লোক বিচার করেন না, তিনি তত্ত্ব জানিয়া ক্ষমা করেন। ছিদ্রান্বেষণ, দোষানুসন্ধান করা অপেক্ষা কোন কারণে দোষ মার্জ্জনা করার উপায় আছে কিনা তিনি তাহা খুঁজেন। সাগরবক্ষের বারি-বিন্দু সমূহ অপেক্ষা তাহার প্রশান্ত ও কোমল হৃদয়ে তাহার ভ্রাতা ভগ্নী, আত্মীয়স্বজনের প্রতি দয়া ও করুণাকণা অনেক অধিক।”

“বৎস! পবিত্রতা ধর্ম্ম নহে। ইহা পাপ হইতে বিরত থাকা মাত্র। ইহাতে সাধুগণ বিশেষ কোন গুণপণা দেখেন না। পবিত্র জীবনও হয়ত সাধন পথে বাধা জন্মাইতে পারে, কারণ ইহা যদি দয়া ও করুণার রসে সিক্ত না হয়, তবে অনেক সময় ইহা লোককে অহঙ্কারী ও কঠিন-হৃদয় করিয়া তোলে। তখন ইহা পবিত্রতার ছায়ারূপে পর্য্যবসিত হয়। বৎস! ভ্রমণকালে কখনও কি সূর্য্যাস্তের সময় গিরিরাজ হিমালয়ের অত্যুচ্চ শৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছ? ধবল তুষারা-বৃত সেই গিরিশৃঙ্গের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে যেন সমস্তই প্রবল হিমে জড়সড় ও মৃতবৎ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু তাহাতে যখন পশ্চিমগগণের সান্ধ্যরক্তি-মাভা প্রতিফলিত হয় তখন সেই অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্য সন্দর্শনে কি মন আনন্দ-রসে আপ্লুত না হইয়া থাকিতে পারে? পবিত্রতাও এইরূপ। অন্তরে ভালবাসা ও করুণা না থাকিলে পবিত্রতা নিতান্ত নীরস ও ঠাণ্ডা তুষারবৎ প্রতীয়মান হয়। কিন্তু প্রেমমাখা পবিত্রতা অতি উপাদেয় দেবদুর্লভ জিনিস। যে হৃদয়ে তাহা বিরাজিত, সেই হৃদয়ে অনন্ত পুণ্যস্রোতঃ নিত্য প্রবাহিত থাকে।”

জেতার নয়নদ্বয় অশ্রুপূর্ণ হইল। তদুত্তরে কথাটী মাত্র না কহিয়া তিনি ভূমিতে পড়িয়া প্রণাম করিলেন। অনেক-ক্ষণ এইরূপে থাকিয়া শেষে বাষ্পাকুল লোচনে, রুদ্ধকণ্ঠে, গদ্ গদ্ স্বরে বলিতে লাগিলেন :—

“ভগবন্! আমাকে আর একবার অনুগ্রহ না করিলে আপনার সম্মুখ হইতে যাইতে পারিতেছি না। আমি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য আর এক বার চেষ্টা করিয়া দেখিব এবং পুনরায় আসিয়া আপনার বিচারপ্রার্থী হইব। আমার কর্ত্তব্য আমি এখন বেশ বুঝিতে পারি-তেছি।”

“সম্মত আছি” বলিয়া ভগবান বুদ্ধ-দেব স্মিতমুখে ধরাবলুণ্ঠিত যুবকের প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিলেন। আহা! তাঁহার সেই দৃষ্টিতে এত কোমলতা এবং হাস্যে

এত মধুরতা ফুটিয়া উঠিল যে, তখন যেন তাহার ছটায় সমগ্র বনভূমি উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল! তাহাতে বিহগকুল নিশাবসানে সুখময়ী উষার আগমন ভাবিয়া উল্লাসে কলরব ধ্বনিতে মাঙ্গলিক প্রভাত-সঙ্গীত আরম্ভ করিয়া দিল।

দীপরাজি প্রজ্বলিত হইল, তাহার আলোকে সেই ক্ষুদ্র সৈন্যদল পথ ধরিয়া আস্তে আস্তে চলিতে চলিতে রজনীর গভীর তিমিরে ডুবিয়া অদৃশ্য হইল। যুবরাজ মন্থর গতিতে তাহাদের অনুসরণ করিলেন। উপবনের প্রান্তদেশ ছাড়াইতে না ছাড়াইতেই রজনী প্রভাত হইল। রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিবার জন্য করেণুকুল তাহাদের প্রভুর জন্য উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। ভগবান বুদ্ধদেব সেই প্রশান্ত বনবিথীকায়, সেই প্রকাণ্ড অশ্বত্থ তরুমূলে পুনরায় গভীর ধ্যানে নিমগ্ন হইলেন।

*　　*　　*

কঙ্কণ দেশে প্রত্যাগমন করা মাত্র জেতা, তাহার পিতার গুরুতর রাজ্যভার গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন, কারণ কঙ্কণরাজ হঠাৎ অসুস্থ হওয়াতে রাজকার্য্য পরিচালনে অসমর্থ হইলেন। বিবেক বুদ্ধির অধীনে থাকিয়া তিনি সুচারুরূপে শাসনদণ্ড পরিচালনা করিতে লাগিলেন। ন্যায়বান ও দয়াশীল শাসনকর্ত্তা বলিয়া যুবরাজের যশ অচিরকাল মধ্যেই দেশ বিদেশে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল।

তিনি রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াই সর্ব্বপ্রথমে যচস্ ও তাহার বন্ধু ভল্লিককে অজস্রভাবে মান সম্ভ্রমে সম্মানিত করিলেন। তাহাদের বাসের জন্য পরস্পরে সংলগ্ন, মনোহর পুষ্পোদ্যান ও স্বচ্ছ বারিপূর্ণ সরোবর সমন্বিত রাজভবন তুল্য প্রকাণ্ড দুইটী বসতবাড়ী প্রদান করিলেন, তাহার পরিত্যক্ত স্ত্রী নন্দার অনুসন্ধান করাইয়া তাহাকে পুনঃ রাজ বাটীতে আনয়ন করিলেন। যুবরাজের এই কার্য্যে রাজধানীতে অত্যন্ত অসন্তোষের ভাব প্রকাশ পাইল। তাঁহার পিতার পুরাতন কর্মচারীগণ তাহাতে ঘোর প্রতিবাদ করিয়া তাঁহার চরিত্রে নানা দোষারোপ করিতে লাগিল। সকলেই যুবরাজের কার্য্যকলাপে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে লাগিল এবং প্রতিকূল আলোচনা স্রোত ক্রমশঃই খর হইতে খরতর হইতে লাগিল। প্রজাবর্গের মঙ্গলের জন্য তিনি ন্যায় ও হিতকর সংস্কার সমূহের বিধান করিলেন এবং তৎসমুদয় প্রচলনের জন্য মন্ত্রীগণকে আদেশ করিলেন। কিন্তু মন্ত্রীগণ তাহাতে নিতান্ত প্রতিকূলাচরণ করিতে লাগিল এবং এই সকল সংস্কার কার্য্যে পরিণত করা দূরে থাকুক, স্বেচ্ছাচারী ও যথেচ্ছাচারী বলিয়া তাহারা ভিতরে ভিতরে যুবরাজের অযথা নিন্দা রটনা করিতে লাগিল।

এই সকল গুপ্ত আক্রমণে জেতা অচল অটল রহিলেন। সুগন্ধ গোলাপের সুঘ্রাণকে যেরূপ আগ্রহ সহ সমাদর করিয়া থাকেন ঠিক সেইরূপ, তাহার তীক্ষ্ণ কণ্টকের আঁচড়কেও তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করিতে লাগিলেন; কিন্তু হইলে কি হয়?

যুবরাজের বিরুদ্ধে অবিলম্বেই ভীষণ ষড়যন্ত্ররূপ এক প্রবল অগ্নি জ্বলিয়া উঠিল। যুবরাজের দুরাকাঙ্ক্ষী কনিষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে পদচ্যুত করিয়া তাঁহার স্থলে অভিষিক্ত হইবার প্রত্যাশায় গোপনে গোপনে যোগদান করিয়া সেই অগ্নিতে ইন্ধন প্রয়োগ ও ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিল, রাজ্য মধ্যে প্রজাহিতকর নানা শুভানুষ্ঠানের প্রচলন করা সত্বেও জেতা যথেচ্ছাচারী, এবং তাহার কার্য্যে রাজ্য অচিরেই ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে, এইরূপ দুরভিসন্ধি মূলক এক মিথ্যা জনরব দেশময় রাষ্ট্র করা হইল। আরও প্রচার করা হইল যে, এক ভিক্ষু সন্ন্যাসীর নাম কঞ্চন্দ দেশ পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে, যুবরাজ মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় সেই সন্ন্যাসীর বশীভূত হইয়া অন্ধভাবে তাহার দ্বারা পরিচালিত হইতেছেন। এবং আবহমান কাল হইতে দেশে যে সকল আচার ব্যবহার, রীতিনীতি, আইন কানুন চলিয়া আসিতেছে, তাহা উঠাইয়া দিয়া তৎপরিবর্ত্তে এক নূতন ধর্ম্ম প্রবর্ত্তন করিবার জন্য তাহার প্রবল ইচ্ছা হইয়াছে। একদা জেতা তাঁহার নিজের বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের জনরব শুনিতে পাইলেন। এমন কি, তিনি ইহাও শুনিলেন যে তাহার প্রাণ সংহারই এই ষড়যন্ত্রের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি তাহাতে ভীত বা উদ্বিগ্ন না হইয়া এ সম্বন্ধে তাঁহার কয়েকজন বিশ্বস্ত বন্ধুকে সতর্ক হইতে বলিলেন। সৌভাগ্যক্রমে সেই বন্ধুগণের বিশেষ উদ্যোগে সেই ষড়যন্ত্র শীঘ্রই প্রকাশ হইয়া পড়িল, এবং শাণিত কৃপাণ হস্তে যুবরাজকে হত্যা করিতে উদ্যত সেই হত্যাকারী ধৃত হইল। তাহার নাম অরদ, সে জাতিতে ক্ষত্রিয়। এইরূপে হঠাৎ ধরা পড়ায় ভয়ে ও ক্রোধে তাঁহার মুখমণ্ডল বিশুষ্ক, এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গেল। এই অবস্থায়ই তাহাকে যুবরাজের সাক্ষাতে আনয়ন করা হইল অত্যধিক ধৈর্য্যসহকারে যুবরাজ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "অরদ! কেন তুমি আমাকে বধ করিতে কৃত-সংকল্প হইয়াছ?"

"আমি আপনাকে রাজ্যের শত্রু বলিয়া জ্ঞান করি, এইজন্য আপনাকে বধ করিতে মনস্থ করিয়াছি। আপনি আমাদের পুরুষ-পরম্পরা-গত আচার পদ্ধতির বিরোধী। আপনি দেশের সুপথা ও সুনিয়মগুলি উঠাইয়া দিয়া তাহার পরিবর্ত্তে এমন কতকগুলি সংস্কারের প্রবর্ত্তন করিতে চান, যাহা রাজ্যের ও প্রজাবর্গের সমূহ অমঙ্গলকর এবং অনিষ্টজনক বলিয়া আশঙ্কা করা যাইতেছে।"

"এই হত্যাকারী অন্ধবিশ্বাসী, তাই নিরপরাধী। এই ভাবিয়া জেতা তাহার প্রতি সকরুণ দৃষ্টিপাত করিলেন। তিনি তাঁহার ভৃত্যবর্গকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "দেখ এই ব্যক্তি আমাকে বধ করিবার জন্য আক্রমণ করিয়াছিল সত্য, কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য মহৎ। রক্ষিগণ! কে আছ, এখনই তাহার বন্ধন মুক্ত কর।

রক্ষিগণ বিস্ময়ান্বিত হইয়া তৎক্ষণাৎ সেই আদেশ পালন করিল।

"একা অরদকে আমার কাছে রাখিয়া তোমরা সকলে এখান হইতে প্রস্থান

কর," জেতা দৃঢ়স্বরে এই আদেশ করাতে তাহার বন্ধু ও ভৃত্যবর্গ নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও তথা হইতে প্রস্থান করিতে বাধ্য হইল। কিন্তু যাইতে যাইতে তাহারা ক্ষণে ক্ষণে ফিরিয়া চাহিতে লাগিল। রাজপুত্রের অসম সাহস দেখিয়া তাহারা সন্ত্রাসিত হইল। অরদ যুবরাজের সম্মুখে যোড়করে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্পর্দ্ধা সহ তাঁহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিল। তাহার এই অবজ্ঞা সূচক ব্যবহারের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া জেতা নিকটে গিয়া বাহু যুগল তাহার স্কন্ধে স্থাপন করিলেন, এবং তাহার চক্ষুর উপর স্বীয় স্থির দৃষ্টি অব-স্থাপিত করিলেন। সেই দৃষ্টিতে কোনরূপ ঘৃণা, দম্ভ বা দয়ার ভাব প্রকাশ পাইল না। ইহা কেবল নিঃশব্দ ও সুদীর্ঘ প্রশ্ন ব্যঞ্জক স্থির দৃষ্টি। তাহার প্রভু কি বলেন নাই যে "সাধকের চক্ষু দোষান্বেষণে নিযুক্ত হওয়া কর্ত্তব্য নহে। দোষানুসন্ধান করা অপেক্ষা দোষের হেতু কি, ও কোন কারণে তাহা মার্জ্জনা করা যায় কিনা তিনি তাহারই অনুসন্ধানে তৎপর হই-বেন।" জেতা গতজীবনের [illegible]-সন্ধান করিতে লাগিলেন। [illegible] তাহার মনে এক অ[illegible] [illegible] উদয় হইল।

তিনি যাঁহাকে গুরুপদে বরণ [illegible] ছেন, হঠাৎ যেন তাঁহার [illegible] মনোমধ্যে প্রবেশ [illegible] তাঁহার আভায় জেতার হৃদয় [illegible] সিত হইয়া উঠিল। তিনি [illegible] অন্ত চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাইয়া উপস্থিত বিষয়ের গূঢ় রহস্য বুঝিতে পারিলেন। পূর্ব্ব-স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। এইরূপে রাজকুমার সেই যোদ্ধার গত জীবন অব-লোকন করিলেন। তাহাদের উভয়ের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জীবনী কিরূপে একই কর্ম্মসূত্রে গাঁথা, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অবিদ্যা ও অজ্ঞতার বিবিধ কারণ এবং তৎসম্ভূত নানা দোষ সেই সেই জীবনে দেখিতে পাইলেন। বাসনার ফল স্বরূপ কিরূপে মনে নব নব ভোগেচ্ছার আবির্ভাব হইয়াছে ও তাহা হইতে কিরূপে বহুবিধ ক্লেশোৎপত্তি হইয়াছে, তাহাও তিনি অবগত হইলেন। তৎপরে হঠাৎ যেন অরদের মূর্ত্তি তাহার হৃদয়-পট হইতে অন্তর্হিত হইল। এবং জগতের মানবজাতি সমষ্টির চিত্র যেন তাহার স্থান অধিকার করিয়া বসিল। এই চিত্র কি ভয়াবহ! কি হৃদয় বিদারক! সমগ্র মানব-জাতির এ অপূর্ব্ব চিত্রে জেতা কি দেখিলেন? তিনি দেখিলেন, হতভাগ্য মানবজাতি অজ্ঞানান্ধকারে ডুবিয়া আছে। তাহারা অবিদ্যাবশে নানা কুকার্য্যে রত হইয়া অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিতেছে। অসংখ্য [illegible] নরনারী স্বীয় স্বীয় পাপের ফল স্বরূপ [illegible] ক্লেশ ক্লিষ্ট হইয়া মর্ম্মভেদী আর্ত্ত-নাদে গগন বিদীর্ণ করিতেছে। এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য দেখিয়া জেতার মন দারুণ শোকে অভিভূত হইয়া পড়িল।

তিনি এই আকস্মিক শোক-সন্তাপে [illegible] প্রায় হইয়া গেলেন, এমন সময় হঠাৎ তাহার মনে করুণ রসের সঞ্চার হইল। পাপতাপগ্রস্ত সমগ্র মানবজাতিকে

আলিঙ্গন করিতে, তাহাদিগকে তাহার কম্পিত বক্ষে ধারণ করিতে তাহার প্রবল ইচ্ছা হইল। তাহাদের জন্য আত্মোৎসর্গ করিতে, নিজের পবিত্রতা প্রদানে তাহাদের পাপতাপ দূর করিতে, তাহাদিগকে পবিত্র করিতে, ভালবাসা ও প্রেমদ্বারা তাহাদিগকে সতেজ ও সঞ্জীবিত করিতে, এমন কি, স্বীয় প্রাণপাত করিয়াও তাহাদিগকে উন্নতিমার্গ সোপানের একধাপ উপরে উঠাইবার জন্য রাজকুমারের মনে একাগ্র অভিলাষ জন্মিল।

কিয়ৎক্ষণ পরে তিনি প্রকৃতিস্থ হইলেন। তাহার স্বাভাবিক সংজ্ঞা পুনরায় ফিরিয়া আসিল। এতক্ষণ যেন তিনি গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করিতেছিলেন, হঠাৎ জাগরিত হইলেন বলিয়া বোধ হইল। তাহার এই সব ভাবপরিবর্ত্তন দেখিয়া সেই যোদ্ধা বিমূঢ়ের ন্যায় দণ্ডায়মান ছিল, তাহাকে সম্বোধন করিয়া জেতা গদ্‌গদ্‌ স্বরে বলিতে লাগিলেন :—

"ভ্রাতঃ!—কারণ, আমি তোমাকে ভ্রাতা ভিন্ন আর কিছু জানি না,—আমি তোমাকে ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করি, তাই বলি ভ্রাতঃ! এস, আমার বাহুযুগলের মধ্যে এস, আমি তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া বক্ষে ধারণ করিব। তুমি আমার যশঃগৌরবের ভাগী হও, আমি তোমার কলঙ্কের ভাগী হইতেছি।"

রাজকুমার জেতা অরদের সঙ্গে একা অনেকক্ষণ নির্জ্জনে থাকায় প্রহরিগণ অধৈর্য্য হইয়া উঠিল। তাহারা বিপদাশঙ্কা করিয়া তথায় উপস্থিত হইয়া দেখে, অরদ রাজকুমারের স্কন্ধের উপর মস্তক রাখিয়া অবিরল ধারায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছে, আর রাজকুমারের মুখমণ্ডল হর্ষে প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে।

* * * *

দিবাকর কিরণ দীপ্ত সেই নির্জ্জন বনবীথিকায় ভগবান বুদ্ধদেব গভীর ধ্যানে নিমগ্ন। তাঁহার সেই প্রিয় অশ্বত্থ তরুর শীতল ছায়ায় স্থির পদ্মাসনে তিনি উপবিষ্ট আছেন, তিনি জানেন, কখনই যুবরাজের বাক্যের স্খলন হইবে না। তাই, তিনি সারারাত্রি তাহার অপেক্ষা করিয়াছেন। প্রথমতঃ উষার ক্ষীণালোক আস্তে আস্তে নয়ন পথে পতিত হইল। তৎপর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে উদ্ভাসিত করিয়া প্রভাতের শুভাগমন হইল। নব সূর্য্যের রক্তিমাভ কিরণজাল সম্পাতে তরুশাখা, লতা পাতা সমুদায় অনুরঞ্জিত ও দশদিক আলোকিত হইল। প্রকৃতিদেবী যেন কি এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দানুভব করত মৃদু মধুর হাসিতে বিশ্বরাজ্যকে উল্লাসিত করিয়া তুলিলেন। মস্তকোপরি অশ্বত্থ তরুর শাখায় বসিয়া ছোট ছোট পক্ষীগণ মধুর স্বরে সেই মহাত্মার স্তুতি গান আরম্ভ করিল। সেই কোমলস্বভাবা স্নেহময়ী কুরঙ্গী তাহার ছোট শাবকটীকে বুদ্ধদেবের নিকটে লইয়া আসিল। তরক্ষু এবং চিতাবাঘ সকল সুহৃদজ্ঞানে নির্ভয়ে সেই মহা পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করিয়া ঘ্রাণ লইতে এবং পদলেহন করিতে লাগিল। বস্তুতঃ প্রকৃতির জাগরণের সঙ্গে সঙ্গে যেন

সেই বন বিথীকায় প্রেমের বন্যা প্রবাহিত হইল।

এমন সময়ে অদূরে অল্প অল্প পদশব্দ শ্রুতিগোচর হইল। ভগবান বুদ্ধদেব চক্ষু উন্মীলন করিলেন। দেখিলেন জেতা সম্মুখে দণ্ডায়মান। এবার তিনি সঙ্গীদিগকে ফেলিয়া একা ভিক্ষুকের বেশে আসিয়াছেন। তিনি গৌতম বুদ্ধের সম্মুখে প্রগাঢ় ভক্তিভরে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। পথ ভ্রমণে পরিশ্রান্ত হওয়ায় তিনি যখন অতি কষ্টে ভূমি হইতে উত্থান করিলেন, তখন ভগবান বুদ্ধদেব আশীর্ব্বাদ করিবার জন্য যুবরাজের দিকে হস্তদ্বয় প্রসারণ করিয়া দয়াপূর্ণ অতি কোমল স্বরে বলিলেন :—

"শিষ্য জেতা, এস বৎস! তোমার মঙ্গল হউক!"

সদ্গুরুর সঙ্গে আদর্শশিষ্যের সম্মিলন!

আহা! কি অপূর্ব্ব শোভা! কি মনোহর দৃশ্য! দেখিলে চক্ষু শীতল হয়, মনপ্রাণ মোহিত হয়!

জেতা ভগবান বুদ্ধদেবের পদ প্রান্তে বসিয়া একাগ্রমনে তন্ময়ভাবে তাঁহার শ্রীমুখ নিসৃত পবিত্র শব্দ—সুধা পান করিতেছেন।

সুগন্ধাবাহী প্রাভাতিক মলয় সমীরণ মৃদু মৃদু বহিয়া তাঁহাদের ভ্রূযুগল চুম্বন করিতেছে! এমন সুশীতল ও সুস্নিগ্ধ অনিল বুঝি আর কখনও প্রবাহিত হয় নাই! ডালে বসিয়া সুকণ্ঠি পাখিকুল মধুর স্বরে কর্ণ কুহর পরিতৃপ্ত করিতেছে! এমন মনোহর গান বুঝি আর তাহারা কখনও গায় নাই! সেই সুষমা বনবিথীকায় সুগভীর শান্তি ও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতেছে! হায়! এমন নিগূঢ় শান্তি, এমন গুরু গম্ভীর নিস্তব্ধতা বুঝি আর কখনও সেই বনে অনুভূত হয় নাই! ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তি॥

শ্রীসুদর্শন দাস

মহিলাদিগের রচনা।

মানব শক্তি।

একদা শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডবত্রয়কে জিজ্ঞাসা করিলেন মানবশক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম শক্তি কি! ভীম উত্তর করিলেন বলং বলং বাহুবলং, অর্জ্জুন উত্তর করিলেন বলং বলং জনবলং, এবং সর্ব্বশেষে যুধিষ্ঠির উত্তর করিলেন বলং বলং ধর্ম্মবলম্।

মানব জাতির আদিম ইতিহাসে দেখা যায় যাহারা শারীরিক বলে বলীয়ান তাঁহারাই হিংস জন্তুদিগকে পরাভব করিয়া এবং অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিতেন। তৎকালে বাহুবলেরই প্রাধান্য ছিল। তৎপরে দ্বিতীয় অবস্থায় জনবল ও অস্ত্রবলই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করে। আলেকজাণ্ডার প্রভৃতি দিকবিজয়ী রাজগণ জনবল ও অস্ত্রবলেই নানাদেশ অধিকার করিয়া পৃথিবীতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। যতই জ্ঞানের বিকাশ হইতেছে ততই দেখা যাইতেছে জ্ঞান বলই প্রকৃত বল। অধুনা জ্ঞানবলে জনবল ও অস্ত্রবলও পরাভূত হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে বিজ্ঞানের নব নব কৌশল

প্রকাশিত হইয়া মানববুদ্ধির অপরিসীম পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই বিজ্ঞান বল অপেক্ষাও ধর্ম্মবল শ্রেষ্ঠ। ইহাই মনুষ্যের প্রকৃত বল। কারণ ধর্ম্মবলের নিকট সকল শক্তিই পরাভব স্বীকার করিয়া থাকে। যেখানে ধর্ম্ম সেখানেই লোক আকৃষ্ট হয়। মহম্মদ যখন ধর্ম্মপ্রচার আরম্ভ করিলেন তখন দলে দলে লোক তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার ত বাহুবল কিম্বা জনবল কিছুই ছিল না। সমস্ত দেশের লোক তাঁহার বিপক্ষ ইহারাও কিছুই করিতে পারে নাই, যাহা ন্যায় যাহা ধর্ম্ম, লোক তাহাতেই মুগ্ধ এবং আকৃষ্ট হইবেই হইবে। সুতরাং আমরা দেখিতেছি বাহু-বল ও জনবল প্রভৃতি বল নয়, ধর্ম্মবলই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। অতএব মানবশক্তির যথার্থ পরিচয় জানিতে হইলে ধর্ম্মরাজ্যের ইতিহাস পাঠ করা আবশ্যক। পৃথিবীতে ধর্ম্মের জন্য কত লোক কি আশ্চর্য্য মানসিক শক্তির পরিচয় দিয়াছেন তাহা ভাবিলে বিস্ময় জন্মে! ধর্ম্ম বলের নিকট রাজার পাশব শক্তিও তৃণের ন্যায় তুচ্ছ বলিয়া গণ্য হয়, এমন কি এই ধর্ম্মবলে কত দুর্ব্বলা রমণী পৃথিবীতে অসাধারণ বিক্রম প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন আজও তাঁহাদের নাম স্বর্ণাক্ষরে লিখিত রহিয়াছে।

অতএব আমরা যদি জীবনের প্রথম হইতেই এই ধর্ম্ম বলের আশ্রয় লাভে সমর্থ হইতে পারি তবে সংসারে আর কিছুরই ভয় ভাবনা থাকে না ধর্ম্মবলে বলীয়ান হইলে যথার্থ মনুষ্যত্ব লাভ করা যায়। এই জন্যই ধার্ম্মিক শ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির বলিয়াছিলেন বলং বলং ধর্ম্মবলম্।

শ্রীতিলতা ঘোষ।

প্রভাত।

সুধাকর অস্ত যায় রাঙ্গা সাড়ীদিয়ে গায়
হাসিমুখে উষারাণী উদিত হইল।
কুমুদিনী নিশানাথে না হেরিয়ে মন খেদে
বিষাদ মনেতে আহা মৌন হয়ে রহিল।
শশধর অস্ত যায় দেখে দেব সবিতায়
দশ দিক্ ঝলসিয়া প্রকাশিত হইল।
সরোজিনী প্রাণ কান্তে নিরখিয়া মহানন্দে
প্রেমেতে মগন হয়ে চাহিয়া রহিল।
পাইয়া প্রভাতি বায় পাখীরা পুলক কায়
প্রেমানন্দে হরষেতে বিভুগুণ গাহিছে।
শুনিয়া বিভুর নাম বৃক্ষ হতে অবিরাম
প্রেমেতে মগন হয়ে বারিবিন্দু পড়িছে।
প্রভাতের আগমনে প্রকৃতি আনন্দ মনে
মাতিয়ে বিভুর প্রেমে মগ্ন হয়ে রহিল।
সুরভী মাখিয়ে গায়, বহিছে মৃদুল বায়
শীতল বাতাসে আহা মন প্রাণ মোহিল।
শয্যাত্যাগী জীবসবে মনের আনন্দ এবে
বিভুপদ স্মরি সবে নিজ কার্য্যে চলিল।
ফুটিল কাননে ফুল মধু লোভে অলিকুল
গুণ গুণ স্বরে আসি কাননেতে পড়িল।
পেয়ে সুসময় হেন যত সাধু ভক্ত জন
ভক্তি ভরে বিভুগুণ গাহিতে লাগিল।
ওরে রে অলস মন এ সময় কি কারণ
মোহ নিদ্রা বশে হায় রহে অচেতন।
দেখরে নয়ন মেলে জীবগণ কুতুহলে
বিভুর প্রেমেতে আহা হইয়াছে মগন

ছাড়িয়া আলস্য ভার মোহ নিদ্রা পরিহার
করিয়ে, দেখরে কিবা শোভা মনোহর
মোহন মাধুরীবেশে ধরা দেবী নবসাজে
কিবা অপরূপ আহা সেজেছে সুন্দর
নানা শোভা মনোহর মুনি মন মুগ্ধ কর
যে সৃজেছে এধরাতে তাঁহার চরণে
করি নিদ্রা পরিহার কর তারে নমস্কার
থাকে না গো কোন ভয় তাঁহার শরণে।

শিলচর। শ্রীমতি সো—

সংবাদ।

শ্রীযুক্ত ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় এক্ষণ কোন্নগর নন্দলাল মল্লিকের বাগান বাড়ীতে বাস করিতেছেন। বাগানটী গঙ্গার উপরে স্থিত। প্রায় দুই মাস তিনি সেখানে থাকিয়া শরীর অনেক ভাল বোধ করিতেছেন। তিনি শয্যাগত অবস্থায় সেখানে গিয়াছিলেন, এক্ষণ চলা ফেরা করিতে পারেন। সম্প্রতি তিনি ৩। ৪ দিনের জন্য কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তাঁর কর্ম্মোৎসাহ নবীভূত হইয়াছে এক জন সহকারী লোক পাইলে অনেক বিষয় বলিয়া দিয়া লিখাইতে পারেন। নিজের ক্রমাগত লিখিবার শক্তি নাই, পড়াশুনা করিবার শক্তি নাই।

মহিলার সম্পাদক শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় ছইৎসরের অধিক কাল যাবৎ পীড়িত। গত ছয় মাস যাবৎ পত্রিকা খানা নিয়মিত রূপে প্রকাশ হইতে পারে নাই। এক্ষণ ভরসা করা যায় যে শ্রীযুক্ত ভাই ব্রজগোপাল নিয়োগী এবং তাঁহার কন্যার তত্ত্বাবধানে কাগজ খানি নিয়মিত প্রকাশ হইবে।

কলিকাতাতে কিছু দিন হইল কতিপয় সম্ভ্রান্ত ভদ্র মহিলা "ভগ্নীসভা" নামে একটী সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। দুঃখী বালক বালিকা এবং স্ত্রীলোক দিগকে সাহায্য করা এই সভার উদ্দেশ্য।

প্রতি বৎসর লণ্ডন সহরে দুই লক্ষ টন বরফ খাওয়া এবং অন্যান্য কার্য্যে ব্যবহৃত হয়।

স্যান ফ্রান্সিস সহরে অগ্নি লাগিয়া যে সমস্ত জিনিষ পুড়িয়া নষ্ট হয় তাহার মধ্যে এক খানি বহুমূল্যের কারপেট ছিল। সে খানির ওজন যত ছিল তত তোলা সোনা তাহার দাম ধরা হয়। উহার পোড়া ছাই হইতে এক হাজার পাউণ্ড মূল্যের সোনা পাওয়া গিয়াছিল।

লণ্ডন সহরে প্রতিদিন প্রাতে ৮ টা হইতে ৯ টা পর্য্যন্ত ১৬৪০০০ লোক ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য বাহির হইতে আগমন করে এবং প্রতিদিন সন্ধ্যা ৬ টা হইতে ৭ টা পর্য্যন্ত ১৫০০০ লোক বাহিরে চলিয়া যায়।

হাওড়ার অধীন দক্ষিণ ব্যাঁটরা গ্রামে ১০৪ বৎসর বয়সের একটী বৃদ্ধের মৃত্যু হইয়াছে। ইঁহার নাম পুণ্যাত্মা মধুসূদন দাস।

চিনদেশে একপ্রকার নস্য আছে তাহার ।৵৹ অর্দ্ধ সেরের মূল্য দুই লক্ষ পাউণ্ড। অর্থাৎ ৩০ লক্ষ টাকা। অদ্ভুত বাবু আনা। এই নস্যের ব্যবহারটা কিরূপ করিয়া হয় এবং ইহা কি কি

পদার্থে প্রস্তুত হয় পাঠিকাগণের বোধ হয় জানিবার ইচ্ছা হইতে পারে।

——

প্রেরিত।

পরিবারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা।

চট্টগ্রাম ভগ্নিসমাজে পঠিত।

মানব সর্ব্বদাই ধনসঞ্চয়ে ব্যস্ত, কিসে ধনাগম হইবে, কিসে ধন সঞ্চিত হইবে সর্ব্বদা এই চিন্তা। প্রকৃত ধন যাহা, যাহার অভাবে ধন মান কিছুই সুখের না হইয়া বরং অশান্তি ও উদ্বেগের কারণ হয়, সেই ধর্ম্মধন লাভ করিবার জন্য, জীবন ও পরিবারে তাহা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অতি অল্প লোকেরই যত্ন ও চেষ্টা দেখা যায়। ধনাগম ও ধন সঞ্চয় করা যত আবশ্যক সুখ ভোগের ব্যবস্থা করা যত প্রয়োজন, জীবনে ও পরিবারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করা তদপেক্ষা অধিক প্রয়োজন।

ধনের অভাবে মানুষ হীন হয় না বরং দরিদ্রতাই অনেক সময় মহত্বের পথ দেখাইয়া দেয় কিন্তু সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধন যে ধর্ম্মধন ইহা ব্যতীত মানব জীবন অত্যন্ত হীন হইয়া যায়।

পরিবারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠা করা পুরুষ ও রমণী উভয়েরই কর্ত্তব্য। এ বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা রমণীর দায়িত্বই অনেক অধিক। কারণ গৃহে রমণীই কর্ত্রী। সন্তানগণের প্রতি পিতার অপেক্ষা মাতার প্রভাবই অধিক দেখা যায়। মাতার শিক্ষা সন্তানের জীবনে যেরূপ কাজ করে, পিতা অথবা অপর কোন শিক্ষকের শিক্ষা সেরূপ কাজ করে না। যে পরিবারের জননী ধর্ম্ম শীলা সেই পরিবারের সন্তানগণ ধর্ম্মানু-রাগী না হইয়া পারে না অতএব প্রত্যেক জননীর জীবনে ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিয়া তাহাকে নিজ পরিবার মধ্যে সুদৃঢ় রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা উচিত। বর্ত্তমান সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে আমাদের দেশের পুরাতন ধর্ম্মভাবের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। পূর্ব্বে লোকে যাহা বিশ্বাস করিত এখন আর তাহা করে না, তৎকালে যে সমুদায় আচার অনুষ্ঠান ধর্ম্ম বলিয়া পরিগণিত হইত, বর্ত্তমান সময়ে তাহার অধিকাংশই কুসংস্কার বলিয়া উপেক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বপুরুষগণের ন্যায় আমরা আর সেই সকল কুসংস্কার লইয়া পরিতৃপ্ত থাকিতে পারিতেছি না। বর্ত্তমান সময়ের বিশ্বাসের উপযোগী ধর্ম্ম পরিবারে প্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত।

সত্য ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য জ্ঞানালোচনার অত্যন্ত প্রয়োজন। অধ্যয়ন, চিন্তা ও আলোচনাই সত্য ও পবিত্র ধর্ম্মলাভের উপায়। এই সকল উপায়ে ধর্ম্মলাভ করিয়া তাহা সযত্নে নিজ পরিবারের প্রতিষ্ঠা করা উচিত। পরিবারের কর্ত্তা ও কর্ত্রীর ধর্ম্মে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিষ্ঠা থাকা আবশ্যক। তাঁহাদের ঐকান্তিক যত্ন না থাকিলে পরিবারে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সন্তানগণের সম্মুখে ধর্ম্মকে সর্ব্বোচ্চ স্থান দিলে তাহারাও ধর্ম্মকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান জ্ঞান করিতে শিখে। পক্ষান্তরে ধর্ম্মের প্রতি অবহেলা বা উদাসীন্য প্রকাশ করিলে সে গৃহে আর ধর্ম্মের স্থান হয় না। যিনি গৃহকর্ত্রী তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য নিজ জীবনে এবং নিজ গৃহে সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত করা। তাঁহার বিশ্বাসের বল, ভগবদ্ভক্তি ধর্ম্ম পালনে নিষ্ঠা ও পারিবারিক ধর্ম্মানুষ্ঠানে দৃঢ়তার দ্বারাই পরিবারস্থ সকলের জীবনে ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত হইবে।

শ্রীজ্ঞানবালা দত্ত।

সূচী।

কলিকাতা

৫ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে. পি নাথ কর্ত্তৃক ৩রা জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৫শ ভাগ] মাঘ ও ফাল্গুন ১৩১৬, ১৯১০। [৭।৮ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে আনন্দময়ী জননী, তুমি মনুষ্যগণকে শুদ্ধ ও সুখী করিতে সর্ব্বক্ষণ তাহাদিগের মঙ্গল বিধান করিতেছ। তোমার মঙ্গল স্বরূপের স্পর্শ মুহূর্ত্তমাত্র অনুভব করিয়াও ইহা বুঝিতে পারি যে তুমি তোমার পুত্র কন্যাগণকে প্রেম পুণ্য আনন্দ শান্তিতে বর্দ্ধিত করিয়া তাহাদিগকে চিরসুখী করিবে। কিন্তু পৃথিবীতে আমাদিগের অবস্থা কিছুই উন্নত হইতেছে না দেখিয়া প্রাণে ক্লেশ হয় এবং কি হইলে এই পতিত নরজাতি পুণ্য শান্তি লাভ করিতে পারে তাহার জন্য প্রার্থনা উপস্থিত হয়। হে দেব, তোমার কৃপায় আমরা ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে পুণ্য শান্তি লাভ করা অর্থ আত্মার তোমাতে স্থিতি করা, তোমাকে লাভ করা। এ বিষয়ে ক্ষণে ক্ষণে বিন্দু বিন্দু করিয়া তোমার দিকে অগ্রসর হইতে হইবে এবং সকল নরনারীর মন এদিকে যত্নশীল না থাকিলে আমরা কখনও তোমার দিকে অগ্রসর হইতে পারিব না। বহু দিনের পরীক্ষায় ইহা বুঝিতে পারিতেছি যে যত দিন তোমার কন্যাগণ, গৃহকর্ত্রী গৃহিণীগণ এই পুণ্য শান্তি সংগ্রহে যত্নবতী না হইবেন ততদিন পরিবারে ও ব্যক্তিগত জীবনে পুণ্য শান্তি প্রতিষ্ঠিত হইবে না। এজন্য তোমার শ্রীচরণে প্রার্থনা করি তুমি তোমার কন্যাগণকে বিশেষভাবে পুণ্য শান্তি সংগ্রহ করিতে নিযুক্ত কর। হে মঙ্গলময় দেবতা, তোমারই মঙ্গল নিয়মে গৃহকর্ত্রীগণ গৃহের সকল অভাবের ভাবনা ভাবেন এবং পরিবারস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির বিশেষ বিশেষ অভাব দূর করেন; কৃপাময়, তুমি কৃপা করিয়া তাঁহাদিগের দায়িত্ববোধ বাড়াইয়া দেও, যে পরিবারস্থ ব্যক্তি সকলের কাহার কত প্রেম, পুণ্য, আনন্দ শান্তি প্রভৃতির অভাব তাহা বুঝিয়া যেন তাঁহারা সেই অভাব দূর করিতে যত্ন

করেন এবং তোমার চরণে প্রার্থনা করেন। হে মাতঃ, যাঁহাদিগকে মাতৃজাতি করিয়াছ, তাঁহারা যদি সকল সন্তানগণের প্রেম পুণ্যের অভাব দূর না করিবেন তবে আর কে করিবে? দেবতা, কৃপা করিয়া তোমার কন্যাগণকে নিত্য নিত্য সত্য, জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য সংগ্রহ করিতে যত্নশীল কর। তোমার কন্যাগণ তোমার হইলেই সকল পরিবার তোমার হইবে। তোমার সংসার প্রতিষ্ঠিত হইবে। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি যদি সমগ্র নর-জাতিকে স্বর্গের সুখ, শান্তি, আনন্দ দান করিবে তবে অগ্রে তোমার কন্যাগণকে তাহার জন্য ব্যাকুল কর। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা তোমার সকল কন্যার জীবনে পূর্ণ হউক।

পুত্র কন্যার শিক্ষা।

কিরূপ প্রণালীতে বালক বালিকাদের শিক্ষা দেওয়া উচিত বর্ত্তমান সময়ে তাহা একটী প্রধান আলোচ্য বিষয়। কিরূপ প্রণালী অবলম্বন করিলে, তাহাদের অন্ত-র্নিহিত সকল শক্তির বিকাশ হয়, ক্রমশঃ উন্নত হইতে উন্নততর আদর্শের দিকে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা চিন্তা ও সাধনের বিষয়। বিশেষতঃ বালিকারা নানারূপ শিক্ষা পাইয়াও, যাহাতে স্বাভা-বিক ভাবে বিকশিত হইতে পারে। বালিকারা বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করিতেছে, কিন্তু তাহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিষয়ে কোনও জ্ঞান লাভ করিতেছে না; এখন যে সকল বালিকারা মাতৃত্বে প্রবেশ করি-তেছে, কিম্বা যাহারা অনতিবিলম্বে মাতা হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মানবাত্মা গঠনের ভার প্রাপ্ত হইবে, তাহাদিগকে যথেষ্ট জ্ঞান ও কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা দান করিয়া এই গুরুতর কার্য্যের জন্য প্রস্তুত করিয়া দিতে হইবে। আমাদের দেশে বালিকা মাতার ক্রোড়ে শিশু, সমাজের নিতান্ত দুরবস্থার পরিচয় দেয়। যার আপনার হিতাহিত জ্ঞান নাই, আপনার শরীর মনকে চালনা করিতে জানে না, সেইরূপ মাতার হস্তে সন্তানের শিক্ষা কিরূপ হইবে, সকলেই বুঝিতে পারেন। কিন্তু বঙ্গসমাজ হইতে ক্রমশঃ এই বালিকা মাতার সংখ্যা কমিয়া যাই-তেছে, প্রায় সর্ব্বত্রই অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সে মাতৃপদে অভিষিক্ত হইতেছে। তথাপি অপেক্ষাকৃত অধিক বয়সেও সন্তান পালন সম্বন্ধে জ্ঞানের অভাবে বিশেষ সুফল দৃষ্ট হইতেছে না। এ কথা সত্য যে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্কা মাতা, অপেক্ষা-কৃত সহজভাবে, ও সুচারুরূপে সন্তান-পালন কার্য্য সম্পন্ন করেন, কিন্তু অজ্ঞান-তার কুফল কোথায় যাইবে।

শিক্ষা দুই প্রকার। এই দুই প্রকারের শিক্ষা লাভ করিলে, মানব-জীবনের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়। প্রত্যেক মানুষের স্বাভাবিক সহজ জ্ঞান আছে, সেই সহজ জ্ঞানের অনুযায়ী চলিলে, অনেক বিষয় সুসম্পন্ন করিতে পারে। আমাদের মাতামহীদের কেবল এই সহজ জ্ঞান ছিল, সেই জ্ঞানেই সকল কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁদের বাহিরের কোন শিক্ষা ছিল না। আজকাল

শিক্ষা দ্বারা জ্ঞান বৃদ্ধি করিতে হয়। সহজ জ্ঞান ও শিক্ষা যে জীবনে মিলিত হইয়া কাজ করে, তাহার পূর্ণ বিকাশ হয়। সহজ স্বাভাবিক জ্ঞান বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া যারা কেবল পুস্তকের বিদ্যা অনুসারে চলে, তাহারা ভ্রান্ত অবিবেচক। পুস্তকে কোনও জ্ঞান লাভ করিয়া যখন কার্য্য-কালে পরীক্ষা বা সপ্রমাণ করি, তখনই পুস্তকের বিদ্যা ও সহজ জ্ঞানের মিলন ও পূর্ণ জ্ঞান লাভ হয়। এইরূপে পুস্তকের বিদ্যা আমাদের সহজ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতাকে সুদৃঢ় করে। অভিজ্ঞতাও পুস্তকের জ্ঞানের অভাবে, অসম্পূর্ণ থাকে।

আমরা এমন কি দেখিতেছি, যে, কোনও ক্ষুদ্র ও বৃহৎ যে কাজেই হউক না কেন, যেমন কৃষি বাণিজ্য গোপালন, গৃহনির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন সেই ব্যবসায়ে বা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কয়েক বৎসর শিক্ষকের নিকট হইতে উপদেশ পাইয়া ও হাতে কলমে অভ্যাস করিয়া যোগ্যতা লাভ করে। কিন্তু এই যে গুরুতর কার্য্য, সন্তানের শিক্ষা, এক একটী অগঠিত জীবকে সুন্দররূপে গড়িয়া তোলা, এই বিষয়ে কোনও বিশেষ শিক্ষা লাভ না করিয়া কোনও উপদেশ না পাইয়া এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। ইউরোপ আমেরিকা প্রভৃতি সুসভ্য উন্নতিশীল দেশে এ বিষয়টী বিশেষরূপে আলোচনা হইতেছে। কত চিন্তাশীল লোক এই চিন্তায় জীবন অতিবাহিত করিতেছেন, কেহ বা একটী অগঠিত মনুষ্য শিশুকে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছেন। শিশুর স্বভাব কি, তার স্বভাবের মধ্যে কি নিহিত রহিয়াছে, কিসে শিশুর উন্নতির বাধা হয়, কিসে বিকশিত হইবার সাহায্য হয়, এ সকল, বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতেছেন। যেমন বুনো গোলাপ হইতে যত্ন করিয়া সার দিয়া সুন্দর সুগন্ধ বৃহৎ পুষ্পবান গোলাপ বৃক্ষ প্রস্তত করে, সেইরূপ অগঠিত ক্ষুদ্র আত্মাকে সুকোমল ব্যবহারে, সুশিক্ষার সারে সুন্দর মানব-জীবন প্রস্তত করা যায়। কিছুদিন হইল, একটী প্রসিদ্ধ সাময়িক পত্রিকাতে একটী প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলাম যে এক ব্যক্তি একটী অশিক্ষিত দরিদ্র পরিবার হইতে একটী শিশুকে আপনার নিকটে রাখিয়া পালন করিয়াছিলেন। তিনি যখন তাহাকে গ্রহণ করেন, তখন সে অত্যন্ত দুর্ব্বল, রক্তহীন ছিল। অত্যল্প দিনের মধ্যে তাহাকে সবল, সুস্থ করিলেন ও এরূপ ভাবে তাহাকে আপনি শিক্ষা দিলেন যে, অতি অল্প বয়সে নানা বিষয়ে সে শিক্ষা করিল, সাধারণতঃ শিশুরা অত অল্প বয়সে সেরূপ শিক্ষা করে না। ইহা কেবল শিক্ষা-প্রণালীর গুণ।

প্রায়ই দেখা যাইতেছে, পিতা মাতা ভাল হইলেও পুত্র কন্যা সেরূপ হইতেছে না, তাহার কারণ তাঁহারা জানেন না কিরূপে শিক্ষা দিতে হয়। এ বিষয়ে মাতার দায়িত্বই অধিক, মাতার নিকটেই সন্তান শিক্ষা লাভ করে। অধিক তিরস্কার, অতিরিক্ত শাসন কিম্বা তত্ত্বাবধানের অভাব কিছুই হিতকর নয়। মাতাকে পূর্ব্ব হইতেই শিশু চরিত্র অধ্যয়ন করিতে

হইবে, কিরূপে তাহাকে কোনও বাধা না দিয়া কিন্তু চোখে চোখে রাখিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে। মাতা ত সন্তানের ভালই চান, কিন্তু জানেন না কি উপায়ে ভাল করা যায়। এমন অনেক মাতার কথা শোনা যায়, রুগ্ন সন্তানকে গোপনে গোপনে মুখপ্রিয় কুপথ্য দিয়া ভালবাসেন. কিন্তু বুঝিতে পারেন না, যে তাহার পরমশক্রর কাজ করিতেছেন। ঠিক সেইরূপ, মাতা তাহার হিতকামনা করিয়া অতিরিক্ত শাসন বা অতিশয় প্রশ্রয় দিয়া তাহার অনিষ্ট সাধন করেন। বিখ্যাত চিন্তাশীল লেখক স্পেনসার শিক্ষা (Education) নামক পুস্তকে শিক্ষাপ্রণালীর নানা দোষ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা সকল মাতারই পাঠ করা উচিত। এজন্য তাহা হইতে কিছু কিছু উদ্ধৃত করিয়া মহিলাতে দিব। আশা করি তাহা পাঠ করিয়া সকলেই সে বিষয়ে চিন্তা করিবেন সেবিষয়ে অধিক জ্ঞানলাভ করিতে উৎসুক হইবেন, এবং সর্ব্বোপরি আপন আপন পুত্র কন্যাদের লইয়া সেই সকল প্রণালীর ফলাফল পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এইরূপ চেষ্টা করাতে আপনার মনেও নানা আলোক পাইবেন, সেই আলোকের সাহায্যে আমরা সেই প্রণালীকে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব।

প্রথমতঃ শরীরকে সুস্থ রাখা দরকার। প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্য চাই—পুষ্টিকর খাদ্য বিষয়ে আজকাল অনেকের দৃষ্টি পড়িয়াছে। যথার্থই এবিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া প্রয়োজন হইয়াছে, পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে বাঙ্গালী জাতি দুর্ব্বল, অল্পায়ু হইতেছে। সকলেরই মানসিক পরিশ্রম করিতে হইতেছে অথচ পুষ্টিকর বিশুদ্ধ খাদ্য পাওয়া যাইতেছে না। শিশুদের প্রথমতঃ প্রধানতঃ পুষ্টিকর বিশুদ্ধ খাদ্যের প্রয়োজন দ্বিতীয়তঃ তাহাদের যথেষ্ট ক্রীড়া কৌতুকের দরকার। অনেক পিতামাতা সন্তানকে ক্রীড়া কৌতুক করিতে দেখিলেই তিরস্কার করিয়া পড়িতে বলেন, ইহা যে কতদূর ভুল ধারণা তাহা বলা যায় না। ক্রীড়া কৌতুক তাহাদের শরীর মনের পক্ষে নিতান্ত আবশ্যকীয় ও সেইজন্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। তখন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চালনা দ্বারা ও বৃক্ষ লতা, নদী পর্ব্বত জীব জন্তু দেখিয়া নাড়িয়া শিখিবার সময়, পুস্তক পড়িয়া শিখিবার সময় নয়। আমাদের অধিকাংশ জ্ঞান, দেখিয়া শুনিয়া হয়। যাহারা এই প্রকৃতি পুস্তক ভাল করে পড়িতে পারে, তাহারাইত জ্ঞানী। সেইজন্য শিশুদের গৃহে, আবদ্ধ করিয়া, পুস্তকগত বিদ্যা কণ্ঠস্থ করিতে বলা উচিত নয়। তাহাদিগকে বাহিরে বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে ছাড়িয়া দিতে হইবে। বই পড়া তাহাও খেলিতে খেলিতে হইবে। কিণ্ডারগার্টেন অর্থ তাহাই। শিশু আনন্দ করিতে করিতে সহজে আপনি শিখিবে, প্রহার করিয়া তিরস্কার করিয়া শিখাইতে হয় না। এখন এবিষয়ে সকলকে শিখিতে হইবে, কিরূপে, শিশু শিক্ষা হওয়া দরকার। পাশ্চাত্য প্রদেশে শিশুশিক্ষা প্রণালী আলোচনা করিতে মাতাদের সভা (mother's meetings) হয়। বঙ্গ-

মাতারাও এবিষয়ে আলোচনা করুন, পরস্পরের নিকট হইতে সাহায্য লউন, সেই প্রণালীতে শিক্ষা দিন, দেখিবেন বঙ্গসমাজে নূতন যুগ উপস্থিত হইয়াছে।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার ও আফ্রিকার অসভ্য জমিদার।

মহাবীর আলেকজাণ্ডার কোন সময় দিগ্বিজয় উপলক্ষ্যে আফ্রিকাদেশে গমন করিয়াছিলেন। এই যাত্রায় তিনি এরূপ একটী স্থানে উপস্থিত হইলেন, যেখানকার অধিবাসীরা সভ্যতার সহিত কোন সংস্রব রাখে না, সামান্য কুটীরে বাস করে, যুদ্ধ কি পদার্থ তাহার কিছুই বোঝে না। গ্রামসমূহের অধিবাসিগণ পরস্পর ভ্রাতৃভাবে বাস করে। বিবাদ, বিসংবাদ, দুরাশা দুরাকাঙ্ক্ষার নাম গন্ধ নাই। শান্তি সর্ব্বদাই বিরাজমান। অধিবাসিগণ মহাবীরকে অভ্যাগত দেখিয়া তাঁহার যথোচিত সম্বর্দ্ধনা পূর্ব্বক তাহাদের জমীদারের বাটীতে লইয়া গেল। জমীদার ও তদীয় প্রজাদিগের ন্যায় সরল ও সাধুস্বভাব লোক ছিলেন। তিনি অতিথির উপযুক্ত সৎকার করিলেন। তাঁহার প্রীত্যর্থে সুবর্ণ পাত্রে সুবর্ণ-নির্ম্মিত ফল ও সুবর্ণ-নির্ম্মিত গোধূম উপহার প্রদান করিলেন।

আলেকজাণ্ডার বিস্ময়ান্বিত হইয়া জমীদারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনারা কি সোণার রুটী ও সোণার ফল আহার করিয়া থাকেন?"

জমীদার একটী প্রশ্ন করিয়া মহাবীরের প্রশ্নের উত্তর করিলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমার বিশ্বাস আপনাদের দেশে খাদ্যসামগ্রী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় তবে কি অভিপ্রায়ে আপনি এত কষ্ট স্বীকার করিয়া আমাদের এই অসভ্য দেশে আগমন করিয়াছেন"?

আলেকজাণ্ডার বলিলেন, "আমি বিলক্ষণ জানি যে আপনাদের দেশে প্রভূত পরিমাণ সুবর্ণ পাওয়া যায় কিন্তু আমি সুবর্ণের লোভে এখানে আসি নাই। আমি আপনাদের সমাজের আচার ব্যবহার অবগত হইবার জন্য আসিয়াছি"।

জমীদার বলিলেন "আপনি বড় সাধুলোক বেশ কথা বলিয়াছেন। যদি তাহাই আপনার অভিপ্রায় হয়, যতদিন ইচ্ছা আমাদের দেশে অবস্থান ও পরিভ্রমণ করুন"।

বীরচূড়ামণি আলেকজাণ্ডার ও অসভ্য জমীদার উভয়ের কথোপকথন হইতেছে এমন সময় জমীদারের দুইজন প্রজা বিচারপ্রার্থী হইয়া প্রভু জমীদারের সন্নিধানে উপস্থিত হইল। জমীদার জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাদের কি প্রয়োজন বল?" উভয় প্রজার মধ্যে যে ব্যক্তি বাদী সে বলিল "ধর্ম্মাবতার, আমি এই ব্যক্তির নিকট একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়াছি সম্প্রতি ঐ ভূমির মধ্য দিয়া একটী পয়ঃপ্রণালী বাহির করিবার জন্য খনন করিতে করিতে দেখিলাম, উহার মধ্যে একখণ্ড বহুমূল্য হীরক রহিয়াছে। এই বহুমূল্য দ্রব্য আমার নহে। আমি ইঁহার নিকট হইতে কেবল ভূমিই ক্রয় করিয়াছি এবং আমি

ভূমিই লইব, ভূমি ব্যতীত অন্য দ্রব্য লইব না। ভূমির নিম্নে এই গুপ্ত দ্রব্য পাইয়াছি। ইহা আমি লইতে পারি না। আমি ইঁহাকে এই জিনিষটী লইবার জন্য অনুরোধ করাতে ইনি আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করিলেন। আমি এইজন্য বিচার প্রার্থনায় আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি"। প্রতিবাদী উত্তর করিলেন। ধর্ম্মাবতার, বাদীর যেমন ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞান আছে আমারও তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে আছে। আমি ইঁহাকে ভূমি বিক্রয় করিয়া মূল্য গ্রহণ করিয়াছি, আমার ধ্রুব জ্ঞান এই, যখন আমি ভূমি বিক্রয় করিয়া নিঃস্বত্ব হইয়াছি, তখন ভূমির নীচে যাহা কিছু আছে, উহা স্বল্প মূল্যই হউক আর বহু মূল্যই হউক উহাতে ক্রেতার সম্পূর্ণ অধিকার জন্মিয়াছে। আমি কোন মতেই এই দ্রব্য লইতে পারি না। জমীদার উভয়ের কি কর্ত্তব্য উভয়কে স্পষ্ট করিয়া বুঝাইয়া দিলেন কিন্তু তথাপি উঁহারা পূর্ব্ব কথাই বলিতে লাগিল। তখন জমীদার বাদীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার না একটী বিবাহযোগ্য পুত্র আছে। বাদী বলিল হাঁ মহাশয়, আমার একটী পুত্র বিবাহযোগ্য হইয়াছে। জমীদার বলিলেন তবে এক কাজ কর। আমি জানি প্রতিবাদীর একটী বিবাহযোগ্যা কন্যা আছে। তোমাদের এই পুত্র কন্যাকে পরস্পর পরিণয়-সূত্রে আবদ্ধ কর এবং এই বহুমূল্য নিধি নবদম্পতীর যৌতুক স্বরূপ হউক। আলেকজাণ্ডার বিচার দেখিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। জমীদার আলেকজাণ্ডারকে বলিলেন "আমরা অসভ্যজাতি, আপনি বোধ হয় মনে করিতেছেন আমি অবিচার করিয়াছি।" আলেকজাণ্ডার বলিলেন—"অবিচার? না, কখনই না। কিন্তু আপনার বিচার প্রণালী দেখিয়া প্রকৃতই বিস্মিত হইয়াছি।"

জমীদার আলেকজাণ্ডারকে বলিলেন, "আপনাদের দেশে এইরূপ মোকদ্দমা উপস্থিত হইলে উহার নিষ্পত্তি কিরূপ হইয়া থাকে অনুগ্রহ করিয়া বলুন।" আলেকজাণ্ডার ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিলেন "আমাদের দেশে এইরূপ বিচার উপস্থিত হইলে বাদী কিম্বা প্রতিবাদী উভয়ের কাহাকেও না দিয়া রাজা নিজে ঐ বহুমূল্য দ্রব্য রাজকোষে প্রেরণ করেন।" জমীদার বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রাজা কি নিজের ব্যবহারার্থ ঐ বহুমূল্য দ্রব্য গ্রহণ করেন?" জিজ্ঞাসা করি "আপনাদের দেশের আকাশে কি সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে?" আলেকজাণ্ডার বলিলেন, "অবশ্যই সূর্য্যোদয় হইয়া থাকে।" জমীদার আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনাদের দেশে বৃষ্টি হয় কি?" আলেকজাণ্ডার বলিলেন "বৃষ্টি হইবে না কেন, অবশ্যই প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে।" জমীদার পুনশ্চ জিজ্ঞাসা করিলেন আপনাদের দেশে গরু বাছুর প্রভৃতি গৃহপালিত পশ্বাদি আছেত? এবং উহারা তৃণশস্যাদি আহার করিয়া জীবনধারণ করিয়া থাকেত? আলেকজাণ্ডার বলিলেন "অবশ্যই, গো মহিষাদি পশু তৃণগুল্ম প্রভৃতি খাইয়া বাঁচিয়া থাকে, এবং নানা জাতীয়

গৃহপালিত জীবের জন্য আমাদের দেশ প্রসিদ্ধ।" জমীদার বলিলেন, "এখন আমি বুঝিলাম। নিশ্চয়ই ঐ সকল নিরীহ জীবের জন্যই পরম কারুণিক পরমেশ্বর আপনাদের দেশের আকাশে অদ্যাপি সূর্য্যকে দীপ্তিশালী রাখিয়াছেন এবং তাহাদের জন্যই তথায় মেঘ ও বৃষ্টি হইয়া থাকে।" আলেকজাণ্ডার অপ্রতিভ হইয়া অধোবদনে ক্ষণকাল বসিয়া তথা হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

যক্ষ্মা।

গত আগষ্ট মাসের "ইণ্ডিয়ান লেডিজ ম্যাগাজিন" Indian Ladies' Magazine) এ একজন লেখক যক্ষ্মা সম্বন্ধে এক প্রশ্নোত্তরমালা লিখিয়াছেন। তিনি সমস্ত নেতাদিগের নিকটে, ধর্ম্মোপদেষ্টাদের নিকটে, জনসভার সভাবৃন্দের নিকটে, অধ্যাপকবর্গের নিকটে তাঁহার বিনীত নিবেদনটি জানাইয়াছেন। তিনি বলেন "যক্ষ্মা স্পর্শাক্রামক রোগ অথচ সতর্ক হইলে অনায়াসে এই রোগের সম্ভাবনা দূর করা যায়। এ বিষয়ে অজ্ঞতাই এই রোগের বৃদ্ধির হেতু। সাবধান হইলে দুএক পুরুষে এই রোগকে দেশ হইতে অন্তর্হিত করা যাইতে পারে। যাঁহাদের উপর বালকবালিকাদের ভার আছে তাঁহারা চেষ্টা করিলে সহজেই এই বিষয়গুলি তাহাদের বুঝাইয়া দিয়া এই রোগকে অপেক্ষাকৃত অল্লায়াসে দূরীকৃত করিতে পারেন। ধর্ম্মনেতাগণ এদিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে অনেক জীবহিংসা নিবারিত হয় অস্ত্রাঘাত হইতে আত্মরক্ষা সম্ভব কিন্তু চক্ষুর অগোচর এ বিষ যদি আমরা বিকীর্ণ করি তবে সে হিংসার আর প্রতিকার নাই।"

১। যক্ষ্মা কিরূপ পীড়া? পীড়াটি সাংঘাতিক অথচ সচরাচরই দেখা যায়, পৃথিবীর সর্ব্বত্রই আছে। মনুষ্য পশু কেহই বাদ যায় না।

২। এই ব্যাধি কোথায় বেশী? নগরের যেখানে লোকের ঠাসাঠাসি, পথ সঙ্কীর্ণ, যেখানে বায়ুর ও আলোকের অভাব।

৩। পীড়ার কারণ (নিদান) কি? এক প্রকার জীবাণু। ইহাদের বংশবৃদ্ধি হইলে জীবশরীরের যে অংশে ইহারা আশ্রয় গ্রহণ করে সেই স্থানটি ধ্বংস প্রাপ্ত হইতে থাকে। অথচ এই জীবাণু চক্ষুর অগোচর, শুধু অণুবীক্ষণ দ্বারা দেখা যায়।

৪। এই জীবাণুর আকৃতি কতটুকু? এত ক্ষুদ্র যে এক বর্গ ইঞ্চিতে ৪০ কোটী জীবাণুর স্থান হয়।

৫। শরীরের কোন কোন অংশ স্বভাবতঃ ইহার দ্বারা আক্রান্ত হয়? সর্ব্বাপেক্ষা শ্বাসযন্ত্র অধিক আক্রান্ত হয়; কিন্তু অস্থি, সন্ধি, গ্রীবাগ্রন্থি, মস্তিষ্কের আবরক ঝিল্লী, অন্ত্র ও অন্যান্য স্থানও আক্রান্ত হইতে পারে।

৬। কোন স্থান আক্রান্ত হইলে রোগ সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ হয়? মস্তিষ্কের আবরক ঝিল্লীতে এই রোগ হইলে (Meningites) অনতিবিলম্বে মৃত্যু হয়।

৭। সাধারণতঃ কোথায় বেশী হয়? শ্বাসযন্ত্রে। তখন ইহাকে ক্ষয়কাশ বা যক্ষ্মা কাশ বলে।

৮। এই পীড়ার অপকারিতা কি? দৈহিক যন্ত্রণা ও ক্ষয়ের তো কথাই নাই; তাহা ছাড়া পৃথিবীতে প্রায় ২০ লক্ষ লোক প্রতি বৎসর এই ব্যাধিতে মারা যায়।

৯। ভারতবর্ষে এই রোগে মৃত্যু-সংখ্যা কিরূপ? এক বোম্বাই বিভাগে গত ১৯০৬৭ সালে এই রোগে ৬০ হাজার লোকের বেশী মারা গিয়াছে। মধ্য প্রদেশে ১৬ হাজার এবং সেখানে গত কয়েক বৎসরের মধ্যে মৃত্যু সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণিত হইয়াছে। মান্দ্রাজের অবস্থা আরও ভয়ানক। ১৯০২ সালে মৃত্যু সংখ্যা ছিল ৫ হাজার, ১৯০৬ সালে ২৩ হাজারের বেশী। পূর্ববঙ্গ ও আসামে ৫ বৎসরে মৃত্যুসংখ্যা চতুর্গুণ হইয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে সেই সময়ের মধ্যেই ৫॥০ হাজার হইতে প্রায় ১০%০০ হইয়াছে, উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ২০০০০ ও পাঞ্জাবে ৫৭০০০ এই ব্যাধিতে মৃত্যুকবলিত।

১০। সাধারণতঃ কত বয়সে এই রোগ দেখা দেয়? সব বয়সেই এই ব্যাধি হইতে পারে তবে বেশীর ভাগ ১৫ বৎসর হইতে ৪০ বৎসরের মধ্যে।

১১। ধনীদের মধ্যে কি এই রোগ দেখা যায় না? খুব দেখা যায়। ধনী দরিদ্র কাহারও নিস্তার নাই।

১২। এই রোগ কি এক দেহ হইতে অন্য দেহে সংক্রান্ত হয়? হাঁ ইহা স্পর্শাক্রামক।

১৩। কিসে এই ব্যাধি অধিকতর বিস্তৃতি লাভ করে? দূষিত বায়ু, ক্ষীণ সূর্য্যালোক বীজাণুর বৃদ্ধির সাহায্য করে।

১৪। কোথা হইতে এই বিষ আসে? এই বিষ উদ্ভিজ্জজাতীয়, কাজেই বাহির হইতেই মনুষ্যদেহে আসে।

১৫। কেমন করিয়া দেহে প্রবেশ করে? নিশ্বাসের সঙ্গে শ্বাসযন্ত্রে এবং মুখ দিয়া পাকযন্ত্রে প্রবেশ করে।

১৬। শ্বাস যন্ত্রে কেন ইহার আক্রমণ অধিক? নিশ্বাসের সঙ্গে যে ধূলি যায় তাহাতে এ বিষ থাকে এবং এই জীবাণুর বৃদ্ধির পক্ষে মানুষের শ্বাসযন্ত্র একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র।

১৭। বায়ুতে এই বিষ কোথা হইতে আসে? আক্রান্ত ব্যক্তিগণের নিষ্ঠীবন (থুতু, গয়ার) শুষ্ক হইয়া গেলে সেই কণাগুলি ধূলির সঙ্গে মিশিয়া যায়।

১৮। রোগাক্রান্তের নিষ্ঠীবনে কি বহু-সংখ্যক জীবাণু থাকে? হাঁ। দেখা গিয়াছে একজনের নিষ্ঠিবন হইতে এক-দিনে ১০ লক্ষের অধিক জীবাণু বাহির হয়।

১৯। এই নিষ্ঠীবন কিরূপে রোগ বিস্তার করে? যদি শোধিত না হয় তবে জীবিত অণুগুলি ধূলির সঙ্গে বায়ুর মধ্যে থাকে। তখন নিশ্বাসের সঙ্গে বিষ দেহস্থ হয় অথবা মক্ষিকাদি এই বিষের দ্বারা খাদ্য দ্রব্যকে বিষাক্ত করে।

২০। খাদ্য দ্বারা এ রোগ সঞ্চারিত

হইতে পারে? পারে বৈকি। অনেক সময় রোগাক্রান্ত গরুর দুগ্ধ দ্বারা এই বিষ সঞ্চারিত হয়।

২১। যদি যক্ষ্মা রোগী নিষ্ঠীবন ত্যাগ না করে বা তাহার নিষ্ঠ্যূত শোধন করা হয় তবে কি ভয়ের কারণ নাই? কিছু না। অবশ্য কথা কহিবার কি হাসিবার কি কাশিবার সময় যেন অন্যের মুখের উপর থুথু না ছিটিয়া যায়।

২২। যাহাদের এই বিষের মধ্যে বাস তাহারা কি এই রোগকে এড়াইয়া চলিতে পারে? পারে, তবে একজন হয়তো এই বিষকে খুব পরাভূত করিতে পারে অন্যে তেমন পারে না। সুস্থ লোকের শ্বাসযন্ত্র কতক পরিমাণ এই বিষ ধ্বংস করিতে পারে।

২৩। এই পরাভব করিবার শক্তি কি এক এক সময় ক্ষীণ হইয়া যায়? হাঁ। রোগ-জীর্ণ উপবাস-শীর্ণ ব্যসন-ক্লিষ্ট অতি-শ্রান্ত শরীরে ও বাতাতপবর্জ্জিত-স্থান-বাসে এই রোগের আক্রমণ কিছু অধিক হয়।

২৪। সুরাপানে কেন যক্ষ্মা রোগের বৃদ্ধি হয়? একেতো পান দোষে শরীরের দৌর্ব্বল্য জন্মে, তদুপরি সুরার ফলে কুভোজন ও কুবাসস্থান। সবই রোগ-বৃদ্ধির অনুকুল।

২৫। এই রোগ কি পুরুষানুক্রমিক? ঠিক তাই নয়। তবে রোগাক্রান্তের সন্তানের এই রোগ-প্রবণতা থাকে এবং বিষের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া প্রায়ই রোগাক্রান্ত হয়।

২৬। ইহাকে পারিবারিক রোগ কেন বলে? পরিবারস্থ লোকের রোগ-প্রবণতা থাকে এবং অসাবধান রোগীরা বিষ চারিদিকে ছড়াইতে থাকে বলিয়া এক পরিবারের অনেকে এই ব্যাধিতে মারা যায়।

২৭।২৮। এই রোগের কি কি প্রধান লক্ষণ? বৈকালে জ্বর, দীর্ঘকাল-ব্যাপী কাশী, দৌর্ব্বল্য, অগ্নিমান্দ্য, নিশা-ঘর্ম্ম, রক্তনিষ্ঠীবন, স্বরভঙ্গ, হৃদ্‌ব্যথা।

২৯। সব লক্ষণই কি সব ক্ষেত্রে থাকে? না। কিন্তু প্রায়ই কয়েকটা লক্ষণ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই থাকে।

৩০। রোগাক্রান্ত হইয়াও কি কেহ ধরা না পড়িতে পারে? হাঁ, রোগের প্রথম অবস্থায় ধরা না পড়িতে পারে।

৩১। প্রথম লক্ষণগুলি কি? অসাধ্য কাসী, অল্পায়াসে শ্রান্তি ও দৈহিক ক্ষয়।

৩২। এই ব্যাধির নিশ্চিত প্রমাণ কি? নিষ্ঠীবনে এই জীবাণু দেখা গেলে রোগ নিঃসংশয়।

৩৩। এই রোগের বৃদ্ধি কি ত্বরিত গতিতে হয়? নাও হইতে পারে।

৩৪। যক্ষ্মা রোগী কি কাজকর্ম্ম করিতে পারে? রোগের কোন্ অবস্থা এবং কোন্ জাতীয় কাজকর্ম্ম ইহা না জানিয়া বলা যায় না।

৩৫। এই ব্যাধি কি আরোগ্য হয়? রোগের প্রথম অবস্থা হইলে আরোগ্য সম্ভব। চিকিৎসাও দিন দিন উন্নত হইতেছে।

৩৬। বিনা চিকিৎসায় আরোগ্য হয় কি? না।

৩৭। কোন বিশেষ ঔষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে? এখন ত হয় নাই, ভবিষ্যতে হইতে পারে।

৩৮। এই ব্যাধিতে উৎকৃষ্ট চিকিৎসা কি? উন্মুক্ত আলোকে ও বায়ুতে বাস, যথেষ্ট বলকারী আহার, এবং চিকিৎসকের অধীনে বিশ্রাম।

৩৯। এই রোগের আরোগ্যশালা কিরূপ? যেখানে উপযুক্ত বৈদ্যের অধীনে রোগীরা উন্মুক্ত বায়ুতে বাস করে, সতর্ক হইয়া চলিতে ফিরিতে শেখে এবং অন্য দেহে রোগ সঞ্চার করে না।

৪০। এই রোগ এড়াইয়া চলিতে পারা যায় কোন উপায়ে? রোগাণু হইতে দূরে থাকিয়া এবং যাহা কিছু ক্ষয়কারী তাহা বর্জ্জন করিয়া।

৪১। এই পীড়া দেশ হইতে একেবারে লুপ্ত করিয়া দিবার কি কোন উপায় নাই? আছে। সাবধানে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করা এবং রুগ্ন লোকের নিষ্ঠীবন নির্ব্বিষ করা।

৪২। নিষ্ঠীবন নির্ব্বিষ করার উপায় কি? দগ্ধ করা। নিষ্ঠীবনাধারে (Sputnm cup) বা খবরের কাগজে কি জলপূর্ণ পিকদানীতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে এবং পরে তাহা অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে।

৪৩। রোগী যদি থুতু গিলিয়া ফেলে তবে কি কোন আশঙ্কার কারণ আছে? আছে। অন্ত্রে কি পাকাশয়ে এই ব্যাধির একটি নূতন ক্ষেত্রে জুটিতে পারে।

৪৪। কাসীবার সময় রোগী কিরূপ সাবধান হইবে? সে সময় কাগজ কি ন্যাকড়াতে মুখ ঢাকিবে এবং পরে তাহা দগ্ধ করিবে।

৪৫। আর কোন প্রকারে রোগী হইতে রোগ সঞ্চার হয়? যে সব বস্তু তাহার মুখে লাগে (যথা—চামচ পেয়লা, গ্লাস ইত্যাদি) তাহার দ্বারা।

৪৬। তজ্জন্য কিরূপ সতর্ক হওয়া উচিত? রোগীর নিজের জন্য এক প্রস্থ বাসন থাকা উচিত এবং ব্যবহার করার পর সেগুলি সিদ্ধ করা উচিত।

৪৭। রোগীকে কি চুম্বন করা বিপজ্জনক? হাঁ। রোগীও যেন কাহাকেও চুম্বন না করে।

৪৮। রোগীর গৃহ সম্বন্ধে কি ব্যবস্থা করা উচিত? রোগীর দ্বার গবাক্ষ দিবারাত্রি খোলা থাকিবে। গৃহে কার্পেটাদি থাকিবে না। গৃহের সব পরদা সব বস্ত্রাদি মধ্যে মধ্যে সিদ্ধ করিতে হইবে। আর কেহ সেই ঘরে শয়ন করিবে না।

৪৯। ঘরের ধূলা কিরূপে ঝাড়িবে? ভিজা ঝাড়নে কি ঝাটাতে। ধূলি যেন না উড়ে।

৫০। মোটের উপর এই রোগের প্রতিষেধক কি কি? পরিষ্কৃতি, শরীরনিষ্ঠা, মিতাচার, যথেষ্ট আলো বায়ু ও আহার।

৫২। যক্ষ্মা রোগীর কোথায় বাস প্রকৃষ্ট? গ্রামে ও বিশেষতঃ পর্ব্বতে,

কারণ সেখানে ধূলা নাই। ধূলি-পথের পাশে বাস বিষবৎ।

৫২। রোগীর মৃত্যুর পর কি কি করা উচিত? ব্যবহৃত বস্তু ও গৃহ শোধিত করিবে। দ্রব্যাদি যথাসম্ভব পোড়াইয়া ফেলিবে।

৫৩। বিদ্যালয়ের বালকদের বিশেষ ভাবে কিরূপ সতর্ক হওয়া উচিত?

(ক) মেঝেতে বা দেওয়ালেতে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না।

(খ) স্লেটে নিষ্ঠীবন ত্যাগ করিবে না।

(গ) আঙ্গুল চুষিবে না।

(ঘ) পেন্সিল কলম প্রভৃতি যা, তা, মুখে দিবে না।

(ঙ) একের উচ্ছিষ্ট অন্যে খাইবে না বা একই দ্রব্য কামড়াকামড়ি করিয়া পরস্পরে খাইবে না।

(চ) অন্যের মুখে দেওয়া দ্রব্য ব্যবহার করিবে না।

(ছ) আঠা লাগাইতে হইলে খাম প্রভৃতি চাটিবে না বা থুতু দিবে না। পৃথিবীতে জলের অভাব নাই।

(জ) হাঁচিতে বা কাশীতে মুখের কাছে রুমাল বা ন্যাকড়া ধরিবে।

(ঝ) সাবান ও জলে হাত না ধুইয়া খাইতে বসিবে না।

(ঞ) যথাসম্ভব হস্ত গাত্র পরিষ্কার রাখিবে।

ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি।

ভক্তি ও প্রীতি মানব জীবনের একটি বিশেষ ভাবপূর্ণ বস্তু। ভক্তি ও প্রীতি মানব জীবনকে সুমধুর সুখময় ভাবে পূর্ণ করিয়া থাকে।

পুষ্পহীন লতা যেমন শূন্য বোধ হয়। ভক্তি ও প্রীতিহীন জীবনও সেইরূপ মাধুর্য্যহীন বোধ হয়। ভক্তি ও প্রীতির সম্মিলনে মানব জীবন এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া থাকে। ভক্তি ও প্রীতি হীন জীবন চিরকাল যেন মাধুর্য্যহীন ও শুষ্ক হইয়া থাকে।

ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি যে জীবনে নাই সে জীবন বাস্তবিকই শান্তিহীন শুষ্ক জীবন। কিন্তু যে জীবনে ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি সততই বিরাজমান থাকে, বাস্তবিকই সে জীবন বড় সুখী।

ভক্তবালক ধ্রুব ও প্রহ্লাদ রাজপুত্র হইয়াও একাকী ভীষণ বিপদ সঙ্কুল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া কেবল "পদ্মপলাশ লোচন হরি" কে ডাকিয়া যে সুখলাভ করিয়াছিলেন, রাজা হিরণ্যকশিপু ও উত্তানপাদ মহা-পরাক্রান্ত সমৃদ্ধিশালী রাজা হইয়াও তত সুখলাভ করিতে পারেন নাই। ভক্ত বালক ধ্রুব ও প্রহ্লাদের ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি ভাবিলে অনেক সময় মনে হয় বাস্তবিক ভক্ত জীবনই সুখী জীবন। ভক্ত জীবনই ধন্য।

সরল শিশু ধ্রুব মনের আবেগে একটি ভীষণকায় শার্দ্দূলকে জড়াইয়া ধরিয়া

বলিয়াছিলেন—"তুমি কি আমার পদ্মপলাশ লোচন হরি। মা বলিয়াছেন—"পদ্মপলাশ লোচন হরিকে ডাক, তিনিই তোমার দুঃখ দূর করিবেন। তবে কি তুমিই আমার সেই পদ্মপলাশ লোচন হরি। তবে তুমিই কি আমার দুঃখ দূর করিতে আসিয়াছ"। কি সরল বিশ্বাস। এতদিন আহার নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভীষণ বিপদ সঙ্কুল বনে বনে ভ্রমণ করিয়া কেবল বাঞ্ছিত ধন পদ্মপলাশ লোচন হরিকে এক মনে এক ধ্যানে ডাকিয়াছিলেন। কতদিন অনাহারে অনিদ্রায় পদ্মপলাশ লোচন হরির দর্শন না পাইয়াও ভক্তশিশু ধ্রুব নিরাশ হন নাই। তবুও ঈশ্বরবিশ্বাসী ভক্ত সন্তান ধ্রুব এক মনে এক ধ্যানে ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলেন। ধন্য অপূর্ব্ব বিশ্বাস !!

ভক্তশিশু ধ্রুব ও প্রহ্লাদ কত কষ্ট পাইয়াও ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলেন, কিন্তু আমরা দিনান্তেও ঈশ্বরকে একবার ভাল করিয়া ডাকিতে পারি না।

যে পরিবারে ঈশ্বরে ভক্তি প্রীতি নাই, বাস্তবিক সে পরিবার যেন মাধুর্য্য হীন পরিবার। সেই পরিবারে সর্ব্বদাই অশান্তি বিরাজ করিয়া থাকে। যে পরিবারে ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি আছে। সে পরিবার যথার্থই সুখী পরিবার। সে পরিবারে সর্ব্বদাই সুখশান্তি বিরাজ করিয়া থাকে।

গন্ধহীন পুষ্প যেমন অনাদরে শুকাইয়া যায়, উন্মত্ত ভ্রমর যেমন গুণ্ গুণ্ রবে গন্ধহীন পুষ্পরেণু সঞ্চয় করে না, শুষ্ক ফুল গুলি অনাদরে শুকাইয়া নীরবে ঝরিয়া পড়ে। ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি বিহীন জীবনও সেইরূপ আনন্দবিহীন হইয়া থাকে। তাহার জীবনের মাধুর্য্য আর থাকে না। কেবল নীরবেই জীবন প্রদীপ নির্ব্বাণ হয়। সেই জীবনের দ্বারা পৃথিবীর কোনও উপকার সাধিত হয় না। যে জীবনের দ্বারা পৃথিবীর কোন উপকার সাধিত হয় না, সে জীবন বাস্তবিক ব্যর্থ জীবন।

প্রকৃত জীবন কাহাকে বলে? যে জীবনে ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি সরলতা প্রফুল্লতা, নম্রতা, দয়া, সৌজন্য প্রভৃতি সুমধুর ভাবে পরিপূর্ণ সেই জীবনই প্রকৃত জীবন।

দ্বেষ হিংসা হীন জীবনই প্রকৃত জীবন। মৈত্রেয়ী, গার্গী, লীলাবতী, রাবেয়া এইরূপ আরও কত কত আর্য্য মনীষিগণ ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতির জন্য যেরূপ ব্যাকুল ভাবে ঈশ্বরকে ডাকিয়া তাঁহাদের পবিত্র জীবনের মাধুর্য্য দেখাইয়া যুগ যুগান্তরেও প্রাতঃস্মরণীয়া হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদের যদি এইরূপ ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি না থাকিত তবে তাঁহাদের জীবনে এমন কোনও মাধুর্য্য থাকিত না যাহাতে যুগ যুগান্তরেও তাঁহাদের পবিত্র নাম আমাদের মুখে ধ্বনিত হইত।

আবার নিতান্ত ঈশ্বর অবিশ্বাসী ও ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতিহীন মানবের মনেও আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। তাহারাও আবার ঈশ্বর বিশ্বাসী হয়। তাহারাও

আবার ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ হইয়া থাকে।

রত্নাকর অতি ভীষণ দস্যু হইয়া এক দিন অতি শুভ-মুহূর্ত্তে ভগবান্ প্রেরিত যোগিদ্বয়ের দর্শন পাইয়া তাঁহাদের উপর ডাকাতি করিতে যাইয়া তাঁহাদের মুখ হইতে যাহা শুনিয়াছিলেন তাহা পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন যোগিদ্বয়ের কথাই সত্য, তখন তাঁহার আশ্চর্য্য ভাবান্তর ঘটিয়াছিল। দস্যু-হৃদয় গলিয়া গিয়াছিল। তারপর তাঁহার ঈশ্বর বিশ্বাস ও ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতি এমন প্রবল ভাবে জাগিয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার জঘন্য দস্যুবৃত্তির জন্য মনে খুব অনুতাপ হইতে লাগিল। এবং অচিরে যোগীদ্বয়ের নিকটে যাইয়া বলিলেন—"আমার উপায় করুন"। আমি কিরূপে পাপ হইতে মুক্ত হইব। তখন যোগিদ্বয় ঈশ্বরে ভক্তি ও প্রীতিপূর্ণ হইয়া তাঁহাকে ডাকিতে বলিয়াছিলেন। দস্যু রত্নাকর সেই অবধি জঘন্য দস্যুবৃত্তি পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক মনে এক ধ্যানে ঈশ্বরকে ডাকিতে লাগিলেন। রত্নাকর পরে ঈশ্বরে এত তন্ময় হন যে বল্মীক তাঁহাকে আচ্ছাদন করিলেও, তিনি তাহা অনুভব করিতে পারেন নাই। কেবল বাহ্য-জ্ঞান রহিত হইয়া ঈশ্বরকে ডাকিয়াছিলেন। কি আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন!! সেই রত্নাকর দস্যুই একদিন অতি শুভ-মুহূর্ত্তে বাল্মিকী নাম প্রাপ্ত হইয়া জগতে অমর ও প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। আজও গৃহে গৃহে তাঁহার পবিত্র নাম ধ্বনিত হইতেছে। সেই রত্নাকর দস্যুই একদিন একজন ব্যাধকে একটী ক্রৌঞ্চ মিথুনকে বধ করিতে দেখিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া ব্যাধকে এই বলিয়া শাপ দিয়াছিলেন যে;—

"মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতী সমাঃ,
যৎ ক্রৌঞ্চমিথুনাদেকমবধীঃ কামমোহিতঃ।"

বাস্তবিক ঈশ্বরের নামের কি মহিমা! আমরা অবোধ নরনারী, তাঁহার মহিমা বুঝা আমাদের সাধ্যাতীত।

আর্য্য-মনীষিগণের পবিত্র জীবনের মাধুর্য্য স্মরণ করিয়া তাঁহাদের পবিত্র পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভক্তজীবনের উপাদানে, আমাদের জীবনকে মাধুর্য্যময় করিয়া গঠন করিতে পারিলে তবেই আমরা ধন্য হইব। বাস্তবিক! তবেই আমরা সুখী জীবন লাভ করিতে পারিব।

বিধাতার অজস্র শুভ-আশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকে বর্ষিত হউক। আমরাও পবিত্র হৃদয়ে তাঁহার পবিত্র চরণে আমাদের পবিত্র বাসনা জানাইয়া তাঁহারই শুভ-আশীর্ব্বাদে নবীন উৎসাহে আমাদের কর্ত্তব্য পালন করি।

শ্রী নির্ম্মলাবালা পাল।
সাধনাকুঞ্জ।

সংসর্গ।

মানবের প্রকৃতি এই যে, মানব কখনও একা থাকিতে পারে না। কারণ একা কেহ কোনও কার্য্য করিতে পারে না। সুতরাং জীবনে একজন সহচর চাই। মানুষ চোরের সঙ্গে থাকিলে চোর

হয়, সাধুর সঙ্গে থাকিলে সাধু হয়। অসত্তের সঙ্গে থাকিলে অসৎ হয়, সৎলোকের সঙ্গে থাকিলে সৎ হয়।

একটী শিশু জঙ্গলের নিকট কোনও কুটীর হইতে ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক অপহৃত হয়। সে বাঘিনী দ্বারা প্রতিপালিত হইয়াছিল। তাহাতে তাহার প্রকৃতি ঠিক বাঘের মত হইয়াছিল। সে ২ পায়ে হাঁটিতে শিখে নাই চারি পায়ে হাঁটিত। গো মহিষাদির মাংস খাইত। একদিন একজন শিকারী ব্যাঘ্র শিকার করিতে গিয়া সেই বাঘিনীটাকে শিকার করে। তারপর তাহার বাচ্চাটাকে আনিয়া দেখে যে সেটা মানুষ। কিন্তু তাহার আচার ব্যবহার ঠিক বাঘের মত। এইরূপ, মানুষ জন্তুর সহিত থাকিলে জন্তুর প্রকৃতিও পায়। আবার এরূপও দেখা যায় যে, ধার্ম্মিক সচ্চরিত্র লোকের সঙ্গে থাকিয়া মানুষ অতি সচ্চরিত্র ও দেবপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়।

সাধুনাং দর্শনং পুণ্যং তীর্থভূতা হি সাধবঃ। তীর্থ ফলতিকালেন সদ্যঃ সাধু সমাগমঃ॥

জগাই মাধাই ঘোর পাপী ও মদ্যপায়ী ছিল। লোকের প্রতি সর্ব্বদা অত্যাচার করিত। মদ খাইয়া রাস্তায় পড়িয়া থাকিত। পাড়াপ্রতিবাসীকে সর্ব্বদা উৎপীড়ন করিত। একদিন তাহারা চৈতন্যদেবকে রাস্তায় পাইয়া অকারণে অত্যন্ত প্রহার করে। কিন্তু চৈতন্যদেব তাহার প্রতিশোধ না লইয়া তাহাদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলেন যে তোমরা হরিভক্ত হও। তোমাদের পাপ বিমুক্ত হইবে ক্রমে তাহারা হরিনাম জপ করিতে ও চৈতন্যের সংসর্গে হরিসঙ্কীর্ত্তন করিতে করিতে এরূপ ধার্ম্মিক হইয়া পড়িল যে লোকে তাহাদিগকে পরম সাধু পুরুষ বলিয়া সম্মান করিত। পুস্তকও মানবের নির্জ্জীব সঙ্গী। সুপুস্তক পাঠে সাধু সঙ্গের ও কুপুস্তক পাঠে অসাধু সঙ্গের ফল নিশ্চয়ই পাওয়া যায়।

সৎগ্রন্থ পাঠ করিবার কালে মনে হয় যেন গ্রন্থপ্রণেতারা স্বয়ং পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া উপদেশ প্রদান করিতেছেন। কুপুস্তক পড়া অপেক্ষা আজীবন নিরক্ষর হইয়া থাকা শতগুণে শ্রেষ্ঠ।

অতি শৈশব হইতেই মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হয়। বাল্যে মানুষের চরিত্র যে ভাবে গঠিত হয় পরে তাহা পরিবর্ত্তিত হইতে কদাচিৎ দেখা যায়। শিশুদিগকে অতি সাবধানে রাখা উচিত। কারণ তাহাদের মন অত্যন্ত কোমল এবং তাহাদের ভালমন্দ বিচার করিবার শক্তি নাই। কাজেই তাহারা অসৎ সংসর্গে পড়িলে নষ্ট হইয়া যায়। মনুষ্যমাত্রেরই অসৎ বিষয় অনুকরণে যতদূর প্রবৃত্তি হয় সৎ বিষয়ে অনুকরণে তত প্রবৃত্তি হয় না। বাল্যে যাহারা অসৎ হয় তাহারা বয়োঃপ্রাপ্ত হইলে কদাচিৎ সুখের মুখ দেখিতে পায়। সুতরাং বাল্যে যাহাতে চরিত্র অসৎ না হয় সেইরূপ চেষ্টা করা আমাদের সকলেরই কর্ত্তব্য।

শ্রী বনলতা দাস।

বীমা। *

আজকাল আমাদের দেশেও অনেকে জীবনবীমা করিতেছেন, কিন্তু ইউরোপ ও আমেরিকার তুলনায় তাহার সংখ্যা নিতান্ত কম। পাশ্চাত্য প্রদেশে ১০০।১৫০ বৎসর পূর্ব্বে জীবনবীমা যেরূপ ছিল, আমাদের দেশে এখন সেই রকম। সেখানে, জীবনবীমার বহুল বিস্তারে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। সেখানে লোকে সব জিনিষই (Insure) বীমা করে। আমাদের এখানে যে সকল বীমা করা হয়, তাহা কেবল এইরূপ যে, কোনও লোকের মৃত্যুর পর তাহার পরিবার সেই অর্থ পাইবেন বা বৃদ্ধবয়সে সেই অর্থ পাইবেন। আমাদের দেশে বীমার বেশী প্রচলন হয় নাই, তাহার অনেক কারণ আছে। এদেশে মৃত্যু সংখ্যা বেশী সেজন্য বাৎসরিক ও ষান্মাসিক বা মাসিক দেয় টাকার হার বেশী, মৃত্যুসংখ্যা অধিক হইলে, অধিক লোকের টাকার সংস্থান করিতে হইবে। এদেশে লোকের জীবন গড়ে ৪০।৪৫ ওদেশে ৫০।৬০, এই সকল কারণে এখানে মাসে মাসে অধিক অর্থ দিতে হয়। বীমার প্রচলন, সেই জাতির সভ্যতার পরিচয় দেয়। অসভ্যেরা কখনও বীমা করে না, সভ্যতা অনেকদূর অগ্রসর হইলে, তবে বীমা হয়। বীমা বা Insure করার অর্থ কি, ক্ষতি হইতে রক্ষা করা, ভবিষ্যতের জন্য ব্যবস্থা করা, ভবিষ্যতে কি হইতে পারে, কি কি ক্ষতি হইতে পারে, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে ব্যবস্থা করা। অসভ্যেরা কখনও বেশী দিনের কথা ভাবিতে পারে না, এমন কি গ্রীষ্মকালে, শীতকালের কথা ভাবিতে পারে না। মানুষ যত সভ্য হয় ততদূর ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া তাহার জন্য ব্যবস্থা করিয়া রাখে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, পাশ্চাত্য প্রদেশে সব জিনিষই বীমা করা হয়। যত লোকের যত গরু ঘোড়া আছে সব Insure করা, যখনই কোন লোক গরু বা ঘোড়া ক্রয় করে, তখন হইতেই তারজন্য মাসে মাসে কিছু দিতে আরম্ভ করে। যদি হঠাৎ ঘোড়া মারা গেল, ঘোড়ার অভাবে কাজকর্ম্ম বন্ধ করতে হবে না, ক্ষতিগ্রস্তও হতে হবে না, Insure Companyর টাকা এনে, ঘোড়া ক্রয় করা হয়। আমাদের এখানে, ডাক্তারদের প্রায়ই ঘোড়া মারা যায়, তাহাতে কাজকর্ম্মের অসুবিধা হয়, ক্ষতিও হয়। গরুর বিষয়েও তাই গরীব কৃষকেরা অনেক কষ্টে একজোড়া গরু কিনে, চাষ আরম্ভ করিল, হঠাৎ একটী গরু মরে গেলে, তার কাজকর্ম্ম বন্ধ উপার্জ্জন বন্ধ, কিম্বা, তার হাতে এমন টাকা নাই, যে তখনই একটা গরু কেনে কিন্তু বীমাকরা থাকিলে, আর কোন ভাবনা নাই। তেমনি যত বাড়ী দোকান, সব বীমা করা থাকে, পুড়েগেলে, একেবারে সর্ব্বস্বান্ত হতে হয় না। জাহাজও বীমাকরা আছে, জাহাজের বীমা না করলে, চলে না, কারণ তার বিপদ

* ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে গত ৩১শে মার্চ্চ শ্রীযুক্ত শরৎকুমার দত্ত মহাশয়ের প্রদত্ত বক্তৃতা অবলম্বনে লিখিত।

বেশী। দোকানের সামনে যে বড় বড় দামী কাচ থাকে, তাহাও বীমাকরা। কারখানায় যতলোক প্রবেশ করে, তারা সকলে বীমা করিতে বাধ্য কারণ তাহাদের মধ্যে প্রায়ই দুর্ঘটনা হয়, হস্তপদে আঘাত পাইয়া তাহারা কিছুকালের জন্য কর্ম্ম করিতে অক্ষম হয়। যখনই তারা পীড়িত বা আহত হইয়া কার্য্য করিতে অক্ষম হয় তারা সেই সময়ে বীমা হইতে অর্থ সাহায্য পাইবে যাহাতে তাহারা বা তাহাদের পরিবারবর্গ অনাহারে কষ্ট না পায়। এই রকম ঝি চাকর সকলেই বীমা করে, অসুস্থ হইলে, অর্থ পায়। যে সকল ছাত্র বিদেশে আসিয়া ছাত্রাবাসে থাকে, তাদের প্রত্যেককে কিছু কিছু অর্থ মাসে দিতে হয়! কাহারও পীড়া হইলে, তাহার জন্য চিকিৎসক ডাকা, ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা সব তাহা হইতে হয়। সেখানে সববিষয়েরই এই রকম বীমা করা থাকে। কন্যার বিবাহের জন্যও কন্যা জন্মগ্রহণ করিলেই বীমা করা হয়, কন্যার বিবাহের সময় অর্থ পাওয়া যায়। কিন্তু কন্যার মৃত্যু হইলে টাকা ফেরত পাওয়া যায় না।

তার উপকারিতা কি? প্রথমতঃ মানুষ নিশ্চিন্ত হইতে পারে। নিশ্চিন্ত হইলে, শরীর মনে কার্য্য করিবার বেশী উৎসাহ উদ্যম পাওয়া যায়। দ্বিতীয়, পরিবারের পিতা বা উপার্জ্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যু হইলে, সেই পরিবারকে অকুল-পাথারে ভাসিতে হয় না। পিতার হঠাৎ মৃত্যুতে পরিবারের কিরূপ দুর্দ্দশা হয়, তাহা আমরা অনেক দেখিয়াছি। কত ভদ্র পরিবার হঠাৎ ঘোর দরিদ্রতায় পড়িয়া তাহাদের ভদ্রত্ব হারাইয়াছে। পুত্র কন্যাগুলি, উপযুক্ত শিক্ষার ও পুষ্টিকর আহারের অভাবে, নীচ প্রকৃতি হইয়াছে, ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। যাহাদের পিতা জীবিত থাকিলে, তাহারা সুশিক্ষা পাইয়া অন্নবস্ত্রের চিন্তাশূন্য হইয়া, ভদ্রসমাজের মধ্যে গণ্য হইত। যদি জীবন বীমা করা থাকে, হঠাৎ মৃত্যু হইলেও, পরিবারবর্গকে অন্নবস্ত্রের জন্য চিন্তা করিতে হয় না।

কেহ হয়ত, অতি অল্পদিন বীমা কোম্পানীতে অর্থ দিয়া মারা গেলেন, তাঁহার পরিবার যে অর্থ পাইলেন, তাহা কোথা হইতে আসিল? বীমা অফিস হইতে তাহা সংগ্রহ করা হইল, কিন্তু দ্বারে দ্বারে গিয়া ভিক্ষা করিতে হইল না। বীমার উৎপত্তি কিসে হইল, প্রথম কথা এই যে সকলেরই বিপদ হইতে পারে, রোগ হইতে পারে, আগুনে ঘর পুড়িয়া যাইতে পারে। সকলেরই যে বিপদ হবে, তা বলছি না, কিন্তু সবারই হবার সম্ভাবনা আছে, আমার তোমার সকলেরই হতে পারে, তাহার জন্য পূর্ব্ব হইতে একটা ব্যবস্থা করিয়া রাখা। সকলে মিলিয়া এক জায়গায়, অল্প কিছু করে অর্থ জমা করিলাম, যার যখন, বিপদ হইল, তাকে সাহায্য করা হইল। ইহাতে কত সুবিধা, প্রত্যেকেই মাসে মাসে অল্প অল্প করিয়া দিতে হইল, কিন্তু বিপদের সময় একেবারে যথেষ্ট অর্থ পাওয়া গেল। বেশী দিতেও হয় না ও ভবিষ্যতের

জন্য নিশ্চিন্তও থাকিতে পারা যায়। আমাদের দেশের লোক বলবে কবে আমার বাড়ী পুড়বে, কি না পুড়বে, আমি আজ থেকে তার টাকা জমা দি। আমাদের মনের এই ভাব, আমি টাকা জমা দেব, আমার বাড়ী না পুড়লে, সেই টাকাত আমি পাব না অন্যের সাহায্যার্থ যাবে, তবে কেন দেব। কিন্তু ভাবিয়া দেখিনা আমার যদি বাড়ী পুড়ে যায়, মাসে মাসে অল্প কিছু টাকা দিয়ে, তখন, একেবারে অনেক টাকা সাহায্য পাব। সেই টাকাটা সকলের নিকট হতে সংগৃহীত। সকলের জন্য ভাবা হইল। কলিকাতায় সেদিন ভয়ানক আগুন লাগিয়াছিল তাহার অধিকাংশ দোকানই বীমা করা ছিল, যাদের করা ছিল না, তাদের একেবারে সর্ব্বনাশ। বীমার অর্থ পাইবার কতকগুলি নিয়ম আছে, জেনে শুনে বিপদের মধ্যে যাবে না, যাইলে সাহায্য পাইবে না। আগুন নিয়ে খেলা করলে, বাড়ী পুড়ে গেলে টাকা পাবে না। যে রকম অবস্থায় যে রকম কাজ করিতে করিতে বীমা করিয়াছে, তার পরিবর্ত্তন করিলে, তখন কোনও বিপদ হইলে, টাকা পাবে না। যেমন কোনও লোক নগরে বাস করিবার সময় বীমা করিয়াছিল, সে যদি নাবিক হয় সমুদ্রে যায় তার বিপদের সম্ভাবনা বেশী। সেখানে কোনও বিপদ ঘটিলে সাহায্য পাইবে না।

সুখী কে ?

১৮৬৯ সনের একদিন গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে মনটা বড়ই উচাটন হইয়া উঠিল। ঘরে কোনরূপেই আর রহিতে পারিলাম না। সেই প্রখর সূর্য্যোত্তাপের মধ্যেই একটা ছাতি হাতে লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। সেই প্রখর কিরণ-সাগরের মধ্য দিয়া ছাতি মাথায় গলদ্‌ঘর্ম্ম শরীরে নিকটস্থ এক পাহাড়ের পাদদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। সেখানে এক বৃক্ষতলে দাঁড়াইয়া সুমন্দ মারুত-হিল্লোলে কতকটা শ্রান্তি দূর হইল। পাহাড়ের উপরের দিকে চাহিয়া দেখিলাম এক কাঠুরিয়া কাঠ কাটিতেছে। উহাকে দেখিয়াই আমার জ্ঞানের উন্মেষ হইতে লাগিল। এতক্ষণ আমার মনঃকষ্টের কারণ কিছুই ঠিক করিতে পারি নাই। কাঠুরিয়াকে দেখিয়া মনে করিলাম ও বেশ সুখে আছে। অমনি ঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলাম--আমি যে পরিবার পরিজন ছাড়িয়া এই দূরদেশে আসিয়াছি সেই কষ্টেই আমার মন উচাটন হইয়াছে। বোঝা মাত্রই মনে অনেকটা শান্তি আসিল। কয়েক মাস পূর্ব্বে আমি পরিবার পরিজন ছাড়িয়া এই ঘোরতর বিদেশে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। বলিতে গেলে এই আমার একরূপ প্রথম বিদেশে প্রবাস। ইহার পূর্ব্বে যেখানে ছিলাম সে স্থান বাড়ী না হইলেও বাড়ীর অতি নিকটে ছিল। কাঠুরিয়াকে দেখিয়া মনে হইল বাড়ী ঘর আত্মীয় পরিবার মনে পড়াতেই মনটা অসুখী হইয়াছিল। কিন্তু

এখন কারণটা বোঝাতে যেন একটা সাগর সাঁতারিয়া আসিয়া উঠিলাম মনে হইতে লাগিল।

কাঠুরিয়াকে লক্ষ্য করিয়া পাহাড়ের পথে উঠিতে লাগিলাম। পাহাড়টি অতি অনুন্নত, বোধ হয় ১৫০ ফুটের অধিক উচ্চ হইবে না। উঠিতে উঠিতে অপ্রবাসীর সুখের কথা আলোচনা করিতে লাগিলাম। অমনি মহাভারতের সেই মহাবাক্য মনে হইল ;—

"অঋণী অপ্রবাসী চ স বারিচর মোদতে।"

হৃদয়ের ঘাত-প্রতিঘাতে যুধিষ্ঠিরকে মানব-প্রকৃতির দুঃখাভিজ্ঞ গুরু বলিয়া মনে করিতে লাগিলাম। মনে হইল বনবাস বা প্রবাস একই কথা। যুধিষ্ঠির বনবাসে যাইয়া আত্মীয় স্বজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাসীর দুঃখটা বেশ বুঝিয়া ছিলেন। তাই প্রশ্নোত্তরে বকরূপী ধর্ম্মকে অপ্রবাসীর সুখশান্তির কথাটা বলিতে ভুলেন নাই।

চিন্তা করিতে করিতে পাহাড় আরোহণ করিয়া আমি কাঠুরিয়ার নিকটস্থ হইলাম। আমাকে দেখিয়াই সে একটুকু চকিত হইয়া সেলাম করিল এবং কাঠ কাটিতে নিবৃত্ত হইল। আমিও সেলাম গ্রহণ করিয়া তাহার আপাদমস্তক চাহিয়া দেখিলাম, সর্ব্বাঙ্গ বাহিয়া ঘর্ম্ম ঝরিতেছে। আমি প্রথমেই তাহার গলদ্ঘর্ম্ম পরিশ্রমের সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া কথা পাড়িলাম। আমার সহানুভূতি পাইয়া সে বড়ই আপ্যায়িত হইল এবং আমাকে একজন হিতাকাঙ্ক্ষী বলিয়া মনে করিল। কাঠুরিয়া বৃক্ষতলে আমার নিকটে আসিয়া দাঁড়াইল। এবং এই ভয়ানক রোদের মধ্যে কেন আমি আসিয়াছি জিজ্ঞাসা করিল। আমি তাহাকে সে কথার কি উত্তর দিয়াছিলাম মনে হয় না। কথা-প্রসঙ্গে তাহার বাড়ী যে পাহাড়েরই অতি নিকটে, এবং পরিবারে তাহার কে কে আছে জানিয়া লইলাম। পরিশেষে আমার অভিলষিত প্রশ্ন তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি তো তাহা হইলে বেশ সুখে আছ ?" সে অতি কষ্ট প্রকাশ করিয়া বিনীতভাবে বলিল "সারাদিন খাটিয়া কাঠ কাটি, বাজারে বিক্রয় করিয়া যাহা পাই তাহা দিয়া অতিকষ্টে সংসার চালাই। আমরা কেবল দুঃখ ভোগ করিতেই আসিয়াছি। আপনারাই সুখী আপনাদিগকে এই দুপরবেলায় রোদ ভোগিতে হয় না। মাস গেলেই যথেষ্ট টাকা পান, সুখে সংসার চালাইয়া আরো কত টাকা আপনারা জমাইতেছেন। আমাদিগকে পড়িয়া থাকিলেই উপোস করিতে হয়। তাহার কথায় বুঝিলাম সে মনে করিতেছে তাহার মত দুঃখী জগতে আর কেহ নাই।

তাহার কথা শুনিয়া রুষের প্রতাপান্বিত জার হইতে পৃথিবীর অতি দুঃখী লোক পর্য্যন্ত রাসের পুতুলের মত আমার মনঃচক্ষুর সম্মুখে ঘুরিতে লাগিল। আমি দেখিলাম পৃথিবীর মধ্যে সকলেই আপনা অপেক্ষা অন্যকে সুখী ভাবে এবং দুঃখ কষ্টের ভারি বোঝাটা যেন ভগবান্ তাহারই মাথায় চাপাইয়া দিয়াছেন মনে করে। এইজন্য আপনার অবস্থায় কেহই সুখী

হইতে পারে না, কেবল তাহা নয় অধিকাংশই আপনাকে হতভাগ্য মনে করিয়া জ্বলিয়া পুড়িয়া মরে। ইহা আসক্তিরই প্রায়শ্চিত্ত ভগবানের বিশেষ দণ্ড। এই দণ্ড লোকে বুঝিয়াও পরিহার করিতে পারে না। কেবল সেই পারে যে নির্লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করে।

কাঠুরিয়াকে এই কথা গুলি নানারূপে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। বহু লোকেও যে দুঃখী তাহাও তাহাকে বলিলাম। আমি যে পরিবার পরিজন ছাড়িয়া বিদেশে রহিয়াছি তাহাতে যে আমার কত কষ্ট তাহাকে তাহা বুঝাইতে চাহিলাম। কিন্তু সেটা যে একটা কষ্ট সে কিছুতেই তাহা বুঝিল না। অর্থ না থাকলেই যে ভয়ানক কষ্ট সে কেবল বার বার তাহাই বলিতে লাগিল। বড়লোকেরা বড় সুখী, তাহাদিগকে খাটিতে হয় না, বসিয়া বসিয়া ভাল খায় পরে, ভাল ঘর বাড়ীতে থাকে, কত সুখ ভোগ করে সে পুনঃ পুনঃ তাহাই বলিতে লাগিল। গরীবদের কত দুঃখ তাহা বর্ণণা করিতেও সে ছাড়িল না। কাঠুরিয়ার সঙ্গে অনেক কথা হইল। সে সকল কথা এখন অক্ষরে অক্ষরে মনে নাই; স্মৃতিপট খুলিয়া দিলেও সে ঝাপ্‌সা চিত্র হইতে কথা উদ্ধার করা বিড়ম্বনা হইবে। তাই কাঠুরিয়ার কথা ছাড়িয়া, আমি তাহাকে কি বলিয়াছিলাম তাহারই মর্ম্ম লিখিলাম।

আমি তাহাকে বলিয়াছিলাম "তুমি যেমন আপনাকে দুঃখী মনে কর, আমিও সেইরূপ আমাকে দুঃখী মনে করি। রাজা হইতে গরীব পর্য্যন্ত সকলেই এইরূপ আপন আপন অবস্থায় দুঃখী। প্রত্যেকেই মনে করে তাহার মত দুঃখী আর জগতে নাই। তোমার অবস্থায় তুমি সুখী হইলেই দেখিতে পাইবে, জগতের লোক তোমা অপেক্ষা কত দুঃখী! তুমি যে এখন আপনাকে সুখী মনে করিতে পার না সে কেবল তোমার নানা প্রকার কল্পিত সুখেচ্ছা ও আসক্তিরই দণ্ড ভোগ করিতেছ বলিয়া। তোমার যখন দিব্য জ্ঞান হইবে, এই দণ্ডেরও অবসান হইবে; তুমি তখন আপনি যে সুখী বুঝিতে পারিবে এবং অন্যকে দুঃখী দেখিয়া কত সহানুভূতি করিবে। ভগবান্‌কে বিশ্বাস কর, তিনি তোমাকে যখন যে অবস্থায় রাখেন তাহাতেই সুখী হও। তাহা হইলেই "জগতের সকলেই সুখী আর তুমিই দুর্ভাগা" এই যে অজ্ঞানতা মোহ ইহা দূর হইবে।

আমার কথা যে সে সব বুঝিল মনে হইল না। কিন্তু যাহা বুঝিল তাহাতেই তাহার অনেকটা শান্তি হইল। তাহার মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া আমি তাহা বুঝিয়া লইলাম। কিন্তু তাহার সহিত কথা বার্ত্তায় আমার দিব্য জ্ঞানের উন্মেষ হইল। তাহার অপেক্ষা আমার লাভ অনেক হইল। আমি কাঠুরিয়াকে বলিতে বলিতে নিজের কথা গুলির মর্ম্ম নিজেই বেশ করিয়া বুঝিলাম। বুঝিলাম "আমি যে নিজেকে দুঃখী মনে করি ইহা আমার নিজেরই পাপের ফল বা প্রায়শ্চিত্ত। যে পর্যন্ত আমার আসক্তির

বন্ধন ছিন্ন না হইবে সে পর্যান্ত আমি আমার অবস্থায় সুখী হইতে পারিব না। অন্যকে সুখী দেখিব, নিজে কিছুতেই সুখী হইতে পারিব না। ভগবানে বিশ্বাস হইলে এবং আসক্তির মোহ দূর হইলেই আমি যখন যে অবস্থায় থাকি না কেন তাহাতেই সুখী হইতে পারিব এবং তখন অন্যের দুঃখের সহিত সহানুভূতি করিয়াও আমি কত আরাম পাইতে পারিব।"

কাঠুরিয়ার সহিত কথা সমাপ্ত হইল। অমনি সে স্থানের মোহন প্রকৃতি কথঞ্চিৎ প্রতিভাত হইল। আমাদের আলাপের সময়েই পর্ব্বতের শীতল বাতাস, ঝাউ-গাছের মধুর ধ্বনি, ছোট ছোট পাখীর সুমিষ্ট কূজন আমাদের শ্রান্তি দূর করিতে-ছিল। এখন অবসর পাইয়া সে সকলের প্রতি মনোনিবেশ করিলাম, আর অমনি শারীরিক ও মানসিক কষ্ট তিরোহিত হইল। সেই গম্ভীর নির্জ্জন প্রদেশে মানবের উচাটন মনের দুঃখ দূর করিতে ভগবান্ কত শান্তি ও কত আরাম করিয়াছেন!

এই কাঠুরিয়ার সহিত সাক্ষাৎ ও আলাপ আমার জীবনের একটী বিশেষ পরিচ্ছেদ। উহা আমি ভুলিতে পারি না। দুঃখী নরনারীদিগকে এই কথা বলিতে আমার কত আশা ও উৎসাহ হয়। মনে করি এই কাহিনী শুনিয়া যদি কেহ দিব্যজ্ঞান লাভ করেন, অন্ততঃ দুঃখময় সুদীর্ঘ জীবনপথে একটুকু বিশ্রাম লাভ করিতে পারেন তবে সে সংবাদ আমার কত আনন্দের হইবে।

আত্মবলিদান *।

কবি নিজামীর একটী পার্শিগানের অনুবাদ।

কবি নিজামী একদা কোনও হিন্দু দেবমন্দিরে প্রবেশ করিতেছিলেন। প্রবেশদ্বারে উপস্থিত হইতেই ধূপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। ধূপ জিজ্ঞাসা করিল"নিজামী কোথায় যাচ্ছ?" "মন্দিরে", "কেন"? "দেবতা দর্শনে", "হুকুমপত্র পেয়েছ?" "না", "দক্ষিণা দিয়েছ?" "না", "তবে দেবতা দর্শন হবে না।" নিজামী জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমার দেবতাদর্শন হয়েছে?" "হাঁ" "কেমন করে দর্শন পেলে?" "দক্ষিণা দিয়েছিলাম—অনুমতি পেয়েছি"। "ধূপ তুমি কি দক্ষিণা দিয়ে অনুমতি পেয়েছ?" ধূপ "আমি নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করেছি, পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছি। শীঘ্রই আমার অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লোপ পাবে। কিন্তু আমার অবসানের সঙ্গে সঙ্গে সৌরভে সকলকে মুগ্ধ কচ্ছি, মন্দির আমোদিত করেছি—আঙ্গিনা আমোদিত করেছি কিন্তু এই সকলই—আমার অস্তিত্বের বিনিময়ে।"

নিজামী চলিলেন, পথে তীর্থসলিলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। তীর্থসলিলের সঙ্গে পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নোত্তর হওয়ার পর তীর্থসলিল বলিল "আমার জন্ম পাহাড়ের

* চট্টগ্রাম ভগ্নীসমাজে একটী মহিলা কর্ত্তৃক বর্ণিত, তাঁহাকে একটী যুবক এই গল্পটী বলিয়াছেন।

দেশে; কিন্তু জন্মাবধিই আমি সাগরকে লক্ষ্য করিয়া সাগরের পানে ছুটেছি। আমার লক্ষ্য সাগর হইলেও অন্য সকলকে উপেক্ষা করি না, জন্মাবধি দুই তটের সেবা কচ্ছি, ক্রমাগত পৃথিবীর মলিনতা ক্ষালন কচ্ছি, পৃথিবীর তাপ শান্তি কচ্ছি, যখন দুই তট শেষ হয় তখন আমি সাগরের গর্ভে আত্ম-বিসর্জ্জন করি। আমি বদ্ধকূপের জল নই, আমি প্রসিদ্ধ গঙ্গার জল তাই আমি তীর্থসলিল।"

নিজামী চলিতে লাগিলেন। পথে চন্দনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। চন্দনের সঙ্গেও পূর্ব্বোক্তরূপ প্রশ্নোত্তর হইলে পর চন্দন বলিল "নিজামী, দেখ্‌ছ না আমাকে ক্রমাগত ঘর্ষণ কচ্ছে? এই ঘর্ষণে ক্রমেই আমি ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছি এবং কোন্ দিন আমি একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাব। কিন্তু তাই বলে আমি অগ্নি উদ্গীরণ করি না, ক্রমাগত আমার অন্তর্নিহিত স্নেহরস সিঞ্চন কচ্ছি, বিলেপন দ্বারা সকলের তাপ বিমোচন এবং সৌরভ দ্বারা সকলকে বিমুগ্ধ করিতেছি।"

চতুর্থ দীপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। দীপ বলিল "আমায় জ্বালিয়ে দেওয়া অবধি আমি আলো বিতরণ কচ্ছি, মন্দির প্রাঙ্গন সব আলোকিত কচ্ছি। কিন্তু নিজামী আমার বুকে বড় তাপ! বড় জ্বালা! এই তাপ টুকুই আমার—আমার বুকের তাপ আমার বুকেই থাক্, তা তোমাদের দিব না, তোমাদের শুধু আলো টুকু বিতরণ করে যাব।"

পঞ্চম ফুল। ফুল বলিল "আমায় আজ চয়ণ ক'রে দেবতা চরণে উৎসর্গ করতে এনেছে। আমি জানি যে ডাকে আমি পৃথিবীতে জন্মেছি সেইরূপ ডাকেই আমাকে অবসর গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু যতক্ষণ আছি আমার অন্তর্নিহিত সৌরভ টুকু নিঃশেষে দান করে যাচ্ছি।"

শেষে শঙ্খ বলিল "আমার ভিতরে একটা জীব বাস করিত আমি সেই জীবটাকে ফেলে দিয়ে তার সমস্ত ক্লেদ ফেলে দিয়ে আমার গর্ভটা শূন্য করে রেখেছি। আমি মৌনভাবে প্রতিমার পদপ্রান্তে পুরোহিতের প্রতীক্ষায় বসে আছি। যখন পুরোহিত আস্‌বেন তখন তিনি আমায় চুম্বন কর্‌বেন, আমি ভগবানের জয় ঘোষণা কর্‌বো। নিজামী, এই শূন্যগর্ভে আর কারো স্থান নাই, কেবল তাঁরই জয় ঘোষণা হবে।"

তখন সকলে মিলিয়া নিজামীকে জিজ্ঞাসা করিল "নিজামী তুমি কি দক্ষিণা দিয়েছ যে তুমি দেবতা দর্শনে প্রয়াসী?". নিজামী তখন যুক্ত করে বলিলেন "ভগবন্ দক্ষিণা যাহা দরকার হয় তুমি হরণ করে লও আমাকে দর্শন দাও।"

"আরে পাগল দক্ষিণা যাহা দরকার সে কিরে? আমরা দেখছিসনে, সব দিয়েছি, সব না দিলে কি দেবতা দর্শন হয়?"

গৃহকার্য্য।

যতদিন সভ্যতার আবির্ভাব হয় নাই ততদিন নরনারীর মধ্যে কর্ত্তব্য কর্ম্মের

ভাগও হয় নাই। আদিম অবস্থাতে প্রত্যেক মানুষকে আপনার সকল কার্য্য করিতে হইত। অবশ্য তখনকার কার্য্য ক্ষুধা পিপাসার নিবৃত্তিই প্রধান ছিল এবং সভ্য জগতের শত প্রকার অভাব কেহ জানিত না। যখন হইতে পরিবার বন্ধন, সমাজ বন্ধন আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতেই কর্ত্তব্য কর্ম্মের বিভাগ আরম্ভ হইয়াছে। সাধারণত অধিক বলসাধ্য বা অধিক বিপদপূর্ণ কার্য্য পুরুষের পক্ষে কর্ত্তব্য, এবং অপেক্ষাকৃত অল্প বলসাধ্য অথচ প্রেম ও নিপুণতার কার্য্য নারীর পক্ষে কর্ত্তব্য। এই স্বাভাবিক ব্যবস্থা লইয়া সমাজ চিরদিন চলিতেছে। ইহার ভিতরে দেশের ধনের ও জ্ঞানের অবস্থা অনুসারে ও সভ্যতার সাধারণ উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কর্ত্তব্য বিভাগ হইয়া আসিতেছে। সাধারণত আমরা মনে করি বাহিরে পরিশ্রম করিয়া ব্যবসায় বাণিজ্য করিয়া বা অন্যের ভারবহন করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করা পুরুষের কার্য্য এবং উপার্জ্জিত অর্থ গৃহে আসিলে তাহা দ্বারা গৃহের যাবতীয় অভাব পূরণ করা নারীর কার্য্য। যুদ্ধের সময়ে শত্রুর সহিত সংগ্রাম করা পুরুষের কার্য্য, এজন্য পুরুষ যতদিন দূরে থাকিবে নারী ততদিন গৃহের সকল কার্য্য করিবে ইহাই স্বাভাবিক। বর্ত্তমানে আমরা কর্ত্তব্য কর্ম্মের যেরূপ বিভাগ দেখিতেছি তাহা আলোচনা করিলে দেখিতে পাইব যে আমাদের শান্তিপূর্ণ দেশে যুদ্ধের সময়ের কোন কল্পনা আসিতে পারে না এবং পুরুষ ও নারীর মধ্যে কর্ম্ম বিভাগের পরস্পরের গৃহীত স্থির নিয়মও দেখিতে পাওয়া যায় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব সময়ে যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে প্রায় সমস্ত সময় কঠিন পরিশ্রম করিতে হইত এখন তাহা সকল পরিশ্রমের সার অর্থ দ্বারাই নির্ব্বাহ হইতে পারে। পূর্ব্বে গৃহের কোন ব্যক্তির কঠিন পীড়া হইলে গৃহিণীকে কঠিন পরিশ্রম করিয়া সেবা করিতে হইত, তাহার উপর হয়ত সমস্ত রাত্রি শয্যার পার্শ্বে বসিয়া কাটাইতে হইত কিন্তু এখন অর্থ থাকিলে আর সেরূপ কষ্ট স্বীকার করিবার প্রয়োজন নাই। উপযুক্ত বেতন দিয়া সেবিকা নার্‌স্ রাখিলেই চলিতে পারে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক দেওয়া যাইতে পারে। এখন অধিকাংশ কর্ত্তব্য কর্ম্ম টাকা দ্বারা সাধিত হয়। টাকা আনয়ন করা যখন পুরুষের কর্ত্তব্য তখন যে পরিমাণে পুরুষ অর্থ আনিতে পারিলেন সেই পরিমাণে তিনি আপনাকে ও তাঁহার নারীকে গৃহকার্য্য হইতে মুক্ত করিলেন। যদি উপযুক্ত অর্থ আগম হয় না বলিয়া নারীকে অধিক পরিমাণে গৃহকার্য্য করিতে হয় তবে তিনি সেই পরিমাণে নারীর নিকট অপরাধী এবং নিজেই গৃহকার্য্য করিতে বাধ্য। বর্ত্তমানে এই নিয়মেই কার্য্য বিভাগ হইতেছে। পল্লীগ্রামের গরীব পরিবারে গৃহস্বামী ধান কিনিয়া মাথায় করিয়া আনিয়া বাড়ীতে ফেলিয়া আপনার কর্ত্তব্য শেষ করিলেন গৃহিণী তাহার দ্বারা চাউল প্রস্তুত করিয়া ভাত রাঁধিয়া যথাসম্ভব উপকরণ সংগ্রহ করিয়া পরিবারের সকলকে খাওয়াইলেন।

গৃহিণী আপনার স্বাভাবিক কর্ত্তব্য জানিয়া সমস্ত দিন এক মনে পরিশ্রম করিয়া সংসার চালাইলেন তাঁহার শরীর সুস্থ ও সবল থাকিল মনও নিরুদ্বেগ। আমরা ক্রমে যত স্বচ্ছল ও উন্নত অবস্থায় পরিবারের দিকে দৃষ্টি করিব ততই দেখিতে পাইব যে ধান ক্রয় করার পরিবর্ত্তে চাউল ক্রয় করা হইতেছে, গম ক্রয় না করিয়া আটা ক্রয় করা হইতেছে। আর একটুকু উন্নত অবস্থায় দেখা যায় যে গৃহিণী রন্ধন করাকে আর আপনার কর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করিতেছেন না, তবে চাউল, দাল, মাছ, তরকারী, মসলা আপনার হাতে ঠিক করিয়া দিতেছেন। এ অবস্থায় গৃহীণী হাতে রন্ধন না করিলেও মনে ও মুখে রন্ধন করেন। ইহার পর যে সকল অবস্থা উপস্থিত হয় তাহাতে পাচক ভৃত্যকে আহারীয় ভিন্ন ভিন্ন সামগ্রীর বিষয় আদেশ করা গৃহীণীর কর্ত্তব্য। ইহার পর অবশ্য হোটেলে বসিয়া গহীণীর আদেশ মত আহার করা পরিবারের নিয়মও আছে। উন্নতির গতি এরূপ ভাবে দেখান হইল যে পাঠিকা হয়ত মনে করিতেছেন যে এ উন্নতির কথা কেবল ব্যঙ্গ করা হইতেছে। সভ্যতা আসিয়া, বিদ্যা ও ধন আসিয়া নারীগণকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিতেছে, তাহা প্রদর্শনই যেন এই আলোচনার উদ্দেশ্য, প্রকৃত পক্ষে তাহা নয়। যাহা সর্ব্বদা দেখা যাইতেছে তাহাই বলা হইল এবং গৃহিণীগণ যখন যে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন তখন সেই কার্য্যকেই আপনার জীবনের কার্য্য বলিয়া গ্রহণ করেন। শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম সকল পুরুষ ও সকল নারীকেই করিতে হয়, কারণ শরীর ও মন লইয়া মানুষ, শরীর ও মনের নিত্য উপযুক্ত চালনা উন্নতির পক্ষে প্রয়োজন। যদি কোন নারী গৃহকার্য্যে এত বিব্রত থাকেন যে তাঁহার মন চিন্তা করিতে, অন্যের সহিত আলাপ প্রসঙ্গ করিয়া, কিম্বা পড়াশুনা করিয়া একটু মনের উন্নতি করিবার কোন অবসর পায় না তাহা হইলে তাঁহার মন নিশ্চিন্ত শরীর সুস্থ থাকিতে পারে কিন্তু যে মন লইয়া মানুষের মনুষ্যত্ব তাহার উন্নতি না হওয়াতে অতি দুর্দ্দশাতে পড়িয়া আছেন স্বীকার করিতে হইবে। এরূপ জীবনকে প্রার্থনীয় জীবন কখনও বলা যাইতে পারে না। অপর শ্রেণীর নারী যাঁহারা আপনাদিগের গৃহকার্য্যের সকল দায়িত্ব অর্থ দ্বারা সম্পন্ন করিতে চেষ্টা করেন তাঁহারা এক ভাবে অতি সঙ্গত কার্য্য করেন। কারণ বর্ত্তমান সময়ে কোন মনুষ্য আপনার সকল প্রয়োজনীয় বস্তু আপনার হাতে প্রস্তুত বা সংগ্রহ করিতে পারে না। তাহাকে আত্মশক্তির দৃশ্যমান নিদর্শন মুদ্রা ব্যবহার করিতেই হইবে। যদি উচ্চতর বা মহত্তর কার্য্য সম্পাদন করিবার অভিপ্রায়ে নিম্নতর কার্য্য অনেক পরিমাণে অর্থদ্বারা লোক নিযুক্ত করিয়া করা হয় তাহাতে অর্থের উত্তম ব্যবহার করা হয়। যদি দূরদেশে লাহোরে কোন আত্মীয়ের পীড়ার সংবাদ পাইয়া চিকিৎসা ও শুশ্রূষা করিতে যাওয়া প্রয়োজন হয়, তখন পদব্রজে দূরদেশে

যাওয়া সম্ভব নহে, অর্থব্যয় করিয়া রেলে যাওয়াই অর্থের সদ্ব্যবহার এবং গৃহের কোন আত্মীয়ের পীড়া হইলে অর্থদ্বারা রন্ধন আদি কার্য্যের জন্য ভৃত্য রাখিয়া আপনার সমস্ত সময় আত্মীয়ের সেবা শুশ্রূষাতে ব্যয় করা অর্থের সদ্ব্যবহার। কিন্তু নারী যখন বৃথা আমোদ বা আলস্যে সময় ক্ষেপ করিতে ইচ্ছা করিয়া আপনার সন্তান পালন ও পরিবারের আহারাদির ভার ভৃত্যের হস্তে ছাড়িয়া দেন তখন তাঁহার গৃহের সহিত কোন স্বাভাবিক যোগ থাকে না এবং শরীর ও মন একান্ত অসুস্থ ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কোন কোন পরিবারে যে ভয়ানক পাপ ও রোগের কথা শুনিতে পাওয়া যায় তাহা গৃহকার্য্য সম্বন্ধে অনিয়ম করাতেই প্রবেশ করিয়া থাকে। যদি অর্থব্যয় করিয়া শরীরকে অবসর দেওয়া হয় তাহা হইলে মনকে এরূপ ভাবে উচ্চ বিষয়ে নিযুক্ত রাখিতে হইবে যে মন পাপ বা কুসঙ্গ করিবার অবসর না পায়। এই সঙ্গে এ কথার স্মরণ রাখিতে হইবে যে শরীরকে সুস্থ রাখিতে হইলে ইহাকে অন্তত কতকক্ষণ পরিশ্রম করাইতে হইবে এ জন্য নারীর পক্ষে গৃহকার্য্য সম্পর্কে এই নিয়ম জানিতে হইবে যে শরীরকে সুস্থ রাখিতে যতটা পরিশ্রম দরকার নারী গৃহকার্য্যে ততটা পরিশ্রম অবশ্যই করিবেন। ইহার পর যে পরিমাণে শরীরকে অবসর দিবেন সেই পরিমাণে মনকে উচ্চ চিন্তায় ও উচ্চ কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন। ধন ও জ্ঞানের হীন অবস্থায় নারীগণ যেমন গৃহকার্য্যেই সমস্ত সময় ব্যয় করিয়া মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক মনের বিকাশ হইতে বঞ্চিত হইতেছেন তেমনই ধনে ও বিদ্যায় উচ্চ অবস্থায় নারীগণ অর্থদ্বারা গৃহকার্য্য সম্পাদন করাইয়া আপনারা শরীরকে রুগ্ন ও মনকে অসারতা ও পাপে ডুবাইতেছেন। এখন ভারত-মহিলাকে মধ্য পথ আশ্রয় করিতে হইবে।

অঘোর নারী সমিতির জন্মদিনোপলক্ষে।

মঙ্গলময়ের কৃপায় এই ক্ষুদ্র সমিতি ধীরে ধীরে ষষ্ঠ দশ বৎসরে পদার্পণ করিল। স্বর্গগতা দেবী অঘোরকামিনী রায় এই সমিতির স্থাপয়িতা। তাঁহার কোমল প্রাণ দুঃখীর দুঃখে দুঃখিত হওয়াতে এবং সেই দুঃখ নিবারণার্থে তিনি গুটি কয়েক ভগিনীকে লইয়া ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৭ই আগষ্টে এই নারী সমিতির প্রথম অধিবেশন করেন। তাঁহারই চেষ্টা ও উৎসাহে ৪২ জন স্থানীয় মহিলা সমিতির সভ্য হয়েন। মাননীয়া স্বর্গীয়া মুক্তকেশী মজুমদার মহাশয়া সভাপতি হয়েন ও শ্রীমতী সরলাবালা রক্ষিত সম্পাদিকা হয়েন এবং স্বর্গীয়া শ্রীমতী সুসারবাসিনী তাঁহার সহকারী হয়েন। স্বর্গীয়া অঘোরকামিনী নিজে চাঁদা আদায়ের ভার গ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু, খৃষ্টান, মুসলমানদিগের অন্তঃপুরে যাইয়া তাঁহাদের সভ্যশ্রেণী ভুক্ত করিতেন,

এই সময় হইতেই সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য গুলিও ক্রমে ক্রমে স্থির হইয়া যায়। সমিতির প্রধান উদ্দেশ্য হইল জাতি ও চরিত্র নির্বিশেষে নারী ও শিশুগণের শরীর মন ও আত্মার মঙ্গল সাধন করা। অন্নদান, বস্ত্র দান, চিকিৎসা সেবা বিদ্যা-দান ও চরিত্রগঠন প্রভৃতি উপায় দ্বারা উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হইবার প্রস্তাব স্থির হইল; এবং এই নিয়মানুসারে এখনও কোনও সভ্যের গোচরে কোনও আশ্রয়হীন অসুস্থ সাহায্যপ্রার্থী আসন্ন লোক আসিলে তিনি তাহা সমিতির নিকট জ্ঞাপন করিয়া থাকেন। যত প্রকার অভাবগ্রস্থ নারী এবং শিশু সভ্যদিগের সম্মুখে উপস্থিত হয়েন তাহাদের সকল প্রকার অভাব সমিতি পূর্ণ করিতে যথা-সাধ্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।

একবার ফরিদপুরে ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হয়, সমিতি যতদূর সম্ভব তাহাদের সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। যদি কোনও দুঃখী রোগী আসে, সমিতি হইতে সে ঔষধ পথ্য সকলি পায়। এই সকল রোগীর চিকিৎসার জন্য এক জন উপযুক্ত চিকিৎসক আছেন। এই সমিতির প্রথম আরম্ভের পর প্রায় এক বৎসর কাল শ্রীমতি সরলাবালা রক্ষিত সম্পাদিকার কার্য্য করেন; তিনি কার্য্য বশতঃ অন্যত্র চলিয়া যাওয়াতে শ্রীমতি নরেশনন্দিনী পাল সম্পাদিকার পদে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার সময়ে ১৭ই আগষ্ট স্বর্গীয়া অঘোর কামিনী ১২ জন সভ্যের মতে Lady Elliot এবং Mr. & Mrs M. M. Ghosh এই তিন জনকে রেল গাড়ীতে অত্যাচারিত রাজ-বালার প্রতিবিধানের জন্য তিন খানি পত্র লেখেন। সমিতির চেষ্টায় ক্রমে বাঁকি-পুর ষ্টেসনে তৃতীয় শ্রেণীর আরোহীদিগের জন্য ভিন্ন বিশ্রামের ঘর প্রস্তুত হয়।

আট নয় মাস কার্য্যের পর শ্রীমতী নরেশনন্দিনী পাল সম্পাদিকার পদ হইতে অবসর লয়েন এবং শ্রীমতী তরুলতা ঘোষ উক্ত স্থান অধিকার করেন।

এইরূপে দেবী অঘোর কামিনী এবং অন্যান্য সভ্যদিগের অদম্য উৎসাহে সমিতির কার্য্য সুন্দররূপে চলিতে লাগিল; কিন্তু দুই বৎসর যাইতে না যাইতে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জুন সমিতি অকালে মাতৃ-হারা হইল। সকলেই মনে করিলেন এই শিশু সমিতি বুঝি আর রক্ষা পাইল না। কি করিয়া রক্ষা পাইবে? চারিদিকেই কেবল আঁধার, কেবল বিঘ্ন বাধা। কিন্তু সমিতির ভগ্নীগণ ইহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। মৃত্যুগ্রাসে পতিত হইতে দিলেন না। ভগ্নীগণ স্বর্গীয়া অঘোর কামিনীর স্মৃতিচিহ্ন-স্বরূপ নারী-সমিতির পরিবর্ত্তে অঘোর নারীসমিতি নাম দান করিলেন। এই সময়ে শ্রীমতী তরুলতা ঘোষ সম্পাদিকার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করেন এবং শ্রীমতী হেমকুসুম মল্লিক সম্পাদিকার পদে নিযুক্ত হন।

এই সমিতি কিন্তু ক্ষুদ্র গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নয়। যথাসাধ্য দূরে নিকটে অনাথা নিরাশ্রয় এবং অভাবগ্রস্থদিগের সাহায্য করিয়াছেন ও করিতেছেন। কেবল বাঁকিপুর নয়, ছাপরা, দানাপুর,

বারাকপুর, কলিকাতা, হাওড়া, সারাঘাট, বৈদ্যনাথ, লক্ষৌ, হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাব প্রভৃতি অনেক স্থানেই এই সমিতি অল্পাধিক সাহায্য করিয়াছেন। স্থানীয় দরিদ্রদিগের শীত নিবারণার্থ প্রতি বৎসর শীতকালে এই সমিতি হইতে শীতবস্ত্র চাদর, বা কম্বল বিতরণ করা হইয়াছে ও হইতেছে।

১৯০১ খৃষ্টাব্দে ১লা সেপ্টেম্বর হঠাৎ ইহার সহকারী সম্পাদিকা শ্রীমতি সুসারবাসিনী পরলোকগত হওয়াতে সমিতির কার্য্য প্রায় বৎসরাবধি বন্ধ ছিল। কিন্তু সমিতির ভগ্নীগণ পুনরায় জাগরিত হইয়া ১৯০২ খৃষ্টাব্দে ২রা মার্চ্চ সমিতির পুনরাধিবেশন করেন। এই সময়ে শ্রীমতী মহালক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায় মহাশয়া সমিতির সভাপতি হয়েন; এবং শ্রীমতী প্রেমলতা রায় সহকারী সম্পাদিকার পদে নিযুক্ত হন।

গত ১১ বৎসর ৭ মাস শ্রীমতী হেমকুসুম মল্লিক সম্পাদিকার কার্য্য করিয়া ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে জুলাই মাসে কার্য্য বশতঃ তাঁহাকে স্থানান্তরে যাইতে হয় বলিয়া সকল সভ্যের মতানুসারে শ্রীমতী মহালক্ষ্মী চট্টোপাধ্যায়ার হস্তে তিনি এ ভার অর্পণ করেন, এবং সুজাতা চট্টোপাধ্যায় সহকারী সম্পাদিকার পদে নিযুক্ত হন।

আজ সমিতির জন্মদিনে ইহার কার্য্যের বিষয় সংক্ষেপে কিছু বর্ণিত হইল। এখন গত কয়েক বৎসরের বিবরণ কিছু বলিয়া শেষ করিবার ইচ্ছা। ১৯০৪ খৃষ্টাব্দে প্রায় এই সময়ে আসানসোল ষ্টেসনে একটি মহিলাকে একাকী পাইয়া চরিত্রহীন রেলওয়ে কোম্পানীর ভৃত্যগণ যে উৎপীড়ন করে এজন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে কোম্পানীর অধ্যক্ষকে ১।০ খরচ করিয়া তার দেওয়া হইয়াছিল। দুটি যমজ ছেলের জন্য কিছু কিছু সাহায্য কিছুদিন করা হইয়াছে। একটি স্থানীয় অনাথ পরিবারকে গত কয়েক বৎসরই ২৲ টাকা করিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। হাওড়ার তিনটি বিধবা ৩৲ টাকা ও দুটি গরিব ছাত্রকে ২৲ টাকা। এই মাসিক ৫৲ টাকা করিয়া অনেক বৎসর ধরিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। পাঞ্জাবের ভীষণ ভূমিকম্পে যে কত শত পরিবার অসহায় ও নিরাশ্রয় হইয়াছিল তাহাদের সেই কষ্ট কিছু পরিমাণেও দূর করিবার চেষ্টায় সমিতি হইতে ৫৲ টাকা ও সমিতির সভ্যগণের নিকট এবং আরও কয়েকটি ভদ্র হিন্দু মহিলাগণের নিকট হইতে আরও কিছু বিশেষ দান প্রাপ্ত হইয়া সর্ব্বসমেত ২৪৲ টি টাকা সেখানে পাঠান হইয়াছিল। স্থানীয় রামমোহন রায় সেমিনারী স্কুলের একটী ছাত্রকে এক বৎসর মাসিক ১।০ করিয়া সাহায্য করা হইয়াছে। সমিতির প্রথম বর্ষ হইতে আজ পর্য্যন্ত ক্রমান্বয়ে একটি ছাত্রের পর আর একটিকে পড়িবার সাহায্য করা হইতেছে। প্রথম ছাত্রটী সমিতির সাহায্যে Entrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রেলওয়ে কোম্পানীতে কার্য্য করিয়া এখন আপনার পরিবারবর্গকে প্রতিপালন করিতেছে। দ্বিতীয়টী Second Class হইতে সমিতির

সাহায্য পাইয়া এখন Eentrance পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া F A পড়িতেছে এবং এখনও তাহাকে সমিতির সাহায্য করিতে হয়। এ বৎসর এবং গত বৎসর হইতে দুইটি ছাত্র ২৲ টাকা এবং একটি গরিব অল্পবয়স্কা ছাত্রীর প্রথম মাসের স্কুলের মাহিনা ১৲ দেওয়া হইয়াছে। উক্ত ছাত্রীটীর পড়িবার সকল খরচের ভারই সমিতি বহন করিতেছেন এবং করিতেও হইবে। গত বৎসর কলিকাতাস্থ একটি গরিব বালক Fee দেবার অভাবে Entrance পরীক্ষা দিতে পারিতেছিল না, এ উপলক্ষে সমিতি তাহাকে ২৲ টাকা সাহায্য করিয়াছেন। ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শীত কালে দরিদ্রদিগকে ৪০৲ টাকার কম্বল দান করা হইয়াছে। সমিতি Fund হইতে এজন্য ২৫৲ টাকা লওয়া হয়, এবং আরও ২০৲ টাকার অভাব হওয়াতে সমিতির দয়ার্দ্র ভগিণীগণ এ উপলক্ষে সে ২০৲ টাকা বিশেষ ভাবে দান করেন। গত বৎসর ৩০ জন একান্ত অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য লোক দিগকে ৩০ খানি শীতবস্ত্র দান করা হইয়াছে। সিন্ধু দেশের পতিত আশ্রমের সাহায্যের জন্য হায়দ্রাবাদে ৬৲ পাঠান হইয়াছে। কলিকাতায় শ্রীমতী হিরণ্ময়ী মুখোপাধ্যায়ের বিধবাশ্রমে ৫৲ এবং নৈশবিদ্যালয়ে ৬৲ টাকা সাহায্য করা হইয়াছে। এক্ষণে সমিতির সভ্য সংখ্যা ৪০ জন। মাসিক স্থানীয় আয় ৭৲ এবং মাসিক ব্যয় ৫৲ টাকা। ইহা ব্যতীত সমিতির আরও কিছু বাৎসরিক আয় আছে যাহা হইতে উল্লিখিত এককালীন সাহায্যগুলি করা হইয়া থাকে।

সমিতির অধিবেশন প্রায়ই প্রত্যেক মাসের শেষ শনিবারে ডাক্তার শ্রীযুক্ত পরেশনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে হইয়া থাকে; এবং অন্ততঃ পাঁচ জন সভ্যের মত না লইয়া কোনও কার্য্য সমিতি করিতে পারেন না। কিন্তু বিশেষ প্রয়োজন হইলে সম্পাদিকা মহাশয়া স্বাধীন ভাবে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত খরচ করিতে পারেন।

দুর্ব্বল অজ্ঞান নারী জাতি আমরা কিছু পারি না, জানি না বলিয়া কখনও চুপ করিয়া বসিয়া থাকিব না। আমরা জানি এ সমিতির কার্য্যক্ষেত্র কত বিস্তৃত, ইহার উদ্দেশ্য কত মহৎ, কিন্তু জানিয়াও আমাদের শক্তি বল, আমাদের অর্থ বল অতি সামান্য বলিয়া আমরা কখনও নিরস্ত হইব না, কখনও ভয় পাইব না। তথাপি আমরা আমাদের সকল ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে এক করিয়া যতটুকু সাধ্য জগতের দীন দুঃখী অসহায় নিরাশ্রয় যাহারা, তাঁহাদের দুঃখের দুঃখী হইয়া সহানুভূতি ও প্রাণের সমবেদনা জানাইয়া যৎকিঞ্চিৎ তাহাদের সাহায্য করিয়া আমাদের এ ক্ষুদ্র জীবনকে ধন্য ও কৃতার্থ করিব।

এ জন্য সকলের আগে আমরা সর্ব্বশক্তিমান বিধাতা, যিনি কৃপা করিয়া তাঁহার কার্য্য এত বৎসর ধরিয়া করাইয়া লইলেন তাঁহারই নিকট আজ আবার বিশেষ ভাবে তাঁহারই কৃপা ও সহায়তা

প্রার্থনা করি। তাহার পরে সকল ভগিনীগণের নিকটেও এই মহৎ কার্য্যের জন্য তাঁহাদেরও সহানুভূতি ও সাহায্য প্রার্থনা করি। যাঁহারা এ বিষয়ে বিশেষ উৎসাহী এবং ইহাতে নিয়মিত সাহায্য করিয়া থাকেন তাঁহাদের নিকট আমরা আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি।

শ্রী সুজাতা চট্টোপাধ্যায়।

হ্যালির ধূমকেতু।

ধূমকেতু সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায় না। গৃহে অতিথি আসিলে যেমন সকলে সসব্যস্ত হইয়া তাঁহার সম্মান এবং সেবার জন্য চেষ্টা করেন সেই প্রকার আমাদেরও আকাশে এক অতিথি আগমন করিয়াছেন, তিনি কেবলমাত্র অতিথি নন, তিনি আবার পরিচিত অতিথি—প্রায় ৭৫ বৎসর পূর্ব্বে একবার আসিয়াছিলেন এবং তাহার পূর্ব্বে কতবার আসিয়াছিলেন। অতএব আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির দ্বারা ইঁহার যত্ন করা এবং কুশল সংবাদ লওয়া আমাদের কর্ত্তব্য।

ইঁহার সংবাদ লইবার পূর্ব্বে দুই এক কথায় এই জাতির সম্বন্ধে কিছু জানিয়া লইলে উপকার হইবার সম্ভাবনা। ধূমকেতু বংশীয় যাহাদের আমরা পৃথিবী হইতে দেখিতে পাই প্রায় সকলেই সৌরজগৎ ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে পৃথিবী হইতে যাহাদের দেখা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে অল্প সংখ্যাই বিনা যন্ত্র সাহায্যে দেখা গিয়াছে। সচরাচর ধূমকেতু বলিলে আমরা যে গুলিকে বিনা যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাই সেই গুলিকেই বুঝি—তবে জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ যন্ত্রের সাহায্যে অনেক ধূমকেতুর ন্যায় বস্তু দেখিতে পান। ধূমকেতুগণের মধ্যে অনেকেই অন্য অন্য গ্রহ এবং পৃথিবীর ন্যায় সূর্য্যের চারিধারে ঘুরিতেছে কিন্তু ইহাদের কক্ষপথ গ্রহগণের কক্ষপথের ন্যায় গোলাকার নহে। অনেক ধূমকেতুর কক্ষপথ বৃত্তাবাসের আকারের ন্যায় অর্থাৎ চেপ্টা। কক্ষপথে চলিতে চলিতে এক সময়ে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় এবং অন্য সময়ে সূর্য্য হইতে অনেক দূরে চলিয়া যায়, কোন কোন ধূমকেতু সূর্য্য হইতে দূরে যাইবার সময় সৌরজগতের অপর প্রান্তে কিম্বা কখন কখন সৌরজগৎ অতিক্রম করিয়াও চলিয়া যায়। ধূমকেতু যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তখনই পৃথিবী হইতে উহাকে দেখা সম্ভব হয়। ধূমকেতু যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয় তখন একটী উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় দৃষ্ট হয় এবং উহার চারিধারে একটা অপরিস্কার আলোক পরিবেষ্টিত থাকে এবং এই পরিবেষ্টনকারী আলোকই অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া ধূমকেতুর পুচ্ছে পরিণত হয়।

ধূমকেতু কোন্ কোন্ উপাদানে প্রস্তুত তাহা এখনও নির্দ্ধারিত হয় নাই, তবে এই সকল উপাদান এত লঘু এবং স্বচ্ছ যে তাহার ভিতর দিয়া দূরবর্ত্তী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের জ্যোতির হ্রাস হয় না। ধূমকেতুর অবয়বের মধ্যে নিম্নোক্ত দুইটী বিশেষ দ্রষ্টব্য ;—(১) মুণ্ড—মস্ত-

কের নিকট একটী উজ্জল নক্ষত্রের ন্যায় এবং তাহার চারিধারে অস্পষ্ট আলোক। এই নক্ষত্রের ন্যায় যাহা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা গোলাকার কিম্বা ডিমের ন্যায়। ধূমকেতু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকিলেই মুণ্ড স্পষ্ট হইতে থাকে। (২) পুচ্ছ—ধূমকেতু যখন সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তখন পুচ্ছ রেলের ইঞ্জিনের কিম্বা জাহাজের ধোঁয়ার ন্যায় মনে হয়। কিন্তু ধূমকেতু যখন সূর্য্য হইতে দূরে গমন করিতে থাকে তখন পুচ্ছ অগ্রে থাকে কারণ ধূমকেতুর মুণ্ড সকল সময়েই সূর্য্যের দিকে থাকে। এই দেখিয়া কেহ কেহ বলেন যে পুচ্ছ এরূপ পদার্থ দ্বারা প্রস্তুত যে উহা সূর্য্য দ্বারা বিকর্ষিত হয়। সাধারণতঃ যে সকল ধূমকেতু বিনা যন্ত্রের সাহায্যে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাদের মুণ্ডস্থিত নক্ষত্রের ব্যাস ২০০,০০০ মাইল হইতে ১২০০,০০০ মাইল পর্য্যন্ত দৃষ্ট হইয়াছে এবং পুচ্ছ দৈর্ঘ্যে ১০০,০০০,০০০ মাইলের কম দেখিতে পাওয়া যায় না।

ধূমকেতু সম্বন্ধে একটী আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ইহা যত সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তত আকারে ছোট হইয়া পড়ে। ইহার বিশেষ কোন কারণ নির্দ্ধারিত হয় নাই। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাবে সূর্য্যের নিকটে আসিয়া আরও বড় হইবার কথা। এবিষয়ে সার জন হার্শেল মহাশয়ের মত উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছিলেন যে সম্ভবতঃ ধূমকেতুকে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তীকালে ছোট হইতে দেখা আমাদের দেখিবার ভ্রমমাত্র। কারণ যখন ধূমকেতু সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতে থাকে তখন সূর্য্যের তীব্র জ্যোতিতে ধূমকেতুর অনেক অংশই আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আর এক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদিও ধূমকেতুর অবয়ব এত বড়, কিন্তু উহা ওজনে অনেক কম, পৃথিবীর ওজনের লক্ষ ভাগের অপেক্ষা কম।

ধূমকেতুর জ্যোতি আংশিকভাবে সূর্য্যের প্রতিফলিত আলোক এবং আংশিক ভাবে নিজের জ্যোতি প্রকাশ করে।

নির্দ্দিষ্টকালে দেখা দেয় এরূপ ধূমকেতু আজ পর্য্যন্ত অনেক আবিষ্কৃত হইয়াছে কিন্তু তন্মধ্যে হ্যালির ধূমকেতু সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। এই ধূমকেতু সূর্য্য হইতে বহু দূর দেশ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়া ৭৫ কিম্বা ৭৬ বৎসর পরে পুনরায় সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হয়। সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইবার সময় ইহা পৃথিবীর কক্ষাভ্যন্তর দিয়া গমন করে। এই ৭৫ বৎসরে সূর্য্য হইতে ৩০ ত্রিশ কোটী মাইল দূরে চলিয়া যায়। ধূমকেতুকে চিনিতে হইলে কেবলমাত্র আকৃতি দ্বারা চেনা যায় না কক্ষপথের আকারের সাহায্য লইতে হয় কারণ প্রত্যেক ধূমকেতুর কক্ষপথের অবয়ব স্বতন্ত্র। কেপ্‌লার এবং এপিয়ান নামক দুই জন প্রধান জ্যোতির্ব্বিদ্‌ ১৬০৭ খ্রীঃ এবং ১৫৩১ খ্রীঃ এর ধূমকেতুর কক্ষপথের অবয়ব স্থির করিয়া গিয়াছিলেন, হ্যালি ১৬৮২খ্রীঃ এর ধূমকেতুর কক্ষপথের অবয়ব নিরূপণ করেন এবং দেখিতে পান যে তাহার আকার প্রায় কেপ্‌লার এবং এপিয়ান দ্বারা নির্দ্দিষ্ট আকারের ন্যায়। তিনি আরও দেখিতে

পান যে ১৪৫৬, ১৩০১, ১১৪৫ এবং ১০৬৬খ্রীঃ ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল। তিনি দেখিয়া বুঝিলেন যে এই কয়েক বৎসরে দৃষ্ট ধূমকেতু একই। এই সকল দেখিয়া এবং এই ধূমকেতু বৃহস্পতি গ্রহের নিকট-বর্ত্তী হইয়া আগমনকালীন ইহার গতি কিরূপ পরিবর্ত্তিত হইতে পারে এই সকল গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন যে এই ধূম-কেতু পুনরায় ১৭৫৯খ্রীঃ এর প্রথম অংশে উদয় হইবে এবং লিখিয়া গিয়াছিলেন যে "এই ঘটনা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সকল পৃথিবীর লোককে বলিতেই হইবে যে এই সকল বিষয় সর্ব্বপ্রথম একজন ইংরাজের দ্বারা আবিষ্কৃত হইয়াছিল।" স্বজাতির নাম গৌরবান্বিত করিবার জন্য এই মহাত্মার ইচ্ছা কি প্রশংসাযোগ্য নহে? পরে দেখা গিয়াছিল যে সেই বৎসরের মার্চ্চ মাসে উক্ত ধূমকেতু দৃষ্ট হয়, সেই সময় হইতে এই ধূমকেতু হ্যালির ধূমকেতু বলিয়া বিদিত হইয়াছে। অন্য অন্য পণ্ডিতগণ হ্যালির ধূমকেতুর পুনরাগমনের সময় নিরূপণ করিয়া ১৮৩৫খ্রীঃ স্থির বলিয়া-ছিলেন এবং যে সময় নির্দ্ধারণ করেন তাহার দুই দিবসের মধ্যেই ধূমকেতু দৃষ্ট হইয়াছিল, তাহার পর আবার এইবার আগমন করিয়াছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে হ্যালির ধূম-কেতু ৭৫ বা ৭৬ বৎসর পরে প্রত্যাবর্ত্তন করে কিন্তু এই ৭৫ বৎসরের মধ্যে কেবল-মাত্র দুই তিন বৎসর মাত্র দূরবীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা দৃষ্ট হয়, এই দুই তিন বৎসরের মধ্যেই ইহা বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষের পর-পারে চলিয়া যায়। বৃহস্পতির কক্ষের ভিতরে আসিলে উহাকে সন্ধ্যাকালীন কিম্বা উষাকালীন নক্ষত্রের ন্যায় দৃষ্ট হয় প্রথমতঃ দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দেখিলে উহাকে ধূমকেতু বলিয়া বুঝিতে পারা যায় এবং বিনা যন্ত্রের সাহায্য পরে দেখিতে পাওয়া যায়।

আজকাল যে ধূমকেতু দৃষ্ট হইতেছে ইহা এই বৎসরে মার্চ্চ মাসের মধ্যভাগ হইতে দূরবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট হইয়াছিল। পরে সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হওয়াতে সূর্য্যের সহিত উদয় এবং অস্ত হইত অতএব দূরবীক্ষণ দ্বারাও লক্ষ্য হইত না। এপ্রিল মাসের মধ্যভাগে উহা সূর্য্যের নিকটতম হইয়াছিল এবং এপ্রিল মাসের শেষভাগ হইতে খালি চোখে দেখা যাইতেছে. ১৯শে মে তারিখে এই ধূমকেতু সূর্য্য এবং পৃথিবীর মধ্যস্থানে আসিবে অতএব সূর্য্যের কিঞ্চিৎ অংশ ধূমকেতু দ্বারা ঢাকা পড়িবে, ইহাকে এক প্রকারের সূর্য্যগ্রহণ বলা যাইতে পারে কিন্তু ধূমকেতুর পুচ্ছেতে বিশেষ কোন স্থূল পদার্থ নাই অতএব পুচ্ছ দ্বারা ধূমকেতু আচ্ছাদিত হইলেও খালি চোখে কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইবে না। ধূমকেতুর মুণ্ডটাই স্থূল পদার্থে নির্ম্মিত অতএব সূর্য্যের যে অংশ মুণ্ডদ্বারা আচ্ছাদিত হইবে সেই অংশে কিছু দেখিতে পাওয়া যাইবে কিন্তু তাহাতে সূর্য্যের ম্লান হইবার সম্ভাবনা নাই, কেবলমাত্র ক্ষুদ্র একটী কৃষ্ণ বিম্ব সূর্য্যের উপর দিয়া চলিয়া যাইবে।

ধূমকেতুর মুণ্ড এবং পুচ্ছের গঠনোপা-দান স্থির করিবার এই এক বিশেষ

সুযোগ আসিয়াছে। রশ্মিনির্ব্বাচন যন্ত্রের সাহায্যেই ইহা প্রায় হইয়া থাকে, সচরাচর ধূমকেতুর মৃদু আলোক বহু যত্নে যন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া সেই আলোকের বর্ণছত্রের পরীক্ষার দ্বারা গঠনোপাদান নির্ণয় করা হয়, এই সুযোগে যখন ধূমকেতুর পুচ্ছ এবং মুণ্ড সূর্য্যালোক অবরোধ করিবে তখন কতকগুলি আলোকরশ্মি উহার পুচ্ছ দ্বারা অপহৃত হইবে। সেই আলোকের বর্ণছত্র পরীক্ষা করিলেই কি কি উপাদানে পুচ্ছ নির্ম্মিত তাহা বুঝিতে পারা যাইবে।

১৯ শে মে এবং তাহার দুইদিন পূর্ব্ব হইতেই পৃথিবীকে ধূমকেতুর পুচ্ছ ভেদ করিয়া যাইতে হইবে। এইরূপ ঘটনা পূর্ব্বে ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ঘটিয়াছিল কিন্তু তাহাতে পৃথিবীর বিন্দুমাত্র ক্ষতি হয় নাই। অতএব এবারও আশা করা যাইতে পারা যায় যে বিশেষ কোন ক্ষতি হইবে না। তবে এই পর্য্যন্ত বলা যাইতে পারে যে পুচ্ছ লঘু বাষ্পীয় দ্রব্য দ্বারা গঠিত হইলেও তাহার অংশে অংশে উল্কাপিণ্ড থাকিবার সম্ভাবনা। অতএব উক্ত কতিপয় দিনে উল্কাপিণ্ড লক্ষিত হইতে পারে।

ধূমকেতুর বিষয় আর দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধ শেষ করা যাউক। ধূমকেতুর সহিত পৃথিবীর সংঘর্ষণ হইবার সম্ভাবনা আছে কি না ইহার উত্তরে পণ্ডিতগণ বলেন যে, ধূমকেতু এত বেশী সংখ্যায় বর্ত্তমান রহিয়াছে যে কোন দিন না কোন দিন একটীর সংঘর্ষণ হইবেই হইবে। জনৈক জ্যোতির্ব্বিদ গণনা করিয়া বলিয়াছেন, এই সংঘর্ষণের সম্ভাবনা দেড় কোটী বৎসরে একবার হইতে পারে। এই সংঘর্ষণের ফল কি হইবে তাহাও বলা সহজ নহে, কারণ উহা ধূমকেতুর ওজনের উপর নির্ভর করে এবং আপাততঃ এই সম্বন্ধে পণ্ডিতগণ বিশেষ কিছু অবগত নহেন। ধূমকেতু দ্বারা অন্য প্রকারেও পৃথিবীর ক্ষতি হইতে পারে, যথা—যদি কোন ধূমকেতু সূর্য্যের মধ্যে পতিত হয় তাহা হইলে এই সংঘর্ষণে সূর্য্যের উত্তাপ এত বৃদ্ধি হইতে পারে যে তাহাতে পৃথিবীর লোকদের ক্ষতি হইতে পারে।

ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে জানিবার জন্য কাহারও কাহারও কৌতূহল জন্মিতে পারে, এ বিষয়ে সঠিক সংবাদ দেওয়া দুষ্কর, কারণ পণ্ডিতগণের মধ্যে অনেক মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন ধূমকেতু সৌর জগৎ হইতেই সৃষ্ট, তাঁহারা বলেন যে, কোন গ্রহ হইতে অগ্ন্যুৎপাতে কিংবা অন্য উপায়ে স্থূল পদার্থ সজোরে নিক্ষিপ্ত হইয়া সেই গ্রহের মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সীমা অতিক্রম করিলেই ধূমকেতু হইতে পারে। কেহ কেহ বলেন যে, গ্রহ হইতে অত জোরে নিক্ষিপ্ত হইবার উপায় চিন্তা করা যাইতে পারে না, অতএব স্থূল পদার্থ সূর্য্য হইতে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এ বিষয়েও মতভেদ আছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, অন্য সূর্য্য হইতে নিক্ষিপ্ত পদার্থ আমাদের সৌর জগতের সীমার মধ্যে আসাতে এবং

সূর্য্যের আকর্ষণের জন্য ধূমকেতুর ন্যায় কক্ষপথে ভ্রমণ করিতেছে।

দুঃখের সহিত লিখিতেছি যে এখনও ধূমকেতু সম্বন্ধে অনেকের কুসংস্কার রহিয়া গিয়াছে। পুরাকালে শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সকলেরই নানারূপ কুসংস্কার দোষ ছিল। কিছুকাল পূর্ব্বে লোকে সূর্য্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণকেও অমঙ্গলসূচক মনে করিতেন, আরও কিছুকাল পূর্ব্বে বিদ্যুৎ ও মেঘগর্জ্জনকেও অমঙ্গলসূচক মনে করিতেন; ক্রমে যেমন জ্ঞানের ও বিজ্ঞানের চর্চ্চা হইতেছে তৎসহ এই কুসংস্কারও চলিয়া যাইতেছে। আমরা আশা করি পাঠিকাগণের মধ্যে এমন কেহই নাই যিনি বিদ্যুৎ কি মেঘগর্জ্জনকে অমঙ্গলসূচক মনে করেন এবং প্রায় সকলেই সূর্য্যগ্রহণ কিংবা চন্দ্রগ্রহণ কিরূপে ঘটিয়া থাকে তাহা জ্ঞাত আছেন, অতএব তাঁহাদের মন হইতে রাহুর গ্রাস ইত্যাদি কুসংস্কার লোপ পাইয়াছে। সেই প্রকার ধূমকেতুর আগমনও অমঙ্গলসূচক হইতে পারে না। আধুনিক পণ্ডিতগণ অনেক যত্নের সহিত আলোচনা করিয়া দেখিয়াছেন যে ধূমকেতু উদিত হইলে জল বায়ু সম্বন্ধে এবং উদ্ভিদ্ বা জীব সম্বন্ধে কোন পরিবর্ত্তন ঘটে না, অতএব পূর্ব্বকার কুসংস্কারের কোন স্থায়ী ভিত্তি থাকিতে পারে না। এবার আবার ঘটনাক্রমে এই সময়েই মহামান্য ভারত-সম্রাটের শোচনীয় মৃত্যু সঙ্ঘটিত হওয়ায় কুসংস্কারসম্পন্ন লোকদিগের মনে পূর্ব্ব সংস্কার দৃঢ়ীভূত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে, কিন্তু ইহা একান্তই "কাকতালীয়বৎ"—অর্থাৎ যে সময় পক্ব তাল পড়িবার উপক্রম হইয়াছিল ঠিক সেই সময়েই ঘটনাক্রমে একটী কাক তাহার উপর বসাতে লোকে ভাবিল কাকের ভারেই তালটী ভূতলে পতিত হইল। ধূমকেতুর উদয়ের সহিত সম্রাটের অকালমৃত্যুর কোনই সম্পর্ক নাই।

শ্রীআশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

স্বর্গীয় সম্রাটের জীবনকথা।

ভারতসম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড স্বর্গগতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দ্বিতীয় সন্তান এবং জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন। লণ্ডনস্থিত বাকিংহাম রাজপ্রাসাদে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দের ৯ই নবেম্বর তারিখে আলবার্ট জন্মগ্রহণ করেন। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী তারিখে তিনি আর্ক বিশপ্ অব্ ক্যাণ্টারবারী কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন এবং তাঁহার নামকরণ হয়। পিতার নামানুসারে ইঁহার নাম আল্‌বার্ট রাখা হয়, আর ইংরাজ রাজবংশের ধারানুসারে এডওয়ার্ড নাম দেওয়া হয়। যুবরাজ আল্‌বার্ট অকস্‌ফোর্ড ও কেমব্রিজে বিদ্যা চর্চ্চা করেন. তৎপর ১৮৫৮খৃষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে ইঁহাকে সামরিক বিভাগে নিযুক্ত করা হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে লর্ড রেনফ্রু নাম ধারণ করিয়া মার্কিণ যুক্তরাজ্যে ভ্রমণ করিতে যান। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর ইনি পিতৃহীন হইয়া মুহ্যমান ভাবে নির্জ্জনে বাস করিতেন। কিছুদিন পরে প্যালেষ্টাইন প্রভৃতি খৃষ্টীয় পুণ্যপূত দেশ

সকল পরিভ্রমণ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১০ই মার্চ্চ ডেনমার্কের অলোকসামান্যা রূপবতী রাজকুমারী আলেকজেন্দ্রার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারী তারিখে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র যুবরাজ আলবার্ট ভিক্টর ও ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দের ৩রা জুন তারিখে আমাদের বর্ত্তমান সম্রাট জর্জ ফ্রেডারিক আরনেষ্ট আলবার্ট জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পর উপর্য্যুপরি তিনটী কন্যা হয়—প্রথম রাজকুমারী লুই, দ্বিতীয় রাজকুমারী মেরি এবং তৃতীয় রাজকুমারী মড জন্মগ্রহণ করেন।

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের নবেম্বর মাসে এডওয়ার্ডের একবার কঠিন টাইফয়েড জ্বর হয়। খৃষ্টমাসের সময় তাঁহার এই উৎকট রোগ সারিয়া যায় এবং কিছুদিনেই তিনি সুস্থ হন।

সপ্তম এডওয়ার্ড বিবিধ গুণসম্পন্ন ছিলেন। তুরস্কভাষা ব্যতীত ইউরোপস্থ সকল দেশীয় ভাষা মাতৃভাষার ন্যায় সচ্ছন্দে বলিতে পারিতেন। এমনকি অনেক সময় তাঁহাকে বিদেশী বলিয়া বুঝিতে পারা যাইত না। তিনি যখন যে দেশে গমন করিতেন পাছে তাঁহার আচার ব্যবহারে কোন রূপ অসৌজন্য প্রকাশ পায় সে বিষয় তিনি খুব সতর্ক ছিলেন এবং পূর্ব্ব হইতে সেই দেশের আচার ব্যবহার যথাসম্ভব জানিয়া লইতেন।

১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের ১১ অক্টোবর তারিখে আলবার্ট এডোয়ার্ড বোম্বায়ে আসিয়া উপস্থিত হন। সে সময় লর্ড নর্থব্রুক্ ভারতের বড়লাট ছিলেন। যুবরাজ ভারতের সকল প্রদেশ ও প্রধান প্রধান নগরী পরিভ্রমণ করেন।

কলিকাতা অবস্থানকালে যে দিন তাঁহা'র সম্মানে কলিকাতা সহর আলোকিত হয় সেই দিন যথারীতি গাড়ীতে যাইতে যাইতে হঠাৎ নামিয়া পড়েন এবং ভিড়ের মধ্যে মিশিয়া প্রফুল্লচিত্তে বেড়াইতে থাকেন। এদিকে স্যার বারট্রো ফ্রেরার ও সেনাপতি হেন্স তাঁহাকে খুঁজিয়া খুঁজিয়া কাতর হন। কিছুক্ষণ পরে আর একটী মোড়ে যাইয়া গাড়ীতে উঠেন। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ১৪ই জানুয়ারী তারিখে এডোয়ার্ডের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজকুমার আলবার্ট ভিক্টর মৃত্যুমুখে পতিত হন। ইনিও মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। ১৯০১ খৃষ্টাব্দের ২২ জানুয়ারী তারিখে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যুর পর আলবার্ট এডওয়ার্ড "সপ্তম এডোওয়ার্ড" এই আখ্যা গ্রহণ করিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সম্রাট হন। সপ্তম এডোওয়ার্ডের অভিষেকের দিন ১৯০২ খৃষ্টাব্দের ২৬শে জুন তারিখে স্থির হয় কিন্তু ২৩শে তারিখেই তাঁহার উৎকট অস্ত্রোপচারিক রোগ হয়। ঈশ্বরের কৃপায় তিনি দুই সপ্তাহের মধ্যে এই উৎকট রোগমুক্ত হন এবং ৯ই আগষ্ট তারিখে তাঁহার অভিষেক কার্য্য সম্পন্ন হয়। সেই অবধি আজ পর্য্যন্ত তাঁহার বিশেষ কোন রোগ হয় নাই। হঠাৎ গত ৬ই মে তারিখে সংবাদ আসে যে ভারতসম্রাট অতি শ্লেষ্মা

ঢ় হাঁপানিতে অত্যন্ত পীড়িত এবং অবস্থা আশঙ্কাজনক।

"টাইম্‌স্" বলেন গত শুক্রবার প্রাতঃকালে সম্রাট শয্যাশায়ী হইয়া থাকিতে অস্বীকার করেন এবং লর্ড মর্লির সহিত রাজকার্য্য পরিচালন করেন। সম্রাট পীড়িত হইলেও তাঁহার দৃঢ়তা ও সাহস নষ্ট হয় নাই। তিনি সহজ ভাবেই কথোপকথন করিতেছিলেন; কেবল কাসিবার সময় স্বরবদ্ধ হইয়া কথা বন্ধ হইতেছিল। মধ্যাহ্নকালে কাসি অত্যন্ত প্রবল হয়; অপরাহ্নকালে পুনরায় ভয়ঙ্কর কাসি উপস্থিত হয়। সন্ধ্যার সময় তাঁহার শ্বাসরোধ হওয়ায় তিনি মূৰ্চ্ছিত হইয়া পড়েন।

সন্ধ্যার সময় জানিতে পারা যায় যে অনবরত কাসিতে কাসিতে এবং শ্বাস প্রশ্বাসের কষ্ট নিবন্ধন সম্রাটের হৃদ্‌যন্ত্র পীড়িত হইয়াছে এবং বাম পার্শ্বের যন্ত্রের কার্য্যে ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। চিকিৎসকেরা অক্সিজেন প্রয়োগ করিয়াছিলেন কিন্তু পীড়ার উপশম হয় নাই।

গত ৭ই মে প্রত্যূষে (বিলাতের রাত্রি ১১টা ৪৫ মিনিটের সময়ে) দেহত্যাগ করিয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৬৯ বৎসর পাঁচ মাস হইয়াছিল।

চরিত্রের মহত্ব।—সপ্তম এডওয়ার্ড জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেও তিনি নিরহঙ্কৃত নিরভিমান, সদালাপী ও হাস্যমুখ ছিলেন। কোন মন্ত্রী আজ পর্য্যন্ত কখনও বলিতে পারেন নাই যে তিনি কোন সময়ে কাহারও প্রতি বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিয়াছেন। রাজনীতি বিষয়ে তিনি অসাধারণ মনীষাসম্পন্ন রাজা ছিলেন। তাঁহার তুল্য নীতি চাতুরী অভিজ্ঞ দূরদর্শী রাজা ইউরোপে আর কেহ নাই বলিয়াই অনেকের বিশ্বাস। তিনি এক দিকে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক শাসন বিষয়ক ব্যবস্থাগুলি সুসংযত রাখিতে পারিতেন, অন্যদিকে ইউরোপের রাজন্যবর্গের সহিত এমন ভাবে ব্যবহার করিতেন যে তাঁহার প্রভাবে ইংলণ্ডের প্রাধান্য ইউরোপের সর্ব্বজনমান্য হইয়াছে।

শান্তি স্থাপন ও সম্বন্ধ।—সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ড অত্যন্ত শান্তিপ্রিয় ছিলেন। কলহ বিবাদ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না।

সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড সিংহাসনে আরোহণ করিবার পরই প্রথমে বুয়রদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন; তৎপরে ফরাসী জাতির সহিত সদ্ভাব স্থাপিত হয়। তিনি ঐ সঙ্গে রুষিয়া ও তুরস্ককে বন্ধুভাবে পাইয়াছিলেন।

অন্য দিকে ইউরোপের এক অষ্ট্রীয়া ব্যতীত সকল দেশের মুকুটধারী রাজাই সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের সহিত শোণিতসংপৃক্ত। জার্ম্মাণ সম্রাট তাঁহার ভাগিনেয়, রুষ সম্রাট তাঁহার ভগিনী রাজকুমারী এলিসের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন, স্পেনের রাজাও সেইরূপ সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। ইটালির রাজাও তাঁহার জামাতৃস্থানীয়। ডেনমার্ক তাঁহার শ্বশুরালয়, ডেনমার্কের বর্ত্তমান রাজা তাঁহার শ্যালক। এইরূপে সমগ্র ইউরোপকে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড যেন গাঁট ছড়ায় বাঁধিয়া রাখিয়াছেন।

দানশীলতা—ভারতসম্রাট যথেষ্ট দানশীল ছিলেন। তাঁহার বিস্তৃত সাম্রাজ্য মধ্যে যে কোন স্থানেই হউক অথবা অন্য যে কোন রাজ্যেই হউক, কোনরূপ দৈবদুর্ঘটনায় জনসাধারণ পীড়িত হইলে সম্রাট মহোদয় মুক্তহস্তে দুঃস্থ জনসাধারণের সাহায্যার্থ সহস্র সহস্র টাকা দান করিতেন। তাঁহার এইরূপ দানের সংখ্যা হয় না। জ্ঞান বিজ্ঞানের উন্নতি কল্পে যে সকল সভা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হইত, সম্রাট বাহাদুর তাহাতেও যথেষ্ট অর্থ সাহায্য করিতেন। তিনি যে ঐরূপ কত সভা সমিতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাহার ইয়ত্তা নাই। যেমন সম্রাট তেমনই সম্রাটমহিষী। মহিষী আলাকজান্দ্রা বিপন্নের দুঃখ মোচনে সত্য সত্যই সম্রাটের সহধর্ম্মিণী ছিলেন। ইংলণ্ডের শ্রমজীবীদিগের দুরবস্থার প্রতিকার কল্পে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড এবং তাঁহার মহিষী সর্ব্বদাই যত্নবান ছিলেন।

মাতৃভক্তি। ভারতসম্রাটের ন্যায় এমন মাতৃভক্ত মাতৃসেবক রাজপুত্র বোধ হয় ইদানীং ইউরোপে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই। ইংলণ্ডে অবস্থানকালে তিনি প্রত্যহ একবার পুত্র পৌত্রদের সঙ্গে করিয়া মাতৃ সন্দর্শনে আসিতেন; মাতার কোন প্রকার অসুখ হইলে অহর্নিশ মায়ের কাছে থাকিয়া মাতৃসেবা করিতেন। মৃতা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার দুইটি জুবিলির সকল উদ্‌যোগ আয়োজন তিনিই করিয়াছিলেন। তিনিই মাতার প্রতিনিধিরূপে ইংলণ্ডের সকল সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্য্যে মাতার সহায়তা করিতেন। মাতার স্বর্গ গমনকালে প্রৌঢ়তার শেষ সীমায় উপস্থিত হইলেও তাঁহার দুই নয়ন দিয়া অনবরত শোকাশ্রু প্রবাহিত হইয়াছিল।

এমন মনীষাসম্পন্ন সর্ব্বদিক্‌প্রসারিণী-প্রতিভাবান্ সম্রাটের মহাপ্রস্থানে দুঃখ হয়, ব্যথা বোধ হয়। সে দুঃখের, সে ব্যথার সান্ত্বনা নাই। যখন মনে হয় এই তিন চারি দিন পূর্ব্বে সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ড সুস্থ শরীরে বায়ারীট্‌জ হইতে ইংলণ্ডে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, ইংলণ্ডের রাজনৈতিক গোলোযোগ মিটাইবার জন্য মন্ত্রীবর্গকে আহ্বান করিতেছিলেন, আর সেই সম্রাট চব্বিশ ঘণ্টাব্যাপী রোগের তাড়নায় হঠাৎ কালকবলে কবলিত হইলেন, ইংলণ্ডের জ্ঞান বিজ্ঞান, চিকিৎসা বিদ্যা, ধন্বন্তরি সদৃশ চিকিৎসকগণের অভিজ্ঞতা, ইংলণ্ডের ঐশ্বর্য্য ধনসম্পৎ, কোন কিছুই তাঁহাকে ইহলোকে ধরিয়া রাখিতে পারিল না, এত বড় জগৎ-শাস্তা সম্রাট জলবুদ্‌বুদের ন্যায় ক্ষণেকের মধ্যে কোথায় মিশাইয়া গেলেন —তখন বিস্ময়ে, ভয়ে, শোকে, অব্যক্ত যাতনায় মন, বুদ্ধি, চিত্ত যেন সংমূঢ় হইয়া যায়। জানি না, এ কেমন ভাগবতী লীলা যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীশ্বরেরও যথাপদ্ধতি চিকিৎসার অবসর হয় না, দেখিতে দেখিতে তিনিও অনন্তে মিশাইয়া যান।

পিসানগরীর আনত প্রাসাদ।

পিসাননগরীর আনত প্রাসাদের (Leaning Tower) কথা অনেকেই অবগত আছেন। অনেকেরই বিশ্বাস যে কোনরূপ ঘটনা চক্রে এই প্রাসাদ এক দিকে হেলিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মিঃ গুডেয়ার সাহেব নানারূপ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে ইহা আবহমান কাল এইরূপ অবস্থাতেই আছে এবং স্থপতিগণ সুকৌশলে এই কার্য্য সমাধা করিয়াছিলেন। অদ্য আমরা এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ বৃত্তান্ত সংক্ষেপে আমাদের পাঠকপাঠিকাদিগকে উপহার দিব।

১১৭০ খৃষ্টাব্দে বোনানাস এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ আরম্ভ করেন। ১৬ বৎসরে চারিতলা প্রস্তুত হয়। ১২৩৩ খৃষ্টাব্দে বেনিনাটো পঞ্চমতলা, ১২৮৬ সনে উইলমভন ইন্স্‌ব্রাচ ষষ্ঠতলা এবং ১৩১০ সনে টমাসো ডি পিসা ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য শেষ করেন। প্রাসাদ নির্ম্মাণ কালে যতই ইহা উচ্চে উঠিতেছিল ততই ইহাকে লম্বের দিকে হেলাইয়া দেওয়া হইতেছিল।

গুডিয়ার সাহেব বলেন যে প্রাসাদের চক্রসিঁড়িটি (Spiral Staircase) যে দিকে প্রাসাদ হেলিয়া রহিয়াছে সেই দিকেই আয়তনে বড় করা হইয়াছে এবং সুবিধানুসারে ও প্রয়োজন বুঝিয়া এই সিঁড়ি ছোট বড় করা হইয়াছে। প্রাসাদের উত্তর ও দক্ষিণ দিকের মধ্যস্থলের প্রবেশদ্বার প্রস্থে ৩৮০ ফুট এবং উচ্চে ৭৯৪ ফুট। উত্তর দিকে, মধ্যস্থলের উচ্চতা ৭৬৩ ফুট পরে ক্রমে ক্রমে উপরে হেলান দিকে ৮১২ ও নিম্নে ৯১৭ ফুট; এই স্থলের ছাদ গড়ে ৮৬৪ ফুট উচ্চ। সিঁড়ির পরবর্ত্তী বাকা "টার্ণে" উহাকে কমাইয়া উত্তর দিকে ৭৮০ ফুট এবং হেলান দিকে পুনর্ব্বার ৮৪৫ করা হইয়াছে। সিঁড়ি আবার যেমন ঘুরিয়া উত্তরে আসিয়াছে অমনি আবার তাহাকে কমাইয়া ৭২৭ ফুট করা হইয়াছে। চারিতলার পরে আর সিঁড়ি নাই।

গুডেয়ার সাহেব বলেন যে চারিতলা পর্য্যন্ত সিঁড়ি করায় উহারই নির্ম্মাণ কৌশলে এই হেলান প্রাসাদ স্থির রহিয়াছে। প্রথম তলার ছাদটীকেও নিজেদের প্রয়োজন সাধনোদ্দেশ্যে আনতির দিকে নীচু করা হইয়াছে। এই সমস্ত বিষয় পর্য্যালোচনা করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে প্রাসাদটীর নির্ম্মাণ কৌশলেই ইহা আবহমান এই ভাবেই আছে। পঞ্চমতলা হইতে এরূপ কোন ব্যবস্থা নাই। কারণ স্বরূপ গুডেয়ার সাহেব বলেন যে পঞ্চমতলা নির্ম্মাণ নিযুক্ত মিস্ত্রিগণ এতদিনেও প্রাসাদের কোন পরিবর্ত্তন হইল না দেখিয়া আর কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিল না।

প্রাসাদ নির্ম্মাণের চারি শত বৎসর পরে কোন গ্রন্থকার লিখিয়া গিয়াছেন যে ভিত্তি বসিয়া যাওয়াতে প্রাসাদ হেলিয়া পড়িয়াছে। বস্তুতঃ তাঁহার বৃত্তান্ত স্বকপোল কল্পিত। যাহাতে এই প্রাসাদ চিরকালই এই ভাবে থাকিয়া পৃথিবীর 'সপ্তম আশ্চর্য্যের' এক আশ্চর্য্য হইতে পারে সেই প্রণালীতেই ইহা নির্ম্মিত।

সুনীতি কলেজের বাৎসরিক বিবরণ ইং ১৯১০ সাল।

শিক্ষা-প্রণালী।

বিগত বর্ষের বাৎসরিক বিবরণীতে শিক্ষা সম্বন্ধে নূতন প্রণালী প্রবর্ত্তিত হওয়ার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। এবার সেই প্রণালী অনুসারে শ্রেণী সংগঠিত হইয়া নিয়মিত ভাবে কার্য্য চলিয়া আসিতেছে।

পরীক্ষার ফল।

বিভাগীয় পরীক্ষা প্রণালী অনুসারে যে তিনটী ছাত্রী উচ্চপ্রাথমিক পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছিল, বিগত অক্টোবর মাসের বিভাগীয় পরীক্ষায় খুব আশাপ্রদরূপে উত্তীর্ণ হইয়াছে। এই তিনটী ছাত্রীর মধ্যে কুমারী খনা নাইটিঙ্গেল মজুমদার নাম্নী জনৈক একাদশ বর্ষীয়া বালিকা সমুদায় পরীক্ষার্থী বালকদিগের সঙ্গে প্রতিযোগীতায় কোচবিহার কেন্দ্রের মধ্যে প্রথম স্থান গ্রহণ করিয়াছে। পারদর্শিতা-অনুসারে উত্তীর্ণা ছাত্রীদিগের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইল।—

(প্রথমবিভাগ।)

কুমারী খনা নাইটিঙ্গেল মজুমদার।
„ চারুবালা সেন।

(দ্বিতীয় বিভাগ)

কুমারী সুভাষিণী রায়।

নূতন প্রণালী অনুসারে বিগত ডিসেম্বর মাসে গৃহীত Anglo vernacular Lower Primary standard পরীক্ষায় নিম্নলিখিত বালিকাগণ পারদর্শিতানুসারে প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণা হইয়াছে :—

কুমারী বিদ্যুৎলতা দেবী প্রথম বিভাগ।
„ লীলাবতী দেবী „
„ { চারুবালা রায় „
{ বিভাবতী বসু „
কুমারী গোকুলেশ্বরী রায় দ্বিতীয় বিভাগ।

ছাত্রী সংখ্যা।

বর্ত্তমানে ছাত্রী সংখ্যা ১৪৫ জন অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ২০ জন অধিক। গড় উপস্থিতি ১৯৫ অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা দৈনিক ২৫ জন অধিক। ইহা অত্যন্ত আশাজনক যে এই সকল ছাত্রীদিগের মধ্যে ১৮ জন মুসলমান অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসর অপেক্ষা ৬ জন অধিক, ৩ জন ব্রাহ্ম, ৩ জন রাজগণ ও ২০ জন কোচবিহারের আদিম অধিবাসী, অর্থাৎ পূর্ব্ব বৎসরের সমান।

শিল্প-বিভাগ।

উন্নত ও অধিক বয়স্কা মহিলাগণই এ বিভাগের ছাত্রী, বর্ত্তমানে ইহাদের সংখ্যা ৩৩ জন। এ বিভাগ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। বিদ্যালয়ের নিয়মানুসারে ইঁহারা সূচি কার্য্য, পশম ও জরী প্রভৃতির কার্য্য শিক্ষা করিতেছেন। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ চিত্র বিদ্যা ও সম্ভবানুরূপ ইংরাজী ও বাঙ্গলা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন এই সকল মহিলাদিগের মধ্যে ১২ জন মহিলা রাজগণ পরিবার হইতে ও একজন আদিম

কোচবিহার পরিবার হইতে শিক্ষার্থ আসিতেছেন।

শ্রীমতী সুমতি মজুমদার,
প্রধান শিক্ষয়িত্রী।

মহিলার রচনা।

(শ্রীমান্ অমূল্যচন্দ্র মিত্রের দীক্ষায়)

করুন দেবতা আজি আশীষ প্রদান,
তাঁরি বলে হও তুমি বীর বলিয়ান।
তরুণ অরুণ ভাতি জীবনের সাথে,
সমুজ্জ্বল হয় যেন নিয়তির পথে।
নবীন জীবন যথা জর্ডনের তীরে,
হয় যেন সেই দিন তোমারই তরে।
শুনরে অমূল্য ধন সে অমূল্য বাণী,
প্রসাদ পীযূষ আজি এনেছেন যিনি।
শিক্ষা দীক্ষা যোগ ভক্তি যাঁর শক্তি ভরা,
চির তরে তাঁহারেই কর ধ্রুব তারা।
হউক হৃদয় খানি প্রেম নিকেতন,
যথায় হইবে সর্ব্ব ধর্ম্মের মিলন।
গৃহে বা প্রবাসে থাক লভিয়া চেতনা,
ফুল্লচিত্তে কর বাছা সত্য আরাধনা।
বিশ্বাসে বিজয়ী হয়ে থাক শুদ্ধ মনে,
পূর্ণ হউক তাঁর ইচ্ছা তোমার জীবনে।

শ্রীমতী তরঙ্গিনী দেবী।

পুস্তকসমালোচনা।

অমর বাণী—শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ সরকার কর্ত্তৃক সংকলিত, মূল্য চারি আনা মাত্র। এই পুস্তিকা প্রকাশ করিয়া বিনয় বাবু পাঠক এবং পাঠিকাগণের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। ইহাতে মিলটন্, সেক্সপিয়র, এমারসন প্রভৃতি মহাকবি ও চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের মহাবাক্য সকল হইতে কতকগুলি অমরবাণী সংকলন ও অনুবাদ করিয়া দেখাইয়া দিয়াছেন যে, ছাত্রগণ ও সাধারণ পাঠকগণ সর্ব্বদা যে সকল পুস্তক পাঠ করিয়া উপকৃত হন তাহা হইতে আপনার অবস্থা ও আদর্শ অনুসারে বিশেষ বিশেষ বাণী সংগ্রহ করিয়া লিখিয়া রাখিলে যখন তখন একবার দৃষ্টি করিলেই এই মর্ত্ত্যধামের উত্তেজনা ও অশান্তির অবস্থার মধ্যেও অমর-বাণী শুনিয়া প্রাণে শান্তি ও আনন্দ লাভ হইতে পারে। এইরূপ অমর-বাণী সংগ্রহ নিজে করিতে পারিলে বিশেষ উপকার হয়। যাঁহাদের সেরূপ অবকাশ ও সুবিধা নাই তাঁহারা এইরূপ ক্ষুদ্র পুস্তক ২।৪ খানি সঙ্গে বা নিকটে রাখিলে অবসর মতে ২।১ মিনিটের মধ্যে মনকে জাগ্রত, প্রাণকে আশ্বস্ত ও আত্মাকে জীবিত করিয়া লইতে পারেন। মহিলার পাঠকগণকে অমর-বাণী হইতে দুই চারি 'বাণী' উদ্ধৃত করিয়া উপহার দিতেছি, আশা করি তাঁহারা বিনয় বাবুর সংকলিত অমর-বাণী আদরে পাঠ করিবেন এবং আপনারাও এক এক খানি অমর-বাণী সংগ্রহ প্রস্তুত করিয়া আপন আপন ব্যবহারের জন্য রাখিবেন অথবা সাধারণের ব্যবহারের জন্য প্রকাশ করিবেন। এইরূপ অমর-বাণী বা মহাবাক্য সংগ্রহ করিয়া পাঠিকাগণকে উপহার দান করা মহিলারও অন্যতর উদ্দেশ্য থাকিবে।

সন্তোষই মানুষের পরম বিত্ত।

দুঃখের ঔষধ। দুঃখীর আর অন্য কোন ঔষধ নাই, তাহার একমাত্র ঔষধ আশা।

পাপ পুণ্যের প্রভাব। লোকে মনে করে বুঝি তাহারা কেবল প্রকাশ্য কার্য্য দ্বারা তাহাদের পাপ পুণ্য সমাজে সঞ্চারিত করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা ভুলিয়া যায় যে পাপ বা পুণ্য মানবের প্রত্যেক নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের সহিত আপনার সুগন্ধ বা দুর্গন্ধ বিস্তার করিতেছে।

শক্তির ব্যবহার। দৈত্যের ন্যায় অমিত শক্তি থাকা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু দৈত্যের ন্যায় সেই শক্তি ব্যবহার করা জঘন্য অত্যাচার মাত্র।

দুঃখের শিক্ষা। দুঃখের শিক্ষা মধুময়। দুঃখ-ফণী দেখিতে সুন্দর নহে—দংশনে বিষের জ্বালাও আছে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার মস্তকে ইহা একটি অমূল্য মণি বহন করে।

সংবাদ।

১৯০৬।৭ সালে জাপান হইতে ১২০০০০ পাউণ্ড মূল্যের মানুষের কাল চুল বিদেশে প্রেরিত হইয়াছে। সভ্য দেশের পরচুলার জন্যই এ সব চুল বিশেষ প্রয়োজন।

বড়দিনের সময় বিলাতে একটী ভোজ দেওয়া হয় ৫০ জন মাত্র লোককে খাওয়ান হইয়াছিল। আশ্চর্য্যের বিষয় এই ভোজে ২,৫০০ পাউণ্ড ব্যয় হইয়াছে। সাজান ব্যয় ১০০ পাউণ্ড, ৪২৯ পাউণ্ড ফুলের দাম, ৭৮ পাউণ্ড ১৫ সিলিং বৈদ্যুতালোকে, ৩৬৭ পাউণ্ড ১০ সিলিং মদ, মেনু ছাপান খরচ ৫০ পাউণ্ড এবং ১২৫০ পাউণ্ড বাজে খরচ। পাঠিকাগণ সাবধান, এরূপ সর্ব্বনেশে ভোজ দিতে যেন তোমাদের কখন প্রবৃত্তি না হয়। নিষ্কর্ম্মা ধনী সন্তানগণ এইরূপেই উৎসন্ন গিয়া থাকে।

কলিকাতায় ট্রামওয়ে কোম্পানীর রিপোর্ট পাঠে জানা গেল গত বৎসরে ২,৭৪,৮৮,৮৫০ জন লোক নিজ কলিকাতায় এবং ১১৯৭৫৬১ জন হাবড়ার গাড়ীতে যাতায়াত করিয়াছেন। আয় ১৭৪৪৩০ পাউণ্ড অর্থাৎ ২৬১৬৪৫০ টাকা ব্যয় ১০৭৬৭৭ পাউণ্ড অর্থাৎ ১৬১৫১৫৫ টাকা। গড়ে দশ লক্ষ টাকার উপর লাভ। বেশ ব্যবসা।

'মহিলা'র পিতা এবং মহিলার পাঠিকাগণের চির-শুভাকাঙ্ক্ষী শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের কুশল সংবাদ জানিতে অবশ্যই সকলে উৎসুক আছেন। আমরা আহ্লাদের সহিত সকলকে জানাইতেছি যে তিনি এখনও কোন্নগরের গঙ্গাতীরে দ্বাদশ মন্দিরের ঘাটের সংলগ্ন উত্তর পার্শ্বে নন্দলাল মল্লিকের বাগান বাটীতে বাস করিতেছেন। তাঁহার শরীর সম্পূর্ণ রোগমুক্ত বা সবল হয় নাই তথাপি এখন কিছু লেখাপড়া করিতে পারিতেছেন। উপাসনা ধ্যানধারণাতে অনেক সময় ব্যয় করেন। কোন কোন ধর্ম্মবন্ধু তাঁহার সহিত উপাসনা ও ধর্ম্মপ্রসঙ্গ করিতে গমন করিয়া থাকেন তাহাতে উভয় পক্ষের বিশেষ আনন্দ ও উপকার

হয়। সেন মহাশয়ের ভাগিনেয় মাননীয় শ্রীযুক্ত কৃষ্ণগোবিন্দ গুপ্ত মহাশয় লণ্ডনস্থ ইণ্ডিয়া কাউনসিলের সভ্যপদে নিযুক্ত আছেন। তিনি বৃদ্ধ মাতুলের সেবার জন্য ও অবাধে ধর্ম্ম সাধনের জন্য তাঁহার সমস্ত ব্যয়ভার আগ্রহের সহিত বহন করিতেছেন। এখন আমাদিগের শ্রদ্ধেয় সেন মহাশয়ের জীবনের এক মহা দুঃখ আমাদিগের ব্যক্তিগত জীবনের ও সামাজিক জীবনের হীন অবস্থা। যদি ব্রাহ্মসমাজের নারীগণ জ্ঞান বিশ্বাস সেবা ভক্তি প্রভৃতিতে অগ্রসর হন যদি তিনি দেখিতে পান যে ভগবানের সংসার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহা হইলে তিনি অধিকতর নিশ্চিন্ত মনে আশা ও উৎসাহের সহিত জীবনের অবশিষ্ট সময় ভগবানের কার্য্য এবং তাঁহার পূজা বন্দনা করিয়া পরম সুখে বাস করিতে পারেন।

বিগত ২৩ শে এপ্রেল শনিবার পূর্ব্বাহ্ন সাড়ে নয় ঘটিকার সময় কুচবিহারস্থ ল্যান্স ডাউন হলে সুনীতি কলেজের বার্ষিক পারিতোষিক বিতরণ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। মাননীয় কুচবিহারাধিপতি স্বয়ং পারিতোষিক দান করিয়াছেন। এতদুপলক্ষে মাননীয়া কুচবিহারাধীশ্বরী, কনিষ্ঠা রাজকুমারী, ষ্টেট সুপারইনটেনডেণ্ট মিঃ ডেটিথ, দেওয়ান রায় কালিকা দাস দত্ত বাহাদুর, মহারাজা বাহাদুরের পারসনাল আসিসটাণ্ট শ্রীযুক্ত বাবু প্রিয়নাথ ঘোষ এম এ, সেসন জজ শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সেন এমএ, বি এল, পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ, ব্যারিষ্টার কুমার গজেন্দ্র নারায়ণ সাহেব, মিঃ এন, সি সেন, জনৈক ইংরাজ মহিলা এবং কয়েকটী দেশীয় ভদ্র মহিলা উপস্থিত ছিলেন। কুমারী খনা নাইটিঙ্গেল মজুমদার নাম্নী যে বালিকা বিগত উচ্চ বাৎসরিক পরীক্ষায় কুচবিহার কেন্দ্রের মধ্যে বালকদিগের সহিত প্রতিযোগীতায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে মহারাজ বাহাদুর তাহাকে একটী স্বর্ণমেডেল প্রদান করিয়াছেন। সমুদয়ে প্রায় দেড়শত বালিকাকে পুরস্কার বিতরণ করা হইয়াছে।

ধূমকেতু।—এক পক্ষ কাল হইল হেলীর আবিষ্কৃত ধূমকেতু উষাকালের পূর্ব্বে দৃষ্টিগোচর হইতেছে। আরও ১২ দিন এইরূপ সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে নয়নগোচর হইবে। ধূমকেতু আগামী শনিবার রাত্রি আড়াইটার পর উদিত হইবে। ১১ই মে রাত্রি ২টা ৪২ মিনিট, ১৪ মে ৩টা ৎ মিনিট এবং ১৬ মে ৩টা ৩৭ মিনিটের সময় তাহার উদয় হইবে। ১৯ এ ধূমকেতু সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া তাহার পূর্ব্ব দিকে যাইবে। ঐ দিন দিবাভাগে উহা সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্য দিয়া যাইবে। ২০ এ মে সন্ধ্যা ৭টার সময় ধূমকেতুকে পশ্চিমদিকে দেখা যাইবে। ২১ ঐ তারিখ রাত্রি ৭টা ৫০ মিনিট পর্য্যন্ত ধূমকেতু দৃষ্টিগোচর হইবে। মে মাসের শেষ দিনে সন্ধ্যা হইতে দুপ্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত ধূমকেতু দেখা যাইবে।

সূচী।

কলিকাতা
৫ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"
কে, পি নাথ কর্ত্তৃক ২রা আষাঢ় ১৩১৭ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৫শ ভাগ]   চৈত্র ১৩১৬, এপ্রিল ১৯১০।   [৯ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে পতিতপাবন পুণ্যময় দেবতা, তোমার কন্যাগণকে তুমি পুণ্যস্বভাব দিয়া সজ্জিত করিয়াছ। মনুষ্য পরিবারের সৌন্দর্য্য বিশেষভাবে তোমার কন্যাগণের চরিত্রের প্রভাবের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হয়। তোমার কন্যাগণ পুণ্যশীলা এবং পুণ্যেতেই আনন্দিত হন কিন্তু সমাজে পুণ্যের উপযুক্ত মান্য হইতেছে না। পুণ্যই যে একমাত্র আশ্রয়, যে স্থানে পুণ্যের আদর নাই সে স্থান যে পাপ, দুঃখ ও মৃত্যু পূর্ণ ভীষণ স্থান এই সত্য তোমার পুত্রকন্যাগণের মনে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া দাও। হে শুদ্ধস্বরূপ দেবতা, তুমি যে কোন প্রকার অশুদ্ধতাকে প্রশ্রয় দেও না, তোমার নিকট কোন পাপ আসিতে পারে না একথা মানুষ বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না। এ জন্যই পৃথিবীর দুরবস্থা ঘুচে না। হে আশ্চর্য্য-রহস্যময় ঈশ্বর, আমাদের মঙ্গলের জন্য তুমি নারী-হৃদয়ে প্রেমের কোমলতা ও পুণ্যের দৃঢ়তাকে আশ্চর্য্যভাবে মিলিত করিয়া রাখিয়াছ, তাঁহারা নিঃস্বার্থ প্রেমদ্বারা পৃথিবীকে, সমাজকে ও পরিবারকে বন্ধন করিয়া রাখিতেছেন কিন্তু তাঁহাদিগের পুণ্যের প্রভাব তেমন প্রকাশিত হইতেছে না। তোমার কন্যাগণ যেমন সকল অবস্থায় নিঃস্বার্থ প্রেমের বলে সকল সহ্য করিয়া পরিবারের ও সমাজের মঙ্গল বিধান করিতেছেন তেমন ভাবে তাঁহারা আপনারা পুণ্যে দৃঢ় থাকিয়া পরিবারের ও সমাজের সকল ব্যক্তিকে পুণ্যের অধীন থাকিতে বাধ্য করিতে পারিতেছেন না; তুমি তাঁহাদিগকে পুণ্যে দৃঢ় করিয়া দাও। পুণ্যহীন সৌন্দর্য্য, পুণ্যহীন প্রেম, পুণ্যহীন ধন, পুণ্যহীন বল সকলই যে দুঃখের হেতু, সকলের পরিণাম যে ঘোর অন্ধকারময় মৃত্যু; তাহা আমাদিগের সকলকে তুমি কৃপা করিয়া উত্তমরূপে বুঝাইয়া দেও।

হে দেবতা, আমরা দেখিতেছি যে তুমি তোমার কন্যাগণকে পুণ্য স্বভাব দিয়া রচনা করিয়াছ, তাঁহারা তোমার নিকট খাঁটি হইয়া নিত্য পুণ্যে প্রতিষ্ঠিত থাকিলে এখনই সংসারে পরিবারে স্বর্গরাজ্য আসিবার পথ খুলিয়া যায়। হে পুণ্যময় পরম দেবতা, তুমি কৃপা করিয়া আমাদিগের সমাজের চক্ষু খুলিয়া দেও, দিব্য আলোক আমাদিগকে দান কর যে আমরা যেন আমাদিগের মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা প্রভৃতি নারীগণকে সমাজে ও পরিবারে উচ্চস্থান দান করিয়া তাঁহাদিগের পুণ্যের প্রভাবে শাসিত হইয়া তোমার ইচ্ছা অনুসারে সংসারে বিচরণ করিতে পারি। হে আমাদিগের পরিত্রাতা, তুমি তোমার পুণ্যরাজ্য ধরাতলে প্রতিষ্ঠিত কর, তোমার কন্যাগণকে ব্রহ্ম-কন্যার উচ্চ অবস্থা দান কর যে তাঁহারা আপনাদিগের প্রেম পুণ্যের বলে পৃথিবীকে স্বর্গে পরিণত করিতে পারেন।

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নবযুগ কন্যাদিগের একটী ভাবিবার বিষয়।

সকলেই জানেন ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে অধুনা একদল লোকের অভ্যুদয় হইয়াছে যাঁহাদিগকে—অন্য নামের অভাবে—পুনরুত্থানকারীর দল বলিয়া অভিহিত করা হইয়া থাকে। ইঁহাদের বুলি এই—পূর্ব্বে ভারতে যাহা কিছু ছিল সকলই "ভাল" ছিল, এখন যাহা কিছু হইতেছে সকলই "মন্দ"। এরূপ একদেশ-দর্শিতাকে আমরা বিকৃতি ভিন্ন কিছুই বলিতে পারি না।

অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতি মানুষের সাধারণতঃ একটা কুহেলিকাময়ী আসক্তি থাকে। ইংরাজী একটী কবিতায় আছে—

দূরত্বই দৃশ্যে করে মাধুর্য্য অর্পণ,
সুদূর পর্ব্বত শোভে সুনীল বরণ।

বাস্তবিকই দূরত্বই বোধ হয় অতীত ও ভবিষ্যতের মাধুর্য্যের কারণ। অমর কবি সেক্সপিয়র একস্থলে বলিয়াছেন—"অতীত এবং ভবিষ্যত আমাদিগের নিকট চির মধুর, শুধু বর্ত্তমানই তিক্ত বলিয়া মনে হয়।" টেনিসনও একস্থলে এই ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি সেই সঙ্গে বলিয়াছেন—অতীত এখন অতীত বলিয়াই আমাদের নিকট মধুর, নচেৎ তাহার মধ্যে তাহার নিজস্ব কোন মাধুর্য্য নাই :—

"অতীত মোহিনী চিত্ত মোহিনী শোভাতে,
অতীতে যখন মোরা ছিনু বর্ত্তমান।"

জগতের সর্ব্বত্রই এই ভাবই পরিলক্ষিত হয়—মানুষ বর্ত্তমানকে তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর মনে করিয়া সুদূর অতীতে বা দুর্লক্ষ্য-ভবিষ্যতে "স্বর্গযুগ' বা সত্যযুগ বা Millennium কে স্থাপিত করে।

প্রাচীন যুগের লোকেরা অতীতেই সত্যযুগকে দর্শন করিয়াছেন—অধুনা বৈজ্ঞানিকগণ সত্যযুগকে অনাগত ভবিষ্যতের অস্পষ্ট উষালোকে মানসনেত্রে দর্শন করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন।

সে যাহাই হউক যাঁহারা মনে করেন সত্যযুগ অতীতেরই বস্তু বর্ত্তমান কাল

শুধু হীনতা ও নীচতার পঙ্কে নিমজ্জিত—আমাদের হৃদয় তাঁহাদের মতে সায় দিতে কিছুতেই সম্মত নহে। বরং হৃদয় কবি টেনিসনের সহিত এক বাক্যে বলে—

“এ বিশ্বের মধ্য দিয়া,
আমার বিশ্বাস এই —
ক্রমোন্নত অভিপ্রায় ছুটেছে নিয়ত;
তপনের গতি সহ
মানবের চিত্ত সদা,
নব নব পূর্ণতায় হ’তেছে বিস্তৃত॥

কিন্তু যদিও পুনরুত্থানকারী দলের সহিত আমাদের সহানুভূতি নাই, তথাপি আমরা এ কথা অকুণ্ঠিত চিত্তে স্বীকার করিব যে যে সকল লোক অতীতের মধ্যে কোন সৌন্দর্য্যই দর্শন করেন না এবং যাঁহারা সেই জন্য অতীতের সহিত সকল সম্বন্ধ ছেদন করিয়া সমাজকে সম্পূর্ণ নূতন গড়িয়া তুলিতে চাহেন—তাঁহাদের কার্য্য নিঃসন্দেহ ব্যাধির লক্ষণ যুক্ত। চতুর ব্যবসায়ী কোন নূতন ব্যবসায়ে সফলতা লাভ করিবার জন্য রিক্ত হস্তে ব্যবসায় আরম্ভ করেন না—তিনি যথেষ্ট পুঁজি লইয়া ব্যবসায়ে ব্রতী হন। যাহার কোন পুঁজি পাটা নাই সে কি কখনও ব্যবসায়ে সফল মনোরথ হইতে পারে? সমাজ গড়িয়া তুলিবার ব্যবসায়ে যাঁহারা ব্রতী তাঁহাদেরও এ ব্যবসায়ে যথেষ্ট পুঁজি লইয়া আরম্ভ করিতে হয়। এ ব্যবসায়ে পুঁজি কি? অতীতের অভিজ্ঞতাই ইহার পুঁজি। যাহাকে অতীত বলি সে কি বর্ত্তমান ছাড়া নূতন কিছু! “বর্ত্তমান”ই; কালে অতীত হয়। বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করিয়া বর্ত্তমানের উন্নতি প্রয়াস বাতুলতা মাত্র—সুতরাং অতীতের সহিত সকল সম্বন্ধ ছেদন করিয়া বর্ত্তমানের উন্নতি বিধানের চেষ্টাও মনের বিকার মাত্র। ভিত্তি না থাকিলে কেহ শূন্যে প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিতে পারে না। অতীতের সব ভাল এ কথা বলাও যেমন অনিষ্টকর অতীতের কিছুই ভাল নহে—অতীত হইতে আমাদের কিছুই লাভ করিবার নাই এ ধারণা তাহার অপেক্ষাও অধিক অনিষ্টজনক। জীবনসংগ্রামের জয় পরাজয়ের ইতিহাস অতীতের বক্ষে সঞ্চিত হইয়া আছে। অত্যাচারের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম, স্বার্থত্যাগের মধুময় ফল—অতীতের পত্রে পত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত হইয়া আছে। সে অভিজ্ঞতা-পুঁজি যিনি উপেক্ষা করিবেন—তিনি রিক্ত হস্তে ব্যবসাও ফাঁদিবেন—তাঁহার বিফলতা অনিবার্য্য।

মানুষের দুইটী পা আছে। মানুষ যখন চলে তখন সে কি করে? যিনি দুইটী পাকেই তুলিয়া চলিতে যাইবেন তাঁহার চলা কেমন সুন্দর হইবে তাহা আমরা কল্পনা করিয়া লইতে পারি। দুই পা তুলিয়া অগ্রসর হইতে যাওয়া—চলার ইতিহাস নহে। যিনি চলিতে চাহিবেন তিনি মাটীর উপরে একটী পাকে দৃঢ়ভাবে স্থাপিত করিয়া তাহার উপর ভর দিয়া অন্য পাটী বাড়াইবেন—ইহাই চলার ইতিহাস। মানবকে চলিতে হইলে পায়ের উপর ভর দিয়া দাঁড়াইবার দৃঢ় ভূমি চাই। মনুষ্য সমাজের চলার সম্বন্ধে “অতীত”ই

সেই দৃঢ় ভূমি। সেই ভূমির উপরে ভর দিয়া অগ্রসর হইতে হইবে। ভূমির উপর ভর দিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া থাকিলে চলা হয় না—চলিবার জন্য পা বাড়াইতে হয়। তেমনি শুধু অতীতের বস্তুগুলিকে নির্ব্বিচার মোহে বুকে আলিঙ্গন করিয়া স্থির থাকিলে সমাজ উন্নত হইবে না—বিশ্বের মধ্য দিয়া যে ক্রমোন্নত অভিপ্রায় ছুটিয়া বলিতেছে, যে অভিপ্রায়কে হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়া আশা পূর্ণ অন্তরে সময়ের সহিত আমাদের অগ্রসর হইতে হইবে—তবেই সমাজের উন্নতি সম্ভবপর হয়। আবার অন্যদিকে এ কথাও সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে যে পা বাড়াইতে হইলে স্থির ভূমির উপর ভর দিয়াই সে কার্য্য করিতে হয়—সুতরাং অতীতের অভিজ্ঞতাকে একেবারে পরিবর্জ্জন করিয়া, অতীতের যাহা কল্যাণকর তাহাকে সম্মান না দেখাইয়া একেবারে নূতন করিয়া সমাজগড়িতে যাওয়াও বিড়ম্বনা।

গ্রহণ ও পরিবর্জ্জনই জীবনের প্রধান লক্ষণ। জীবিত সমাজ গ্রহণও করিবে পরিবর্জ্জনও করিবে। গ্রহণ না করিয়া কেবল পরিবর্জ্জনে সমাজের চিরস্থায়ী কল্যাণ সম্ভবপর নহে।

টেনিসন একস্থলে বলিয়াছেন যে প্রত্যেক মানবশিশু যুগযুগান্তরে ধন সম্পদের উত্তরাধিকারী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। এক্ষণে যুগের দশম বর্ষীয় বালকও নিউটনের বিখ্যাত মাধ্যাকর্ষণের নিয়মের কথা জ্ঞাত আছে—যোগী নিউটন যোগবলে যে অমূল্য রত্ন উপার্জ্জন করিয়াছিলেন—তাহা এক্ষণে জগতের সাধারণ সম্পত্তি হইয়া গিয়াছে—মানবশিশু মানব বলিয়াই সেই সম্পদের উত্তরাধিকারী—কেহই তাহাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। যদি কেহ আপনাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া, সে অমূল্য সম্পদের উপকারিতা গ্রহণে অনিচ্ছুক হইয়া, নিজের উদ্ভাবনী শক্তি বলে আবার নূতন করিয়া সেই নিয়ম আবিষ্কার করিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকেন, তবে তিনি পাগল। এ ভাবে চলিতে গেলে সমাজকে বহুদিন শিশু অবস্থায় পড়িয়া থাকিতে হয়।

সুতরাং অতীতের অভিজ্ঞতার পুঁজি আমাদিগকে সম্বল করিতে হইবে। মন্দকে পরিবর্জ্জন করিয়া ভাল যাহা প্রকাশিত হইয়াছে তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে। অতীতের জ্ঞানকে বর্ত্তমানের পথপ্রদর্শকরূপে স্বীকার করিতে হইবে।

ভারতের তামসযুগের অবসানে অধুনা সংস্কৃত জ্ঞানের আলোক উদয়াচলের শিখরে আবার দেখা দিয়াছে। ভারতের নারী সম্বন্ধে নবীন জ্ঞানের আলোকে নবঅভ্যুদয়ের দিকে অগ্রসর হইতেছে। ভারতের সুদিন সমাগত বলিয়া মনে হয় কারণ যেখানে নারীজাতি সমুন্নত হন—সেখানে বিধাতার আশীর্ব্বাদ বর্ষিত না হইয়াই পারে না।

কিন্তু এই মাতৃজাতির দায়িত্ব অতি গুরু। তাঁহারা যদি শুধু স্রোতে অঙ্গ ভাসাইয়া চলিয়া যান—যদি পরিবর্ত্তনের

কূলবিপ্লাবী টানে পড়িয়া অতীতের পুণ্যআদর্শের কথা বিস্মৃত হইয়া পড়েন তবে শুভলক্ষ্যে উপনীত ও সুন্দর হইয়া উঠিবে।

কলিকাতায় বাসকালে আমি একটী বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণের ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলাম। সেখানে যখনই আমি ক্ষুদ্র বালিকাদিগের সুধাকণ্ঠের মধুময়ী আবৃত্তি শুনিয়াছি—যখনই জ্ঞানের দিব্য কিরণে উদ্ভাসিত মহিমাময়ী নারী মূর্ত্তিগুলি দেবলোকের অপূর্ব্ব শোভায় আমার নয়ন সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়াছে—তখনই আমার মস্তক আনন্দে ও কৃতজ্ঞতায় সেই মঙ্গলময় বিধাতার চরণে নত হইয়া পড়িয়াছে। আমার উচ্ছ্বাসিত চিত্ত সেই দেবীমূর্ত্তিগুলিকে অভিবাদন করিয়া বলিয়াছে—এস কন্যা এস ভগিনি, এস জননি, দুঃখিনী ভারতমাতা তোমাদেরই পথ চাহিয়া বসিয়া আছেন—তোমরা না হইলে আর অন্য কেহই তাঁহাকে হীনতা পঙ্ক হইতে টানিয়া তুলিতে পারিবেন না। আর সেই সঙ্গে আমি আপনাকে ইহাঁদের ভাই—পুত্র ভাবিয়া মহান গৌরবে নিজকে পরম ধন্য মনে করিয়াছি।

আমি অন্তরের সহিত বিধাতার চরণে নিয়ত এই প্রার্থনা করি—আমার দেশের নারীসমাজ জ্ঞানে ও শিক্ষায় দিন দিন সমুন্নত হউন। আমি কবির সঙ্গে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করি—"অজ্ঞানতা বিধাতার অভিশাপ, জ্ঞান সেই জ্যোতির্ম্ময় পক্ষ যাহার উপর ভর দিয়া আমরা স্বর্গে উড়িয়া যাই।"

কিন্তু হে নবযুগ কন্যাসমাজ, আমি আপনাদিগকে আপনাদিগের দায়িত্বের কথা স্মরণ রাখিতে বিশেষভাবে অনুরোধ করি। আপনারা জ্ঞান বিজ্ঞানের আলোকে কুসংস্কারকে জয় করিয়া উচ্চ লক্ষ্যের পথে চলিয়াছেন—বিধাতা আপনাদের এ সাধু উদ্দেশ্যের উপর আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন। আপনারা নগ্ন বর্ব্বরতাকে দূরে পরিহার করিয়া যে শীলতা ও সভ্যতার সাধন অবলম্বন করিতেছেন, আপনাদের এ মহৎ সঙ্কল্প সিদ্ধিতে পরিণত হউক। কিন্তু একটী কথা—আপনারা অতীত ভারতের লুপ্তপ্রায় রত্ন-রাজির উদ্ধার বিষয়ে উদাসীন থাকিবেন না। ঘরের অমূল্য সম্পদকে হেলায় উপেক্ষা করিবেন না।

কল্পনাকৌতুকী কবি ও ঔপন্যাসিকগণ কল্পনার রঙ্গীন চশমা পরিধান করিয়া পল্লীগ্রামের যে পরম রমণীয় মধুর মূর্ত্তি দর্শন করিয়া থাকেন, আমরা সত্যের খাতিরে বলিতে বাধ্য যে সে ছবি এক্ষণে আমাদের চক্ষে পতিত হয় না। আমরা নিজে পল্লীগ্রামবাসী কবি-বর্ণিত পল্লীগ্রাম নিছক কল্পনার বস্তু, বাস্তব জগতে এখন তাহার অস্তিত্ব নাই। আমরা দেখিতে পাই দ্বেষ, হিংসা, অসূয়া, সঙ্কীর্ণতা ও কুসংস্কার পল্লীগ্রামে পূর্ণ মাত্রায় বিরাজিত। ভাইয়ে ভাইয়ে দ্বন্দ, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে বিবাদ, পাড়ায় পাড়ায় বিদ্বেষ ইহা পল্লীগ্রামের নিত্য নৈমিত্তিক ঘটনা। সুতরাং কাল্পনিক পল্লীরমণীর রমণীয় ছবি অঙ্কিত করিয়া যাঁহারা আপনাদিগের প্রতি অযথা বিদ্বেষের ও ভ্রূকুটীর বাণ নিক্ষেপ করেন

আমরা তাঁহাদের ব্যবহারে সবিশেষ লজ্জিত। আশা করি আপনারা তাঁহাদিগকে উদার হৃদয়ে ক্ষমা করিবেন। আপনারা আরো ক্ষমা করিবেন সেই সকল দীন কৃপা-পাত্রদিগকে যাহারা শিক্ষা ও সংস্কারের বিরুদ্ধে অশ্লীল ও বিকৃত রুচির পরিচয় দিয়া আপনাদিগকেই নীচত্বে সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে।

পল্লীগ্রামে মহত্বের প্রাসাদ এখন বিচূর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু যে ধ্বংসাবশেষ এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে বুঝিতে পারি যে এককালে পুণ্য আদর্শের উচ্চ অট্টালিকা সেখানে আকাশের দিকে মস্তক উন্নত করিয়া দণ্ডায়মান ছিল। আজ সেই সকল ধ্বংসাবশেষের দু একটীর কথা আপনাদের নিকট উল্লেখ করিব।

এখনও আমি যখন সহর হইতে আমার দীন জন্ম-পল্লীতে গিয়া উপস্থিত হই, তখন দেখি যে আমাদের পাড়ায় যেন মস্ত একটা অসুরের সাড়া পড়িয়া যায়। আমার বামুন জেঠাইমা সংসারের শতকর্ম্ম ফেলিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়া আমার কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন। আমার কামার ভাইজী কত আগ্রহের সহিত জিজ্ঞাসা করে "কাকা ভাল আছ?" আমার নাপিত দিদি, আমার কুমোর মামী সবাই আমাকে ঘিরিয়া কথায় গল্পে আমাকে যেন অভিভূত করিয়া ফেলে। আপনারা বিশ্বাস করিবেন কি, সে সময়ে আমার হৃদয়ে যেন সুধার সমুদ্র উথলিয়া উঠে। কি একটী অদৃশ্য কোমল স্নেহের ডোর প্রাণের সঙ্গে প্রাণ যেন গাঁথা পড়িয়া গেছে। এই সরল সুন্দর আত্মীয়তার পরিচয় অজ্ঞাতসারে আমার চক্ষের পাতাকে ভিজাইয়া আনে। আমি সহরেও অনেক স্বর্গীয় নারী-হৃদয়ের অপূর্ব্ব স্নেহসুধা লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছি। ইঁহাদের কথা আমি কিছু বলিব না। কিন্তু সাধারণতঃ অনেকস্থলে লক্ষ্য করিয়াছি, আদর আছে, যত্ন আছে, সেবা আছে, অভ্যর্থনা আছে কিন্তু যেন সেই সরল ব্যাকুল স্নিগ্ধ আন্তরিকতাটুকু নাই। হয়তো ভুল বুঝিয়াছি, সেরূপস্থলে আমি সর্ব্বান্তঃকরণে আপনাদের ক্ষমা ভিক্ষা করি। কিন্তু যদি আমার এই ধারণার মধ্যে কিছুমাত্রও সত্য থাকে, তবে আপনাদের তাহা বিশেষ করিয়া ভাবিবার বিষয়। পল্লীগ্রাম হইতে এই বামুন জেঠাই মা ও কুমোর মামীর দল ক্রমশঃই লোপ পাইতেছে, অজ্ঞানতা ও কুশিক্ষা যেখানে দীর্ঘকাল ধরিয়া বিরাজ করে সেখানে স্বর্গীয় গুণ অধিকদিন তিষ্ঠিতে পারে না। নবযুগ কন্যাগণ তাঁহাদের জ্যেষ্ঠাগণের এই অমূল্য ভূষণটীকে কি নষ্ট হইতে দিবেন, তাঁহারা কি ইহাকে আদরে আপনাদের কণ্ঠে ধারণ করিবেন না? আমি জানি তাঁহাদের হৃদয়ে কাঞ্চন আছে, তাঁহারা যেন এই মণিকে উহার সঙ্গে মিলাইয়া লইতে উদাসীন না থাকেন। যদি পরকে আপনার করিয়া প্রাণের মধ্যে টানিয়া লইতে হয় তবে এই আন্তরিকতারূপ চুম্বককে উপেক্ষা করিবেন না।

আর একটী দেবগুণ—সুকোমল বিন-

য়ের ভাব। কেমন একটা সুশোভন অবনত দীনতা, যাহা পদতলে লুণ্ঠিত হইয়া সকলের উপর আপনার প্রভুত্ব বিস্তার করিয়া থাকে। অনেকে হয় তো বলিবেন অশিক্ষিতা, আত্মগৌরব-জ্ঞান-বঞ্চিতা স্ত্রীলোকেরা যেরূপ দীন অকিঞ্চনতার ভাব প্রকাশ করিবেন, সুশিক্ষিতা নারীজাতির উচ্চাধিকার বিষয়ে জাগ্রৎ-চেতনা রমণীগণও কি সেরূপ করিবেন? ইহার উত্তরে আমি বলিব, শিক্ষিতাগণ শুধু সেইরূপ করিবেন তাহা নহে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক করিবেন। শিক্ষা যদি বিনয় না দেয়, তবে জানি না আর কিসে তাহা দিতে পারে! তবে প্রকৃত শিক্ষা চাই, শিক্ষার বাহ্য-আড়ম্বরে কখনই এ বিনয় আসিবে না। Little learning is a dangerous thing বস্তুতঃই অল্প-বিদ্যা ভয়ঙ্করী। আমাকে যেন কেহ ভুল বুঝিবেন না, আমি বিনয় অর্থে নির্জ্জীব নিরাশ্রয়ের, বা কপট সৌজন্যের ভাব বুঝিতেছি না। আমি বুঝিতেছি সেই গুণ যাহা দাস হইয়া প্রভু, যাহা ছোট হইয়া সর্ব্বাপেক্ষা বড়। শিক্ষার সঙ্গে একটা দুরধিগম্যতার অপবাদ থাকিয়া যাইতেছে, শিক্ষা যেন "সঙ্গীনের" ন্যায় খাড়া থাকিয়া সাধারণ লোকদিগকে দূরে খেদাইয়া রাখিতেছে। অথচ শিক্ষার ন্যায় সুকোমল বস্তু আর কি আছে? প্রাণ খুলিয়া বিশ্বাস করিবার এমন জিনিস আর কি আছে? শিক্ষা "সঙ্গীন" নহে শিক্ষা পরম সুহৃদের স্নিগ্ধ প্রেমছায়া। ইহা বিভীষিকার ন্যায় মানুষকে দূরে সরাইয়া রাখিবে না কিন্তু মানুষ সংসারে শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া এই অক্ষয় বটমূলে বসিয়া প্রাণের ক্লান্তি দূর করিবে। সকল সদ্‌গুণের শ্রেষ্ঠ এই বিনয়—ইহা উপেক্ষা করিবার জিনিস নহে।

তাহার পর আর একটী গুণ—শ্রদ্ধা নিষ্ঠা সংযম। নাম ভিন্ন হউক কিন্তু বস্তু একই। পল্লীগ্রামে এখনও নারীদিগের ব্রত ও নিয়ম পালনের জন্য যে কঠোর সংযম ও স্বার্থত্যাগ, পূজার আয়োজনের মধ্যে যে শুদ্ধাচার রক্ষার ঐকান্তিকী চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় তাহা প্রকৃতই স্বর্গীয় বস্তু। অবশ্য এ গুলির ভিতর হইতে এখন প্রাণ চলিয়া যাইতেছে ও কেবল বাহ্যআড়ম্বরই অবশিষ্ট থাকিয়া যাইতেছে—কিন্তু তথাপি এই ধ্বংসাবশেষ হইতেও আমরা পূর্ব্ব অট্টালিকার মহত্ত্ব ও মাধুর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। আর বাহ্য আয়োজন যে একেবারে উড়াইবার জিনিস তাহাও মনে হয় না—"বাহির" হইতে ভিতর অনেক বিষয়ে সাহায্য লাভ করিয়া থাকে। তবে অন্তর শুদ্ধি চিত্তের নিষ্ঠা ও সংযমই যে চরম লক্ষ্য এ কথা কে অস্বীকার করিবে? প্রাণহীন বাহ্যআড়ম্বর গুলিকে উপেক্ষা করিতে পারেন কিন্তু তাহাদের উপেক্ষা করিতে গিয়া যদি তাহার সঙ্গে ঐ অমূল্য মাণিকগুলি হারাইয়া ফেলি তাহা হইলে উহা গভীর পরিতাপের বিষয়। কুসংস্কার পরিত্যাগ করিতেই হইবে কিন্তু কুসংস্কারের বিভীষিকায় আকুল হইলে চলিবে না। আপনারা চিন্তাশীল বাগ্মী Burke এর সেই কথা

মনে রাখিবেন—There is superstition in avoiding superstition—

কুসংস্কার বিভীষিকায় ব্যতিব্যস্ত হইয়া "ঐ কুসংস্কার ঐ কুসংস্কার" করিয়া বেড়ানও এক বিষম কুসংস্কার। কুসংস্কারকে ঝাঁটাইয়া ফেলিতে গিয়া ঘরের মণি মাণিক্য গুলিকেও তাহার সহিত ঝাঁটাইয়া ফেলিলে আমাদের পরম দুর্ভাগ্য।

আজ আর এ বিষয়ে অধিক আলোচনা করিব না করিবার আবশ্যকতাও নাই। আপনাদের ভাবিবার জন্য সামান্য ইঙ্গিত করাই আমার উদ্দেশ্য। আপনারা যদি এই পত্রিকায় এ বিষয়ে সবিস্তার আলোচনা করেন তাহা হইলে বিশেষ সুখী হইব। এ বিষয়ে যতই আলোচনা হয় ততই মঙ্গল। আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পল্লীগ্রামে এখন আর এ গুনগুলি অবিকৃত অবস্থায় নাই—শূন্য আড়ম্বর প্রাণের সিংহাসন অধিকার করিয়া লইতেছে। অজ্ঞানতার যাহা অবশ্যম্ভাবী ফল সেই ফল ফলিতে আরম্ভ করিয়াছে। এক্ষণে ঘরের এ রত্নগুলির যদি পুনরুদ্ধার করিতে হয় তবে এ বিষয়ে আপনাদিগকেই বিশেষভাবে অগ্রসর হইতে হইবে। আপনারা পোষাক পরিচ্ছদ, রীতি নীতি, সামাজিক আচার ব্যবহার বিষয়ে উন্নততর লক্ষের দিকে চলিয়াছেন—আপনারা শিক্ষার শুভ আলোক লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন, আপনারাই ভারতীয় নারীর অপূর্ব্ব দেবগুণ গুলির মাহাত্ম্য বুঝিবার প্রকৃত অধিকারিণী। উন্নততর রীতি নীতি ও উচ্চতর আচার ব্যবহারে দেশ দিনদিন সমুন্নত হউক—কিন্তু এ সকলের যাহা প্রাণ যাহাকে আশ্রয় করিয়া এ সকলের মহিমা ও মাধুর্য্য সেই ধর্ম্ম ও চরিত্র যেন সর্ব্বপ্রযত্নে রক্ষিত হন। প্রাণহীন দেহে যেমন অলঙ্কারের সন্নিবেশ সর্ব্বথা নিষ্ফল, ধর্ম্মহীন সভ্যতা ও সংস্কার তেমনি একান্ত নিরর্থক। মন্দিরের শোভা সম্বর্দ্ধন সর্ব্বপ্রযত্নে সাধিত হউক কিন্তু মন্দিরই যেন সর্ব্বস্ব হইয়া না উঠে—মন্দিরের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাই যেন সকলের মূল লক্ষ্য হইয়া অন্তর বাহির পূর্ণ করিয়া চিরদিন বিরাজিত থাকেন।

কিরূপে শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে।

পাঠিকাগণ, আপনাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, সমস্তদিন সংসারের নানা কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে করিতে একবারও কি অশান্তি বা বিরক্তি আসে নাই? সন্ধ্যা বেলা দিবসের কর্ম্ম সমাপনান্তর যখন একটু অবকাশ পাই, তখন সমস্ত দিনের কর্ম্মের আলোচনা ও বিচার করিতে বসিলে দেখি, কত ব্যস্ততা, অধীরতা, বিরক্তি ক্রোধ আসিয়াছে। অর্থাৎ কত বার মনের শান্তি হারাইয়াছি, আপনাকে দুঃখী ও দুর্ভাগা করিয়াছি।

প্রাতঃকালে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া ভগবানের নিকটে প্রার্থনা করিলাম, সমস্ত দিনের কাজ কর্ম্মের মধ্যে যেন মনের শান্তি, সমতা না হারাই; কিন্তু মধ্যাহ্নের পূর্ব্বেই দেখি কতবার অশান্ত

হইয়াছি। সংসার বড় ভয়ানক স্থান, এখানে পদে পদে এত বাধা বিঘ্ন, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এত বিরক্তি, অশান্তির কারণ উপস্থিত হয় যে, ইহার মধ্য দিয়া শান্ত সন্তুষ্ট ও প্রফুল্ল মনে গমন করিতে পারেন, এমন ভাগ্যবান ব্যক্তি অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। দিনের কর্ম্মের মধ্যে এক এক সময় চারিদিক হইতে এত বিরক্তির কারণ উপস্থিত হয় যে, মনে হয় যেন সকলে মিলিয়া পরামর্শ করিয়া ধৈর্য্য পরীক্ষা করিতে আসিয়াছে; সে সময় যোগীরাও শান্তি রক্ষা করিতে পারেন না। পাঠিকা, এরকম পরীক্ষার সময় কি আপনার কাছে উপস্থিত হয় নাই? অবশ্যই হইয়াছে। গৃহিণী জননী যিনি, যাঁহার কত প্রকার কর্ত্তব্য, দায়িত্ব তাঁহার নিকট প্রায়ই এ অবস্থা আসে। পাঠিকা, এই প্রকার একটি কার্য্যব্যস্ততার অবস্থা স্মরণ করিয়া দেখুন প্রাতঃকালে যখন আহারের আয়োজন করিতে ব্যস্ত, শিশু সন্তান ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিয়াছে, কেহবা অন্ন চাহিতেছে, ভৃত্যকে ডাকিয়া পাওয়া যাইতেছে না, দূরস্থ কোনও আত্মীয়ের পীড়ার সংবাদ আসিল, কেহবা কোন মূল্যবান্ দ্রব্য হঠাৎ ভাঙ্গিয়া ফেলিল, এমন সময়ে হয়ত শিশুটি পড়িয়া গিয়া ভয়ানক আঘাত পাইল,—গৃহিণী, জননী ভাবিয়া দেখুন, এসময় স্থির শান্ত থাকা কাহার সাধ্য! তখন অধীর অশান্ত হইয়া আর একটি কিছু অন্যায় কাজ করিয়া বসেন, হয় সন্তানকে প্রহার, নয়ত ভৃত্যকে তিরস্কার করেন। নারীর জীবনে এরকম পরীক্ষার অবস্থা প্রতিদিনই আসে। যিনি অধীর হইয়া পড়েন, তিনি দশ দিক অন্ধকার দেখেন। মানুষ বড় বড় বিপদ পরীক্ষা বরং সহ্য করিতে পারে, কিন্তু সংসারে প্রতি মুহূর্ত্তে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পরীক্ষায়, অসুবিধায় ও ক্ষতিতে অধীর হইয়া পড়ে।

পূর্ব্বকালে অনেকে (এখনও কেহ কেহ) প্রলোভন ও পরীক্ষাপূর্ণ সংসার ত্যাগ করিয়া নির্জ্জন বনে গিয়া একাকী ধর্ম্মসাধন করিতেন। ধর্ম্মসাধনের পক্ষে আমাদের দেশের লোক বনগমনই প্রকৃষ্ট পথ মনে করিতেন। সেখানে গিয়া প্রলোভন পরীক্ষার হাত এড়াইয়া একান্ত মনে ভগবানে মনোভিনিবেশ করিতেন। কিন্তু এরূপ ভাবে ধর্ম্ম উপার্জ্জন করার বা ধার্ম্মিক হওয়ার অধিক মূল্য নাই। সংসারের পরীক্ষা প্রলোভনে মনের শান্তি চলিয়া যায় সেই জন্য সে সব ছাড়িয়া নিরাপদে ধর্ম্ম সাধন করা হয় তাহার উপকারিতা কি? পুনরায় সংসারে আসিলেই যদি মনে অধীরতা বিরক্তি ক্রোধ হিংসা দ্বেষ সাংসারিকতা আসে তবে তাহার মূল্য কি? রাগের কারণ উপস্থিত হয় নাই বলিয়া রাগ কর নাই, হিংসার উদ্রেক করে এমন কোনও ঘটনা ঘটে নাই বলিয়া হিংসা প্রবল হয় নাই তখন কি তোমাকে অক্রোধী বা অহিংসুক বলা যায়? অন্তরে সকল প্রকার প্রবৃত্তি রহিয়াছে যখন যে প্রবৃত্তির উপরে আঘাত পড়িতেছে, তখন সে আপনার অন্তর্নিহিত প্রবল পরাক্রম প্রকাশ করিতেছে। এখানে আর একটী বিষয়েরও উল্লেখ

করা যাইতে পারে। আমরা অন্যের দোষের বিচার করি, বলি, মানুষ আবার এরকম কাজ করিতে পারে? কিন্তু যদি বিচার করিয়া দেখি, সে কিরূপ অবস্থায় পড়িয়া, কিরূপ প্রলুব্ধ বা উত্তেজিত হইয়া সেরূপ কর্ম্ম করিয়াছে, তখন তাহার সহিত সহানুভূতি হয়। আমি সে অবস্থায় পড়িলে, সেরূপ উত্তেজনা প্রলোভন উপস্থিত হইলে, কি করিতাম তার পরে যেন তাহার বিচার করি। আমি যে অমুক পাপ কার্য্য করি নাই তাহার কারণ সেরূপ কোন পরীক্ষা আমার নিকট উপস্থিত হয় নাই। আমি যে সেরূপ পাপ কর্ম্ম কখনও করিতে পারি না তাহা কি বলিতে পারি? অন্যের অপেক্ষা আপনাকে শ্রেষ্ঠ মনে করিবার কোনও কারণ নাই। যে কোনও যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়া আপনার শৌর্য্য বীর্য্য প্রকাশ করে নাই সে কখনও যোদ্ধা হইতে পারে না, হইতে পারে সে বহুদিন হইতে যুদ্ধবিদ্যা অভ্যাস করিতেছে অনুকরণ করিতেছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত না ভীষণ যুদ্ধক্ষেত্রে আপনার সকল, শক্তি বুদ্ধি ব্যয় করিয়াছে, সে পর্য্যন্ত সে যোদ্ধা নয়। প্রতিদিনের কর্ম্মক্ষেত্র যুদ্ধক্ষেত্র অপেক্ষা অধিক পরিক্ষা পূর্ণ। যুদ্ধক্ষেত্র হইতে অনেকেই বিজয়ী হইয়া ফিরিয়া আসেন কিন্তু এক্ষেত্র হইতে অতি অল্প লোকেই বিজয়ী হইয়া গমন করিতে পারেন। সংসারে যিনি জয়ী হন, তিনি যুদ্ধজয়ী অপেক্ষা অনেক গুন শ্রেষ্ঠ। সংসার ত্যাগ করিয়া একাকী কখনও জীবনের বিকাশ বা উন্নতি হয় না। ভগবান, ধৈর্য্য সহিষ্ণুতা ক্ষমা, উদারতা প্রভৃতি সকল গুণের বিকাশের জন্য রাগ বিরক্তির কারণ পূর্ণ এই সংসারে রাখিয়াছেন। বর্ত্তমান যুগের বিশেষ ধর্ম্ম এই শান্তি, অবিকৃত চিত্তে, সুমিষ্টভাবে, সকলের প্রতি কর্ত্তব্য করিতে হইবে।

চিত্রবিদ্যা শিখিতে হইলে, কেবল, সুন্দর সুন্দর চিত্র দেখিয়া প্রশংসা করিলেই হয় না, কিন্তু বহুদিন ধরিয়া বহুযত্ন পরিশ্রম করিয়া, অভ্যাস করিতে হয়। এখানে প্রতিমুহূর্ত্তে ধৈর্য্য সংযম আত্মত্যাগ শিক্ষা করিতে হয়; পরিবারে সমাজে থাকিয়া সকলের প্রতি কর্ত্তব্য করিলে বহু শিক্ষা হয় সংসার, তাহাকে নানা পরীক্ষার আঘাতে মানুষ করিয়া দেয়, শত শত পুস্তক পড়িলেও এ সে শিক্ষা অভিজ্ঞতা হয় না। একাকী বাস করিলে, কোনও পরীক্ষাও নাই কোনও শিক্ষাও নাই। নব নব কর্ত্তব্য দায়িত্ব অর্থ নব নব পরীক্ষায় পতিত হওয়া, নব নব পরীক্ষা অর্থ, নব নব শিক্ষা লাভ করা। আমরা নিতান্ত নির্ব্বোধের ন্যায় ভাবি, সংসারে সবদিকে বেশ সুবিধা হবে, সব অনুকূল হবে, তবে আমি ধর্ম্ম সাধন করিব, অক্রোধী সংযমী হব। যদি সবই অনুকূল স্বচ্ছল হয় তবে জড়প্রকৃতি পাইতে হয়, কোনও বিকাশ হয় না। যাহারা সুখস্বচ্ছন্দতা আরামের মধ্যে প্রতিপালিত হয় তাহারা অনেক সময়ে মনুষ্য নামের অযোগ্য হয় ও পরে নানা বিপদ দুঃখে পড়িয়া একেবারে অন্ধকার দেখে বা পরীক্ষা বিপদের আঘাতে ঠেকিয়া শিখিয়া মানুষ হয়। আবার ইহাও দেখিতে

পাই প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া আত্মোন্নতি করিতে সমর্থ হয়। সবই অনুকূল স্বচ্ছল হবে, তবে আমি ভাল হব সেটা ভুল। বাধা বিঘ্ন অসুবিধা প্রতিকূলতা এসব ভগবানের স্বহস্তের দান, মানবের উন্নতির পরম সহায়। অল্পবুদ্ধি অদূরদর্শী আমরা, আমরা ভাবি রোগ শোক থাকিবে না সুস্থশরীর সুব্যবস্থা হইলে তখন ইহা করিব। বুঝি না, দুঃখ বিপদ বাধা বিঘ্ন আসিয়া কত শিক্ষা দিয়া যায়। তাই কবি বলিয়াছেন "আমি তাই চাই ভরিয়া পরাণ, দুঃখের সাথে দুঃখের ত্রাণ, তোমার হাতের বেদনার দান, এড়ায়ে চাহি না মুকতি; দুঃখ হবে, মোর মাথার ভূষণ সাথে যদি দাও ভকতি।"

সমস্তদিন কি কি কারণে মনের শান্তি হারাই? আপনারা একবার চিন্তা করিয়া দেখুন, আপনাদের কি মনে হয়? ১। লোকে আমার কথা শুনিল না; আমার কথামত কাজ করিল না। ২। আমাকে সম্মান বা আদর যত্ন করিল না। ৩। আমার দোষ প্রদর্শন করিল বা অযথা অতিরিক্ত তিরস্কার করিল। ৪। অসুবিধায় পড়িতে হইল বা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল। কেহ যদি আমার কথা না শুনে আমার কথামত কাজ না করে; সেজন্য মনে মনে রুষ্ট বিরক্ত হইয়া কি লাভ? অতি সামান্য সামান্য বিষয়েও আপনার ইচ্ছা বজায় রাখিতে মনে একটা জেদ হয় সহজে অন্যের ইচ্ছাতে, মত দি না, অন্যের ইচ্ছা মত চলিলাম, তাহাতে ক্ষতি কি, অনেক সময় দেখি ভালই হইয়াছে। কিন্তু যদি আমার ইচ্ছা পূর্ণ হইল না বলিয়া কষ্ট পাই, নিজের মানও থাকে না, আর অন্যকেও অশান্তিতে ফেলি। আমার যাহা বলিবার বলিলাম, যাহা সাধ্য হয় করিলাম, যে বিষয়ে আমার কোনও হাত নাই সে বিষয়ে শান্ত হইতে হইবে। কেহ যদি সম্মান না দেয় সে বিষয়ে মনোযোগ দিবার দরকার কি, যতই মনে করিব, সে আমাকে মানিল না, ততই অশান্তি বোধ করব। যে দোষ প্রদর্শন করিল পরম উপকার করিল, ক্রুদ্ধ না হইয়া, সে দোষকে স্বীকার করিয়া সংশোধন করিতে হইবে। আর একটী উপায় অন্যের দোষ প্রদর্শন না করা। কাহারও জন্য অসুবিধায় পড়িতে হইল, ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইল, তাহা ক্ষমা করিয়া সহ্য করিতে হইবে। একের দোষ দুর্ব্বলতার জন্য অন্যকে কষ্ট পাইতে হয়। আমার জন্যেও কত সময় অন্য কে অসুবিধা ভোগ করিতে হয়। ক্ষমা না করিলে শান্তি অসম্ভব। ক্ষমা ও ধৈর্য্য শান্তির সোপান। যিনি সকলকে ক্ষমা করিতে পারেন, তাঁর শান্তি কে হরণ করিবে? তুমি কাহারও কোন অনিষ্ট সাধন কর না; কাহাকেও আঘাত দাও না, কিন্তু লোকে তোমার অনিষ্ট সাধন করিতে পারে তোমাকে আঘাত দিতে পারে তখন যদি তোমার মনে প্রতিশোধের ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে, তুমি তোমার শান্তি হারাইলে। অতএব দেখা যাইতেছে, মনের শান্তি সমতা প্রফুল্লতা অব্যাহত রাখিতে হইলে, কেবল যে আপনার চিত্তবৃত্তি সকলকে সুসংযত

করিতে হয় তাহা নয় কিন্তু অন্যের আচার অবিচার অথবা তিরস্কার কঠোর ব্যবহার শান্তভাবে সহ্য করিয়া ক্ষমা করিতে হইবে। অপরাধীর বিষয়ে উদাসীন হইলে কিম্বা কোন প্রকারে ক্ষমা করিলে মনে শান্তি থাকে না, কিন্তু যদি তৎপরিবর্ত্তে মিষ্ট ব্যবহার করিতে পারি, তাহার হিতাকাঙ্ক্ষী হইতে পারি তবেই শান্তি দেবী সেখানে তিষ্ঠিতে পারেন। আমি যদি বলি, আমিত চেষ্টা করি যাহাতে রাগ না হয় কিন্তু লোকে যে আমায় রাগায়, একথা বলিলে, নিস্কৃতি কোথায়? লোকে নানা কারণ উপস্থিত করিবে। আর আমি যদি উত্তরোত্তর অধিক ক্রোধী হইতে থাকি, তাহাতে আমারই ক্ষতি। যদি কেহ অন্যকে আঘাত দিবার জন্য আপনার সমস্ত শরীর কণ্টক বিদ্ধ করে যে, যে কেহ আমাকে আঘাত করিবে, সেই আহত হইবে। ইহাকে যেমন লোকে উন্মাদ বলিবে, সেই প্রকার ক্রোধীর প্রতি ক্রোধকরা কর্কশ বাক্যের পরিবর্ত্তে কর্কশ বাক্য প্রয়োগ করা একই কথা। অন্যের মন্দ করিবার জন্য আপনি মন্দ হওয়া। মানুষের সুখ দুঃখ তাহার আপনার হাতে। সরল কোমল পরদুঃখে দুঃখী মিষ্ট প্রকৃতির লোক, সকলকে ভালবাসিয়া, সকলের হিত সাধন করিয়া, আপনিও সুখী হয় অন্যকেও সুখী করে। ভগবানে যাহার চিত্ত সর্ব্বক্ষণ নিমগ্ন, সেই ব্যক্তিরই শান্তি চিরঅক্ষুন্ন থাকে।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা। *

ছায়া সত্যে পরিণত হইল।

কিন্তু তথাপি এরূপ অপরিণত-বয়স্ক যুবককে গৃহে স্থান দিবার ঔচিত্য অনৌচিত্য সম্বন্ধে বিশেষরূপে বিবেচনা করিলেই ভাল হইত। মিষ্টার হ্যালিবার্টন টেট্ পরিবারে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। তাঁহারা যতই তাঁহার সহিত পরিচিত হইতে লাগিলেন ততই তাঁহার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। জেনও আকৃষ্ট হইল।

মিষ্টার হ্যালিবার্টনকে গৃহে স্থান দিলে তাহার ভাবীফল কি হইবে সেই বিষয়টী একটী ছায়ার আকারে মিঃ টেটের মনে উদিত হইয়াছিল, এবং সেই জন্যই তিনি তাঁহাকে পরিবারভুক্ত করিতে প্রথমে হৃদয়ে একটু দ্বিধাবোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু এই ক্ষণিকছায়া মুহূর্ত্তের জন্যই

* যিনি এই অনুবাদ কার্য্যে ব্রতী হইয়াছিলেন অন্যান্য কর্ত্তব্যের গুরুভার প্রযুক্ত তিনি এ কার্য্যে আর অগ্রসর হইতে অপারক। যিনি আরম্ভ করিয়াছিলেন তিনিই শেষ করিলে সুন্দর হইত। কিন্তু যখন তিনি এ বিষয়ে অসমর্থ, তখন নিজের ত্রুটি ও অক্ষমতা সত্বেও এই কার্য্যভার আমি আনন্দের সহিত গ্রহণ করিলাম। যে পুস্তকের ইহা অনুবাদ, বঙ্গীয় নারীসমাজে সেরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার একান্ত বাঞ্ছনীয়। দেশের মঙ্গল আমার লক্ষ্য; সুধী মণ্ডলী এই লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া অনুবাদের সকল ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীবিনয় ভূষণ সরকার।

তাঁহার মনের উপর কালিমা নিক্ষেপ করিয়াছিল—পরক্ষণেই সে ছায়া কোথায় বিলীন হইয়া গেল। যেখানে দুইটী মধুর স্বভাব-সম্পন্ন নবীন হৃদয় প্রতিদিন সম্মিলিত হইবার সুযোগ প্রাপ্ত হয়, সেখানে সাধারণতঃ ফল এই দাঁড়ায় যে তাহাদের পরস্পরের মধ্যে একটী নিবিড় অনুরাগের বন্ধন সৃষ্ট হয়। এই অনুরাগ পৃথিবীর যাবতীয় আকর্ষণ অপেক্ষা প্রবল এবং মধুর। এ ক্ষেত্রেও সেই ফলই ফলিয়াছিল।

মিঃ হ্যালিবার্টনের টেট্ পরিবারে প্রথম আসিবার পর এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল—জেন এবং হ্যালিবার্টনের পক্ষে এই সময় যে কত শীঘ্র অতিবাহিত হইল তাহা কেবল তাহারাই বলিতে পারে। মিঃ হ্যালিবার্টন জেনকে এমন একটী কথাও বলেন নাই যাহা তিনি তাহার মাতা বা ভগ্নী মারগারেটকে বলিতে না পারিতেন। জেনও তাঁহার প্রতি কখনও এরূপ ভাবে দৃষ্টি-নিক্ষেপ করে নাই যাহা দেখিয়া হ্যালিবার্টন বুঝিতে পারিতেন যে জেনের চক্ষে তিনি পৃথিবীর যাবতীয় আত্মীয়বর্গ হইতে পরমাত্মীয়। কিন্তু তথাপি উভয়েই উভয়ের মনোগত-ভাব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিল, এবং সেইজন্য যখন এক বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল, তখন উহা তাহাদের পক্ষে এক মুহূর্ত্ত বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। প্রেম যুগকে মুহূর্ত্তে পরিণত করে।

ডিসেম্বর মাসের একদিন সন্ধ্যার সময় জেন বাহিরের ঘরে দাঁড়াইয়া চা প্রস্তুত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। সেই হ্যালিবার্টন যে দিন সর্ব্বপ্রথম তাহাদের বাড়ীতে আসেন সে দিন যেমন করিয়া জেন চা প্রস্তুত করিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল—আজও ঠিক সেই-রূপেই অপেক্ষা করিতেছিল। বাহিরের চিহ্ন ধরিয়া বিচার করিতে গেলে বলা যাইতে পারিত যেন তাহাদের প্রথম পরিচয়ের পর এক ঘণ্টাও অতীত হয় নাই—ইহা যেন সেই দিনেরই সেই সন্ধ্যা। আজি ঠিক তেমনি বাহিরে বৃষ্টি ও কর্দ্দম এবং ভিতরে আলোক এবং উজ্জলতা। তেমনি করিয়া বাতিগুলি টেবিলের উপর দাঁড়াইয়াছিল—তেমনি করিয়া গৃহে অগ্নি প্রজ্বলিত ছিল—এবং জেন একাকিনী সেখানে দাঁড়াইয়াছিল। গৃহিণী তাঁহার চিরসঙ্গী শিরঃপীড়া লইয়া উপরে শুইয়াছিলেন মার্গারেট তাঁহার কাছে ছিল অন্য দুইটী বালক তখনও গৃহে প্রত্যাগমন করে নাই।

জেন চিন্তামগ্নভাবে দাঁড়াইয়াছিল, অগ্নির উজ্জ্বল আলোক তাহার মধুর মুখমণ্ডলের উপর দীপ্তি পাইতেছিল। শীতের সন্ধ্যার গোধূলি এবং রজনীর সম্মিলন মুহূর্ত্তের এই নীরব গম্ভীর শান্তি জেনের মনকে কি এক অব্যক্ত মধুরভাবে আবিষ্ট করিয়া তুলিল।

ঘড়িতে ৫টা বাজিয়া গেল। জেনের চিন্তাস্রোত থামিল না। সে ঘড়ির শব্দ কাণে শুনিল, কিন্তু উহা তাহার মনের উপর কোনই কার্য্য করিল না। ঘড়ির আওয়াজ গৃহের আকাশে মিলাইতে না মিলাইতে সম্মুখের দরজায় আঘাতের শব্দ

শুনা গেল। জেন এইবার জাগিল সে জানিত দরজায় কে আঘাত করিল। সে শশব্যস্ত হইয়া দরজা খুলিয়া দিল। তাহার গণ্ডস্থল আরক্তিম হইয়া উঠিল, তাহার হৃদয়ের শোণিত পূর্ব্বাপেক্ষা দ্রুতগতিতে প্রবাহিত হইতে লাগিল।

সে ধীরে ধীরে একখানি চেয়ারের উপর বসিল। একটী দীর্ঘাকৃতি সুপুরুষ সেই সময়ে গৃহে প্রবেশ করিলেন।

"আজ বড় ঠাণ্ডা, জেন। আজ রাত্রে খুব বরফ পড়বে "

"হাঁ, এখন হ'তেই বাইরে চৌবাচ্চার জল একটু একটু জমে আসছে।"

"মা এখন কেমন আছেন?"

"একটু ভালই। মার্গারেট তাঁকে কাপড় চোপড় ঠিক ক'রে পরিতে দিতে উপরে গেছে। তিনি চা খেতে নীচে আসছেন।"

মিঃ হ্যালিবার্টন মুহূর্ত্তের জন্য নীরব থাকিলেন। তৎপরে তিনি সহাস্যমুখে জেনকে বলিলেন—"জেন, আজ আমার পদোন্নতি হ'য়েছে।"

জেন সাগ্রহে বলিল—"পদোন্নতি হ'য়েছে? কি রকম পদোন্নতি?"

"ডক্টর পার্শি প্রস্তাব ক'রেছেন যে জানুয়ারী মাস হ'তে আমি অঙ্ক ছাড়া স্কুলে গ্রীকও পড়াব, আর এর জন্যে তিনি আমাকে দ্বিগুণ বেতন দিবেন। অবশ্য এরূপ হ'লে আমাকে আরো বেশীক্ষণ স্কুলে খাটতে হবে। কিন্তু তা আমি অনায়াসেই কর'তে পারব, এখন আমার হাতে যথেষ্ট সময় আছে।"

"এ সংবাদে আমি বড়ই সুখী হ'লুম।"

"আমিও এতে খুব সুখী হ'য়েছি, জেন। এখন আমার সমস্ত আয় ধ'রলে আমি বৎসরে ২৮৩ পাউণ্ড ক'রে উপার্জ্জন ক'রব।"

"তুমি দেখছি যে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব ক'রে রেখেছ!"

"হাঁ, আমার এ রকম ক'রবার উদ্দেশ্য আছে, না হ'লে করি?"

তাঁহার কণ্ঠস্বর কেমন যেন এক রকম হইয়া গেল। জেন সে স্বর শুনিয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু তাঁহার চক্ষুদ্বয় সে মুখের উপর পড়িবামাত্রই আবার নত হইয়া আসিল। হ্যালিবার্টন জেনের নিকট সরিয়া আসিলেন এবং তাহার স্কন্ধোপরি হস্তস্থাপন করিয়া বলিলেন—"জেন তুমি আমার সম্বন্ধে ভুল কর নাই। যদি আমি তোমাকে আমার প্রাণের কথা সমস্ত খুলিয়া বলিতাম তাহা হইলে তুমি যেরূপে বুঝিতে, আমি দেখিতেছি তোমাকে না বলিলেও তুমি তেমনি করিয়াই আমার প্রাণের কথা বুঝিয়া লইয়াছ। আমার আয় খুব বেশী নহে, কিন্তু যদি তুমি মনে করিতে পার তবে ইহাই যথেষ্ট। আমি কি তোমার পিতাকে এ বিষয়ে স্পষ্ট করিয়া জানাইতে পারি?"

জেন যে ইহার কি উত্তর দিবে তাহা সে কিছুই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। কিন্তু সেই সময়েই তাহার জননীর পদশব্দ শুনা গেল। জেন কেবল সলজ্জ মধুর দৃষ্টিতে মিঃ হ্যালিবার্টনের মুখের দিকে নীরবে চাহিল। মিঃ হ্যালিবার্টন সত্বর

যাইয়া গৃহিণীর জন্য দরজা খুলিয়া দিলেন। গৃহিণী ভিতরে আসিলেন।

গৃহিণী পাণ্ডুরাকৃতি, সুরুচিসম্পন্না। প্রতিভাশালিনী নারী তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ এক খানি শালে সমাবৃত। যে শিরঃপীড়ায় তিনি অধিকাংশ সময়ই কষ্ট পাইতেন উহা তাঁহার সাধারণ স্বাস্থ্যের কোন অনিষ্ট করিতে পারে নাই। তবে যে দিন তাঁহার শিরঃপীড়া হইত সেদিন তিনি একেবারে শক্তিহীন হইয়া পড়িতেন। মিঃ হ্যালিবার্টন তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া অগ্নির নিকট একখানি চেয়ারে বসাইয়া দিলেন। গৃহিণী হ্যালিবার্টনকে বলিলেন, "আমি এখন অনেকটা ভাল আছি একটু চা খেলে আরো অনেকটা ভাল হব। যাঁরা কখনও শিরঃপীড়ায় ভোগেন না তাঁদের প্রতি অনেক সময় আমার হিংসা হয়।

"কিন্তু তারা হয়তো শিরঃপীড়ার মতই কষ্টকর অন্য কোন ব্যাধিতে ভোগেন।„

"হাঁ তা ঠিক। জগতে সম্পূর্ণরূপে সুস্থ ও সুখী লোক বোধ হয় কেহই নাই।"

জেন জিজ্ঞাসা করিল, "মা, আমি চা তৈরি ক'রব ?"

"হাঁ, মা, একটু চা খেলে শরীর অনেকটা ভাল হবে। আর তোমার বাবাও এখনই ফিরে আসবেন—এই যে তিনি আসছেন ছেলেদের আজ দেখছি ফিরতে দেরি হচ্ছে।"

ধর্ম্মযাজক গৃহে প্রবেশ করিলেন। সন্ধ্যা শেষ হইবার পুর্ব্বেই মিঃ হ্যালিবার্টন তাঁহাকে সকল কথা খুলিয়া বলিলেন। তিনি জেনকে পত্নীরূপে পাইতে চান।

এক বৎসর পুর্ব্বের সেই অনির্দ্দিষ্ট অস্পষ্ট ছায়া আজ সত্যে পরিণত হইল! মিঃ হ্যালিবার্টনের প্রতি ধর্ম্ম যাজকের কোনরূপ বিরক্তি বা অসন্তোষের ভাব ছিল না বরং যতই তিনি তাঁহার সহিত ঘনিষ্ট ভাবে পরিচিত হইতেছিলেন ততই তাঁহার প্রতি তাঁহার প্রীতি ও শ্রদ্ধা উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতেছিল। কিন্তু প্রিয়তমা প্রাণের দুহিতাকে যাহার হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার সম্বন্ধে অনেক কথাই ভাবিতে হয়।

"তোমার আয় এখন অতি সামান্য ইহাতে আর এক জনের ভার গ্রহণ করা চলে না। তা ছাড়া, এ আয়েরও কোন স্থিরতা নাই।"

"যতদিন আমার স্বাস্থ্য ও শক্তি বজায় থাকিবে ততদিন এ আয় আমার এক প্রকার স্থির! আর আমার মনে হয় না যে শীঘ্র আমার স্বাস্থ্য বা শক্তি নষ্ট হইবে।

"আমি শুনেছিলুম যে তুমি দীক্ষা গ্রহণ করে ধর্ম্মযাজক হবে।"

হ্যালিবার্টনের মুখ আরক্তিম হইয়া উঠিল। তিনি বলিলেন "হাঁ, ইহাই আমার জীবনের সুক্ষ্মতম লক্ষ্য, ইহাই প্রাণের প্রিয়তম আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এ পথে অন্তরায় অনেক। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যয় অত্যন্ত অধিক। আর যদি আমাকে অর্থ সঞ্চয় করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে হয় তাহা হইলে আমাকে অনেক পরিমাণেই আমার বর্ত্তমান উপ-

জীবিকা পরিত্যাগ করিতে হইবে। কারণ অনেক দিন ধরিয়া অনুপস্থিত থাকিলে আমাকে কে শিক্ষকতা কার্য্যে নিযুক্ত করিতে চাহিবে? তাহা হইলে আমি আমার সমুদায় বন্ধু বান্ধব হারাইব, এবং হয় তো এরূপ সুবিধা আর জুটিবে না।”

মিঃ টেট বলিলেন--সে কথা সত্য।

“তার পর, একবার পাদ্রির জীবনে প্রবেশ করিলে আমাকে হয় তো অনেক দিন ধরিয়া অত্যন্ত অধিক হীনাবস্থায় থাকিতে হইবে। খুব সম্ভবতঃ তাহাই করিতে হইবে কারণ আমাকে সাহায্য করিবার কোন ক্ষমতাশালী বন্ধুবান্ধব আমার কেহই নাই। এরূপ ঘটিলে জেনকে ও আমাকে বহু বৎসর ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে—হয় তো অবিবাহিত অবস্থাতেই উভয়ের জীবন লীলার অবসান হইতেও পারে।

ধর্ম্ম যাজক টেট আপনার গত জীবনের কথা স্মরণ করিলেন। তাঁহাকে কতদিন ধরিয়া অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইয়াছিল! বার্দ্ধক্যের নিস্তেজতা জীবনকে অধিকার করিবার পূর্ব্বে তিনি বিবাহ করিতে সমর্থ হন নাই। আর ৪ বৎসর অতীত হইলেই তিনি ৭০ বৎসরে পদার্পণ করিবেন। মানুষ সাধারণতঃ ৭০ বৎসরের অধিক বাঁচে না কিন্তু এখনও তাঁহার পুত্র কন্যাগণ মানুষ হইয়া উঠিতে পারে নাই। না, তিনি কখনও কাহাকেও আপনার ন্যায় অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পরামর্শ দিবেন না।

মিঃ হ্যালিবার্টন বলিলেন—পরিণামে পাদ্রি হইবার আশা আমি এখনও সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করি নাই। তবে এ ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিতে হইবে। আমার মনে হয় সুবিধামত প্রতি বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি কিছুদিন করিয়া অধ্যয়ন করিয়া আসিতে পারি। তাহাতে আমার শিক্ষকতার কোন ব্যাঘাত হইবে না। আমি এই রূপেই চেষ্টা করিতে থাকিব ইহার জন্য যে সময় ও অর্থের প্রয়োজন তাহারও কোন উপায়ে সংস্থান করিয়া লইব। বিবাহ হইলে এ বিষয়ে কোনরূপ প্রতিবন্ধক হইবে না।

অনেকেই হয় তো হ্যালিবার্টনকে বলিতেন যে অগ্রে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার উপায় স্থির করুন তাহার পর বিবাহ করিলেই চলিবে। মিঃ টেট কিন্তু সে কথা বলিলেন না—হয় তো তাঁহার মনে এ কথার উদয়ই হয় নাই। আর যদি স্বয়ং হ্যালিবার্টনের মনে এ ভাব উদিত হইত তাহা হইলে তিনি উহাকে বলপূর্ব্বক হৃদয় হইতে নিষ্কাষিত করিয়া দিতেন। এ ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিলে তাঁহাকে বহুদিনের জন্য জেনের আশা ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু তিনি জেনকে যেরূপ প্রাণের সহিত ভাল বাসিয়াছিলেন তাহাতে ঐ ভাবে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করিয়া থাকা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। তাই তিনি দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিলেন“শিক্ষকতায় ইহা অপেক্ষাও নিশ্চিতই আমার পদোন্নতি হইবে। উপস্থিত

আমি যাহা পাইতেছি তাহাও এমন কিছু অল্প নহে আর জেন ঐ আয়েই তাহার ভাগ্য পরীক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে।"

(ক্রমশঃ)

দেবী অঘোর কামিনীর পত্র।

দেবী অঘোর কামিনীর কথা মহিলার অনেক পাঠিকা অবগত আছেন। ইনি বাঁকিপুরের আমাদিগের শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয়ের সহধর্ম্মিণী।* কয়েক বৎসর পূর্ব্বে 'মহিলাতে' ইঁহার কতকগুলি পত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। পরে অঘোর প্রকাশ নামক গ্রন্থে ইঁহার জীবনী পৃথক ভাবে প্রকাশ হয় এবং বঙ্গনারীগণ আগ্রহ সহকারে তাহা পাঠ করেন। এই পুস্তক খানি তাঁহার স্বামী শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র রায় মহাশয় এরূপভাবে রচনা করেন যেন স্বামী ও স্ত্রী আপনাদিগের গত জীবন আলোচনা করিতেছেন। বঙ্গনারীগণের অবস্থা যাহাতে উন্নত হয়, যাহাতে বঙ্গনারীর গৃহে জ্ঞানধর্ম্ম প্রবেশ করে সেই উদ্দেশ্যে ইঁহারা অনেক বৎসর সমাজের সেবা করিয়াছেন এবং পুস্তক খানিও সেই উদ্দেশ্যে লিখিত। দেবী অঘোর কামিনীর কতকগুলি অপ্রকাশিত পত্র 'মহিলাতে' প্রকাশ করা হইবে এবং পত্রের ভাব বিষয় শ্রীযুক্ত রায় মহাশয়ের কিছু কিছু মন্তব্যও থাকিবে। আশা করি মহিলার পাঠিকাগণ, এই সকল পত্রও মন্তব্য পাঠে সুখী ও উপকৃত হইবেন।

* ১৮৯৬ সনের ১০ই জুন সোমবার বাঁকিপুরে ইঁহার স্বর্গারোহণ হয়।

১২ই ভাদ্র
বাঁকিপুর।

বাবা জ্ঞান;

অনেক দিন তোমার পত্র পাইয়াছি। নানা কাজে ব্যস্ত থাকায় উত্তর দিতে পারি নাই। কেমন আছ পত্র পাঠ লিখিবে। তোমার মাতা কেমন আছেন, সংবাদ পাইতে ইচ্ছা করি। তুমি আবার 'ল' দিবার জন্য পড়িতেছ। বড়দিনের সময় কি ছুটি হইবে না? আমাদের ইচ্ছা ঐ সময় এদিকে বেড়াইয়া যাও। তোমার শরীর এখন কেমন? শ্রদ্ধেয় প্রতাপবাবুর সঙ্গে কি দেখা হয়? আর আর বিষয় সরোর পত্রে অবগত হইবে। আমরা উভয়ে একরকম আছি মন্দ না। আর সকলে ভাল। তোমরা উভয়ে আমাদের ভালবাসা লও। মার নিকট এই প্রার্থনা করি তোমরা উভয়ে এক হইয়া দেবদেবী হইয়া পৃথিবীতে আদর্শ হও। মা আশীর্ব্বাদ করুন। পত্র পাঠ উত্তর দিও। তোমার মাতাপিতাকে আমাদের প্রণাম বলিও। তবে আজ আর না। ইতি

তোমার মাতা

জামাতাকে যে পত্র লিখিলেন তাহা ছোট কিন্তু ভাবে এক রকমের মিষ্ট এবং উপদেশপূর্ণ। যখন এ সকল পত্র রচনা করিয়াছিলে তখন আমাকে কিছু জিজ্ঞাসাও কর নাই। সুতরাং এগুলি তোমার স্বাভাবিক, যাহা ভাবিতে তাহাই লিখিতে। ভরসা করি তোমার ঝি জামাই

তোমার মনের মত হইয়া আদর্শ জীবন রাখিয়া যাইতে পারিবেন।

২১শে জুলাই

মা সরো ;

তোমার পত্র পাইয়াছি। স্কুলে মেয়ে বাড়িয়াছে, বাটীতেও অনেক লোক কাজ অনেক, সময় খুব কম। সেই সকল কারণে পত্র দিতে বিলম্ব হইল কিছু মনে করিও না। তোমার দিদি শাশুড়ী মাতার সংবাদে দুঃখিত হইলাম। বোধ হয় তোমার শাশুড়ী মাতা বড় কাতর হইয়াছেন। তুমি তাঁহার শোকের লাঘব যাহাতে করিতে পার তাহা করিও। উপাসনা কেমন হয় লিখ। তোমার দাদা মহাশয়ও দিদিমা দারজিলিং হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন, তোমার সহিত কি দেখা হইয়াছে? কোনদিন কি তোমরা সেখানে গিয়াছিলে? তোমার বাবা বাহিরে গিয়াছেন। সরলা স্কুলে পড়ান। এখানকার সকলে ভাল আছেন। আমার শরীর ভাল। তুমি ভাবিও না। মার কাজ যতদিন করিব ততদিন ভালই থাকিব। মোণী ভাল হইয়াছে। একদিন গিয়াছিলাম, আজকাল বড় যাইতে পারি না। সরলা নির্ম্মালী হইতে এখানে আসিয়াছেন, এখানে এখন একটু গরম কম। হোসেনের মা কলিকাতায় আছেন? আর কি দেখা হয়? মেশোমহাশয় কি আসেন? মৃণালিনীর সহিত কি দেখা হইয়াছে? সর্ব্বদা মাকে নিকটে রাখিয়া সকল কাজ করিও। রোজ কিছু নূতন করিতে পারিতেছ কি না? তাহা অনুসন্ধান করিও। নিজ জীবন পাঠ করিতে ভুলিও না। ভাল ভাল জীবনী মনযোগ দিয়া নিত্য পড়িবে। ইহা জীবন পথের বড় সহায়। স্বামীর সহিত এক হইতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। ত্যাগ জীবনের ভূষণ তাহা ভুলিও না। যখন যে বিষয় কঠিন বোধ হইবে, জননীকে জিজ্ঞাসা করিবে, এবং তোমার স্বামীকে সকল পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিবে। উভয়ে এক হইয়া সকল কাজ করিবে। কেমন আছ লিখিও। শ্বশুর মহাশয়কে ও শাশুড়ী মাতাকে সেবা করিবে। এ বিষয় শিথিল হইবে না। আজ আর না, বেলা হইল। এখনি স্কুলে যাইব। আমার ভালবাসা তোমরা লও।

তোমার মা।

পাড়া গাঁয়ে ঢেঁকিতে ধান ভানিতে এবং পরিবারের সকলের সেবা করিতে তোমার সকল সময় চলিয়া যাইত। বিদ্যালয়ে অবৈতনিক কাজ, প্রতিবেশীদের রোগে শোকে সেবা এবং রক্ত মাংস সম্বন্ধহীন যে বৃহৎ পরিবার তাহার সেবায় তোমার সময় অতি বাহিত হইত। এত যে কাজ বাড়িল তাহাতে তুমি কোন দিন চিন্তিত হও নাই। সকলকে বলিতে মার কাজ যতদিন করিব ততদিন ভালই থাকিব। অনেক কাজ করিতে হইলে মাকে নিকটে রাখিয়া সকল কাজ করিতে, তাই তুমি ক্লান্ত হইলেও নালিশ করিতে না। জীবন ভরা পরীক্ষায় তুমি যাহা লিখিয়াছিলে, তাহা তুমি কন্যাকে এই পত্রে বলিয়া গেলে। বঙ্গনারী ঈশ্বর কৃপায় এতদূর উন্নত হইতে পারে।

মা সরো ;

তোমার পত্রে জানিলাম, তোমার দিদি শাশুড়ী মাতা বড় পীড়িত। তিনি কেমন আছেন লিখিবে। আশা করি তোমরা ভাল আছ। আমার ভালবাসা তোমরা লও। ডাকের সময় হইয়া গেল। পাছে ব্যস্ত হও তাই এই পর্য্যন্ত. সকলের সেবা করিবে। মার পূজা ভাল করিয়া করিলে সকল কাজ ভাল হয়। যত সময় পার দিদি শাশুড়ী মাতার নিকট থেক. ঘরের কাজ করিয়া। এখানকার সকলে ভাল। তোমার পিসিমাকে করুণার মাকে পত্র দিও। তোমার মা।

পত্র খানি খুব তাড়াতাড়ি যে লিখিয়াছিলে, তাহার আর সন্দেহ নাই। ছত্রে ছত্রে তাহার প্রয়াস। তথাপি আসল কথা বলিতে ভুল নাই। মার পূজা ভাল করিয়া করিলে সকল কাজ ভাল হয়। এযে প্রহ্লাদের কথা। তোমার প্রাণে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, তাই ব্যস্ততার মধ্যেও এই স্বর্গের কথা কন্যাকে বলিয়া গেলে। হায় পৃথিবী কেন সত্য বুঝিতে পারে না।

৮ই জুলাই।

প্রিয় জ্ঞান!

তোমার মিষ্ট পত্র খানি পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। তোমার দিদি মাতার সংবাদে বড় চিন্তিত আছি। দেখিতে যাইতে ইচ্ছা করে কিন্তু অসম্ভব। তোমরা তাঁহার সংবাদ সর্ব্বদাই দিও। তোমার কথা শুনিয়া বড় আনন্দ হইল যে এই অবস্থায় তিনি নিজ ধর্ম্মের পরিচয় দিয়া জননীর নাম জয় যুক্ত করিতেছেন। তোমরা তাঁহার সেবা করিয়া সুখী হও। এখানকার সকলে ভাল। সময় হইল ডাকের, তাই আর লিখিলাম না, তোমার মাতাও পিতা মহাশয়কে প্রণাম দিও। তোমার দিদিমাতাকে আমার ভক্তি পূর্ণ প্রণাম দিও। তবে আজ আর না। তোমার শুভার্থিনী মা।

সম্রাট বিয়োগ।

১

সিন্ধু অতিক্রমি ভারত বেলায়
কিসের নিনাদ আজিরে আসিল,
অসংখ্য লহরী উন্মত্তের প্রায়
কিসের বারতা আজিরে আনিল!

২

কুমারিকা হতে দূর হিমাচলে
কিসের সংবাদ চলেছে ছুটিয়া,
বিংশ কোটী জীব মিলিয়া সকলে
চলেছে শোকের সঙ্গীত তুলিয়া!

৩

তাড়িত বারতা তড়িৎ বেগেতে
দেশে দেশে আজ চলেছে ছুটিয়া,
আবাল বৃদ্ধ সবারে বলিতে
"রাজা এডোয়ার্ড গেছেন চলিয়া"

৪

নাইকো এ শোক রাখিবার স্থান
দুঃখী ভারতের আজি ঘরে ঘরে
হৃদয়ে সবার সন্তপ্ত পরাণ
নয়নে নয়নে তীব্র অশ্রু ঝরে!

মনে পড়ে আজ সেদিন আমার
সেই স্মৃতি আজো রয়েছে হৃদয়ে
পঞ্চাত্রিংশ বর্ষ পূর্ব্বেতে যাঁহার
দেখেছিনু মূর্ত্তি ভারত আলয়ে

৬

সেই শুভদিন সেই স্মৃতি তাঁর
ভুলিবেনা কভু দরিদ্র ভারত
সেই সমাদর অভ্যর্থনা আর
গাবে চিরদিন গাবে অবিরত।

৬

সেই "সিরাপিস" সুসজ্জিত তরী
সেই মহাদৃশ্য "প্রিন্সেপ" ঘাটেতে
সেই তোপধ্বনি গঙ্গা বক্ষোপরি
সেই রাজোয়ারা দাঁড়ায়ে তীরেতে

৮

সেই কলিকাতা রাজ পথ শ্রেণী
সেই দীপালোক "ওয়েলকাম" আঁকা
সেই আনন্দের মহা "হুরে" ধ্বনি
লোকের জনতা, উড্ডীন পতাকা

৯

মনে পড়ে সব মনে পড়ে আজ
মনে পড়ে সেই "কুমারের" সুখ
মনে পড়ে তাঁর সেই রাজ সাজ
মনে পড়ে আজো সেদিনের সুখ

১০

কি শুনিনু আজ সেই নর পতি
আর নাহি আজ আমাদের তরে
কি শুনিনু হায় আজ্ সে মূরতি
গিয়াছেন চির এ পৃথিবী ছেড়ে!

১১

বৃটিশ প্রাসাদ, রাজ সিংহাসন
শূন্য আজ্ সব রাজ পরিবার
শূন্য এ ভারত বৃটিশ ভবন
শূন্য প্রাণমন আজিরে সবার

১২

যে রাজ্যে তপন অস্তমিত নয়
বৃটিশ পতাকা উড়িছে যথায়
আজ্ সে তপন ম্লান তমোময়
আজ সে পতাকা উড়েনা তথায়

১৩

রাজ ভক্ত মোরা বিধান বিশ্বাসী
গাইব তাঁহার চির যশোগান
অগ্রণী মোদের শুভক্ষণে আসি
রাজ ভক্তি শিক্ষা করিলেন দান।

১৪

গা'ব মোরা গাব বিশ্বাস অন্তরে
গান তাঁর যশ গৃহেতে গৃহেতে
ভারত নিবাসী গাবে সমস্বরে
যশোগীত তাঁর দেশেতে দেশেতে

১৫

ভারত ঈশ্বরী ভারত জননী
ভারতের ভার যাঁহার হাতেতে
ছিল বহুদিন তাঁর চিত্র খানি
আজি এ দুর্দ্দিনে আসিছে স্মৃতিতে

১৬

ভারত মহিষী "আলেকজেণ্ড্রিয়া"
না জানি কি শোকে শোকাকুলা আজ্
লই পদধূলি মস্তক পাতিয়া
কাঁদি আজ্ সবে ধরি শোকি সাজ!

১৭

আমাদের শোক বলিবার নয়
বিধানের এই দরিদ্র কুটীরে
দারুণ আঘাতে আহত হৃদয়
কাঁদি সবে আজ্ দুঃখী পরিবারে

১৮
ভুলিবার নয় কভু না ভুলিব
"রাজভক্তি" ধর্ম্ম শিখেছি আমরা
যতদিন মোরা "বিধান মানিব
বলিব রাজারে বিধাতার গড়া
১৯
এ শিক্ষা পেয়েছি ভক্ত কেশবের
এ মন্ত্র হৃদয়ে রবে চির গাঁথা
এ মন্ত্র আমরা সেই আচার্য্যের
স্মরিব বলিব সবে যথা তথা
২০
বলেছেন ভক্ত বলিব আমরা
বৃটিশ মহিষী "আমাদের মাতা"
মহিষী নন্দনে, দীন দুঃখী মোরা
স্মরিয়া গাইব যশের কথা
২১
উভয়ের প্রিয় আচার্য্য মোদের
উভয়ের প্রেম ভালবাসা যত
উভয়ের শ্রদ্ধা পীতি উভয়ের
ভারতে বৃটনে পেয়েছেন কত
২২
ইচ্ছা হয় আজ্ যাই সিন্ধু পারে
পাখীর মতন উড়ে যাই তথা
ইচ্ছা হয় আজ্ দেখি যাই তাঁরে
মনে পড়ে আজ্ সে দিনের কথা
২৩
সেই রাজমুখ অনিত উষ্ণীষ
উৎসাহ পূর্ণ প্রশান্ত মুরতি
সেই রাজপথে প্রজার আশীষ
মনে পড়ে আজ সেদিনের স্মৃতি
২৪
কি বলিব আর তাঁর অভিপ্রায়,
আমাদের কিছু নাই বলিবার
আমাদের মন্ত্র সকল সময়
পূর্ণ হোক্ ইচ্ছা দয়াল পিতার।

উচ্চ চিন্তা।

সন্তোষের প্রধানতঃ তিনটী কারণ। সেই সকল অনিবার্য্য ও অবশ্যম্ভাবী বিষয়ের প্রতীকার করিতে চেষ্টা করিয়া উন্মত্ত ও ভ্রান্ত হই। সেই তিনটীর নাম মৃত্যু, পরিশ্রম, ও ভবিষ্যতের বিষয়ে অজ্ঞতা।

যে সমস্ত বিষয় আমাদের সাধ্যের অতীত, যাহার প্রতীকার আমরা করিতে পারি না, সে বিষয় আক্ষেপ করিয়া কি লাভ? কিন্তু আমরা যাহা পারি, আমরা যাহা, তাহার সদ্ব্যবহার করিলেই প্রকৃত কর্ত্তব্য করা হইল। উপযুক্ত যন্ত্র নাই, এই অভিযোগ করিয়া কি লাভ কিন্তু যাহা আছে, তাহার উত্তমব্যবহার করাই কাজ। আমরা যাহা এবং আমরা যে অবস্থায় আছি, সে সমস্তই ভগবানের বিধান। জীবনের যত নিরাশ নিষ্ফলতা, অকৃতকার্য্যতা তাহার প্রতি দৃষ্টি লাভ করিয়া সে সকলের মধ্য হইতে কি করা যায় অনুসন্ধান করা মনুষ্যত্ব।

পৃথিবীর সকল প্রকার বৃক্ষলতার উপর সমভাবে সূর্য্য কিরণ দেয়, মেঘ বারিবর্ষণ করে, কিন্তু প্রত্যেকে তাহাদের নিজ নিজ আদর্শ বৃদ্ধি লাভ করে। সকল ফুলই গোলাপ নয়, সব গাছই ওক (oak) নয়। বহু যত্ন সত্ত্বেও গোলাপ গাছ, আপেল গাছে পরিণত হয় না। বহু

যন্ত্রেতেও দ্রাক্ষালতাকে সরল ভাবে দণ্ডায়মান হইতে শিক্ষাইতে পারি না। সহস্র বৎসর চেষ্টা করিয়াও সূর্য্যমুখী ফুলে গোলাপের গন্ধ জমাইতে পারি না। ভগবান তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিচিত্রতা রাখিয়াছেন, কেহ কাহারও মত নয়। ওক বৃক্ষকে বলশালী দ্রাক্ষালতা ফলবান ও গোলাপকে সুন্দর করিয়াছেন। সেইরূপ তিনি মানুষের সঙ্গে মানুষের ভিন্নতা রাখিয়াছেন। কোনও দুটী লোকের মুখ এক রকম নয় পৃথিবীর কোটী কোটী নরনারীর মধ্যে কোনও দুজনের শক্তি ও গুণ এক রকম নয়।

পক্ষপাত বিহীন বিচার—বিচারককে হস্ত বিহীন মনুষ্য মূর্ত্তিরূপ গঠন করে। হস্ত বিহীন করার অর্থ, বিচারক উৎকোচ গ্রহণ করিবেন না। কেবল যে হস্তবিহীন করা হয় তা নয় চক্ষুহীনও করা হয়। চক্ষুহীন করার অর্থ, যখন কেহ বিচারকের আসনে বসিবেন, তখন পিতামাতা, স্ত্রীপুত্র, ভাইবোন, দাস, সম্রাট বন্ধু শত্রু সকলই ভুলিয়া যাইবেন। তিনি কাহারও আশ্রিত লোক হইবেন না, বিবাদের কারণ শ্রবণ করিয়া, আপন ধর্ম্মবুদ্ধি অনুসারে বিচার করিবেন। কাহাকে ভয়ও করিবেন না, কিম্বা কাহাকেও অনুগ্রহও করিবেন না।

প্রত্যেক লোক, তার শক্তিসাধ্য উন্নতির জন্য দায়ী। যাহা তাহার সাধ্যের অতীত, তারজন্য কখনও সে অপরাধী হইতে পারে না। কেহ বলিতে পারে না, কার সুযোগ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

যে কথা যথার্থ রূপে জান না, তাহা বলিতে ব্যস্ত হইও না।

মহিলাদিগের রচনা।

কিরূপে সুখী পরিবার গঠন করা যায়।

কতিপয় নরনারী লইয়া একটী পরিবার এবং কতকগুলি পরিবার লইয়া একটা জাতি। পরিবারের উন্নতি না হইলে জাতীয় উন্নতি সম্ভবে না। জাতীয় অবনতি হইলে দেশের অবনতি অনিবার্য্য। সুতরাং সর্ব্বাগ্রে পরিবারের উন্নতি সাধন করা কর্ত্তব্য। বঙ্গদেশে অধিকাংশ পরিবারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। হিংসা দ্বেষ কলহ প্রভৃতিতে প্রায় সকল পরিবারই পরিপূর্ণ। একমাত্র শিক্ষার অভাবই ইহার কারণ বলিয়া মনে হয়। নারীই পরিবারের লক্ষ্মী স্বরূপিণী। আমাদের দেশে অশিক্ষিতা মেয়েরা প্রায়ই এমন সামান্য সামান্য বিষয় লইয়া বিবাদ করেন যে তাহাতে পরিবারে অত্যন্ত অশান্তি উপস্থিত হয়। এরূপ মেয়েদের দ্বারা অনেক সময় ভ্রাতৃ বিরোধের সৃষ্টি হয়। হিন্দু মুসলমান, উচ্চ নীচ, প্রায় সকল পরিবারে কলহ অত্যন্ত অধিক। ধনী হইলেই সুখী হওয়া যায় না। ধনী পরিবারে মধ্যে এমন অনেক সময়ে কলহ যে ধনই ভাইকে ভাই হইতে বিচ্ছিন্ন করে।

১ম শিক্ষা, ২য় নীতি, ৩য় ধর্ম্ম এই তিনটী দ্বারা পরিবারকে সুখী করা যায়।

পরিবারের পরস্পর পরস্পরকে বিশ্বাস করিবে। যদি পুত্র পিতাকে বিশ্বাস না করেন, কন্যা মাতাকে বিশ্বাস না করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সঙ্গে থাকা সসর্প গৃহে থাকার ন্যায়। সুখী পরিবার গঠন করিতে হইলে বিশ্বাস অতি প্রয়োজনীয়।

দায়িত্ব জ্ঞান মানব চরিত্র গঠন করে; সন্তানগণের প্রতি পিতা মাতার দায়িত্ব জ্ঞান, পিতা মাতার প্রতি পুত্র কন্যাদের দায়িত্বজ্ঞান থাকা কর্ত্তব্য, মানব অধিকাংশ সময় পরিবারের মধ্যে থাকিয়া সাধুতা এবং অসাধুতা শিক্ষা করে। স্বার্থপরতার দৃষ্টান্ত দেখিলে স্বার্থপর, কলহের দৃষ্টান্ত দেখিলে কলহপ্রিয়, মিথ্যাবাদিতা দেখিলে মিথ্যাবাদী হয়। অতএব পরিবারে যাহাতে স্বার্থপরতা না থাকে তাহাই করা উচিত। পরিবারের সকলের প্রতি সমভাব প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

মানব চরিত্র যে সকল সদ্‌গুণে সমাজে কিংবা জাতিতে বড় হয়, সে সমুদয়ের বিকাশ পরিবারে। সুখী পরিবার গঠন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ঈশ্বরে বিশ্বাস লাভ করা আবশ্যক। পরিবারের সকলেরই বিশ্বাসী, নীতিশীল এবং ধার্ম্মিক হওয়া কর্ত্তব্য। পিতা মাতার দায়িত্ব জ্ঞান, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, নিঃস্বার্থতা, মিতব্যয়িতা ও সংযম প্রভৃতি দেখিয়া সন্তানগণ ভক্তি, নিঃস্বার্থতা, ন্যায়পরতা, অতিথি অভ্যাগতের পরিচর্য্যাতে বিনয় ও পরসেবা, সত্য এবং নীতি পরায়ণতা শিক্ষা করে। এই সকল শিক্ষা পুস্তকে কিংবা মুখে হয় না; পিতামাতার চরিত্র দেখিয়া শিক্ষা করে। পরিবারে প্রত্যেককে স্বাধীনতা দেওয়া উচিত। যেখানে স্বাধীনতা নাই, সেখানে মানুষের মনে সুখ থাকে না এবং হৃদয়ের বিকাশ হয় না। কিন্তু শাসন থাকা কর্ত্তব্য। ঈশ্বরোপাসনার নির্দ্দিষ্ট সময় থাকা উচিত। পরিবারের অভিভাবক নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলকে লইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করিবেন। ধর্ম্মই মানব সমাজের সেতু স্বরূপ। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া গৃহ পরিবার কিছুই থাকিতে পারে না। অতএব সুখী পরিবার গঠন করিতে হইলে ধর্ম্মের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা থাকা কর্ত্তব্য। পরিবারের মধ্যে ধর্ম্মানুষ্ঠান থাকিলে নরনারীর ধর্ম্মোন্নতির সাহায্য হয়।

স্বাস্থ্য অমূল্য জিনিস। স্বাস্থ্য না থাকিলে মনে শান্তি থাকে না এবং মানুষ অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সুতরাং স্বাস্থ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখা উচিত। পরিবারের পরস্পর পরস্পরকে ক্ষমা করিবেন। শাসন অথচ ক্ষমা থাকা চাই। পারিবারিক শান্তিকে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ ভাবিতে হইবে, পরিবারের প্রত্যেককেই পারিবারিক শান্তির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। "যে জাতির পারিবারিক সুখ ও নীতি উৎকৃষ্ট, অপর সকল গুণ সে জাতি মধ্যে আপনা-আপনি ফোটে এবং জগতের জাতি সকলের মধ্যে তাহারা সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি পায়।" বঙ্গদেশের প্রত্যেক নরনারী যেন ভগবানের চরণে প্রার্থনা করেন যে তাঁহাদের দ্বারা প্রেম পরিবার সুখী পরিবার প্রতিষ্ঠিত হয়।

শ্রীমতি ভক্তিসুধা দেবী।
আশাকুটীর, টাঙ্গাইল।

উপদেশ।

পিতৃদেব!

তোমার মধুর কণ্ঠে সুললিত স্বরে
দিয়েছিলে উপদেশ মনে কিগো পড়ে?
সংসার ভীষণ স্থান বিঘ্ন প্রতি পলে
সাবধানে অতিক্রমি বিপদ সকলে,
সাধিও সংসার ধর্ম্ম আনন্দিত মনে
ভক্তি সেবা সুখী সদা করো গুরুজনে।

আর পিতা মনে পড়ে সজল নয়নে
বলেছিলে তুমি মোরে মধুর বচনে;—
জানিও মা পুণ্যময় এই গৃহ ধর্ম্ম
গৃহিণীর সুকর্ত্তব্য প্রিয় নিত্য ধর্ম্ম.
গৃহ ধর্ম্ম পালি সদা আনন্দিত মনে
হাসিমুখে চলো সদা সবাকার সনে।

একে একে সবি আজ মনে মোর পড়ে
বিদায় মুহূর্ত্তে তুমি বলেছিলে মোরে,—
সুখে দুখে সাথী এক প্রিয় ভগবান
সুখে দুখে করো সদা তাঁর নাম গান,
পাইবে অতুল সুখ দুখ যাবে দূরে
দিন অন্তে একবার ভাবিও তাঁহারে।

পিতৃদেব! কি মধুর কি গভীর বাণী
স্মরিলে সে কথা আজি কি বিস্ময় মানি;
স্বামী সেবা দেব সেবা অতিথি পালন
করিয়া লভিও সুখ মনের মতন,
ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখ চলি ধর্ম্মপথে
হইও অমর দেবী নশ্বর জগতে।

সুধাময় বাণী তব মন্ত্রের মতন
গভীর হৃদয় মাঝে আছে গো স্মরণ;—
একমাত্র কন্যা তুমি বড় আদরের
এতদিন ধরে তুমি ছিলে আমাদের;
আজি হ'তে বধূ তুমি হ'লে যাঁহাদের
সুখে দুঃখে সাথী হয়ে থেকো তাঁহাদের।

বিদায় মুহূর্ত্তে যাহা বলেছিলে মোরে
একে একে সবি আজ মনে মোর পড়ে;
কি আর বলিব তোমা, সংসার ভীষণ
এই কথা সদা হৃদে রাখিয়া স্মরণ,
চলিও ধরম পথে ভগবানে স্মরি
লভিও অতুল সুখ তাঁর গান করি।

কিন্তু পিতা আমি তব অযোগ্য সন্তান
পালিতে পারিনি তব স্নেহ উপদেশ;
সংসারে বিলাস স্রোতে সঁপে দিয়ে প্রাণ
নিয়ত পেতেছি কত দুখ আর ক্লেশ।

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা পাল।

চট্টগ্রাম। ঘাটফরাদবেগ, লেন।

সংবাদ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবৎসরের বি, এ, বী, এস্, সী; আই, এ, ও আই, এস্, সী, পরীক্ষার ফল প্রকাশ হইয়াছে। এই সকল পরীক্ষাতে ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রের সংখ্যার শতাংশ হইতেও অল্প। আমরা ঠিক বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা নারীগণের উপযোগী নহে বলি, কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা যে উচ্চ সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু যে সকল পিতামাতা আপনাদের কন্যাগণকে উচ্চ শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করেন তাঁহাদিগকে ইচ্ছাতে অনিচ্ছাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়মানুসারেই শিক্ষা দিতে হয়। এই সকল পরীক্ষাতে এত অল্প ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছেন দেখিয়া দেশের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মহাশয়গণ নারীগণের উচ্চ শিক্ষার সুব্যবস্থা করিবেন আশা করি।

মহিলার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় কিছু দিন কলিকাতার প্রচারাশ্রম বাস করিয়া ষ্টীমারযোগে ঢাকা যাত্রা করিয়াছেন। সেখানে তাঁহার আত্মীয় ও আত্মীয়াগণ তাঁহার শরীর মনের দুর্ব্বল অবস্থায় শুশ্রূষা করিয়া তাঁহাকে সুখী করিয়া কৃতার্থ হইতে ইচ্ছা করিয়াছেন।

১৫শ ভাগ।
১০ম সংখ্যা।

পৌষ।
১৩১৭।

সূচী।

কলিকাতা

৫ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি নাথ কর্ত্তৃক ৬ই শ্রাবণ ১৩১৭ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ

১৫শ ভাগ] বৈশাখ ১৩১৭, মে ১৯১০। [১০ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে নিত্যনূতন মঙ্গলবিধাতা তুমি চিরপুরাতন, মনুষ্যসমাজে সর্ব্বক্ষণ বর্ত্তমান থাকিয়া মঙ্গল বিধান করিতেছ। তোমার মঙ্গল-স্বরূপের বিচিত্র রহস্য আমরা ধারণ করিয়া উঠিতে পারি না। তোমার প্রেম নারী-হৃদয়ে প্রকাশিত হইয়া আপনার সৌন্দর্য্যে মাধুর্য্যে পৃথিবীকে স্বর্গীয় শোভা দান করে। তোমার কন্যাগণ তোমার প্রেমের অবতার হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করেন তাঁহাদিগের প্রেমের বলে সমাজ রক্ষা পায় কিন্তু প্রেমের ভরে তোমার কন্যাগণ বড় কষ্ট পান ইহা দেখিয়া প্রাণে বড় কষ্ট হয়। হে প্রেমময়, তাই তোমাকে জিজ্ঞাসা করি তোমারই বিধানে তোমার কন্যাগণ ভাল-বাসিয়া পরিবার, সমাজ, মণ্ডলী, সকলকে রক্ষা করেন কিন্তু তাঁহাদিগকে কে রক্ষা করে তাহা দেখিতে পাই না। পৃথিবীতে যে নারী যত অধিক নরনারীকে আপনার প্রিয় করিয়া লইয়াছেন, তাঁহার অন্তরে তত অধিক পরিমাণে বিপদের আশঙ্কা, তত অধিক ভয় ভাবনা শোক দুঃখ। যে নারী বহু পুত্র কন্যার মাতা, অনেক ভাই ভগ্নীর ভগ্নী, অনেক মাতৃহীনের মাতা, অনেক দুঃখিনীর সমদুঃখ-ভাগিনী, তাঁহাকে কত ভয়, কত ভাবনা, কত শোক, কত দুঃখ পাইতে হয়। এরূপ নারীগণের অবস্থা দেখিয়া, বিশেষ তাঁহাদের শোকের আর্ত্তনাদ শুনিয়া প্রাণ ব্যথিত হয়। তাই তব পাদপদ্মে প্রার্থনা করি যে তুমি নারীগণের উপর যে প্রেমভার দান করিয়াছ তাহা দ্বারা যে তাঁহারা নিষ্পেষিত হইতেছেন, পৃথিবীকে অন্ধকার দেখিতেছেন, তোমাকে পর্য্যন্ত ভুলিয়া যাইতেছেন তুমি তাঁহাদিগের নিকটে আপনার প্রেমমুখ প্রকাশিত কর। পুত্রহারা জননী যদি প্রেমের তাড়নায় তোমাকেও হারান্ ভবে যে তাঁহার সর্ব্বনাশ হইল। হে কৃপাময়,

কৃপা করিয়া তোমার সেই নূতন রূপ দেখাও যাহা দেখিয়া তোমর কন্যাগণ বুঝিতে পারিবেন যে সমস্ত প্রেমভার তুমিই দিয়াছ এবং তোমার প্রেমাবতার কন্যাগণের অন্তরে থাকিয়া তুমিই তাহাদের ভারও বহন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছ। হে মঙ্গলময়, তুমি দয়া করিয়া এই ব্যবস্থা কর যে তোমার কন্যাগণ যেন তোমার প্রদত্ত পবিত্র ভালবাসার ভারে তোমা হইতে দূরে না পড়িয়া যান। তোমাকে ভুলিয়া তোমার কৃপার দান পুত্র কন্যাগণকে ভালবাসিতে যাইয়াই তাঁহাদের এই দুর্গতি ঘটে, তুমি দয়া করিয়া তোমার কন্যাগণের বিশ্বাস চক্ষু খুলিয়া দেও যে তাঁহারা তোমার দান জানিয়া তোমার প্রেমে যেন প্রিয়জনকে ভালবাসিতে পারেন এবং সেই প্রিয়জন সম্পর্কে কোন দুঃখ বিপদ ঘটিলে যেন তোমার শরণ লইয়া তাহা সহ্য করিতে পারেন। তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণাম করি।

শিক্ষিতা ও শিক্ষার্থিনী।

আমাদিগের দেশের দুঃখ দুর্দ্দশার মধ্যে শিক্ষার অভাব একটা মহাদুঃখের বিষয়। সাধারণতঃ শুনিতে পাই আমাদের দেশের শতকরা দশজন লোক শিক্ষিত, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শিক্ষিতের সংখ্যা তাহা অপেক্ষা অল্প। যখন শিক্ষিত অশিক্ষিতের কথা আলোচনা করা হয় তখন নারীজাতির কথা প্রায় মনেই থাকে না। যে সকল শ্রেণীর লোক শিক্ষিত বলিয়া পরিচিত তাঁহাদিগের পরিবারের পুরুষগণ শিক্ষিত ইহাই বুঝিতে হয়। যদি সেই শ্রেণীর লোকদিগের পরিবারস্থ নারীগণের শিক্ষার সংবাদ লওয়া হয় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে সেই শ্রেণীর নারীগণমধ্যে শতকরা দশজনমাত্র শিক্ষিতা কিম্বা তাহা অপেক্ষাও অল্প সংখ্যক নারী শিক্ষিতা নামের যোগ্য। কোন প্রাচীনা পাঠিকা হয়ত বলিবেন যে নারীগণের শিক্ষার অভাবের জন্য অধিক ক্ষতি হইতেছে না, কিন্তু বর্ত্তমান যুগে আর সে কথা বলিবার অবসর নাই, কারণ বিদ্যাশিক্ষার শত প্রকার উপকারিতা এখন সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। এখন যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই বলিবে যে যেমন চক্ষু না থাকিলেও জীবন থাকিতে পারে এবং জীবন দ্বারা অনেক কাজও হইতে পারে কিন্তু চক্ষু থাকিবার যে এক মহাসুখ ও কার্য্যের মহাসুবিধা তাহা চক্ষু না থাকিলে কখনও ভোগ করা যায় না। শিক্ষা না থাকিলে মানুষের অবস্থাও সেইরূপ হয়। ইহা বড় দুঃখের বিষয় যে পিতামাতা পুত্রদের জন্য বহুব্যয় করিয়া, বহুকষ্টে উচ্চ শিক্ষা দান করেন কিন্তু কন্যাগণের শিক্ষার তেমন ব্যবস্থা করেন না। অনেক পিতা মাতা কন্যার শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় না করিয়া তাহার অলঙ্কারের জন্য অনেক ব্যয় করেন। শরীর অপেক্ষা যদি মন বড় হয়, সোণা অপেক্ষা যদি বিদ্যা বড় হয়, তাহা হইলে শরীর সোণা দ্বারা বিভূষিত করা অপেক্ষা মনকে বিদ্যা দ্বারা উন্নত করা

শ্রেষ্ঠতর হিতৈষীর কার্য্য তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। নারীশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে অবশ্য অনেক বলা হইয়াছে এবং লেখা হইয়াছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও যখন নারীশিক্ষার অবস্থা অত্যন্ত হীন রহিয়াছে তখন এবিষয়ে আরও বহুকাল লেখা, বলা, ও সাধারণের মন এদিকে আকৃষ্ট করা প্রত্যেক দেশহিতৈষীর কর্ত্তব্য। আমরা না চাহিলেও আমাদের দেশে নানারূপ উন্নতির পথ খুলিয়া যাইতেছে; শারীরিক ও মানসিক বহুবিধ সুখ সুবিধার সুযোগ আমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছে। যত দিন যাইবে আরও নূতন নূতন উন্নতিলাভ হইবে। শিক্ষালাভ না করিলে যে মহিলাগণ তাহা ভোগ করিবেন না তাহা নয় কিন্তু সে সকল দ্বারা পূর্ণরূপ লাভবান কখনও হইতে পারিবেন না। বিশেষ বদ্ধমূল কুসংস্কার ত্যাগ করিতে হইলে শিক্ষার বল একান্ত প্রয়োজন। প্রত্যেক বালিকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষায় পাস করিবেন, ইহা সম্ভব নয়। কিন্তু প্রত্যেক বালক ও বালিকাকে সাধারণ জ্ঞাতব্য সকল বিষয়ই জানা প্রয়োজন। যেমন পৃথিবীটা গোলাকার, আকাশে নির্দ্দিষ্ট পথে সূর্য্যের চারিদিকে কিরূপে ঘুরিতেছে এবং পৃথিবীর উপরের ও ভিতরের বস্তু সকল কি কি বিশেষ স্বভাবযুক্ত, ইহার ধাতু প্রস্তর, জল বাতাস বৃক্ষলতা জীব জন্তুর শরীর, শক্তির বিবরণ ও পরস্পরের সহিত কিরূপ সম্পর্কে সম্বন্ধ তাহা জানা এবং মানবজাতির সাধারণ উন্নতির নিয়ম ও ইতিহাস এবং মানুষের শরীর মন আত্মার স্বভাব ও উন্নতির নিয়ম কি এবং এই সকল বিষয় দর্শন-বিজ্ঞানরাজ্যে এখন যে সকল উন্নতি হইতেছে তাহার সাধারণ সংবাদ জানা প্রত্যেকের পক্ষে প্রয়োজন। সর্ব্বোপরি বিশুদ্ধ নীতি ও বিশ্বস্রষ্টা মঙ্গলময় ঈশ্বরের পূজা বন্দনা বিষয়ে শিক্ষা চাই। ফলে প্রয়োজনীয় শিক্ষা কাহাকে বলে তাহা এখন সকল শিক্ষিত লোকই জানেন। শিক্ষা সম্বন্ধে আদর্শ ভিন্ন ভিন্ন আছে তাহা সত্য কিন্তু সুশিক্ষা যে প্রয়োজন সে বিষয়ে আর দ্বিমত হইতে পারে না। অনেক সময়ে যেন মনে হয় পুরুষগণ আপনাদিগের উচ্চ জ্ঞানের গৌরব পরিবারস্থ নারীগণকে দেখাইয়া একটা তৃপ্তি অনুভব করেন এবং তাঁহারা জানেন যে নারীগণ উচ্চশিক্ষালাভ করিলে তাঁহাদের সেরূপ অহঙ্কার করিবার পথ থাকিবে না। ইহা অবশ্য একটা ক্ষুদ্র কথা ও লজ্জার কথা, কিন্তু পুরুষগণের একথা ভাবিয়া দেখা উচিত যে পরিবারস্থ নারীগণ শিক্ষিত না হইলে তাঁহাদিগের উচ্চজ্ঞান বা শ্রেষ্ঠবিদ্যা অনেক সময়ে কেবল নিরর্থক হয় তাহা নহে বরং কষ্টের কারণ হয়। যখন সাহিত্য বা বিজ্ঞান, দর্শনশাস্ত্র বা ধর্ম্মালোচনা করিতে করিতে সুখকর, বিস্ময়কর, শিক্ষাপ্রদ বা কৌতুকপূর্ণ বিষয় সকল উপস্থিত হয় তখন যদি সেই সকল বিষয়ে পরিবারস্থ নারীগণের সহিত জ্ঞানের আদান প্রদানে প্রীতিসুখ অনুভব করা সম্ভব না হয় তাহা হইলে পরস্পরে কেবল উচ্চশ্রেণীর পরিচয় ও ভালবাসা হয় না তাহা নহে কিন্তু সেই বিদ্যাই অত্যধিক

পরিমাণে লাভ হয় না ও কোন কার্য্যের উপযোগী হয় না। যেমন লোকে তুলনা দিতে বলিয়া থাকে যে জ্ঞানী মানুষের মন লইয়া যদি ষাঁড়ের দেহে বাস করিতে হয় তাহা হইলে অপর সকল ষাঁড়ের মতই ব্যবহার করিতে হইবে, মনের উচ্চজ্ঞানের কোন ব্যবহার হইতে পারিবে না। তেমনই যদি গৃহ জ্ঞানের দ্বারা আলোকিত না হয় সে গৃহে বসিয়া মনে জ্ঞান সংগ্রহ করা হইতে পারে, কিন্তু সে জ্ঞান স্বপ্নের মত হইয়া থাকিবে, তাহা দ্বারা কোন সুখ বা সাহায্য হইবে না। মহিলাগণ পুরুষগণের চিরসঙ্গিনী, মহিলাগণ যে ভাষ যে ভাব যে কার্য্য, যে উন্নতির চেষ্টা না বুঝিতে পারিবেন পুরুষগণ সে সকল বিষয়ে তাঁহাদিগের সাহায্য ও সহানুভূতি পাইবেন না বরং প্রতিকূলতা পাইবেন। নারীকে শিক্ষিতা না করিলে পুরুষের শিক্ষার অধিকাংশ অকর্ম্মণ্য হইয়া যায় ইহা অতি স্পষ্ট সত্য। আমরা শিক্ষিতা নারীর সম্মান করিব এবং নারীশিক্ষা যাহাতে সর্ব্বত্র বিস্তৃত হয় সে বিষয় চিরদিন যত্নবান থাকিব। এ কথা অবশ্য প্রত্যেক শিক্ষিত পুরুষ বলিবেন। কিন্তু আমাদের দেশের যুবকদিগের মধ্যে, এমন কি প্রবীণ পুরুষদিগের মধ্যেও শিক্ষিতা নারীর প্রতি যেন একটা ভয় বা বিরক্তির ভাব আছে। অনেক লোকে শিক্ষিতা নারী হইতে যেন দূরে থাকিতে ইচ্ছা করেন, ইঁহারা যে অত্যন্ত জ্ঞানাভিমানী, এবং নারীগণের জ্ঞানের জ্যোতি সহ্য করিতে পারেন না তাহা মনে হয় না। মনে হয় বর্ত্তমান সময়ে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প বলিয়া শিক্ষিতা নারীগণের মনের এক বিকার উপস্থিত হয়। যাঁহারা শিক্ষিতা তাঁহাদিগের শিক্ষার্থিনীর ভাব চলিয়া যায়। যে সকল নারী মনে করেন যে তাঁহারা সকলই জানেন, সকলই বুঝিতে পারেন, যাঁহাদের শিখিবার অবশিষ্ট নাই তাঁহারাই সমাজের সাধারণ পুরুষ নারী সকলেরই ভয়ের বিষয়। মানুষের একটা দুর্ব্বলতা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায় যে যিনি এক বিষয়ে কৃতকার্য্য হন, নাম যশ লাভ করেন, তিনি মনে করেন যে সকল বিষয়ই তিনি বুঝিতে পারেন বা উপযুক্তরূপ সংবাদ রাখেন। এই জাতীয় দুর্ব্বলতা নারীচরিত্রে অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়। যিনি গৃহিণী হইয়াছেন তিনি মনে করেন যে বিদ্যা, ধন, ধর্ম্ম ইত্যাদি লাভ করিয়া মানুষ যাহা পায় বা যে জ্ঞানলাভ করে সে সমস্তই যেন তাঁহার হইয়াছে। অথবা যদি কোন নারীর ধন থাকে তিনি মনে মনে আপনাকে জ্ঞানে বুদ্ধিতে সকল বিষয়ে অত্যন্ত উচ্চ মনে করেন। আর যিনি শিক্ষালাভ করিয়াছেন তিনি মনে করেন যেন শিক্ষার বলে ধনবল, ধর্ম্মবল, বহুদর্শিতার ফল সকলই লাভ করিয়াছেন। এসকল কথা উপস্থিত করিবার অভিপ্রায় এই যে শিক্ষিতাগণ যদি বিশেষভাবে শিক্ষার্থিনী না হন তাহা হইলে তাঁহারা লোকের সদ্‌ভাব ও আদরলাভ করিতে পারেন না। আমাদের দেশে শিক্ষিতা নারীর সংখ্যা অত্যন্ত অল্প একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখন এই কথা মহিলা-

গণকে বিশেষ করিয়া বলিতে চাই যে আমাদের দেশে শিক্ষার্থিনীর সংখ্যা আরও অল্প। যাঁহারা শিক্ষালাভ করিয়া শিক্ষার্থিনীর স্বভাব হারাইয়াছেন তাঁহাদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। তাঁহারা অশিক্ষিতা নহেন অথচ শিক্ষার জীবন্তভাব তাঁহাদিগের নাই; এজন্য তাঁহারা উভয় শ্রেণীর বহির্ভূত জীব। একদিক দেখিতে গেলে শিক্ষিতা নারী হওয়া অনেক অনুকূল অবস্থাসাপেক্ষ, কিন্তু শিক্ষার্থিনী হইতে হইলে সকল প্রতিকূল অবস্থাতেই লাভবান হইতে পারেন। আমাদের দেশের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য শিক্ষিতা নারীর অত্যন্ত প্রয়োজন তাহার অর্থ এই যে তাঁহারা শিক্ষিতা হইবেন এবং শিক্ষার্থিনী হইবেন। আর যাঁহারা শিক্ষিতা নহেন তাঁহাদিগের পক্ষে একমাত্র কর্ত্তব্য শিক্ষার্থিনী হওয়া। যিনি যত শিক্ষা করুন না কেন তাঁহাকে আরও অনেক শিখিতে হইবে একথা সকল সময় মনে থাকা প্রয়োজন। শিক্ষার বিষয়ে সকলের এক অবস্থা থাকিবে না, উচ্চশিক্ষিতা, অল্প শিক্ষিতা অশিক্ষিতা নারী সকল সময়েই থাকিবেন; কিন্তু সকল নারীই শিক্ষার্থিনী হইবেন। যদি নূতন বিষয় জানিতে, বুঝিতে, আপনার করিয়া লইতে প্রাণের আগ্রহ থাকে তাহা হইলে শিক্ষার বা শিক্ষকের অভাব কখনও হয় না। বিশেষ যাঁহারা অল্পাধিক বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছেন তাঁহাদের অন্তরে সর্ব্বক্ষণ শিক্ষার্থিনীর ভাব থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক। আমাদের দেশে শিক্ষিতা মহিলার অভাব ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয় কিন্তু তাহা অনেকটা আমাদের দেশের সাধারণ দারিদ্র্য ও সামাজিক কঠিন বন্ধনের জন্য অনিবার্য্য; সে বিষয়ে সকল দেশহিতৈষী লোক চেষ্টা করিতেছেন এবং চিরদিন করিতে থাকুন কিন্তু সকল নারীর সকল সময়ের শ্রেষ্ঠ অধিকার শিক্ষার্থিনী হইয়া সর্ব্বদা শিক্ষালাভের জন্য উন্মুখ হইয়া থাকা, এ বিষয়ে নারীগণের দৃষ্টি পড়িলে প্রভূত মঙ্গল হইবে।

বর্ত্তমানে নারীজীবনের আদর্শ কি?

বিংশ শতাব্দীর নারীগণ কোন্ দিকে ছুটিয়াছেন? তাঁহাদিগের গম্যস্থানের নাম কি? তাঁহাদিগের লভ্য বস্তু কি? পাঠিকাগণ, ভগিনীগণ, মধ্যে মধ্যে এ চিন্তা কি আপনাদের মনে উদিত হইয়াছে. জীবনপথে চলিতে চলিতে এক একবার কি থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন ও ভাবিয়াছেন, তাইত কোন্ দিকে চলিয়াছি কি খুঁজিতেছি? সংসারের প্রবল স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছি, ভাবিবার দাঁড়াইবার অবসর নাই। ভয়ানক ব্যস্ততা, অনতিক্রমণীয় লোকসঙ্গ, অজ্ঞাতসারে অনুকরণ, প্রাধান্য লাভের জন্য অবিরাম সংগ্রাম, ইহারা সকলে আমাদিগকে একমুহূর্ত্তও ভাবিবার দাঁড়াইবার অবসর দিতেছে না। আমাদের মন কেবলই বিক্ষিপ্ত হইতেছে, লোকের ব্যবহার পরিচ্ছদ ক্রমাগত অনুকরণ করিতেছি। অনুকরণ, অনুসরণ

মানুষের জীবন নয়, স্বাধীনতা, মনুষ্য চরিত্রের বিশেষ উপাদান। আমরা কেবলই অনুকরণ করিতেছি। সমাজের মধ্যে যাঁহারা ধনে মানে শ্রেষ্ঠ তাঁহারা যাহা করেন, অধিকাংশ লোকের পক্ষে তাহাই আদর্শ হয়। তাহা লাভ করিতে প্রাণপণ যত্ন করেন, কষ্ট স্বীকার করেন তাহা করিতে পারিলেই সমাজের দশজনের মধ্যে একজন হইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে করেন ও এই পকার একটী আদর্শ স্থির করিয়া তাহা লাভ করিতে না পারিলে আপনাকে দুঃখী দুর্ভাগা মনে করা কতদূর ভ্রান্তি তাহা একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারা যায়।

আজকাল বালিকাদের শিক্ষার আদর্শ কি? কি আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। বর্ত্তমান আদর্শ কি, আলোচনা করিবার পূর্ব্বে প্রাচীন মহিলা-চরিত্র বিচার করি। প্রাচীন মহিলাদের সংখ্যা ক্রমেই কমিয়া আসিতেছে, তথাপি এখনও আমাদের পিতামহী, মাতামহী যাঁহারা জীবিত আছেন, তাঁহাদের দেখিয়া বুঝিতে পারি। ইঁহারা কল্যাণদায়িনী, মঙ্গলস্বরূপিনী অন্নদায়িনী গৃহলক্ষ্মী পরিবার আত্মীয় স্বজনের প্রতি ইঁহাদিগের কি অকৃত্রিম স্নেহ, যত্ন, দেবদ্বিজের প্রতি অসীম ভক্তি গৃহকর্ম্মে সুদক্ষা ইঁহারা লিখিতে পড়িতে জানেন না, অতএব ইঁহারা অনভিজ্ঞ, জ্ঞানহীনা, তাহা কি আমরা বলিতে পারি। পড়িতে না জানিয়াও ইঁহারা এত বিষয় জানেন, যে বর্ত্তমানের শিক্ষিত মহিলারাও সে সকল বিষয় সেরূপ জানেন না। রামায়ণ, মহাভারত, ইঁহাদের কণ্ঠস্থ, কত উপকথ ব্রতকথা কথায় কথায় আবৃত্তি করেন। তাঁহাদিগের সম্মুখে একটী ব্রতধারিণী নিষ্ঠাবতী কল্যাণদায়িনী জননী-মূর্ত্তি ছিল। তাঁহারা রন্ধনে নিপুণ হইতেন, অল্প আয়ে সুন্দররূপে সংসার চালাইতে পারিতেন, কতই পরিশ্রম করিতে পারিতেন, কতই সহ্য করিতে পারিতেন। বিদ্যা উপার্জ্জন করা তাঁহাদের কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন না।

এখন মেয়েদের জীবনের আদর্শ কি? যাঁহারা বিদ্যালয়ে বিদ্যা উপার্জ্জন করিতেছেন, তাঁহাদের জীবনের আদর্শ কি প্রথমে তাহাই দেখা যাউক। বালিকাদের বিদ্যালয়ে গমনের উদ্দেশ্য বুদ্ধি মার্জ্জিত করা ও মানসিক বৃত্তি সকল বিকশিত করা। আচ্ছা এই উদ্দেশ্য কি সংসাধিত হইতেছে? বিদ্যালয়ে যেরূপ ভাবে, যে সকল বিষয় শিক্ষা দেওয়া হয়, তাহাতে সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় না। আজকালকার উচ্চশিক্ষিত বালিকাদের অবস্থা দেখিয়া সকলে চিন্তিত হইয়াছেন। পাঠিকাগণ! আপনাদিগকে অনুরোধ করিতেছি, বিদ্যালয়ের অধ্যয়নশ্রম নিপীড়িত বালিকাদের সহিত, গৃহের স্বাভাবিক সহজভাবে বর্দ্ধিত বালিকাদের তুলনা করিয়া দেখুন উভয়ের পার্থক্য অতিশয় স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয়। বিদ্যালয়ের বালিকাগণের কি অবস্থা, প্রাতঃকালে মুষ্টিপরিমেয় অন্ন কোনও প্রকারে গলাধঃকরণ করিয়া বিদ্যালয়ে আসিতে হয় ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে গৃহাগত হয় তখন

তাহাদের অবস্থা দেখিয়া ভয় হয়, শুষ্ক মুখ ও পরিশ্রান্ত দেহ লইয়া যেন অর্দ্ধমৃত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

কিছু আহার করিয়া (আহার্য্য বস্তু অনেক সময়ই যথেষ্ট পুষ্টিকর হয় না) অনেক বালিকাকেই মাতার গৃহকর্ম্মে সাহায্য করিতে হয়, কারণ দরিদ্র পরিবার, অধিক দাসদাসী থাকে না, ছোট ভাই বোন থাকে, কখনও বা মাতা পীড়িতা থাকেন, তখন সেই বিশ্রামাকাঙ্ক্ষী অবসন্ন শরীর লইয়া গৃহকর্ম্ম করিতে হয় ও কর্ম্ম সমাপনানন্তর পরদিনের পাঠাভ্যাস করিতে হয়, কখনও বা রাত্রি জাগরণ করিয়া পড়িতে হয় ও পরদিন আবার সেই প্রাতঃকালে সামান্য আহার করিয়া বিদ্যালয়ে যায়, বিদ্যালয়ে গিয়া সকল পাঠ উত্তমরূপে শিক্ষা হয় নাই সে জন্য শিক্ষক বিশেষতঃ শিক্ষয়িত্রীর নিকট তিরস্কৃত ও দণ্ডিত হইতে হয়, সে তিরস্কার সময় বিশেষে অতিশয় ভয়ানক হয়, এরূপ নিরাশ করিয়া দেওয়া হয় তাহার বুক ভাঙ্গিয়া যায় এত কষ্ট করে পরিশ্রম করে আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া শিখিয়াও, এত তিরস্কার। এইত বালিকাদের অবস্থা, সকলেরই যে ঠিক এইরূপ হয় তাহা বলিতেছি না, কিন্তু অল্পাধিক পরিমাণে ইহা সকলেই প্রযোজ্য। বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের শরীর শীর্ণ, চক্ষু ক্ষীণ জ্যোতি, মুখে, শরীরে স্বাস্থ্যের প্রফুল্লতার সৌন্দর্য্য ও কমনীয়তা নাই, কিন্তু যাহারা গৃহে থাকিয়া মিষ্ট ব্যবহার পায়, যথেষ্ট আহার, পরিমিত পরিশ্রম করে, তাহাদের শরীর সুস্থ মুখ প্রফুল্ল, সুস্থতার মিষ্টতার একটী মিষ্ট সৌন্দর্য্য ফুটিয়া বাহির হয় তাহাদের মুখ দেখিলে আনন্দ হয়। আর ইহাদের এই শুষ্কশীর্ণ মলিন বদন দেখিলে দুঃখ হয়। বর্ত্তমানের ইহা একটী বিষম সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে। এই সকল কারণে অনেক বালিকা অকালে প্রাণ হারাইতেছে ও ইহাও একটী দেখিবার বিষয় যে অধিকাংশেরই ক্ষয়কাশীতে মৃত্যু হইতেছে। ইহা দেখিয়াও সকলের জ্ঞান হইতেছে না।

আমরা ভাবিতে চাহি না, যে পথে সমাজের দশজন চলিয়াছে, বিনা বিচারে সেইদিকে পা ফেলি, যেমন কোনও মেষযূথের মেষগণ চক্ষু মুদিয়া অগ্রগামী মেষদলের অনুসরণ করে, একটী মেষ গর্ত্তে পড়িলে একে একে সকলেই পড়ে। মানবসমাজেরও সেই অবস্থা কেহ ভাবিতে চায় না, চক্ষু খুলিয়া দেখিতে চাহে না, আপনার বুদ্ধি বিচার ব্যয় করে না।

অনেক সময়ে শুনিতে পাই অসুস্থ শরীর বলিয়া পিতামাতা পরীক্ষার জন্য পাঠ করিতে নিষেধ করেন কিন্তু কন্যা কিছুতেই ছাড়িবে না, শরীর যায়, প্রাণ যায় তাও স্বীকার, পড়া ছাড়া হইবে না। বালিকাদের তখন ভবিষ্যতে ইহার পরিণাম কি হইবে, তাহা বিচার করিবার শক্তি জন্মায় না, যদি পিতা মাতা বুঝিতে পারেন, অধিক পরিশ্রম করিয়া পাঠ করিলে, স্বাস্থ্যের হানি হইবে, তখন, তাহাদের হিতের জন্য পাঠ ত্যাগ করিতে বাধ্য করিতে হইবে। অধ্যয়ন করা

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিশ্রমের কাজ শারীরিক পরিশ্রম অপেক্ষা মানসিক পরিশ্রমে অধিক শক্তি ব্যয় হয়, অতএব যদি অধিক মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তদনুরূপ প্রচুর পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন, তদ্ব্যতীত শরীর রক্ষা অসম্ভব। আহার যে একটী কর্ত্তব্য কার্য্য ইহা তাহারা বুঝিতে পারে না, যেমন অধিক পরিশ্রম করে, সেইরূপ আহার প্রয়োজন।

কোনও বালিকাকেই অধিক পাঠ করিতে দেওয়া উচিত নয়, তাহা কখনই বলিতেছি না, কতকগুলি বালিকা যাহাদের বুদ্ধিতে শক্তিতে কুলায় তাহারা অবশ্যই পাঠ করিবে, কিন্তু কি দেখিতে পাই শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে, চক্ষু অন্ধ হইয়া আসিতেছে তথাপি কোনও প্রকারে পরীক্ষা দিতে হইবে।

আর একটী বিষয়ে সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন, যদিও তাহার কোনও প্রতীকার হইতেছে না। এক এক জন বালিকা এক এক বিষয়ে বুঝিতে পারে না, তাহারা বিদ্যালয়ে সকলের সঙ্গে সমানভাবে, সকল বিষয় পাঠ করিতে গিয়া, কেবলই তিরস্কৃত হয়, কিন্তু কোনও লাভ হয় না। বুদ্ধি শক্তি অনুযায়ী যতদূর সম্ভব উচ্চশ্রেণী অবধি পাঠ করিল, পরে শরীর যদি খারাপ হয় কিম্বা কোনও একটী বিষয় কিছুতেই আয়ত্ত করিতে পারিতেছে না, তাহাদের পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত না হওয়াই ভাল। কিন্তু সাহিত্য বিজ্ঞান, ইতিহাস, কিম্বা যার যে বিষয়ে রুচি আছে সেই সকল বিষয় আরও উত্তমরূপে শিক্ষা করিবে। সূচীকর্ম্ম, চিত্রবিদ্যা, ও সঙ্গীতবিদ্যার চর্চ্চা করিবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে গিয়া বালকেরা শ্রান্ত হইয়া পড়ে, বালিকাগণ যে আরও অধিক পরিশ্রান্ত হইবে, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন। সেজন্য বিদ্যালয়ে এরূপ ব্যবস্থা রাখা উচিত, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে না পারিলেও সাহিত্য বিজ্ঞান ইত্যাদি যে বিষয়টী যার ভাল লাগে সে বিষয়ে উত্তমরূপে শিখিতে পারে। পরীক্ষোত্তীর্ণ হইলেই অধিক জ্ঞানী হয় তাহা নয়, যে সকল বিষয় পড়িতে, জানিতে, আপনাপনি ইচ্ছা হয় ও যে সকল বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন, সেই সকল বিষয়ে জ্ঞান অর্জ্জন করিতে হইবে। শিশুচরিত্র-গঠন সম্বন্ধে সকল বালিকারই জ্ঞানলাভ করা উচিত।

মেয়েদের জ্ঞানলাভ করা একান্ত প্রয়োজনীয় একথা সমাজ বুঝিতে পারিয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমানে বিদ্যালয়ে গিয়া জ্ঞান উপার্জ্জন করার ব্যবস্থা দ্বারা নানা অনিষ্ট হইতেছে। ইহার একটী মীমাংসা দরকার। অনেক পিতামাতা এই সকল কারণে কন্যাগণকে আর বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিতেছেন না। রাস্কিন বলিয়াছেন, মেয়েদের বিষয়ে প্রধান একটী কথা এই ভাললাগার উপর অনেক নির্ভর করে, যার যে বিষয়ে রুচি আছে, যে যা ভালবাসে তাহাকে তাহাই শিখিতে দেওয়া উচিত, সে বিষয় সে আদরের সহিত

শিখিতে পারিবে, উন্নতি লাভ করিতে পারিবে। যেখানে মুখ বিষণ্ণ সেখানে কল্যাণ নাই। মেয়েদের স্বভাবের মধ্যে আনন্দ একটী বিশেষ জিনিষ।

ছাত্রীগণ বিদ্যালয়ে আনন্দ পায় না, মিষ্ট ব্যবহার পায় না, নিরন্তর তিরস্কৃত, নিন্দিত, শাসিত দণ্ডিত হইয়া তাহাদের মুখ মলিন হইয়া যায়। তিরস্কার মেয়েদের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্টকর, তাহাতে স্বভাব কঠোর হইয়া যায়। স্নেহ যত্ন, কোমল ব্যবহার পাইলে মেয়েদের স্বভাব, সুন্দর কোমল হয়। মঙ্গলের জন্য তিরস্কার করি, কিন্তু অধিক তিরস্কারে মঙ্গলত কিছুই হয় না, অত্যন্ত অনিষ্ট হয়। তাই বলি বর্ত্তমান নারী-জীবনের আদর্শ কি ভাবিয়া দেখা উচিত ও আমরা কি সেই আদর্শমত চরিত্র গড়িয়া তুলিতে পারিতেছি ?

হ্যালিবার্টনপত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

মিঃ টেট আন্তরিকতার সহিত বলিলেন, "আমি জেন ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ সংঘটন করিতে চাহি না। যদি তোমরা জীবনের সুখ দুঃখ উভয়ে বাঁটিয়া লইবার জন্য সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত হইয়া থাক তবে ঐরূপই হইবে। তথাপি এ কথা আমি বলিব যে আমি তোমাদের ভাগ্যাকাশ খুব সুপ্রসন্ন দেখিতেছি না।"

"অনেক সময় দেখা যায় যে প্রথমে ভাগ্য অন্ধকারময় প্রতীয়মান হইলেও শেষে উহাই আবার সুপ্রসন্ন হইয়া উঠে।"

"তুমি তো জান আমি যৌতুকস্বরূপ জেনকে কিছুই দিতে পারিব না।"

"আমি সে কথা তো একবারও মনে ভাবি নাই। আমি মনেও করি নাই যে সে আমার ঘরে এক কপর্দ্দকও সঙ্গে আনিবে। আমি জেনকেই বিবাহ করিতে চাই, আমি টাকাকে বিবাহ করিতে চাই না।"

ধর্ম্মযাজক অকপট সরলতার সহিত বলিলেন—জেন কপর্দ্দক শূন্য হইয়া আমার গৃহ হইতে যাইলেও তাহারও কষ্ট আমারও কষ্ট। সেইজন্য আমি যৌতুকস্বরূপ একখানি ২০ পাউণ্ডের নোটমাত্র দান করিব, ইহা ব্যতীত আমার আর অন্য কিছুই দিবার সাধ্য নাই। টাকা জমানর কথা দূরে থাকুক আমরা স্ত্রীপুরুষে বৎসরের শেষে আমাদের খরচ পত্রই সংকুলান করিয়া উঠিতে পারি নাই। ইচ্ছা করিলে হয়তো বৎসরে আমি সামান্য কয়েক পাউণ্ড জমাইতে পারিতাম কিন্তু তুমি তো জানই এ গ্রামের অধিবাসীদিগের অবস্থা কিরূপ হীন। আর টাকা জমাইবার কথা মনে হইলেই সর্ব্বদা এই চিন্তা আমার মনে উদিত হয়—যে সকল দীন দুঃখীদের ভার ভগবান্ আমার হস্তে ন্যস্ত রাখিয়াছেন তাহারা অনশনে দিনযাপন করিতেছে ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াও যদি আমি নিজের সুখের জন্য অর্থ সঞ্চয়

করিয়া রাখি তাহা হইলে প্রভু আমার কি মনে করিবেন? আমি যাহা পারিয়াছি তাহা দান করিয়াছি, আমি পুত্র কন্যাদের জন্য কিছুই সঞ্চয় করিয়া রাখি নাই।"

"আপনি ঠিকই করিয়াছেন।"

তখন মিঃ টেট জেনের নিকট গিয়া বলিলেন--জেন, না মা তুমি অমন ক'রে মাথা হেঁট করে থেকো না। তোমার সঙ্কোচের কোন কারণ নাই, তুমি এমন কিছুই অন্যায় কর নাই, যাহার জন্য আমি তোমার উপর অসন্তুষ্ট হইতে পারি। জেন, আমি হ্যালিবার্টনকে স্নেহ করি, তাঁহাকে হৃদয়ের সহিত ভালবাসি। তাঁহার ন্যায় সৎপাত্র কয়টী পাওয়া যায়? কিন্তু মা, তাঁহার আর্থিক অবস্থা খুব আশাপ্রদ নহে। শিক্ষকতা কার্য্যের আয় বড়ই অনিশ্চিত, উহার উপরে নির্ভর করা যায় না।

জেন সঙ্কোচে পিতার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিল—বাবা, তাঁর মত শিক্ষিত সুবুদ্ধি লোকের পক্ষে কি এ আয় অনিশ্চিত?

"মা, এ কার্য্যে বেতন অল্প। দেখ, তাঁহাকে কিরূপ কঠোর পরিশ্রম করিতে হয়। আর নূতন বৎসর আরম্ভ হইলে তাঁহাকে ইহার অপেক্ষাও অধিক পরিশ্রম করিতে হইবে। আর এত পরিশ্রমের পুরস্কার কি? বাৎসরিক ২।৩ শত পাউণ্ড মাত্র। উপরি পাওনা কিছুই নাই।"

জেনের চক্ষু ছল ছল করিয়া আসিল। তিনি নির্ধন হউন, তিনি পথের ভিখারী হউন, কিন্তু জেনের হৃদয় যে তাঁহাকেই চায়। অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী রাজকুমার হ্যালিবার্টনের তুলনায় তুচ্ছ, নগণ্য দীন। জেনের অবনত চক্ষু যেন নীরব ভাষায় এই কথাই ধর্ম্মযাজককে জানাইয়া দিল।

ধর্ম্মযাজক বলিলেন—"বৎসে, বিবাহ হওয়া না হওয়া তোমারই উপর নির্ভর করিতেছে। যদি তুমি সমস্ত বুঝিয়া সুঝিয়া এই বিবাহের সুখ দুঃখ মাথায় বরণ করিয়া লইতে প্রস্তুত থাক—তবে এ বিবাহে আমার পূর্ণ সম্মতি আছে। তোমার মাও এ বিবাহে সম্মতি দিবেন—কারণ তাঁহার মতে মিঃ হ্যালিবার্টনের ন্যায় সচ্চরিত্র ব্যক্তি সংসারে দুর্লভ। কিন্তু মা, এ বিবাহে তোমাদের জীবনে অনেক কষ্ট—অনেক দুঃখ আনয়ন করিতে পারে।

"বাবা, আমি তাহাতে ভীত নহি। যদি কষ্ট দুঃখ আসে তবে তাহা——তুমি তো এ কথা কালই রাত্রে আমাদের ব'লছিলে——"

"কি বল্‌ছিলুম মা?"

"যে জীবনের দুঃখ ক্লেশ যদি মানুষ অনুদ্বিগ্নচিত্তে প্রসন্ন মুখে বহন ক'রতে পারে, তবে সে দুঃখ মানুষকে ভগবানের নিকটবর্ত্তী ক'রে দেয়।"

"ঠিক মা, তা ঠিক। এই মহান্ সত্য হৃদয়ে যথার্থরূপে উপলব্ধি করিবার পূর্ব্বেই হয়তো জীবনে দুঃখের পরীক্ষা আসিবে। জেন, তুমি এ বিষয় বেশ ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখ। আজ সকল কথা উত্তমরূপে বিচার করিয়া, না হয় কাল তোমার মতামত প্রদান করিও। আমি

মিঃ হ্যালিবার্টনকে বলিয়া দিব তিনি যেন আজ রাত্রিতে, তোমার মতামত জিজ্ঞাসা না করেন। তুমি যেমন বলিবে সেইরূপই কার্য্য হইবে।”

জেন কি মীমাংসা করিল তাহা কি আর বলিয়া দিতে হইবে? সংসারানভিজ্ঞা সরলা বালিকার চক্ষে বাৎসরিক ২৮৩ পাউণ্ড আয় লোভনীয় বলিয়াই মনে হয় - ইহাতে দাম্পত্যজীবনের সুখ শান্তি আরামের যাবতীয় পদার্থই আয়ত্তাধীন করা যাইতে পারে। তাহা ছাড়া জেনের হৃদয় যে হ্যালিবার্টনকেই চায়।

জেন হ্যালিবার্টনের সহধর্ম্মিণী হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মযাজক মিঃ টেট।

জুলাই মাসের এক দিন অপরাহ্নে জেন তাহার মাতার সহিত বৈঠকখানায় বসিয়াছিল। উভয়েই নিবিষ্ট মনে সীবন কার্য্যে নিযুক্ত ছিল। ঘরটী বেশ প্রশস্ত —তিনটী বড় বড় জানালা - সেই জন্য তাহারা গ্রীষ্মকালে এই ঘরটীতে বসিতে ভালবাসিত। জেন আজ প্রায় তিন কি চারি মাস বিবাহিত, কিন্তু তাহাকে দেখিলে ঠিক সেই পূর্ব্বের সরল বিনম্র বালিকাটী বলিয়াই বোধ হয়। তাহার অঙ্গুলিতে বিবাহের চিহ্নস্বরূপ অঙ্গুরীয়টী না থাকিলে কেহ তাহাকে বিবাহিতা বলিয়া মনেই করিতে পারিত না।

তাহাদের বিবাহের পর এইরূপ স্থির হইয়াছিল যে জেন ও তাহার স্বামী মিঃ টেটের গৃহেই বাস করিবে—অন্ততঃ বর্ত্তমানের জন্য থাকিবে। যখন তাহাদের বিবাহের কথাবার্ত্তা স্থির হইতেছিল এবং মিঃ হ্যালিবার্টন জেনেদের বাড়ীর সন্নিকটে অল্প ভাড়ায় একখানি বাড়ী খুঁজিতেছিলেন সেই সময় ফ্রান্সিস্ একদিন বলিল —“মিঃ হ্যালিবার্টন চলিয়া গেলে যদি বাবা এ বাড়ীতে আর কাহাকেও রাখিতে চান, তবে আবার কাহাকে পাওয়া যাইবে?” মার্গারেট বলিয়া উঠিল—কেন দিদি ও মিঃ হ্যালিবার্টন কি এই বাড়ীতেই আমাদের সঙ্গে থাকিতে পারে না? তাহা হইলেই তো বেশ ভাল হয়।”

এই প্রস্তাবটী ধর্ম্মযাজকের সম্পূর্ণ ইচ্ছানুরূপ হওয়ায় তিনি সাগ্রহে বলিয়া উঠিলেন—“এরূপ হইলে তো খুব ভালই হয়—এ সব চেয়ে ভাল ব্যবস্থা। হ্যালিবার্টন, তুমি কি ইহাতে সম্মত আছ?”

“এরকম হ'লে আমি তো পরম সুখী হই। তবে এ বিষয়ে আমার অপেক্ষা জেনের মতামতই অধিক প্রয়োজনীয়।”

এ কথায় জেনের মুখখানি লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল। সে জানাইল যে এরূপ হইলে সেও পরম সুখী হইবে। তাহার সর্ব্বদাই এ কথা মনে হইত, কিন্তু সে সঙ্কোচবশতঃ এ কথা তাহার মাতা বা স্বামীকে জানাইতে পারে নাই। সে বলিল—“আমি এখান হইতে চলিয়া গেলে মায়ের ও গৃহস্থলীর কিরূপ বন্দোবস্ত হইবে সেই কথা ভাবিয়া আমার মনে বড়ই কষ্ট হইত।”

মার্গারেট হাসিয়া বলিল—“সাংসারিক বিষয়ে কোন গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হ'লে

দিদি ভাবিয়া চিন্তিয়া তাহার একটা মীমাংসা এবং উপায় বাহির করেই ; তা ছাড়া আমার মনে হয় দিদি চ'লে গেলে আমাদের কপালে আর এক দিনও "পুডিং" জুটবে না—আর বাবাকে ও ছেঁড়া মোজা পায়ে দিয়েই কাটাতে হবে।"

জেনের মা কাঁদিয়া ফেলিলেন। মার্গারেটের মত তিনিও গৃহস্থলী বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা ছিলেন। তিনিও মনে মনে ভাবিতেছিলেন যে জেন চলিয়া গেলে তাঁহার একেবারে প্রাণান্ত হইবে—সংসারের সকল দিকেই বিশৃঙ্খলা ঘটিবে। তিনি বলিলেন—"জেন, মা, বল তুমি আমাদের সঙ্গে এই খানেই থাকবে? এ শুনলেও আমার প্রাণ শান্ত হবে! মার্গারেট সংসারের কোন কাজই জানে না, তুমি গেলে আমার ঘাড়েই সমস্ত চাপ প'ড়বে। এডগার, আশা করি তোমার এতে কোন অমত হবে না—এরূপ হ'লে সকল দিকেই বেশ সুবিধা হবে। আর আমাদের বাড়ীও তো বেশ বড়—এতে সকলকারই সংকুলান হবে এখন।"

অতঃপর তাহারা সেই বাড়ীতেই থাকিয়া গেল। বিবাহের পর হ্যালিবার্টন এক সপ্তাহের জন্য জেনকে লইয়া সমুদ্র-দর্শন মানসে যাত্রা করিয়াছিলেন। তৎপর তাহারা পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া—জেন পূর্ব্বের ন্যায় গৃহস্থলী ধর্ম্মে এবং হ্যালিবার্টন শিক্ষকতা কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন।

এখন জুলাই মাস—রীতিমত গ্রীষ্ম পড়েছে। জেন ও জেনের মাতা বৈঠকখানায় বসিয়া সেলাই করিতেছিলেন। তাহারা মার্গারেটের জন্য বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতেছিল। মিঃ হ্যালিবার্টন বন্ধুবান্ধবদের সাহায্যে একটী প্রথম শ্রেণীর স্কুলে মার্গারেটের জন্য একটী স্থান যোগাড় করিয়াছিলেন। মার্গারেট সেখানে ছাত্রী রূপে বাস করিয়া নিজে শিক্ষালাভ করিবে এবং ইহার পরিবর্ত্তে সে সেই স্কুলের ছোট ছোট ছাত্রীদিগকে সঙ্গীত শিক্ষা দিবে। বেতন স্বরূপ তাহাকে বাৎসরিক ১০ পাউণ্ড হিসাবে দিতে হইবে। এরূপ সুবিধা এ কালে সুলভ হইলেও সে সময়ে অত্যন্ত দুর্লভ ছিল—সুতরাং মিঃ টেট ও তদীয় পত্নী ইহাতে অত্যন্ত সুখী হইলেন। মার্গারেটের বয়স এখন ১৬ বৎসর—কিন্তু তাহাকে দেখিলে ২।১ বৎসরের বড় বলিয়াই বোধ হইত। আকৃতি, আচার ব্যবহার এবং বুদ্ধির পরিপক্কতায় তাহাকে ১৮ বৎসরের বলিয়াই মনে হইত।

মার্গারেটকে আর এক সপ্তাহের মধ্যেই স্কুলে যাইতে হইবে। স্কুলটী হ্যারোর (Harror) নিকট অবস্থিত। সেই জন্য জেন ও টেটগৃহিণী তাহার বস্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে ব্যস্ত ছিলেন।

জেন সেলাই করিতে করিতে কিছুক্ষণ স্থিরভাবে কি ভাবিয়া হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিয়া উঠিল—"মা, মার্গারেটের জ্যাকেটের এ হাতাটার কি মাপ নেওয়া হ'য়েছিল?"

"হ্যাঁ মা, নেওয়া হ'য়েছে বৈকি। কেন এ কথা জিজ্ঞাসা ক'রছ যে?"

"আমার মনে হ'চ্ছে এটা তার ছোট

হবে। কিন্তু দেখছি পিন আঁটা র'য়েছে —তা হ'লে তো নিশ্চয়ই মাপ নেওয়া হয়েছে। বোধ হয় মার্গারেট নিজে মাপ নিয়েছে?"

"তবেই হ'য়েছে! তা হ'লে আবার মাপ নিয়ে দেখতে হবে। তার কাজের উপর একটুও বিশ্বাস নেই—তার কিছুই ঠিক হয় না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! গান বাজনা, লেখা পড়ায় তার কেমন বুদ্ধি! জেন, ঈশ্বর যে আমাদের সকলকে একই রকম বুদ্ধি দেন নাই—সে দেখছি আমাদেরই মঙ্গলের জন্য।"

"নিশ্চয়ই মা। তাতে আর সন্দেহ কি? আমি যাই, মার্গারেটের ঘরে গিয়ে তার হাতের মাপ নিয়ে আসি।"

"তা আর যাবার দরকার নাই। ঐ সোফার উপর যে সব কাপড় চোপড় প'ড়ে আছে ওরই মধ্যে তার একটা পুরোণো হাতা আছে দেখ তো।"

জেন সেই হাতাটী আনিল। তাহার সহিত নিজের হস্তস্থিত হাতা মাপিয়া সে বলিয়া উঠিল—"এই দেখ মা, যা ব'লেছি তাই—ছোট হ'য়েছে। তবে আমি যে টুকুন সেলাই ক'রেছি সে টুকুন খুলে ফেলি। যাই হউক ভাগ্যে বেশী সেলাই হয় নি!"

"জেন, একবার এদিকে এস তো— আমার চেয়ে তোমাদের চোখের জ্যোতিঃ বেশী। দেখ তো, তোমার বাবাই না ময়দানের ও দিক হ'তে এ দিকে চ'লে আসছেন?"

জেন জানালার নিকট দাঁড়াইয়া বলিল —"হাঁ মা, বাবাই তো বটেন। মা, তুমি তাঁর কাপড় চোপড় দেখে তাঁকে চিনতে পারছ না?"

"কাপড় চোপড় কি মা, দেখতে পেলে আমি তাঁকে এম্নিই চিনতে পারতুম। কিন্তু আজ কাল কি হ'য়েছে মা ব'লতে পারি না—আর দূরের জিনিস মোটেই নজর হয় না।

"সে জন্য তুমি ভেবো না মা। তুমি কাজ করবার আর পড়বার মত দেখতে পেলেই হ'ল। দেখ মা, বাবা কত তাড়াতাড়ি চ'লে আসছেন!"

বাস্তবিকই ধর্ম্মযাজক অতি দ্রুত চলিতেছিলেন। তিনি সাধারণতঃ ধীরে ধীরেই চলিতেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া তিনি বরাবর বসিবার ঘরে আসিলেন। তাঁহার কয়েক দিন ধরিয়া শরীর তেমন ভাল ছিল না। তিনি অত্যন্ত ক্লান্তভাবে একখানি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন।

"জেন আমার জন্য যে Beef tea (অবসাদপ্রতিষেধক উত্তেজক মাংস-নির্য্যাস) তৈরি ক'রেছিলে, তা আর আছে কি?"

জেন সত্বর উঠিয়া বলিল—"হাঁ, আছে বৈ কি! যাই, আমি এখনই তোমাকে এনে দিচ্ছি।"

(ক্রমশঃ)

দেবী অঘোরকামিনীর পত্র।

২০শে মে, ১৮৯৬।

বাবা জ্ঞান!

তোমার পত্র পাইয়া সুখী হইলাম।

সুবোধের মত যে যখন ক্লাশ নাই তখন প্রাইবেটের জন্য আর এখান হইতে পরিবর্ত্তন করিয়া কি কাজ? ওখানে ৫০৲ (টাকায়) বোধহয় এক ঘণ্টা সাহায্য পাইবে। সেরূপ এক ঘণ্টা সে বলিতেছিল। এখানে কোন রকম করিয়া লইবে। তার যখন মন হইতেছে না কলিকাতায় যাওয়া তখন আর চেষ্টা করিব না, কারণ, স্থান পরিবর্ত্তন করিলে শরীরের পরিবর্ত্তন হইতে পারে। এই সকল ভাবিয়া এখানে যাহাতে ভাল বন্দোবস্ত করিতে পারি, তাই করিব। তোমার মা কেমন আছেন লিখ। তাঁহাদের উভয়কে আমার প্রণাম দিও। তোমরা উভয়ে আমার ভালবাসা লও। ইতি।

তোমার মাতা।

মা সরো,

এখনি ডাক যাইবে তাই দুই কলম লিখিতেছি। ব্যাকুলতার সহিত উপাসনা করিও। দিনের কিছু সময় মার জন্য দিও। আমাদের ভালবাসা লও। এখানকার সব ভাল। আমি সালসা খাইতেছি। দেখি কি হয়। তোমার মা।

এই পত্রখানি ঝি জামাইকে স্বর্গারোহণের কিছুপূর্ব্বে লিখিয়াছিলে। পৃথিবীতে এই তোমার শেষ বিকাশ। সুবোধ চন্দ্র বি এ পাশ করিয়াছেন, তাহার এম এ পড়িবার কিসে ভাল তাহারই চেষ্টা। "তাই করিব"। বিদ্যাশিক্ষার ব্যাবস্থাও তুমি করিতে, সরোজিনীকে দিনের কিছু সময় ভগবানকে অনুরোধ করিয়াছ। এই শেষ অনুরোধ!!! তাঁহার যত কন্যা ও ভগিনী এই অনুরোধ কি রক্ষা করিবেন?

৫ই জুলাই, ১৮৯৫।

তোমার পত্র অনেকদিন পাইয়াছি কিন্তু তুমি জান স্কুল খুলিলে আমাকে কত ব্যস্ত থাকিতে হয় তাহাতে মাসকাবার, আবার তোমার বাবা বাটীতে নাই। সকল কাজই আমাকে করিতে হয়। সময় না থাকায়, এত দেরী হইল, দুঃখ করিও না। সরলা রক্ষিত এখানে এসেছেন। স্কুলে পড়ান। আমাকেও ১১টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত কায, আজকালও করিতে হয়। আশা করি তুমি ও জ্ঞান ভাল আছ। তোমরা উভয়ে আমাদের ভালবাসা লও। তোমার শ্বশুর মহাশয় ও শাশুড়ী মাতাকে প্রণাম দিও। তুমি ভাবিও না। আমরা বেশ আছি। তোমরা খুব ভাল হও। ঈশ্বরের প্রিয়কাজ কর দেখে সুখী হই। সর্ব্বদা মাকে নিকটে রেখ। নিষ্ঠার সহিত উপাসনা করিও। রোজ রোজ চিন্তা করিও। দেখিও ভাল উপাসনা হইতেছে কি না। রোজ নিজ কাজে আত্মপ্রসাদ আসিতেছে কি না। আর কি বলিব, সকলই ত জান। সাধন বিধানের, আজকাল পরীক্ষা হইতেছে। তোমার বাবা ভাল আছেন। তবে আজ আর না। শ্বশুর শাশুড়ীর সকল কথা শুনিও, ও সেবা করিও। আজ আর না।

তোমার মা।

সরোজিনীর বিবাহের পরে এই প্রথম পত্র। ইহাতে প্রধান কথা নিষ্ঠার সহিত উপাসনা করিতে বলিয়াছ। আত্মার

উন্নতি তোমার লক্ষ্য। কি কি করিলে উন্নতিলাভ হয় পরীক্ষায় যাহা জানিয়াছিলে, কন্যাকে তাই বলিয়া গেলে। ধন রত্ন কিছুই রেখে যাও নাই, ধর্ম্ম ধন যাহা কিছু উপার্জ্জন করিয়াছিলে তাহাই কন্যাকে দিয়া গেলে। সামান্য মহিলা, পাড়াগাঁয়ে প্রতিপালিত, যে তুমি "ক খ" শেখ নাই, ভগবানের কৃপায় এই সকল উচ্চতর বলিয়া গেলে। মায়ের ধন্য কৃপা !!!

বাঁকিপুর, ২০শে অক্টোবর।

মা সরো!

তোমার পত্র আজ কয়দিন হইল পাইয়াছি। ভূপেনের বড় ব্যায়রাম হইয়াছিল, এবং নলিনীরও জ্বর হইয়াছিল, সেইজন্যে বড় ব্যস্ত ছিলাম। এখন নলিনী ভাল হইয়াছে। ভূপেনও অনেক ভাল, এখনও জ্বর আছে। আর সকলে ভাল আছে। তোমরা কেমন আছ? স্কুল হইতে দু' কলম লিখিতেছি তোমার পেটের অসুখ করিত, তাহা এখন কেমন? লিখিবে। তোমার শাশুড়ী মাতার জ্বর হইয়াছে লিখিয়াছিলে তিনি কেমন আছেন? তাহা জানিতে ইচ্ছা করে। জীবনবালা ও তাঁহার সন্তানটী কেমন আছেন? তাহাদের আমার ভালবাসা দিও। তোমরা উভয়ে আমাদের ভালবাসা লও। উপাসনা কেমন হয়? রোজ যাহাতে ভাল উপাসনা হয় তাহার চেষ্টা করিবে। প্রতিদিন ভোরে জাগিয়া কিছু সময় মার জন্য দিও। এবং ঐ সময়ে সমস্ত দিনের বিষয় ভাবিয়া ঠিক করিয়া লইও। কি কি কাজ করিতে হইবে এবং আত্মার কি অভাব-কি বিষয় প্রার্থনা করিবে। ঐ সময় বড় ভাল সময়। আজকাল উপাসনা কখন কর? খুব সকালে না বেলায়? আমাদের সেইরূপ সকালেই উপাসনা হয়। তোমাকে রোজ ঐ সময়ে মনে হয়। তোমার স্থানে ও আসনে আজকাল সরলা বসেন। তোমার কথা সকলেই প্রায় বলেন। তোমার বাবা সহরে আজকাল আছেন। আজ বাটী আসিবার কথা আছে। তিনি মন্দ নাই। আমারও তাই, তবে আজ আর না। তোমার শ্বশুর মহাশয়কে ও শাশুড়ী মাতাকে আমাদের প্রণাম দিও। আমার পত্র না পাইলেও তুমি লিখ। পত্রপাঠ উত্তর দিও। তবে আজ আর না। সকল বিষয়ে উত্তর দিও।

তোমার মা।

সংসারের কথা দু' চারিটী কহিতে না কহিতে জিজ্ঞাসা করিলে উপাসনা কেমন হয়। কি করিলে উপাসনা ভাল হয় তাহাও বলিয়া দিলে। কি করিলে নিত্য প্রার্থনা করা যায়, তাহাও বলিয়া দিলে? সমস্ত দিন কি করিতে হইবে, তাহাও প্রাতে ঠিক করিতে বলিয়া দিলে। আপনার জীবনে এই সকল উপায় অবলম্বন করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলে সেইজন্য কন্যাকে বার বার লিখিলে। যাঁরা বলেন কি প্রার্থনা করিব তাহা ঠিক করিতে পারি না, তাহারা যদি এই উপায় অবলম্বন করেন, তাহা হইলে ভাল হয়।

স্ত্রীলোকদিগের কর্ত্তব্য কাজ।

(বামাবোধিনী হইতে উদ্ধৃত।)

কোন একজন ইউরোপীয় শিক্ষক ছাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিবার সময় বলেন—প্রফুল্ল থাকা স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ; পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন থাকা দ্বিতীয়, এবং রন্ধনে নিপুণ হওয়া তৃতীয় গুণ। বালিকারা উহার বিবৃতি জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি এই উত্তর দেন যে, সর্ব্বদা প্রফুল্ল থাকিয়া আমোদ আহ্লাদ করা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য, ফুটন্ত ফুলের ন্যায় হাসিয়া হাসিয়া সংসারকে সুখ-শান্তিময় করা নারীর প্রধান কর্ত্তব্য। আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার অর্থ যে, সাবান মাখিয়া কেবল বেশবিন্যাস করা তাহা নহে; নিজ শরীর ও বস্ত্র হইতে সমস্ত গৃহ একরূপ পরিষ্কার, ধৌত ও সামান্য দ্রব্যে সুন্দর করিয়া সাজানই উহার উদ্দেশ্য। তৃতীয় গুণ—রান্নায় নিপুণতার অর্থ যে কেবল পোলাও কালিয়া রান্না, তাহা নহে। প্রত্যেক স্ত্রীলোকের যত প্রকার তরিতরকারী, সাক্‌সবজী, ফলমূল আছে, তাহার বিষয় জানা উচিত, তাহা ব্যতীত অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে সুন্দর ব্যঞ্জন প্রস্তুত করা ও রাঁধাবাড়া দেখা শুনা গৃহিণীর একটা প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

প্রাচীন শিক্ষকের ঐ উপদেশটী ইউরোপীয় স্ত্রীলোকদের ন্যায় বঙ্গনারীদেরও বিশেষ উপকারী। সকল দেশেই স্ত্রীজাতির প্রধান কার্য্যক্ষেত্র নিজ গৃহ, প্রথম কর্ত্তব্য গৃহকর্ম্ম। সেজন্য যাহাতে সেই গৃহকে সুখময় করিতে পারা যায় ও আপনাকে গৃহকর্ম্মে পারদর্শিনী করা যায়, তাহার উপায় জানা প্রত্যেক স্ত্রীলোকের একান্ত আবশ্যক। বিশেষতঃ ইহা সকল মহিলারই স্মরণ রাখা উচিত যে, স্ত্রীলোকেরা নির্দ্দিষ্ট কাজে অবহেলা করিয়া অন্য কোন কাজে পারদর্শিনী হইলে তাহাতে তাহাদের চতুরতার প্রমাণ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু উহাতে প্রকৃত উন্নতি সাধিত হয় না। স্বভাব দ্বারা নির্ণীত স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্যে নিপুণ হইয়া তাহার উপর যদি আমরা আরও কোন বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি, তাহা হইলেই উহাকে প্রকৃত উন্নতি বলা যাইতে পারে। আমাদিগের মা, দিদিমাদিগের লক্ষ্মী, অন্নপূর্ণা প্রভৃতি নামের সহিত সুশিক্ষিতা, মার্জ্জিতা পদের যোগ করাই প্রকৃত নারীশিক্ষার উদ্দেশ্য—ইহা যেন আধুনিক মহিলারা সর্ব্বদা স্মরণ রাখেন।

মিসেস্ ডি, এন, দাস।

মাতৃ-জীবনী।

(বঙ্গবন্ধু হইতে উদ্ধৃত)

আমাদের পুণ্যময়ী মা সাতটী শিশু-সন্তানকে মাতৃহীন করিয়া গত ১লা অগ্রহায়ণ বুধবার রাত্রি ১২॥ ঘটিকার সময় এ নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করিয়া ৩৫ বৎসর বয়সে নিত্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সুন্দর পবিত্র জীবন আমার লিখিয়া প্রকাশ করা অসাধ্য।

মাতার বাল্যাবস্থার কথা আমি জানি

না। ১৬ বৎসর বয়সে মার বিবাহ হয়, বিবাহের পর পিতৃগৃহেই অবস্থান করেন। ২১।২২ বৎসরে তিনি মাতৃহীনা হন। সেই অবধি তাঁর পিতার সংসার তাঁর উপরই পড়ে, এবং ৩১ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত পিতৃগৃহেই থাকিয়া বৃদ্ধ পিতা, ছোট ছোট ভাই বোন এবং নিজের সন্তানদিগকে একাকী সেবা যত্ন করিয়াছেন। অতি বড় সংসার তিনি একাই চালাইয়াছেন; পিতার এবং নিজের অবস্থা তেমন ভাল ছিল না, কাজেই কত কষ্টে যে সংসার চালাইয়াছেন বলিতে পারি না। সংসারের সমস্ত কাজ, জল তোলা, বাসন মাজা, রান্না হইতে আরম্ভ করিয়া ধান কুটা পর্য্যন্ত নিজে স্বহস্তে করিয়া দিনাতিপাত করিয়াছেন। কোন দিন চাকরের সাহায্য গ্রহণ করেন নাই। এত কাজ কর্ম্ম করিয়াও তাঁর মুখ মলিন হয় নাই, মুখে চির-প্রফুল্লতা বিরাজ করিয়াছে।

এরূপ অসচ্ছল অবস্থার দরুণ বিগত ৫ বৎসর হইতে নোয়াখালী অন্তঃপুর শিক্ষয়িত্রীর কাজগ্রহণ করিয়া এখানে আসেন। এবং অসুখের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সুচারুরূপে কাজ করিয়া সকলের সেবা করিয়াছেন। এই শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়াও সংসারের সমস্ত কাজ করিয়াছেন, যতদূর সাধ্য একাকী সব করিয়াছেন, মেয়েদের সাহায্যও গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। খোকা যখন দুমাসের, তখন থেকে এই কচি শিশুকে বাড়ীতে রাখিয়া কার্য্যস্থলে যাইতেন, কোন কোন দিন ফিরিতে সন্ধ্যা হইয়া যাইত, এরূপ শিশুকে এতক্ষণ ছেড়ে থাকাতে মাতার মন কিরূপ হয় তাহা সকলেরই বোধগম্য। এক একদিন তিনি নিজেও বলিতেন মন কিরূপ অস্থির হয় কিন্তু তথাপি একদিনও বলেন নাই যে আমি কাজ করিতে পারিব না। অলসতা কাহাকে বলে তিনি জানিতেন না, তিনি কাজ কর্ম্ম ছাড়া বসিয়া থাকিতেন না কিম্বা গল্প আমোদ হাসি ঠাট্টা করিতে একটুও ভালবাসিতেন না, এরূপ জীবন সচরাচর দেখা যায় না। সংসারে এত সব করিয়াছেন, অথচ টাকা পয়সার সঙ্গে তাঁর কিছুই সম্পর্ক ছিল না, তাঁর হাতে একটী পয়সা রাখিতে দেখি নাই। সাধ ক'রে একটী পয়সা নিজে খরচ করেন নাই। সব বিষয়ে যতদূর হতে হয় সংযত ছিলেন। তাঁর স্বভাব কত যে বিনীত ছিল বলিবার নয়। মাকে রাগ করিতে কিম্বা জোরে কর্কশ স্বরে বকিতে দেখি নাই, ছেলে মেয়েদের কাহারও গায়ে হাত তুলিয়া তিনি শাসন করেন নাই। মা নিজেই বলিয়াছেন আমি যখন ছোট ছিলাম ভয়ানক কাঁদুনে এবং রাগী ছিলাম। তাই এক একদিন খুব মারিতেন, মেরে তাঁর মনে ভয়ানক অনুতাপ হইত এবং বলতেন যে সেদিন আমার উপাসনা ঘরে যেতে ভয় হতো; এবং কি করে গিয়ে তাঁর কাছে বসিব এরূপ মনে হইয়া ভয়ানক আত্মগ্লানি হইত। এবং এইরূপে আমার প্রহার করার অভ্যাস একেবারে চলিয়া গিয়াছে। যথার্থই মা এ বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। এত সব কার্য্যের ভিতরেও

প্রতিদিন পারিবারিক উপাসনায় যোগ দেওয়া এবং সন্ধ্যায়, একাকী নির্জ্জনে উপাসনা করার ও সমাজে যাওয়ার ত্রুটী হয় নাই। তাঁর উপাসনা প্রার্থনায় "সংসার অসার অনিত্য এবং জননী তোমাকে যেন জীবনের সম্বল করিতে পারি" এই ভাবই থাকিত; তাই জননী, এ অনিত্য সংসারে তাঁকে তুমি বেশী দিন রাখিলে না, গত বৎসরই তোমার কাছে নেবার জন্য প্রস্তুত করিয়াছিলে, কিন্তু তাঁরদ্বারা তোমার কি কাজ অসম্পূর্ণ ছিল তাই একটী বৎসর জীবিত রেখে তোমার উদ্দেশ্য সাধন ক'রে চিরশান্তি চিরসুখ দেবার জন্য কোলে তুলে নিয়ে গেলে! এখন হে মাতার মাতা, পরম মাতঃ, তুমিই যে আমাদের চিরদিনের মা, এইটী বুঝিতে দাও! পৃথিবীস্থ মাতার অভাবে তোমাকে যেন মা বলে ধরতে পারি, ভালবাসিতে পারি, আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর, আর তোমার এ সতীসাধ্বী কন্যার আদর্শ আমাদের প্রত্যেকের জীবনে প্রতিফলিত কর।

১—১২—০৯। শ্রীমুক্তিবালা।

অভিনব সংশোধনাগার।

(প্রবাসী হইতে উদ্ধৃত)

অল্প বয়সে যে সমস্ত ছেলেমেয়েদের স্বভাব চরিত্র অসৎ হইয়া যায় তাহাদের জন্য নিউইয়র্কে একটি আশ্চর্য্য রকমের শোধনাগার আছে। ইহার বিবরণ যেমন কৌতূহলপূর্ণ তেমনি শিক্ষাপ্রদ।

উইলিয়াম্ আর, জর্জ নামক একটি ভদ্রলোক ইহার প্রতিষ্ঠাতা। নিউইয়র্ক সহরের রাস্তায় রাস্তায় যে সমস্ত ছেলে-মেয়েরা ঘুরিয়া বেড়াইত তাহাদের দেখিয়া তাঁহার মনে দয়ার উদ্রেক হয়। কি উপায়ে তাহাদের ভাল করা যায় সেই বিষয় তিনি ভাবিতে লাগিলেন। স্থির করিলেন কতকগুলি ছেলেকে সহরের কুসংসর্গ হইতে দূরে কোনো নির্জ্জন স্থানে লইয়া চেষ্টা করিয়া দেখিবেন, কিরূপ ফল হয়। এই উদ্দেশ্য লইয়া তিনি একটি সংশোধনাগার স্থাপন করেন। প্রথমে তাঁহার অভীপ্সিত কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারেন নাই, কিন্তু শেষে শোধনাগারটিকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যতন্ত্রের আকার দেওয়াতে ইহা আশ্চর্য্য-ফলপ্রসূ হইয়াছে।

নিউইয়র্কের ফ্রিভিল্ নামক গ্রামে এই ক্ষুদ্র রাজ্যতন্ত্রটি অবস্থিত। ইহার অধিবাসীরা পূর্ব্বে ঘোড়া-চুরি, পকেট-কাটা প্রভৃতি কাজ করিয়া বেড়াইত। কেহ হয়ত বাড়ী হইতে পলাইয়া আসিয়াছে। এখানে প্রবেশ করিবার পর হইতেই তাহাদের পরিবর্ত্তন দেখা যায়; তাহারা শীঘ্রই স্বাধীনচেতা, মিতব্যয়ী এবং শান্ত-শিষ্ট হইয়া উঠে। একটি ছেলে পূর্ব্বে দুই বার চুরির অপরাধে ধরা পড়িয়াছিল; শেষে বাড়ী হইতে পলাইয়া যায়। সকলে তাহার আশা একেবারে ত্যাগই করিয়াছিল। সে আসিয়া এই শোধনাগারে প্রবেশ করে। কিছুদিন পরে তাহাকে একবার জিজ্ঞাসা করা হইয়াছিল, "জিম, তোমার ভাল হবার ইচ্ছা হ'ল কবে

থেকে?" জিম তৎক্ষণাৎ উত্তর দিয়াছিল, "এইখানে প্রবেশ করা অবধি।"

জর্জ্জ সাহেবের এই রাজ্যটি ১০০ একর (এক একর প্রায় তিন বিঘা।) জায়গা লইয়া। রাজধানীতে সাদাসিধা রকমের দশটি কাঠের বাড়ী আছে। ইহার মধ্যে ছটি থাকিবার ঘর—একটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের; একটিতে পুস্তকালয়, রান্নাঘর, হোটেল প্রভৃতি আছে; একটিতে শিক্ষা-ভবন, ভাঁড়ার এবং ব্যাঙ্ক; একটিতে আদালত, জেলখানা, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি। এ ছাড়া মেয়েদের জেলখানা, হাঁসপাতাল, গোলাবাড়ী, কাপড়কাচা এবং স্নান ছুতোর মিস্ত্রীর কারখানা প্রভৃতির জন্য স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ঘর আছে। সম্প্রতি একটি গির্জ্জার জন্য কিছু টাকা মঞ্জুর হইয়াছে। ফ্রিভিলের জমি বেশ উর্ব্বর—প্রতি বৎসর ক্ষেত্র হইতে প্রচুর পরিমাণে খড়, শস্য ও তরিতরকারি উৎপন্ন হয়। এখানে কয়েকটি ঘোড়া, গরু ও মহিষ আছে। তাহাদের দ্বারাও বিশেষ উপকার পাওয়া যায়।

এই অভিনব রাজ্যটির সরকার, প্রজা সমস্তই শিশুরা। ইহার নামও George Junior Republic অর্থাৎ জর্জ সাহেবের শিশু-প্রজাতন্ত্র। বারো বৎসর হইতে আঠার বৎসর বয়স্ক ছেলেরা রাজ্যচালনার অধিকারী। বারোর কম বয়স হইলে সে নাবালক—সরকার, বয়স্ক বালকবালিকাদের মধ্য হইতে নাবালকদিগের জন্য অভিভাবক নিযুক্ত করেন। এই সমস্ত বালক-অভিভাবকেরা বেশ চতুরতা ও সহৃদয়তার সহিত আপন আপন শিশুদের দেখে শোনে। যদি কোনো নাবালক নিজের জীবিকা উপার্জ্জন করিতে না পারে অভিভাবক তাহাকে সাহায্য করে,—সরকারকে সে জন্য চিন্তিত হইতে হয় না। এই রাজ্যের অধিবাসী-সংখ্যা এখন মোট ছিয়াশিটি।

এই শিশু-রাজতন্ত্রের শাসনব্যাপার অনেকটা যুক্তরাজ্যেরই মত। প্রেসিডেণ্ট, মন্ত্রীসভা, পার্লামেণ্ট, প্রধান আদালত প্রভৃতি ইহাতে সমস্তই আছে। প্রেসিডেণ্ট সপ্তাহে ৫০ সেণ্ট (১ সেণ্ট = ২ পয়সা) করিয়া বেতন পান। অন্যান্য কর্ম্মচারীদেরও বেতন আছে। বিচার, পুলিশ বা অন্য কোনো সরকারি বিভাগে কাজ পাইতে হইলে একটা পরীক্ষা দিতে হয়। এই পরীক্ষার জন্য বালক বালিকারা আইনের পুস্তক খুব ঘাটাঘাটি করে। খাঁটিভাবে কাজ করিলে কাহারো পদচ্যুত হইবার সম্ভাবনা থাকে না। রাজ্যের কোনো একটি পদ পাইবার জন্য সকলেরই খুব উৎসাহ দেখা যায়। সাধারণ রাজ্যে যে সমস্ত পদ আছে এখানে তাহার কিছুরই অভাব নাই; প্রধান বিচারক, কমিশনার, স্বাস্থ্য-পরিদর্শক, শেরিফ প্রভৃতি সমস্ত পদই এই "লিলিপুটিয়" রাজ্যে আছে। এ ছাড়া ইস্কুল-পালানো ছেলেদের বিদ্যালয়ে হাজির করিয়া দিবার জন্যও একজন কর্ম্মচারী নিযুক্ত থাকে। শান্তিরক্ষার জন্য পূর্ব্বে বারোজন পুলিশ নিযুক্ত হইত—এখন দুই জনেই সে কাজ চালাইতেছে। ইহাতেই বুঝা যায় ছেলে-

দের স্বভাব চরিত্র এখানে আসিয়া অনেকটা শোধরাইয়া গিয়াছে। এই কাজের জন্য একটি ক্ষুদ্র বালক-সৈন্যদলও গঠিত হইয়াছে।

এই ক্ষুদ্র রাজ্যের মধ্যে দুইটি রাজনৈতিক দল আছে। একটি সু-শাসনের দল (Good Government Party) আর একটি মহা-প্রবীণের দল (Grand Old Party) দুই দলে খুব প্রতিযোগিতা; সদস্য নির্ব্বাচনের সময় যুক্তরাজ্যের অনুকরণে উভয় পক্ষ হইতেই নিজেদের গৌরব এবং বিপক্ষের নিন্দা কীর্ত্তন করিয়া বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়। এ রাজ্যের পার্লামেণ্টে সদস্য নির্ব্বাচনের ক্ষমতা হইতে মেয়েরাও বঞ্চিত নহে। (রাজনৈতিক অধিকারপ্রার্থী মহিলারা (Suffragettes) আশ্বাসলাভ করুন!) ভোট দিবার অধিকারকে বালক এবং বালিকা উভয়েই খুব গৌরবের চক্ষে দেখে।

রাজ্যের আইন কানুন সমস্তই নিউ-ইয়র্কের ধরণে গঠিত হয়। কোনো অপরাধের শাস্তি নিউইয়র্কের শাস্তির চেয়ে বেশী হইতে পারে না। নূতন আইন হইলেই তাহা আইনপুস্তকে তোলা হয়। অসুবিধাকর হইলে কোনো কোনো আইন পরে বদ্‌লাইয়া দেওয়া যায়।

সিগারেট্ খাওয়ার জন্য পূর্ব্বে বিশেষ শাস্তি নির্দ্দিষ্ট ছিল; কিন্তু অনেকে পুলিশের পাহারার বাহিরে গিয়া ধূমপান করিত। কাজেই তাহাদের দোষ হাতে হাতে বড় ধরা পড়িত না। সেইজন্য আইন হইয়াছে যে কাহারও মুখে সিগারেটের গন্ধ পাইলে তাহাকে শাস্তি পাইতে হইবে। সিগারেট খাওয়ার শাস্তি এক ডলার হইতে তিন ডলার (১ ডলার = তিন টাকা) পর্য্যন্ত জরিমানা, অথবা এক দিন হইতে তিন দিন পর্য্যন্ত ওয়ার্কহাউসে (workhouse) গিয়া কাজ করা। খাওয়া এবং থাকা সম্বন্ধে এস্থলের সঙ্গে জেলের বিশেষ তফাৎ নাই।

জুয়াখেলাও বিশেষভাবে দণ্ডনীয়। সর্ব্বপ্রথমে পার্লামেণ্টের একজন সভ্যই এই দোষে ধরা পড়ে, তখনি তাহাকে পার্লামেণ্ট হইতে তাড়াইয়া দেওয়া হয় এবং তাহার নিকট হইতে পার্লামেণ্টে ভোট দিবার ক্ষমতা পর্য্যন্ত কাড়িয়া লওয়া হয়। এর উপর যখন পঁচিশ ডলার জরিমানা করা হইল, সে কিছুতেই জরিমানার অর্থ দিবে না। কাজেই তাহাকে সাধারণ কয়েদীর মত পাথর ভাঙিতে দেওয়া হইল। শোধনাগারের প্রতিষ্ঠাতা মিষ্টার জর্জ নিজে আসিয়া তাহাকে জরিমানা দিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কোনো ফল হইল না। কয়েকদিন পরে পাথর ভাঙিতে ভাঙিতে সে একদিন হাতুড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল আমাকে ব্যাঙ্কে লইয়া চল আমি এখনি জরিমানা চুকাইয়া দিতেছি।

শপথ করা, জুয়াখেলা, ধূমপান করা এবং অন্যান্য অসৎ কাজের বিরুদ্ধে এই সমস্ত আইন ছেলেদের নিজেদেরই তৈরি। যেরূপ কড়াকড় ভাবে ইহারা এই সমস্ত বিষয়ের অভিযোগের বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন

করে তাহা দেখিয়াই বুঝা যায় এই সব কাজকে ছেলেরা কিরূপ ঘৃণার চক্ষে দেখে। ইহা অপেক্ষা এই প্রতিষ্ঠানটির সফলতার প্রমাণ অধিক আর কি হইতে পারে?

জর্জ রাজ্যের জেলখানা বড় সামান্য ব্যাপার নয়,—লোহার শিকল দেওয়া ছোট ছোট কুঠুরি; উপরে ক্ষুদ্র জানালা; বিছানা ভয়ানক শক্ত; খাওয়া সাধারণ জেলখানারই মত। জেলের উপরতলায় বিচার সভা,—প্রকাণ্ড হলের মাঝখানে বিচারপতির জন্য একটা লম্বা চওড়া ডেস্ক। বিচারপতির পার্শ্বে জুরিদের বসিবার বেঞ্চি; সাক্ষীদের দাঁড়াইবার জন্য বিচারপতির সম্মুখে একটা স্থান রেলিং দিয়া ঘেরা; তারপরে শ্রোতাদের জন্য কয়েকটা লম্বা লম্বা বেঞ্চি পাতা আছে। আদালতের পশ্চাদ্ভাগে কতকটা স্থান উকীলদের বসিবার জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হইয়াছে। সেটা তাঁহাদের আফিস ঘর; সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার নাই। বিচারকার্য্য বেশ স্থিরভাবে সুশৃঙ্খলায় নিষ্পন্ন হয়। ঠিক আদালতের মতই সাক্ষীদের যথাক্রমে এক একজন করিয়া ডাকা হয়। উকীলেরা খুব উৎসাহের সহিত বক্তৃতা করেন; বিচারক আসামীর দোষগুণ উত্তমরূপে বিবেচনা করিয়া দেখেন;—এইরূপেই বিচারকার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

সরকারি কর্ম্মচারীরা সকলেই বেশ সচ্চরিত্র এবং ন্যায়পরায়ণ। একবার মাত্র একটি লোক ঘুষ খাওয়ার অপরাধে ধরা পড়িয়াছিল. তৎক্ষণাৎ সে পদচ্যুত হয় এবং সেজন্য তাহাকে অন্য রকম শাস্তিও ভোগ করিতে হইয়াছিল।

এই ত গেল রাজ্যের আইন কানুন সম্বন্ধে। খাওয়া পরা সম্বন্ধেও অধিবাসীরা অত্যন্ত আত্মনির্ভরশীল, 'শ্রম না করিলে কিছুই লাভ হয় না' ইহাই অধিবাসীদের মূলমন্ত্র। প্রত্যেক বালক বালিকা নিজের জীবিকা নিজেই উপার্জ্জন করে। অসুস্থ হইয়া না পড়িলে কখনো ইহার অন্যথা হয় না। রাজ্যের সমস্ত কাজকর্ম্ম দেখাশোনার জন্য দুই জন বয়স্ক কৃষক, একজন সূত্রধর ও একজন গৃহকর্ম্মপরিদর্শক উপরওয়ালাস্বরূপ নিযুক্ত আছে। কিন্তু ছেলেরা নিজেরাই হোটেল চালাইবার ও রাস্তা, ড্রেন, চাষ, ঘরবাড়ী প্রভৃতি তৈরি করিবার চুক্তি লয়, এই সব কণ্ট্রাক্টরেরা আবার বেতন দিয়া অন্যান্য ছেলেদের মধ্য হইতে লোক নিযুক্ত করে। যে যেরূপ কাজ করে সে সেইরূপ বেতন পায়। মেয়েরা সাধারণতঃ গৃহস্থালীর কাজকর্ম্ম করে এবং নাবালকেরা তাহাদের অভিভাবকদের সাহায্য করে। সপ্তাহে একবার করিয়া মাহিনা দেওয়া হয়। যদি কোন অপরিণামদর্শী দুই একদিনের মধ্যেই সপ্তাহের সমস্ত উপার্জ্জন খরচ করিয়া ফেলে কাহারো কাছ হইতে সে সাহায্য পায় না, সপ্তাহের বাকী কয়দিন তাহাকে মন্দ খাবার খাইয়া এবং শক্ত বিছানায় শুইয়া কাটাইতে হয়।

পূর্ব্বে এই রাজ্যের কতকগুলি প্রজা কাজ না করিয়া ও বিনা খরচায় সরকারে খাইতে পাইত। সাধারণের সঙ্গে তাহা-

দের তফাৎ এই ছিল যে তাহারা সকলের সঙ্গে বসিতে পাইত না। তাহাদের খাদ্যও জেলখানার চেয়ে বিশেষ ভাল ছিল না। আত্মসম্মান এতটা পরিমাণে খর্ব্ব হইলেও অনেক কুড়ে এই রকম ভাবেই থাকিতে ভাল বাসিত। কিছুমাত্র আয় না থাকায় তাহাদিগকে কোন প্রকার সরকারি খাজনাও দিতে হইত না। ইহাদের জন্য সরকারের অনেক ব্যয় হইত। শেষে একজন সভ্য ব্যবস্থাপক সভায় প্রস্তাব করিলেন যে যাহারা ক্ষমতা থাকিতেও কাজ করিবে না তাহারা সরকারে খাইতেও পাইবে না। সেই হইতে পূর্ব্বের ব্যবস্থা পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে। শারীরিক অক্ষমতার জন্য যাহারা কাজ করিতে পারে না তাহাদের পক্ষে অবশ্য এই নূতন নিয়ম খাটানো হয় না।

আমেরিকার এই শোধনাগারটি হইতে আমাদের অনেক বিষয় শিক্ষার আছে। আমাদের দেশে এমন অভিভাবক নাই যিনি ছেলের দুরন্তপনা লইয়া ভাবনায় না পড়েন। সঙ্গদোষে দুরন্তপনা অনেক সময়ে অসৎপথে লইয়া যায় সে কথা মিথ্যা নহে। কিন্তু ইহা যে ছেলের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির আতিশয্য বশতই সে কথা চিন্তা না করিয়া অনেক অভিভাবক ছেলেদিগকে ঘরের মধ্যে আট্‌কাইয়া রাখেন। ইহাতে তাহাদের সমস্ত উদ্যমকে একেবারে গোড়াতেই পিষিয়া ফেলা হয় এবং ভিতরে নানারকম কুৎসিৎ চিত্তবিকারের সৃষ্টি হইতে থাকে। এই উভয়সঙ্কট হইতে ছেলেদের রক্ষা করিবার উপায় কেবল পড়াশুনার মধ্যেই তাহাদের সম্পূর্ণরূপে আবদ্ধ না রাখিয়া প্রচুরপরিমাণে নির্দ্দোষ আমোদ, যথা, খেলা, অভিনয়, তর্কসভা প্রভৃতির ব্যবস্থা করা। ইহার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু বাহিরের কাজের ভার দেওয়াও আবশ্যক। অর্থাৎ ছেলের মনকে সর্ব্বদাই একটা কোনো না কোনো বিষয়ে ব্যাপৃত রাখিবার ব্যবস্থা থাকা চাই যেন ইহা মন্দ দিকে যাইবার অবকাশই না পায়। অবশ্য এই প্রকার কাজের ব্যবস্থা অবস্থানুসারে বিভিন্ন রকম করিতে হইবে। বোর্ডিং স্কুলে এই সমস্ত কাজ বড়ই আনন্দ-দায়ক হইয়া উঠে এবং ছেলেরা বড়ই উৎসাহ বোধ করে ইহা আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি। এইরূপ কাজকর্ম্মের মধ্যে ছেলেদের স্বাভাবিক উদ্যম যেমন একটা ভাল পথ পাইবে তেমনি তাহাদের মধ্যে স্বাধীন ও বিধিবদ্ধভাবে কাজ করিবার শক্তিও বাল্যকাল হইতেই বিকশিত হইয়া উঠিতে থাকিবে।

মহিলাদিগের রচনা।

ঈশ্বরের করুণা।

দয়াময়! কি করুণা হৃদয়ে তোমার!
পৃথিবীতে যত কিছু সৌন্দর্য্যের তরে
দিয়েছ গো ফল ফুল তব অমরার;
নানা সাজে সাজায়েছ এই পৃথিবীরে।

পিতা মাতা ভাই বোন্ দিয়েছ সবারে,
দিয়েছ সুখের তরে প্রিয় পরিজন

সংসারে দুখের কথা জানাবার তরে
সুখ-শান্তি-পূর্ণ হ'তে আমাদের মন।

মানবেরা দুঃখ কষ্ট ভুলিবার তরে,
একটুকু সুখ শান্তি পাইতে হৃদয়ে
দিয়েছ গাহিতে গান সুমধুর স্বরে
রেখেছ মানবে তুমি কত না ভুলায়ে!

তা না হ'লে পৃথিবীতে মানব সকল,
পৃথিবীর দুঃখ কষ্ট বহিতে নারিয়া,
হ'য়ে যে'ত একে একে উন্মত্ত পাগল,
তাই তুমি রাখিয়াছ মোহেতে ঢাকিয়া।

অজ্ঞান মানব মোরা থাকিগো ভুলিয়া,
ধরণীর ক্ষণিকের মায়াময় সুখে,
দিন কাটাইয়া দেই হাসিয়া খেলিয়া,
কভু মোরা ভাবিনা'ক অতীতের দুঃখে।

কভুবা পাইলে ক্লেশ ভাবি—এই ধরা,
কিছু নয়, কিছু নয়, মায়াময় খেলা
অনন্ত অপার রোগ শোক দুখ ভরা,
এই আছি, এই নাই, মোহের কি ছলা!

তারপর ক্ষণেকের সুখ-শান্তি পেলে,
বিন্দুমাত্র স্নেহ যদি পশেগো হৃদয়ে
সংসারের দুঃখ ক্লেশ যাই অবহেলে
পশ্চাতে যে আছে দুঃখ দেখিনাক চেয়ে।

দয়াময়; শুভদিন দাও আমাদের,
জ্ঞানের আলোক যেন হৃদয়ে পশিয়া
চেতনা জাগায়ে দেয়; মূঢ় মানবের
অমানিশা অন্ধকার লয়গো হরিয়া।

শ্রীমতী নির্ম্মলাবালা পাল।
ঘাটফরাদ বেগ লেইন্,
চট্টগ্রাম।

শ্রীমান্ অমূল্যচন্দ্র মিত্রের আমেরিকা যাত্রা উপলক্ষে—

প্রীতি-উপহার।

আজি দিবা অবশানে
অমূল্য রতন।
নিশার নিবিড়ে ফেলি
করিবে গমন? ১॥

নয়ন পুত্তলি তুমি
হৃদয়ের মনি।
ক্ষণ হারা হলে হেরি
আঁধার ধরণী॥ ২॥

নীরবের অশ্রুধারা
তোমার লাগিয়া।
থাকে যেন হিয়া মোর
নিয়ত ভরিয়া॥ ৩॥

আকুল প্রাণের আশা—
কি দিয়া মিটাব?
যখন তোমার মুখ
না দেখিতে পাব॥ ৪॥

দিবেন সান্ত্বনা যিনি
তাঁরি নামে আজ।
বিদায়ের দিনে সবে
করি শুভ কাজ॥ ৫॥

কভু যেন নাহি হয়
ভয়ের সঞ্চার।
তুফান তরঙ্গ বাহি
যাবে সিন্ধুপার॥ ৬॥

তব সঙ্গে আছে তাঁর —
অপার করুণা।
সুদূর প্রবাস-বাসে
কিসের ভাবনা ॥ ৭ ॥

সাধনা সফল হোক
অসীমের মাঝে।
সসীম ছাড়িয়া যাও
সাহসীর সাজে ॥ ৮ ॥

হরষিত মনে সদা
নিয়তির পথে।
অগ্রসর হও যাদু
তাঁহারই সাথে ॥ ৯ ॥

বিজয় নিশান ধরি
লভি কৃপাবল্।
প্রলোভন মাঝে থেকো
বিশ্বাসে অটল ॥ ১০ ॥

প্রবাসীর সহবাসে
শুদ্ধ শান্ত মনে।
বীরত্বের পরিচয়—
দিও এ জীবনে ॥ ১১ ॥

শুভ ইচ্ছা হোক পূর্ণ
মঙ্গল স্মরণে।
কাতরে প্রার্থনা করি
তাঁহারি চরণে ॥ ১২ ॥

১৯১০, ২০ জুন, সোমবার। } শুভাকাঙ্ক্ষিণী, তোমারই পিসিমা শ্রীমতী তরঙ্গিণী দেবী।

সংবাদ।

ইংলণ্ডের যে সকল মহিলা পার্লিয়ামেণ্টের সভ্য হইবার ও সভ্য মনোনীত করিবার অধিকার পাইতে গত কয়েক বৎসর হইতে মহা আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন শুনা যাইতেছে যে তাঁহাদের চেষ্টা কিছু পরিমাণে সফল হইয়াছে অর্থাৎ পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভায় সে বিষয় আইনের পাণ্ডুলিপি উপস্থিত হইয়া প্রথম ও দ্বিতীয়বার পঠিত ও অধিকাংশের মতে গৃহীত হইয়াছে। ইহাতে মনে হয় ঠিক এই বৎসরে না হউক ৫।৬ বৎসর মধ্যে পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার সভ্যপদে নারীগণও মনোনীত হইবেন। এদেশের মহিলাগণের মনে এত বড় উচ্চ অধিকার লাভ করিবার স্বপ্নও বোধ হয়, হয় না, কিন্তু যখন তাঁহাদিগের ভগিনীগণ এত বড় অধিকার লইতেছেন এদেশের মহিলাগণকেও উচ্চ অধিকার গ্রহণ করিতে হইবে। তাঁহারা আপনাদিগের উচ্চস্থান লাভ করিতে উদ্যম উৎসাহ প্রকাশ করুন।

আজকাল রেলগাড়ীতে অত্যন্ত চুরি হইতেছে। বিশেষ নারীদিগের গাড়ীতে অনেক চুরির সংবাদ পাওয়া যায়। নারীগণ অনেক সময়ে অসহায় শিশু ও বহুমূল্য অলঙ্কার লইয়া দূরপথ মেয়েদের গাড়ীতে ভ্রমণ করেন। বিশেষ যাঁহারা ইণ্টারমিডিয়েট গাড়ীতে যাতায়াত করেন তাঁহাদিগকে অনেক সময় হয়ত এক কামরায় একা যাইতে হয়। এখন চারিদিক হইতে যেরূপ ভয়ানক চুরি ও হত্যাকাণ্ডের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে তাহাতে নারীগণের পৃথক্ গাড়ীতে যাওয়া কিছুতেই সঙ্গত নয়।

গ্রাহক ও গ্রাহিকা মহোদয় ও মহোদয়াদের নিকট বর্ত্তমান বৎসরের মহিলার মূল্য পাঠাইতে বিশেষভাবে অনুরোধ করিতেছি বৎসর প্রায় শেষ হইয়া আসিল অদ্যাপি অনেকের নিকট হইতে মূল্য পাওয়া যায় নাই।

সূচী।

কলিকাতা।

৩ নং রমানাথ মজুমদারের ষ্ট্রীট, "মঙ্গলগঞ্জ মিশন প্রেসে"

কে, পি নাথ কর্ত্তৃক ১৪ই ভাদ্র, ১৩১৭ সালে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মাসিক পত্রিকা।

"যত্র নার্য্যস্তু পূজ্যন্তে রমন্তে তত্র দেবতাঃ।"

১৫শ ভাগ] জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ় ১৩১৭, ১৯১০। [১১।১২ সংখ্যা।

প্রার্থনা।

হে পূর্ণ, হে পরম মঙ্গলময় পরমেশ্বর, তোমার রাজ্যে কি সকল সৃষ্ট বস্তুর, সকল জীবের, সকল নরনারীর পূর্ণ বিকাশের স্থান নাই? তুমি পরম ন্যায়বান্, তুমি কি এক জাতির প্রতি অবিচার করিয়া অন্য জাতিকে প্রাধান্য দান কর? তাহাত কখনও সম্ভব নয়। পৃথিবীতে যে সকল অবিচার, অত্যাচার, অন্যায় ব্যবহার দেখা যায় তাহা কেবল তোমার ন্যায়ের আলোকেই মানুষ দেখিতে পায়। বর্ত্তমান সময়ে সুসভ্য জগতে নরনারীর পরস্পরের প্রতি অধিকার বিষয়ে যে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে ইহা কি তোমার ন্যায়ের রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য নয়? এখন নারীগণ যে উচ্চ অধিকার পাইতে ব্যাকুল হইয়াছেন, ইহার ভিতরে কি তোমার ন্যায়শক্তি প্রকাশ পাইতেছে না? তোমার রাজ্যে, স্বর্গরাজ্যে, নরনারী আপন আপন ক্ষেত্রে পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত আনন্দ ও উন্নতিলাভ করিতেছেন, কিন্তু আমরা বর্ত্তমানে সে স্বর্গের সম্বন্ধ দেখিতে পাইতেছি না অথচ ইহা বিশ্বাস করি যে যেমন তোমার সৃষ্ট বাহ্যজগতে সূর্য্য চন্দ্র পরস্পর ঘনিষ্ঠ যোগে যুক্ত অথচ স্বাধীনভাবে বিচরণ করিতেছে, যেমন বায়ু ও অগ্নি পরস্পর সম্পর্কিত অথচ পৃথক্ পৃথক্ ভাবে কার্য্য করিতেছে তেমনই তোমার জগতে, মনুষ্য সমাজে নরনারী পরস্পর ঘনিষ্ঠযোগে যুক্ত থাকিয়াও স্বাধীনভাবে আপন আপন নির্দ্দিষ্ট কার্য্য করিবে। সমাজের এক অংশ অপর অংশের প্রতি অন্যায় অত্যাচার করিবে ইহা কখনও তোমার ব্যবস্থা হইতে পারে না। তুমি তোমার কন্যাগণকে যে অতি উচ্চ স্থান দান করিয়াছ তাহা তাঁহারা অবশ্যই ভোগ করিবেন এবং তোমার জ্ঞান, প্রেম, পুণ্য রাজ্যে সকলে সুখে বিচরণ করিবেন এবং আনন্দ

ও উন্নতিলাভ করিবেন। তব পাদপদ্মে এইজন্য বিনীত ভাবে আমরা প্রার্থনা করি যে তুমি পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন করিবার অভিপ্রায়ে পুরুষ এবং নারীকে কি ভাবে পূর্ণ স্বাধীনতার সহিত পরস্পর পরস্পরকে একাত্মতাতে মিলিত করিবে তাহা দেখাইয়া দেও। কিরূপে তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিতে হইবে সেই আলোক দান করিয়া পৃথিবীকে উন্নত কর, ইহাকে স্বর্গ কর। তোমার নিয়মে সকলেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হউন এবং তোমার একান্ত অধীন হইয়া পূর্ণ স্বাধীনতা সম্ভোগ করুন। তব পাদপদ্মে এই প্রার্থনা করিয়া বার বার প্রণিপাত করি।

অলঙ্কার শাস্ত্র।

এই প্রবন্ধটির নাম পাঠ করিয়া পাঠিকা হয়ত মনে করিতেছেন যে সাহিত্য জগতের প্রসিদ্ধ বিচিত্র বাক্যবিন্যাস দ্বারা উৎপ্রেক্ষাদি নামযুক্ত যে কাব্যের অলঙ্কার-শাস্ত্র মহিলার পাঠিকাগণের জন্য সেই বিষয় একটি প্রবন্ধ লেখা হইতেছে, কিন্তু এ প্রবন্ধ সাহিত্যশাস্ত্রের অলঙ্কার বিষয়ক নহে, ইহাতে নারীজাতির চিরপরিচিত ও অতিপ্রিয় অঙ্গসৌষ্ঠবসাধক অলঙ্কারের বিষয় কিছু আলোচনা করা উদ্দেশ্য। আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা অত্যন্ত সৌন্দর্য্যপ্রিয়। তিনি যাহা সৃষ্টি করেন তাহাই সুন্দর করেন। যদি কোন অবস্থাতে এক বস্তুর সুন্দর হওয়া সম্ভব না হয় তাহা হইলে তাহা লোক চক্ষুর নিকট উপস্থিতই করেন না। সৃষ্টিকর্ত্তা স্বয়ং সকলই জানেন, তাঁহাকে অবশ্য বাহিরের সৌন্দর্য্য মুগ্ধ করিতে পারে না কিন্তু তিনি নিজে আমাদিগের নিকট অদৃশ্য থাকিয়া চারিদিকে সৌন্দর্য্যপূর্ণ বস্তু দ্বারা জগৎকে সাজাইয়া আমাদিগকে তাহাতে স্থাপন করিয়াছেন। তিনি যে কেবল আকাশ জল বৃক্ষ লতা প্রভৃতিকে সুন্দর করিয়াছেন তাহা নয়, তিনি জীবগণকে সুন্দর করিয়াছেন এবং কোন কোন ইতর-প্রাণীকে পর্য্যন্ত সুন্দর, পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকিবার স্বাভাবিক বৃত্তি দিয়াছেন। আমরা সাধারণত মনুষ্যজাতির জন্যই এ সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে মনে করি। সেই দৃষ্টিতে দেখিলে অতি উজ্জ্বলভাবে দেখিতে পাই যে মানুষকে এমন বৃত্তি দিয়াছেন যে মানুষ আপনার চারিদিকের সৌন্দর্য্য সকল দেখিয়া পুলকিত হয় এবং আপনিও সুন্দর হইতে চেষ্টা করে। আমাদিগের মনে অন্যকে দেখিবার ও জানিবার ইচ্ছা যেমন অদম্য, আপনাকে সুন্দর দেখাইবার ইচ্ছাও তেমনই গভীর ও স্বাভাবিক। যাঁহারা মনুষ্য সমাজের আদিম ইতিহাসের চর্চ্চা করেন তাঁহারা বলেন যে মানুষ যখন অত্যন্ত অসভ্য ছিল তখনও তাহার সৌন্দর্য্যস্পৃহা ছিল। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল জাতি অসভ্য অবস্থায় আছে তাহারা বস্ত্র ব্যবহার করিতে জানে না, কিন্তু সৌন্দর্য্যসাধন করিতে জানে ও সর্ব্বদা তাহার চেষ্টা করে। এই সৌন্দর্য্যসাধন বিষয়ে পুরুষ ও নারীর দৃষ্টি ভিন্ন দিকে, ইহাও আমাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তার

অভিপ্রেত, অর্থাৎ আমাদিগের স্বভাবের অন্তর্গত যে পুরুষ বল বীর্য্য দৃঢ়তা তীক্ষ্ণতা প্রভৃতিতে আপনাকে সজ্জিত করিতে ইচ্ছা করে, এবং নারী মৃদুতা, কোমলতা, লাবণ্য, সুবর্ণ প্রভৃতি দ্বারা আপনার সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করে। ইহার অল্প অল্প ব্যতিক্রম কোন কোন স্থানে লক্ষিত হয় কিন্তু সাধারণ নিয়ম এই যে পুরুষ আপনার স্বভাবের মূলভাবকে প্রকাশ করিতে এক প্রকার উপকরণ ব্যবহার করে এবং নারী আপনার বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে অন্য জাতীয় উপকরণ ব্যবহার করে। জ্ঞান,সভ্যতা,ধর্ম্ম প্রভৃতির প্রভাবে সময়ে সময়ে অলঙ্কারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে,ধনের তারতম্যে চিরকালই অলঙ্কার ব্যবহারস্পৃহা অত্যন্ত ভিন্নরূপে চরিতার্থ করা হয়, কিন্তু বৃত্তিটি সকল নরনারীর অন্তরে চিরদিন রহিয়াছে। আমাদিগের মধ্যে কোন পুরুষ বা নারী আপনার সৌন্দর্য্য সাধন করিতে অত্যন্ত চেষ্টা করিতেছেন একথা সাধারণের নিকট প্রকাশ হইয়া পড়িলে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইবেন,কিন্তু প্রত্যেকেই আপনাকে মনোমত সুন্দর দেখাইতে সর্ব্বদা যত্নবান্। যখন হইতে নরসমাজে বিচিত্র বর্ণের ও সৌন্দর্য্যের বস্ত্র ব্যবহার হইতে আরম্ভ হইয়াছে তখন হইতে অলঙ্কারের স্পৃহা অনেক পরিমাণে বস্ত্র দ্বারাই তৃপ্ত করা হয়। পুরুষ ও নারীর বিশেষত্ব প্রদর্শন করিতে কেবল যে অলঙ্কার ব্যবহার করা হয় তাহা নয়। বস্ত্র ব্যবহার দ্বারাই বর্ত্তমান সময়ে অত্যন্ত অধিক পরিমাণে সেরূপ অলঙ্কারের কার্য্য করা হয়। কিন্তু তথাপি অলঙ্কার ব্যবহার কোনরূপে হ্রাস হয় নাই। মহাধনী রাজা মহারাজা, শতকোটিপতি কুটিয়াল মহাজন হইতে দীন, দরিদ্র, ভিখারী পর্য্যন্ত অলঙ্কার ব্যবহার করিতেছে। সৃষ্টির মধ্যে সৌন্দর্য্য সাধনের মহাব্যাপার ঘটিতেছে, মনুষ্য স্বভাব বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হইয়া বাসগৃহ, গৃহ-সামগ্রী সকলকে সুন্দররূপে সজ্জিত করিয়া পরম সুন্দর সেই বিশ্বপতির ইচ্ছা পূর্ণ করিতেছে। যে পুরুষ বা নারী এই বিশ্বজনীন সৌন্দর্য্য সাধন উৎসবে যোগ না দেয় সে তাহার কার্য্যের জন্য দায়ী। সে সৃষ্টির ব্যবস্থার বিরোধী কার্য্য করে। বিশ্বেশ্বর বলিতেছেন সুন্দর হও, প্রকৃতি সুন্দর সুন্দর অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বলিতেছে আমার মত সুন্দর হও, পুরুষ নারীকে বলিতেছে অলঙ্কারে, বস্ত্রে, সৌন্দর্য্যে, কোমলতায়, সত্তায়, বিভূষিত হইয়া সুন্দর হও, নারী পুরুষকে বলিতেছে গুণালঙ্কৃত হও, সকল মানুষ সকলকে বলিতেছে সুন্দর হও—প্রত্যেক নরনারীর মন বলিতেছে 'সুন্দর হই।' এই জন্য সকলেই সুন্দর হইতে চায়, বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিত হইতে চায়। এই স্রোত বংশপরম্পরা প্রবাহিত হইয়া বর্ত্তমান বংশকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। বিশ্বেশ্বর অন্যান্য সৃষ্ট বস্তু ও প্রাণী হইতে মনুষ্যকে পৃথক্ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। আকাশের রামধনু অত্যন্ত সুন্দর, বসন্তের প্রাতঃকাল অত্যন্ত সুন্দর, কিন্তু তাহাকে আরও অধিক সুন্দর হইতে চেষ্টা করিতে হয় না। কিন্তু মানুষ

যাহাতে সংস্পৃষ্ট তাহাকেই অধিক হইতে অধিকতর সুন্দর হইতে হইবে। যেমন উন্নতির চেষ্টা করিবার শক্তি মানুষের আছে তেমনই অধোগতিও তাহার পক্ষে সম্ভবকল্প হইয়াছে। অলঙ্কার দ্বারা সৌন্দর্য্য সাধন বিষয়েও মানুষ সকল সময়েই যে কেবল উন্নতিলাভ করে তাহা নয়, সময় সময় অধোগতি প্রাপ্ত হয়। বর্ত্তমান সময়ের সভ্যতাতে এই অলঙ্কারের বৃত্তি নানারূপ ধারণ করিয়াছে। পুরুষ ও নারী সকলেই অলঙ্কৃত হইতে ব্যস্ত ইহার মধ্যে পুরুষের অলঙ্কার স্পৃহাটা সাধারণত ধরা পড়ে না, নারীগণের অলঙ্কার স্পৃহা অতি প্রবল ও অতি স্পষ্ট। আমাদিগের দেশে অতি দরিদ্র লোকদিগের মধ্যে অলঙ্কার গঠনের জন্য লোহা লাক্ষা প্রভৃতি ব্যবহার হয়, ক্রমে যত উচ্চতর অবস্থার দিকে দৃষ্টি করা যায় দেখা যায় পিতল কাঁসা রূপা চাঁদি, সোণা, মুক্তা, হীরা প্রভৃতি ব্যবহার দৃষ্টিগোচর হয়। যাঁহারা ধর্ম্ম প্রবলতায় জ্ঞানের অলঙ্কার স্পৃহাকে সংযত করিতে চেষ্টা করেন বস্ত্র বা অন্য কোনরূপ সামগ্রী তাঁহাদিগের অলঙ্কার স্পৃহাও পৃথকত্ব প্রমাণ করে কিন্তু কার্য্যত সেই এক নিয়ম অনুসারে সকলেই চলে। আমাদিগের পূর্ব্বে সংস্কার ছিল বুঝি এদেশের নারীগণই অত্যন্ত অলঙ্কারাসক্তা কিন্তু যত পৃথিবীর সংবাদ জানা যাইতেছে তত বুঝিতে পারিতেছি যে এবিষয়ে ভারতনারী কোনরূপে নিন্দনীয়া নহেন। আমাদিগের দেশে এখন নানাস্থানে নানারূপ প্রদর্শনী হয়, যদি তাহার একটা বিভাগে বর্ত্তমান সময়ে দেশীয় সকল প্রকার অলঙ্কার প্রদর্শনের ব্যবস্থা হয় তাহা হইলে অত্যন্ত শিক্ষাপ্রদত্ত কৌতুকাবহ ঘটনা দৃষ্ট হয়। অলঙ্কার বিষয়ে এসকল ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কিছু বলিবার নাই। সময়ে রুচি পরিবর্ত্তিত হইতেছে, সৌন্দর্য্য বিষয়ে নূতন নূতন ভাব প্রকাশ হইতেছে, নূতন নূতন অলঙ্কার প্রস্তুত হইতেছে, ইহার আলোচনা করাতে মানুষের মনের গতি দেখিতে পাওয়া যায়। সভ্যতার ইতিহাসের ইহা একটি বিশেষ অঙ্গ।

অলঙ্কার ও বস্ত্র বিষয়ে বিকৃতি কোথায় আরম্ভ হয় তাহাও আলোচনা করা প্রয়োজন। সকলেই উচ্চতা লাভ করিতে যায়। যেমন মানুষ সুন্দর হইতে যায়, তেমনই বড় হইতে যায়। যখন নারীগণ অলঙ্কারের স্পৃহাকে উচ্চতালাভের স্পৃহার সহিত মিলাইয়া অবস্থার অতীত অলঙ্কার ব্যবহার করিতে যান তখনই তাঁহার দুর্গতি আরম্ভ হয়। সমাজে ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর লোকই আছে, যদি ধনী ধনীর মত অলঙ্কার ও বস্ত্র ব্যবহার করেন, দরিদ্র আপনার অবস্থার উপযোগী বস্ত্রালঙ্কার ব্যবহার করেন, তাহা হইলে সকলই স্বাভাবিকতাতে সুন্দর হয় এবং কাহারও কষ্টের কারণ থাকে না। কিন্তু অন্য সকল বিষয়েও যেমন মানুষ দুর্ব্বলচিত্ত এ ক্ষেত্রে নারীগণও অনেকে অত্যন্ত দুর্ব্বলচিত্ত। কোন কোন নারী ধনী প্রতিবেশী-পত্নীর ন্যায় মূল্যবান্ নূতন অলঙ্কারের জন্য স্বামীর অনিদ্রার কারণ হন, গৃহকে

অশান্তিতে পূর্ণ করেন, প্রাতিবেশীর নিকটে পতি নিন্দা করিয়া মনের জ্বালা নিবৃত্তি করিতে চেষ্টা করেন, এবং যদি স্বামীর মনে যথেষ্ট বল না থাকে তাহা হইলে অলঙ্কার ক্রয় করিতে স্বামীকে ঋণগ্রস্ত ও বিপন্ন করেন। অপর দিকে হয়ত অনেক কষ্ট পাইয়া ও কষ্ট দিয়া যে অলঙ্কার ক্রয় করিলেন তাহা অবস্থার অনুপযোগী হওয়াতে লোকের নিকটে হাস্যাস্পদ হইলেন। ফলে অলঙ্কার বিষয়ে যোগ্যাযোগ্যতা সাধারণ লোকে সর্ব্বদাই ধরিতে পারে। কথায় বলে গরিবের হাতে সোণার আঙটী থাকিলেও লোকে মনে করে পিতলের, আর ধনীর হাতে পিতলের আঙটী থাকিলেও লোকে বলে সোণার! প্রত্যেক লোকের অবস্থার উপযোগী তাহার গৃহ, গৃহসামগ্রী, বস্ত্র, অলঙ্কার হইয়া থাকে, ইহার একটির উন্নতি করিতে অন্য সকল বস্তুরও উপযুক্ত উন্নতি হওয়া প্রয়োজন। যাঁহারা নিমন্ত্রণে যাইতে ধনী আত্মীয়ের নিকট হইতে বস্ত্রালঙ্কার চাহিয়া লইয়া ব্যবহার করেন, তাঁহারা আপনাদিগের প্রতি অত্যন্ত অন্যায় ব্যবহার করেন। স্বীয় অবস্থার উন্নতি চেষ্টা উচিত ও স্বাভাবিক, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া উচ্চতর অবস্থা প্রদর্শন অতি নীচ মিথ্যাচরণ। এরূপ ভাবে চুরী করিয়া ধনীর মান্য লইতে যাইয়া মানুষ আপনার অধিকারও মান্য হারায় ও সর্ব্বত্র ঘৃণার পাত্র হয়। নারীজাতি কোমলতাতেই প্রসিদ্ধ, কিন্তু আপনার অবস্থার বিষয়ে দৃঢ় হইতে না পারিলে আকাঙ্ক্ষার হাতে পড়িয়া কোমলতা অত্যন্ত দুর্গতিগ্রস্ত হয়। অনেক মাননীয়া নারীরও অলঙ্কার বিষয়ে অনেক দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, ফলে আপনার প্রকৃত স্থানে অবস্থার উপযোগী অলঙ্কৃত হইয়া শরীর মনকে সুস্থ ও সুন্দর রাখা অত্যন্ত প্রার্থনীয়, কিন্তু ইহা অত্যন্ত কঠিন। এ জন্য এ বিষয়ের কোন ত্রুটি হইলে তাহার কঠিন বিচার করা উচিত নয়। অলঙ্কার ব্যবহার করা মনুষ্যের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক, বিশেষ নারীগণের অন্তরে বসিয়া সৃষ্টির প্রভু বলিতেছেন, সুন্দর হও, অলঙ্কার দ্বারা ভূষিত হও, এ কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এখন একবার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক পারিবারিক জীবনে অলঙ্কারের উৎপত্তি স্থিতি ও গতি কি প্রকার হয়। যখন বালক বালিকা শিশু থাকে, তখন পিতা মাতা তাহাদিগের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিতে সুন্দর বসন ভূষণ দান করিয়া পরম সুখ অনুভব করেন। যখন কন্যাকে বিবাহ দেওয়া হয় তখন পিতা মাতা যথাশক্তি তাহাকে নানা অলঙ্কারে ভূষিত করেন। যখন নারী স্বামীগৃহে বাস করেন তখন স্বামী তাঁহার রূপে গুণে মোহিত হইয়া নানা আভরণে সাজাইয়া আপনি সুখী হন ও প্রিয়তমার সুখ হইতেছে দেখিয়া আরও সুখী হন। ভালবাসা প্রকাশের এমন উপায় আর নাই। স্বামী পত্নীর নিকট শত প্রকার সাহায্য, সেবা, ভালবাসা, পরামর্শ ও শিক্ষা লাভ করেন, তাহার বিনিময়ে এবং মনের

প্রবল প্রেম প্রকাশের একটা বিশেষ উপায় স্বরূপ অলঙ্কার দিয়া সতীকে সজ্জিত করেন। ধনীর ঘরে দাম্পত্য প্রেমের প্রকাশ যেমন অলঙ্কার দ্বারা হয় এমন আর কিরূপে হইতে পারে? নারী এইরূপে ধনের অধিকারিণী হইলেন। গৃহের অন্য সকল অংশে যেমন লক্ষ্মীশ্রী দেখা যায়, গৃহিণীর অঙ্গেও লক্ষ্মীশ্রীর তেমনই প্রকাশ। যে নারী গৃহকর্ত্রী, গৃহলক্ষ্মী তাঁহাকে দেখিলেই লোকে বুঝিতে পারে যে গৃহে তাঁহার কত মান্য, কত শ্রেষ্ঠতা। কিন্তু লক্ষ্মী চঞ্চলা, জীবন যৌবন সকলই অতি চঞ্চল, কোন গৃহেই রূপ, যৌবন, ধন, জন চিরদিন সমভাবে থাকে না। যখন অবস্থাহীন হয়, যখন আয় বন্ধ হইয়া যায়, যখন দেশে দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন অলঙ্কারের প্রকৃত মূল্য জানিতে পারা যায়। সাধারণ ধনী মহাজন প্রভৃতির ঘরে যেমন শত সহস্র মুদ্রা আসে তেমনই চলিয়া যায়। যে গৃহস্থ প্রতিদিন ব্যবসায়ে বহু অর্থ লাভ করে সে হয়ত একদিন এমন অবস্থায় পতিত হয় যে তাহার সর্ব্বস্ব বিক্রয় হইয়া যায় এবং আয়ও থাকে না। এ দিকে পরিবারের এ সকল লাভ ক্ষতি আগম অপায়ের সহিত নারীর অলঙ্কারের কোন সম্বন্ধ থাকে না। অথচ যখন অন্য সমস্ত ধন চলিয়া গেল, উপার্জ্জন বন্ধ হইয়া গেল, তখন গৃহিণী তাঁহার একখানি অলঙ্কার অঙ্গ হইতে মোচন করিয়া দিলেন, এবং তখনই পরিবারের উপস্থিত অভাব দূর হইল এবং হয়ত এরূপ হইল যে ধনী মহাজন ব্যবসায়ের দুর্দ্দশাতে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া শেষে স্ত্রীর অলঙ্কার বিক্রয় করিয়া পুনরায় ব্যবসায় প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং সকল অভাব হইতে উদ্ধার পাইলেন! যখন কোন দেশে দুর্ভিক্ষ আরম্ভ হয়, অথবা আহারীয় সামগ্রীর মূল্য অত্যন্ত বাড়িয়া যায়, তখন দেখা যায় যে গৃহে যত অলঙ্কার থাকে তাহা বিক্রয় হইতে থাকে। পিতল কাঁসার অলঙ্কার গাড়ী বোঝাই হইয়া বিদেশে যাইতে থাকে। যতদিন নারীর কোন অলঙ্কার অবশিষ্ট থাকে ততদিন গৃহের পুরুষের অনাহার ঘটে না। এই জন্য দেখা যায় যে স্বভাবের নিয়মে সমাজে যে অলঙ্কার ব্যবহারের ব্যবস্থা ইহাতে প্রথমে সৌন্দর্য্যের পূজা হয়, পরে প্রেমের পূজা হয়, তাহার পর আত্ম-ত্যাগের জয় হয়। অলঙ্কার বিষয়ে অনিয়ম অপব্যবহার অবশ্য অনিষ্টকর। সংসারে যাহা ধর্ম্ম ও ন্যায়ের সীমা অতিক্রম করে তাহাতেই অনিষ্ট হয়, কিন্তু অবস্থার উপযোগী অলঙ্কার ব্যবহারে পরিবারের সুখ শান্তি বৃদ্ধি করে এবং অসময়ে উপকার হয়। মহিলার পাঠিকাগণ অবশ্যই অলঙ্কার শাস্ত্রের বিষয় আলোচনা করিয়া ইহার যথাযথ ব্যবহার করিবেন।

লাভ ও ক্ষতি।

এ সংসারে সকলেই দিবানিশি লাভ ও ক্ষতি গণনা করিতেছে। যাহাতে ক্ষতি-গ্রস্ত হইতে না হয়, লাভবান্ হইতে পারা

যায়, সকলেই তজ্জন্য ব্যস্ত ও তাহার উপায় করিতেছে। এই ভূমণ্ডলে কেহই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে চায় না, যদিও সকলকেই ক্ষতি সহ্য করিতে হয়। আমরা ক্ষতি বলি, কিন্তু যথার্থ ক্ষতি কি, তাহা কি কখনও ভাবিয়া দেখিয়াছি? কোনও চিন্তা না করিয়া সকলের সহিত লাভ ও ক্ষতি বিচার করিয়াছি?

ভগিনীগণ আপনারা কি প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ক্রমাগত লাভ ও ক্ষতি গণনা করিতেছেন না? প্রত্যেকেই অজ্ঞাতসারে দশজন যে পথে চলিতেছেন, সেই পথে চলিয়াছেন, অতি অল্প লোকেই যথার্থ লাভই বা কি ক্ষতিই বা কি চিন্তা করেন, ও তদনুসারে লাভ ও ক্ষতি বিচার করেন।

রাজা কোনও যুদ্ধে জয়ী হইয়া স্বপক্ষের বিপক্ষের শত শত জীবন ধ্বংস করিয়া শত শত পরিবারে শোকের দারিদ্র্যের আগুণ জ্বালিয়া একটা রাজ্য হস্তগত করিয়া আপনাকে মহা ভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন। যাহারা কোনও ব্যবসা বাণিজ্য করে তাহাদিগের মুখেই লাভ ও ক্ষতি দিবানিশি উচ্চারিত হইতেছে। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অল্প হ্রাস বৃদ্ধিতে তাহাদিগের লাভ ও ক্ষতি হইতেছে। অনাহারক্লিষ্ট, দরিদ্র গ্রাম্যলোক পুষ্করিণী হইতে শাক তুলিয়া নগরে বিক্রয় করে, যদি কোন দয়ালু ব্যক্তি তাহার সেই সামান্য শাকের পরিবর্ত্তে আশাতিরিক্ত মূল্য প্রদান করে, সেদিন সে আপনাকে পরম লাভবান্ জ্ঞান করিবে। সেদিন সে আপনার লাভ গণনাতে এত মত্ত যে পথপার্শ্বে কত ব্যক্তি তাহা অপেক্ষা কত অধিক গুণ লাভ করিতেছে, সে সকল দেখিবার অবসর নাই। স্বগ্রামস্থ আপনার ন্যায় দরিদ্র প্রতিবেশীর নিকটেই সেই লাভের কথা কতই গর্ব্বের সহিত বলিবে ও তাহার সেই প্রতিবেশীও তাহাকে কতই না ভাগ্যবান্ মনে করিবে। অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট্ হইতে দরিদ্রতম শ্রমজীবী পর্য্যন্ত সকলেই আপনার আপনার মত লাভ গণনা করিতেছে। তাই বলি প্রকৃত লাভ কি? যে সামান্য লাভে উৎফুল্ল হই, সামান্য ক্ষতিতে বিষণ্ণ হই। কেহ যদি কাহাকেও বঞ্চিত করিতে পারে, ভাবে আমি জয়ী হইলাম। প্রকৃত প্রস্তাবে কে যে জয়ী হইল, প্রবঞ্চিত না প্রবঞ্চনাকারী তাহা ভগবান্ দেখিতেছেন।

সংসারের লাভ ক্ষতি অতি অসার, তথাপি লোকে সেই সকল লইয়াই উন্মত্ত হইয়া ফিরিতেছে, কত না অন্যায়াচরণ করিতেছে, কতই না অসুখী হইতেছে। মোহান্ধ অদূরদর্শী মানব ভাবিয়া দেখে না তাহার ন্যায় কত কত জন এই সংসারক্ষেত্রে আসিয়াছে, ভয়ানক সংগ্রাম করিয়াছে, অন্যায় উপায়ে কত ধনরত্ন বিষয় বিভব লাভ করিয়াছে। কিন্তু তাহারা আজ কোথায়! তাহাদের সে ধনরত্ন বিলাস বিভব কোথায়! কালস্রোতে সব ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে, কেবল তাহাদের পাপ প্রবঞ্চনা ইতিহাসে কাল দাগ রাখিয়া গিয়াছে। লাভ ও ক্ষতি কিছুই থাকে না, সকলই অসার; পুণ্যবানের পূত-চরিত্র

ও কীর্ত্তি অবিনাশিরূপে রহিয়া গিয়াছে, পাপীর পাপকাহিনী সকলকে সাবধান করিতেছে।

শঙ্করাচার্য্য এই সংসারকে অনিত্য মনে করিয়া, সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসী হইলেন, তিনি দেখিলেন, এই সংসারের সম্বন্ধ, লাভ ও ক্ষতি এত চঞ্চল অস্থায়ী, তাহাতে আসক্ত হইলে দুঃখ পাইতে হইবে। তিনি সংসারের লাভকে লাভ মনে করিলেন না, ক্ষতিকেও ক্ষতি মনে করিলেন না। অর্থাৎ তিনি পার্থিব পদার্থকে মূল্যবান মনে করিতেন না, তাহা পাইলেই বা কি না পাইলেই বা কি? শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় সকলের বুদ্ধি হইলে আর সংসার চলিত না।

তাই বলি ভগিনীগণ, আমাদের লাভ ও ক্ষতি ইহজগতের বিষয়ে নয়। কবি গাহিয়াছেন, "অগণন ধনরাশি তায় কিবা ফলোদয় হে, যদি লভিয়া সে ধনে, পরম রতনে, যতন না করয় হে"। যদি সততা সাধুতা বিক্রয় করিয়া সুখ স্বচ্ছন্দতা লাভ করি, তাহাকে কি বলিব, লাভ না ক্ষতি? আমাদের লাভ ক্ষতি এখানে নয়, আর এক জায়গায়। অন্যকে প্রবঞ্চনা করিয়া যে লাভ, জ্ঞানীর নিকট তাহা ক্ষতি। কিন্তু যদি পরোপকার দয়া সহানুভূতি ন্যায়বিচার করিয়া, সাংসারিক বা আর্থিক ক্ষতি হয়, তাহাকে জ্ঞানীরা ক্ষতি মনে করেন না, পরম লাভ মনে করেন। সংসারের নশ্বর বস্তু দিয়া যে নিত্যধন ক্রয় করিতে পারে সেইত বুদ্ধিমান। ভগবদ্ভক্ত জন, যে যে বস্তুকে ভগবচ্চরণ লাভের অন্তরায় মনে করেন, তাহাকে কণ্টকস্বরূপ জ্ঞান করিয়া উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করেন, সেইজন্য তাঁহার কার্য্যকলাপ সংসারাসক্ত লোকের বোধগম্য নয়, এজন্য তাঁহাকে নিতান্ত নির্ব্বোধ মনে করে। কিন্তু যাহার নিকট তাহাই সত্য বস্তু হইয়াছে, সে আর সকলকে অসার মনে করে। সংসারের লোকে অন্যকে প্রবঞ্চনা করিয়া ভাবে, আমরা কি বুদ্ধিমান। কিন্তু অবিলম্বেই দেখিতে পাইবে, তাহারা কি নির্ব্বোধের কাজ করিয়াছে। স্বর্ণের পরিবর্ত্তে অস্থায়ী চাকচিক্যশালী গিল্টির দ্রব্য ক্রয় করিয়াছে।

একটী পয়সাও ক্ষতি হইলে দুঃখিত হই, কিন্তু যদি দেখি, যাহা উচিত বুঝিয়াছি, করিয়াছি, তাহাতেও যদি ক্ষতি হয় তাহা ক্ষতি নয়। সামান্য সামান্য ক্ষতি সকলকেই সহ্য করিতে হয়, তাহা সহ্য না করিলে কেবল অসুখী হইতে হয়। বড় বড় ক্ষতিও অনেক সময় নীরবে সহ্য করিতে হয়, কারণ তাহার কোনও প্রতীকার নাই। যে ক্ষতির আর উপায় নাই তাহার জন্য বৃথা অনুতাপ না করিয়া, সম্মুখে যাহা কর্ত্তব্য, তাহাই দৃঢ়তার সহিত করিয়া যাইতে হইবে। কোন লোকই সব বিষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত বা লাভবান্ হইতে পারে না। যদি কোনও বিষয়ে ক্ষতি হয়, তবে অন্য কোনও বিষয়ে লাভ হইবেই, বা কোনও বিষয়ে লাভ হইলে, আর এক দিকে ক্ষতি হইবেই, ইহা আপনাদের সকলকে লক্ষ্য করিতে অনুরোধ করিতেছি। যেমন সকল সুবিধা

একজনের ভাগ্যে হয় না বা সকল প্রকার অসুবিধা একজনকে ভোগ করিতে হয় না। কতকগুলি বিষয়ে সুবিধা হইলে অপর কতকগুলি বিষয়ে অসুবিধা হইবেই। সুবিধা, অসুবিধা যেন সকলের ভাগে সমান ভাবে ওজন করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

ধর্ম্মপদে (ইহাতে বুদ্ধদেবের উপদেশ সকল সংগৃহীত হইয়াছে) লিখিত আছে, যাহারা নিরন্তর মনে করে, লোকে আমাকে প্রবঞ্চনা করিল, পরাজিত করিল, ক্ষতিগ্রস্ত করিল তাহাদের মনে শান্তি কোথায়? তাহারা বড় অসুখী। সংসারে প্রতিনিয়ত আমাদিগকে নানাপ্রকার ক্ষতি সহ্য করিতে হয়, সে সকল ক্ষতি আমাদিগের, আত্মীয় স্বজন পাড়াপ্রতিবেশী, ভৃত্য বা অন্যান্য যাহাদের সহিত আদান প্রদান করিতে হয়, তাহাদিগের দ্বারাই হইয়া থাকে। নিয়ত যদি সেই সকল ক্ষতি গণনা করিতে থাকি, তাহাতে মনে মনে তাহাদের প্রতি ক্রোধ হিংসা উপস্থিত হয়, তাহাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত করিতে তাহাদের অনিষ্ট সাধন করিতে ইচ্ছা হয়, এরূপ কুকামনা যদি মনে আসে তবেই আমি ক্ষতিগ্রস্ত হইলাম দুঃখী হইলাম। লোকে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় নানা প্রকার ক্ষতি করিতেছে, কিন্তু তাহা সহ্য করিতে শেখা, তাহাদের ক্ষমা করা, প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছাকে দমন করা, এমন কি তাহাদের হিতাকাঙ্ক্ষা করা, হিতসাধন করা তাহাদের জন্য প্রার্থনা করাই লাভ।

ভগিনী, অন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখুন, আমাদের মনে এরূপ সংগ্রাম হয় কি না। আমরা ভাবি, আমরাত লোকের কোনও অনিষ্ট করিতেছি না, লোকে কেন অনিষ্ট করে। লোকের কুব্যবহার পাইয়া আমাদের মনেও কি সময় সময় প্রতিশোধের ইচ্ছা হয় না? তাই বলি যদি ক্ষমা করিতে পারি, সহ্য করিতে পারি তাহাই লাভ।

ইহা ভগবানেরই ইচ্ছা যে আমরা সংসারের যাবতীয় পদার্থ ও অর্থ ব্যবহার বিষয়ে আমাদের যার যেটুকু অভিজ্ঞতা দূরদর্শিতা, বুদ্ধি বিবেচনা আছে, তাহা দ্বারা যথাসাধ্য চেষ্টা করিব, যাহাতে ক্ষতি না হয়, সংসারে স্বচ্ছলতা হয়। কিন্তু এই সকল চেষ্টা যত্নের একটী সীমা আছে, উহাই আমাদের চরমলক্ষ্য নয়। পার্থিব, লাভ ক্ষতি অপেক্ষা আরও অনেক শ্রেষ্ঠ বিষয় আছে, ইহার স্থান সেখানে অনেক নীচ। অনেকের নিকট ইহারই উচ্চস্থান, ইহা লাভ করিতে যদি ন্যায়ধর্ম্ম বিনষ্ট হয় হউক। আমরা যেমন দেহের কত যত্ন করি, ইহার সুস্থতা আরামের জন্য কত শত ব্যবস্থা করি, কিন্তু এমন অনেক সময় আসে, যখন দেহের মঙ্গল অপ্রধান হয়, আত্মার মঙ্গলের জন্য অকাতরে অম্লানবদনে দেহত্যাগ করা হয়। আমরা সংসারের অর্থ, পদার্থ ব্যবহার করিতে প্রস্তুত, সুতরাং আমাদিগকে লাভ ও ক্ষতি ভাবিতেই হইবে, কিন্তু ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে ইহা অপেক্ষা উচ্চতর, শ্রেষ্ঠতর বিষয় আছে, যাহার জন্য উহাদিগকে ত্যাগ করা যায়।

নিষ্ঠা।

নিয়মং ব্যতিরেকেন যদ্ যৎ কর্ম্ম করোতি যঃ
ন তস্য ফল মাপ্নোতি উষরে বপনং যথা।

মরুভূমিতে বীজ বপন করিলে যেমন তাহাতে শস্য জন্মে না, তদ্রূপ নিয়ম ব্যতিরেকে কার্য্য করিলে ফল পাওয়া যায় না।

দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনের নামই নিষ্ঠা। নিষ্ঠা তিন প্রকার ১। সময় নিষ্ঠা। ২। নিয়ম নিষ্ঠা। ৩। কর্ত্তব্য নিষ্ঠা। নিষ্ঠা ভিন্ন মনুষ্য চরিত্র গঠিত হয় না। অমুক সময়ে অমুক কাজ করিতেই হইবে, এইটী সময় নিষ্ঠা। যেমন বৈশাখে বীজ বপন করিতে হইবে এই বীজ পৌষে কিংবা আষাঢ়ে বপন করিলে হইবে না, সময়ের একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম চাই। এই জন্য ঘড়ীর দরকার। কর্ত্তব্য মানবকে উন্নতির দিকে চালিত করে, একটী কার্য্য দিবসের কোন ভাগে সম্পন্ন করিলে কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইল না। কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকিলে যে কার্য্যই হউক না কেন তাহা সুসম্পন্ন হয় না। অদ্য এক সময়ে, কল্য অন্য সময়ে এইরূপে কর্ম্মের নির্দ্দিষ্ট সময় না থাকিলে নিয়ম প্রতিপালিত হইল না। প্রাচীনকালে ও পাশ্চাত্য ইউরোপেও সময় নিষ্ঠা প্রতিপালিত হইতে দেখা যায়। কিন্তু অধুনাতন সময়ে বঙ্গদেশে সময় নিষ্ঠার অত্যন্ত অভাব দৃষ্ট হয়। প্রাচীন ও প্রাচীনাদের মধ্যে আমার পিতামহী ঠাকুরাণীর কতকগুলি নিয়ম, দেখি—যেমন প্রাতে গোবরছড়া দেওয়া ফুলতোলা, মধ্যাহ্নে স্নান, পূজা আহ্নিক এই সকল নিয়ম আমরা কখনও ব্যতিক্রম হইতে দেখি নাই, ইঁহাদের জীবন হইতে এই সকল নিষ্ঠা আমাদের গ্রহণীয়।

বঙ্গদেশের কোন ভদ্র যুবক ইংলণ্ডে বিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য (বোধ হয় ব্যারিষ্টারী পরীক্ষা দিবার জন্য) গমন করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন ;—আমার ইংলণ্ডে অবস্থিতিকালে কোনও ইংরেজ ভদ্রলোক অপরাহ্ন ৮ ঘটিকার সময় আমাকে তাঁহার বাগান বাটীতে আহার করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন। বঙ্গদেশের রীতি অনুসারে নিমন্ত্রণের প্রায় ১ ঘণ্টা পূর্ব্বে আমি উক্ত বাগানে উপস্থিত হই এবং দেখি বাগান অন্ধকারময়, নিমন্ত্রণের কোন আয়োজন দেখিতে পাই না। এমন কি আলো পর্য্যন্তও নাই। শুনিয়াছি লণ্ডনে অনেক প্রতারক আছে, বোধ হয় কোন প্রতারক এইরূপ মিথ্যা নিমন্ত্রণ করিয়াছে ; এইরূপ মনে করিয়া নির্দ্দিষ্ট সময় পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলাম। নির্দ্দিষ্ট সময়ের ১৫ মিনিট পূর্ব্বে বাটীস্থ গৃহে আলোকমালা প্রজ্জলিত হইল, এবং সমস্ত দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল, ক্রমে টেবিল চেয়ার ও ভোজ্যপাত্র সকল আনীত হইতে লাগিল, এবং যথাসময়ে নিমন্ত্রিত ব্যক্তি সকল আসিতে লাগিলেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে সকলে আহার করিলাম। আমি ইংরেজের সময়নিষ্ঠা দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম।

এই ঘটনায় ইংরেজ জাতির সময়নিষ্ঠা পরিচয় পাওয়া যায়। আমাদের দেশে যদি কোন বক্তা ৪ ঘটিকার সময় বক্তৃতা করিবেন বলিয়া প্রকাশ হয়, কিন্তু তাঁহার বক্তৃতা আরম্ভ করিতে ৫।৬টা বাজিয়া যায়। সময় নিষ্ঠার অভাবই ইহার কারণ। আমাদের দেশে নিয়মনিষ্ঠার বড়ই অভাব। সকলেরই মনোযোগের সহিত নিষ্ঠা পালন করা কর্ত্তব্য। সময়-নিষ্ঠা না থাকিলে কার্য্য ক্রমে ক্ষীণ হইয়া অবশেষে বিলুপ্ত হয়। সুনিয়ম ও নির্দ্দিষ্ট সময় কার্য্য করিলে সময়ের অত্যন্ত লাঘব হয়, ইংরেজজাতি সুনিয়মের সহিত কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহারা এক জীবনে কত কার্য্য করিয়া থাকেন।

পৃথিবীর প্রায় সকল সাধু মহাজনের জীবনে এইরূপ নিষ্ঠা দেখা যায়। সাধু হরিদাস্ নিষ্ঠার সহিত প্রতিদিন তিন লক্ষ হরিনাম জপ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। যে কোন সাধু কার্য্যই হউক না কেন তাহা নিষ্ঠার সহিত পালন করিলে তাহা হইতে সুফল উৎপন্ন হয়।

নিবেদিকা—শ্রীভক্তিসুধা দেবী।
আশাকুটির টাঙ্গাইল।

হ্যালিবার্টন পত্নীর জীবনের পরীক্ষা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি।)

মিঃ টেট—দাঁড়াও মা, অত তাড়াতাড়ির দরকার নেই। আমি নিজের জন্যে ওটা চাচ্ছি না, আমার না হ'লেও চলবে। "তাহার পর তিনি পত্নীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিলেন" আজ একটী দৃশ্য দেখে প্রাণে বড় ব্যথা পেয়েছি। বিধবা গ্রেণের সেই মেয়েটী আবার বাড়ী ফিরে এসেছে। আমি তাদের সঙ্গে দেখা ক'রতে গিয়ে দেখি যে, মেয়েটী একখানি ছেঁড়া মাদুরের উপরে অনাহারে মুমূর্ষু অবস্থায় প'ড়ে আছে! তার মা বল্লে যে সে গতরাত্রে মরণাপন্ন অবস্থায় ফিরে এসেছিল। সেই হ'তে একটু ঠাণ্ডা জল ছাড়া আর কিছুই তার পেটে পড়ে নি। প্রথমে তাকে কিছু খাওয়াবার চেষ্টা ক'রেছিল, কিন্তু বেচারা কিছুই গিলতে পারে নি। সেই Beef tea টুকুতে এখন তার প্রাণ বাঁচতে পারে। জেন, সেইটুকু গরম ক'রে আন না।

কর্ত্রী বলিলেন, দেখ সে মেয়েটা বড়ই পাপিষ্ঠা, সে দয়া পাবার যোগ্য নয়।

ধর্ম্মযাজক দৃঢ়স্বরে বলিলেন, আহা! পাপ-পথবর্ত্তিনী ব'লেই তো তাকে আরো প্রাণপণে মৃত্যুর হাত হ'তে রক্ষা করা দরকার। ধার্ম্মিকেরা তো সর্ব্বদাই মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকেন। পাপীরা মৃত্যুকে ভয় করে। জেন, আর দেরি ক'রো না। সে টুকু একটী বোতলে পূরে গরম কর, আমি এখনি গিয়ে তাকে সে টুকু খাইয়ে আসব।

জেন বলিল, বাবা অন্য কোন খাবার জিনিস দিলে কি চ'লবে না? একটু ব্র্যাণ্ডি দিলে হবে না? Beef tea অতি

সামান্যই আছে, আর সে টুকু দিলে তুমি কি খাবে?

"থাক্, সে ভাবনার এখন দরকার নাই। আমার শীঘ্র সে টুক্ এনে দাও।

জেন দৌড়িয়া রান্না ঘরে যাইল। সেখানে পরিচারিকাকে বলিল,—সুসান, বাবা সেই বাকী Beef tea টুকু এখনই চান। তুমি শীঘ্র সেটুকু গরম ক'রে দাও, আমি একটী বোতল দেখে আনি। বাবা সেটুকু এখনই চ্যারিটি বুথকে দিয়ে আসবেন।

পরিচারিকা বলিল—"কি! সেই পাপিষ্ঠা আবার ফিরে এসেছে!" সকলেই বুথের দুশ্চরিত্রতার জন্য তাহার উপর অসন্তুষ্ট ছিল। দাসী আরো বলিল আহা! কর্ত্তার ভাগ্যে কোন জিনিস নির্ব্বিঘ্নে ভোগ হবার যো নেই! তিনিতো কখনও কোন জিনিস নিজের খাবার জন্যে তৈরি ক'রতে বলেন না; আর যদিবা কখনও কোন দিন তাঁর জন্যে কিছু তৈরি হয়, তা হ'লে তাঁর ভাগ্যে তা খাওয়া ঘটে উঠে না! সে দিন তাঁর সঙ্গে কোন না কোন গরীব লোকের দেখা হয়, আর কর্ত্তা মনে করেন তাঁর নিজের চেয়ে সেই লোকটার সেই জিনিসের বেশী দরকার। কাজেই সে জিনিস আর তাঁর মুখে ওঠে না। কেমন নয় কি না দিদি?

জেন সেই সময় একটী পরিষ্কার বোতল লইয়া আসিল। বোতলটীর অর্দ্ধসের আন্দাজ মাপ। জেন বলিল— এই বোতলেই যথেষ্ট হবে, কেমন না?

সুসান বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "এ বোতলে হবে না তো কি আবার আধমূণে বোতল চাই?" মনিবের নিজের ব্যবহারের জন্য প্রস্তুত কোন জিনিস কাহাকেও দিতে হইলে সুসান মনে মনে বড়ই বিরক্ত হইত। "ওমা! আর তো তিন পোয়াও নেই। দিদি এটুকু তাঁর নিজের খাওয়া উচিত।"

জেন পরিচারিকার দিকে তাহার প্রফুল্ল মুখখানি ফিরাইয়া বলিল –'দেখ সুসান, বাবার আমাদের হৃদয়টা বড় উঁচু। আমরা কেবল স্বার্থের কথা ভাবি, তিনি পরার্থে প্রাণটী সঁপে দিয়েছেন। মেরি কোথা গেল, সুসান?

"সে ঐ পেছনের ঘরে মার্গারেট দিদির কতকগুলি জিনিস পত্র গোছাচ্ছে। এই আগুনের মত রান্না ঘরটার চেয়ে ওঘরটা অনেক ঠাণ্ডা।"

জেন বোতল লইয়া তাহার পিতার হস্তে দিল। তাঁহাকে আজ বড়ই দুর্ব্বল ক্লান্ত এবং পাণ্ডুবর্ণ দেখাইতেছিল। তিনি ধীরে ধীরে চেয়ার হইতে উঠিলেন।

জেন বলিল—বাবা, আজ তোমার চেহারা বড় খারাপ মনে হচ্চে। আমি তোমার জন্যে একটী ডিম ভেঙ্গে নিয়ে আসি। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি এখনি এনে দিচ্ছি।"

"না মা, ততক্ষণ আর আমি দেরি ক'রতে পারব না। তা ছাড়া এখন আমি কিছুই খেতে পারব না। সত্যিই মা আজ শরীরটে বড় খারাপ বোধ হচ্ছে।"

"বাবা, তবে তুমি এ টুকু নিজে খেয়ে

গেল। এ তো তোমারই জন্যে করা হয়েছিল।" জেন "তোমারই" কথাটীর উপর বিশেষ জোর দিয়া বলিল।

মিঃ টেট কন্যার মস্তকোপরি আপনার দুর্ব্বল হস্ত স্থাপন করিয়া বলিলেন—"মা, যদি আমি পরের কষ্ট না ভাবিয়া সারা-জীবন কেবল নিজের সুখ দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত থাকি, তাহা হইলে প্রভুর আদেশ পালন করা হয় কই মা?"

জেন আর কিছু না বলিয়া তাড়াতাড়ি সম্মুখের দরজাটী খুলিয়া দিল, সে তাহার পিতাকে আজ দরজা খোলার কষ্টটুকু হইতেও বাঁচাইতে চায়! জেন বাস্তবিকই "কন্যারত্ন"। ধর্ম্ম-যাজক সেই মুহূর্ত্তে সম্ভবতঃ জেনের স্বর্গীয় স্নেহ মমতা হৃদয়ে উপলব্ধি করিয়াই বলিলেন—"মা, ভগবান্ তোমাকে আশীর্ব্বাদ করুন।" এই বলিয়া তিনি বাহির হইয়া গেলেন।

জেন এক দৃষ্টে পিতার পানে চাহিয়া রহিল, সে তাঁহাকে তাহাদের বাটীর সম্মুখস্থ উদ্যানটী পার হইয়া যাইতে দেখিল। তাহার পর আর যখন তাঁহাকে দেখা গেল না, তখন সে ধীরে ধীরে মায়ের কাছে ফিরিয়া আসিল। জেন বলিল—বাবা একটুও সময় নষ্ট ক'রতে চান না। পাছে দেরি হ'লে বৃথের কোন অনিষ্ট হয় তাই তিনি কত তাড়া-তাড়ি চলছেন।"

জেনের মাতাও তাঁহাকে জানালা হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন—"ওকে আর চলা বলে না ওতো রীতিমত দৌড়ন! কিন্তু বাছা আমি খুব ব'লতে পারি উনি সেই পাপিষ্ঠা বৃথের কখনও মতিগতি ফেরাতে পারবেন না।"

ইহার পর প্রায় ১ ঘণ্টা অতীত হইয়া গেল, প্রায় আহারের সময় হইয়া আসিল। জেন এবং টেট গৃহিণী পূর্ব্ববৎ আপনাদের কার্য্য লইয়া অত্যন্ত ব্যস্ত ছিলেন; এমন সময় মিঃ হ্যালিবার্টন আসিয়া দরজায় ঘা দিলেন।

জেন বলিল,—"আজ খুব সকাল সকাল বাড়ী ফিরেছ দেখছি।"

মিঃ হ্যালিবার্টন অত্যন্ত ব্যস্ততার সহিত সবেগে উপরতলায় উঠিলেন, এবং বৈঠকখানার দরজা খুলিয়া তাহার ভিতরে প্রবেশ করিলেন। টেটগৃহিণী দরজার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়াছিলেন, সুতরাং তিনি হ্যালিবর্টনের মুখ দেখিতে পাইলেন না। জেন তাঁহার মুখ দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইল। সে দেখিল তাঁহার মুখখানি একেবারে বিবর্ণ হইয়া গিয়াছে।

জেন বলিল—"তোমার কি কোন অসুখ হ'য়েছে?" হ্যালিবার্টন প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া বলিলেন—"অসুখ! আমার অসুখ! না আমার কোন অসুখ হয় নি, আমি তোমার সঙ্গে আড়ালে দু চারিটী কথা বলতে চাই।"

জেনের প্রশ্ন শুনিয়া তাহার মাতা মুখ ফিরাইলেন, কিন্তু তখন হ্যালিবার্টন ঘর হইতে বাহির হইয়া গিয়াছেন। জেনও তাড়াতাড়ি বাহির হইয়া গেল।

হ্যালিবার্টন কোন কথা বলিলেন না, শুধু নীরবে জেনের হাত ধরিয়া আপনা-

দের ঘরে তাহাকে লইয়া গেলেন এবং ভিতর হইতে দরজা বন্ধ করিলেন। জেন ভয়ে ও ভাবনায় অত্যন্ত কাতর হইয়া উঠিল।

তখন হ্যালিবার্টন বলিলেন,—জেন প্রিয়তমে, আজ তোমাকে এরূপ ভাবে ভীত করিয়া তুলিতে চাহি নাই। আমি জানিতাম তোমার হৃদয় খুব সবল। আমি ভেবেছিলাম যদি আমাকে একটী অশুভ সংবাদ দিতে হয়, তবে সর্ব্বাগে উহা তোমাকেই জানান উচিত। বাড়ীর অন্যান্য সকলকে সে সংবাদ জানান বিষয়ে তুমি আমাকে সাহায্য করিতে পার।"

জেন আরো ব্যাকুল হইয়া উঠিল। সে একান্ত ব্যগ্র হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—"তুমি শীঘ্র বল কি হ'য়েছে।"

হ্যালিবার্টন গম্ভীরস্বরে বলিলেন,—"তোমাকে সে সংবাদ দিবার পূর্ব্বে তুমি তোমার মনকে সুস্থির কর।"

"তোমার নিজের তো কোন দুর্ঘটনা নয়? তুমি তো পীড়িত হও নি?"

এ প্রশ্নটী একরূপ নিরর্থক ছিল, কারণ হ্যালিবার্টনকে দেখিয়া তাঁহাকে অসুস্থ মনে হইতেছিল না, তবে তাঁহাকে অত্যন্ত চঞ্চল ও ব্যাকুল দেখাইতেছিল।

জেন ভীত ও কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। প্রকৃত ঘটনা যে কি তাহার আভাষ পর্য্যন্ত তাহার মনে উদিত হইল না। সে পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকটা স্থিরভাবে বলিল, "আমার মাথার দিব্বি, আর তুমি দেরি করো না, যা হয়েছে তুমি এখনই সব খুলে বল। সত্য যতই কঠোর হউক, সহ্য হয়, কিন্তু অনিশ্চয়তার উদ্বেগ অসহ্য।"

"এই যে আমি দেখছি তোমার মন এরই মধ্যে অনেকটা সুস্থির ও সবল হয়েছে! আজ আমি দেখতে চাই যে আমার সহধর্ম্মিণী একটী ভীরু বালিকা নহে কিন্তু একটী বীর-হৃদয়া রমণী। দেখ আমি কি অপদার্থ! আমি তোমাকে ভীত না করিয়া সকল কথা শান্তভাবে বলিতে চাহিয়াছিলাম কিন্তু আমি করিলাম কি? আমি তোমাকে আশঙ্কা এবং দুর্ভাবনায় একেবারে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছি।"

জেন ঈষৎ ম্লানহাসি হাসিল। সে বুঝিতে পারিল এ সমস্ত বাগাড়ম্বর কেবল ভাবী দারুণ দুঃসংবাদের পূর্ব্বাভাস মাত্র। সে বহুকষ্টে চিত্তকে শান্ত ও সংযত করিল।

তখন হ্যালিবার্টন বলিলেন যাঁহাকে তুমি এবং আমি উভয়ে অত্যন্ত ভালবাসি, এমন একজনের আজ একটী আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে।

জেনের এইবার আর বুঝিতে বাকী থাকিল না। তাহার স্বামী ভিন্ন তাহার পিতার ন্যায় সে আর কাহাকেও ভালবাসিত না।

সে বলিল—"তবে কি বাবার কিছু হয়েছে?"

'হাঁ জেন, চল আমরা দুজনে গিয়া মাকে এ সংবাদ জানাই।"

জেনের হৃদয় সবেগে স্পন্দিত হইতে লাগিল। তাহার মুখমণ্ডল পুনর্ব্বার পাংশুবর্ণ ধারণ করিল কিন্তু সে প্রাণপণে

ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

জেন বলিল—"বাবার মৃত্যু হয় নাই তো?"

প্রকৃতপক্ষে মিঃ টেট তাহাদিগকে চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু হ্যালিবার্টন সহসা স্পষ্টাক্ষরে সে সংবাদ জেনকে দিতে পারিলেন না। তিনি দুর্ঘটনার আনুসঙ্গিক ব্যাপার সকল বর্ণনা করিতে লাগিলেন।

"জেন, তিনি হাতে একটী ছোট বোতল লইয়া দ্রুতবেগে চলিতেছিলেন। আমি নিশ্চয় বল'তে পারি সেই বোতলে কোন অসহায় দুঃখীজনের কিছু আহারীয় সামগ্রী ছিল, কারণ তিনি গরীবদের পল্লী মধ্যেই অগ্রসর হইতেছিলেন। সহসা তিনি পড়িয়া গেলেন, লোকেরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে উঠাইয়া একজন ডাক্তারের বাড়ী লইয়া গেল। দুর্ভাগ্যবশতঃ সে সময় ডাক্তার বাড়ীতে উপস্থিত ছিলেন না, সুতরাং তাহারা তাঁহাকে অন্য একজন ডাক্তারের বাড়ী লইয়া গেল। কিন্তু এইরূপে যথেষ্ট সময় নষ্ট হইয়া গেল। তিনি তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান অবস্থায় ছিলেন।"

"কিন্তু তুমি এখনও আমাকে ব'লছ না কেন—তিনি কি মারা গেছেন?"

মিঃ হ্যালিবার্টন ভাবিলেন—সত্য জ্ঞাপন করিতে বিলম্ব করায় আর ফল কি? তিনি বুঝিতে পারিলেন এ সংবাদ যেরূপ ধীরভাবে তাঁহার প্রকাশ করা উচিত ছিল তিনি সেরূপভাবে তাহা করিতে পারিলেন না। তখন তিনি মৃদুস্বরে বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন—"জেন, জেন, আর কি বলিব? আশা করি আমা অপেক্ষা তুমি অনাকুলিত চিত্তে ভগবানের এই পরীক্ষা মাথায় তুলিয়া লইবে।"

শোকের সেই ভয়াবহ প্রথম মুহূর্ত্তে জেনের চক্ষু দিয়া এক ফোঁটা জলও পড়িল না। এরূপ শোক জগতে আছে যাহা অশ্রুবারিকে উপেক্ষা করিয়া হৃদয়ের অন্তস্তল পর্য্যন্ত দগ্ধ করিয়া তোলে। জেন বলিল—"মাকে আমি কেমন ক'রে এ সংবাদ দেব?"

টেট-গৃহিণীকে অবিলম্বে এ সংবাদ দেওয়া কিন্তু একান্ত আবশ্যক। ঠিক সেই সময়ে মিঃ টেটের মৃতদেহ তাঁহাদের বাড়ীতে আনীত হইতেছিল। যখন লোকেরা মিঃ টেটকে দ্বিতীয় ডাক্তারের বাড়ী লইয়া গিয়া ডাক্তারখানার চতুর্দ্দিকে ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছিল, ঘটনাক্রমে হ্যালিবার্টনও সেই সময় সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কতকগুলি লোক বলিয়া উঠিল—"মহাশয়, ধর্ম্মযাজক সহসা মূর্চ্ছাপন্ন হয়েছেন।" তিনি বলিলেন—ধর্ম্মযাজক! কে—মিঃ টেট?

"হাঁ মহাশয়, তিনিই।"

তখন হ্যালিবার্টন দ্রুতগতি ডাক্তারের বাড়ীতে লোকের ভিড় সরাইয়া প্রবেশ করিলেন। ডাক্তারের পরীক্ষা সেইমাত্র শেষ হইয়াছিল।

ডাক্তার তাঁহাকে বলিলেন—"হৃদ্‌রোগ যে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।"

"মারা যান নি তো?"

"সম্পূর্ণ মৃত। পতনের সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।"

বাহিরে সমবেত জনমণ্ডলীর কর্ণে শীঘ্রই এ সংবাদ পৌঁছিল। হ্যালিবার্টন বলিলেন—আমি পূর্ব্ব হইতে যাইয়া পরিবারের লোকদিগকে এ অশুভ সংবাদের জন্য প্রস্তুত করি, আমাকে ১৫ মিনিট অগ্রে যাইতে দাও, তাহার পর তোমরা মৃতদেহ লইয়া আসিবে।

সুতরাং ১৫ মিনিটের মধ্যে তাঁহাকে সমস্ত ঠিক করিতে হইবে। সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার স্ত্রীর কথা তাঁহার মনে হইল। তিনি জানিতেন যে যদিও জেনের বয়স অল্প, তথাপি জেন তাহার মাতা অপেক্ষা শান্ত ও ধীর-বুদ্ধি। তিনি বাটীর দিকে অগ্রসর হইতে হইতে কেমন করিয়া এ সংবাদ প্রকাশ করিবেন সেই কথা মনে মনে স্থির করিয়া লইতেছিলেন। তাঁহার কর্ত্তব্য তিনি সুন্দররূপে সম্পন্ন করিতে পারিতেন কিন্তু তাঁহার মুখখানি এমনি সরল স্বাভাবিকতাপূর্ণ ছিল যে লোকে তাঁহার মুখ দর্শনে তাহার হৃদয়ের ভাব সম্পূর্ণ পড়িয়া লইত। তিনি মৃদুস্বরে বলিলেন "জেন, প্রিয়তমে, এখন ইহাই তোমার চিরন্তন সান্ত্বনা হোক তোমার পিতা যাইতে সম্পূর্ণ প্রস্তুত ছিলেন।

জেনের গণ্ডস্থল বহিয়া অশ্রুবারি প্রবলবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল। সে অশ্রুপূর্ণ নয়নে উত্তর করিল—"হাঁ, আমার হৃদয়ে সম্পূর্ণ সে বিশ্বাস আছে। যদি এ জগতে থেকে কেউ কখনও স্বর্গের জন্য প্রস্তুত হ'য়ে থাকেন তবে তিনি আমার পিতা। হৃদয়ের রক্ত দিয়ে তিনি ভগবানের আশীর্ব্বাদ উপার্জ্জন ক'রেছেন; সুখ দুঃখকে ভগবানের দান জেনে অবিচলিত চিত্তে মাথায় তুলে নিয়েছেন—তিনিই যথার্থ প্রাণ দিয়ে অনন্ত প্রাণকে লাভ ক'রেছেন।

হ্যালিবার্টন বলিলেন—"ঐ শোন!" নীচে শব্দ শুনা যাইতেছিল অনেকগুলি লোক অনুচ্চকণ্ঠে কথা কহিতেছিল। হ্যালিবার্টন বুঝিতে পারিলেন যে লোকেরা সংবাদ লইয়া তাঁহাদের গৃহদ্বারে উপস্থিত হইয়াছে এবং সেই মুহূর্ত্তে দুইটী পরিচারিকাকে এই নিদারুণ শোক-সংবাদ জ্ঞাপন করিতেছে।

"জেন, আর ক্ষণমাত্রও বিলম্ব করা উচিত নয়।"

কেমন করিয়া যে জেন সেই সময় আপনার চক্ষের জল মুছিয়া তাহার হৃদয়ের শোকাবেগকে প্রশমিত করিয়া লইল, তাহা সে নিজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। একটী পরিস্ফুট কর্ত্তব্য জ্ঞান তাহার হৃদয়ে প্রবলবেগে জাগিয়া উঠিল, এবং সে তখন বুঝিতে পারিল যে ইহা তাহার রোদনের সময় নহে, এ সময় তাহাকে পাষাণে বুক বাঁধিয়া তাহার চির-দুঃখিনী জননীকে সান্ত্বনা দিতে হইবে ইহাই তাহার বর্ত্তমানে পবিত্রতম কর্ত্তব্য। জেন এবং হ্যালিবার্টন একত্রে বসিবার ঘরে প্রবেশ করিল এবং সেই সময় টেট-গৃহিণী সস্মিত-বদনে হ্যালিবার্টনের দিকে চাহিয়া বলিলেন।—

"তোমাদের দুজনের মধ্যে এতক্ষণ পর্য্যন্ত কি গোপনীয় পরামর্শ চ'লছিল ?" কিন্তু পরক্ষণেই জেনের বিষণ্ণ মুখখানি দেখিয়াই তাঁহার অন্তরাত্মা কাঁপিয়া উঠিল "জেন, বল বল কি হ'য়েছে! বল কি সর্ব্বনাশের কথা তোমরা দুজনে মিলে আমাকে শোনাতে এসেছ।"

জেন সস্নেহে হৃদয়াবেগে জননীকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, তাহার গণ্ডস্থল বহিয়া অবিরল অশ্রুধারা পড়িতে লাগিল। সে ভগ্নকণ্ঠে মর্ম্মভেদী স্বরে বলিল—"মা, এখন হ'তে তুমি আমাদের উপর নির্ভর কর'তে বাধ্য হ'লে। আজ হ'তে তোমার অযোগ্য সন্তানদের উপর তোমার সকল ভার প'ড়লো। যে মহৎ আশ্রয় অবলম্বন ক'রে তুমি এতদিন কুশলে ও কল্যাণে বাস ক'রছিলে, মা, সে আশ্রয় আজ আমাদের ছেড়ে অশোক অমরধামে প্রস্থান ক'রেছেন।"

ক্রমশঃ।

শিক্ষিতা মহিলাগণ ও সভ্যতা।

সভ্যতার মূল জ্ঞান। জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সভ্যতার শ্রীবৃদ্ধি হইয়া থাকে। পৃথিবীর যে প্রদেশে জ্ঞানরবির কিরণজাল পতিত না হয় সে প্রদেশ সভ্যতার ধারও ধারে না। অসভ্যাবস্থায়ও মনুষ্যগণ স্বাধীনতা উপভোগ করে। স্বাধীনতা বা যথেচ্ছাচারিতা থাকিলেও সভ্যতা না থাকিতে পারে। অথচ স্বাধীনতাও সভ্যতার প্রধান উপাদান বটে।

ভারতভূমিতে সর্ব্বাগ্রে জ্ঞানসূর্য্য সমুদিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে এই কারণে সভ্যতার প্রথম বিকাশ দেখা গিয়াছে। ভারতের জ্ঞান সভ্যতা পূর্ব্বে চীন জাপান এবং পশ্চিমে আরব ও মিশর দেশে প্রসারিত হইয়াছিল। কালের কুটিলগতিতে ভারতের জ্ঞানরবি কুসংস্কার ও অজ্ঞানতার রাহুগ্রাসে পতিত হইল। ইউরোপের প্রতীচ্যভূমি নবীনতর জ্ঞান সভ্যতার দিব্যালোকে উদ্ভাসিত হইল। অধুনা পুরাতন সভ্যতা ও জ্ঞানের লীলাভূমি ভারতে প্রতীচ্যজ্ঞান ও সভ্যতা স্বীয় অধিকার বিস্তার করিতেছে। প্রতীচ্য সভ্যতার নবচাক্‌চিক্যে বিমোহিত হইয়া অনেক নরনারী প্রাচ্যসভ্যতার গৌরব ও মহিমা বিস্মৃতি সলিলে নিমজ্জমান করিতেছে। ইউরোপের অনেক সভ্য-ভব্য লোক ভারতবাসীকে অসভ্য বর্ব্বরাদি নামে অভিহিত করিতে এখন কিছুমাত্র সঙ্কোচিত হন না। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে পড়িয়া পূর্ব্বদেশীয় অনেক লোকের চক্ষে খুবই ধাঁধাঁ লাগিয়াছিল। পশ্চিমের সকলই ভাল, পূর্ব্বের সকলই যেন কুৎসিৎবর্জ্জনীয় এরূপ ধারণাও জন্মিতেছিল। ঈশ্বরাশীর্ব্বাদে সে ভাবের কথঞ্চিৎ তিরোভাব আরম্ভ হইয়াছে। তবে শিক্ষিতা মহিলাকুলে অদ্যাপি প্রতীচ্য ও প্রাচ্য সভ্যতার কোথায় বিভিন্নতা এবং প্রাচ্য সভ্যতার কোন্ ভাগ গ্রহণীয় কোন্ কোন্ দিক বর্জ্জনীয় এবিষয়ে বিচার আলো

কি না তাহা আমরা জানি না। এ কারণে প্রতীচ্য ও প্রাচ্যসভ্যতা বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক বোধ করি। মহিলাবৃন্দ এবিষয়ে প্রণিধান করিলে আমাদের উদ্দেশ্য সফল হইবে।

মনুষ্য আহার পান বিশ্রাম ও জনসঙ্গ ভিন্ন জীবনধারণে সক্ষম নহে। সুতরাং তুমি সভ্য বা অসভ্য থাক, উভয়াবস্থাতেই উল্লিখিত কয়টি বিষয় দৈনন্দিন প্রয়োজন। ক্ষুৎপিপাসা নিবৃত্তি ও নিদ্রা বিশ্রাম এবং অন্য লোকের সাহায্য সকলেরই প্রয়োজন।

অসভ্যাবস্থায়ও মানবজাতি একাকী নিভৃতস্থানে বাস করে না। তরু কোটরে বা গিরিগহ্বরে থাকিতে হইলেও কয়েকজন এক সঙ্গে স্থিতি করে। এ প্রকার আসঙ্গলিপ্সা হইতে পরিবার সংসার, গ্রাম, নগর ও দেশ সকল মনুষ্যসমূহের আবাসস্থান হইয়াছে। নানা প্রকার স্থপতিবিদ্যা ও ভাস্করবিদ্যার উন্নতিসাধনপূর্ব্বক মনুষ্যগণ গ্রাম ও নগরাদির শোভা সৌন্দর্য্য-সাধনে কত কৌশল প্রকাশ করিতেছে।

যথেচ্ছা আহারে মনুষ্যের শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যরক্ষা পায় না। এ জন্য বস্তু বিচার ও প্রাণীবিদ্যা আলোচিত হইয়াছে। আহার্য্য বস্তু বিষয়ক, পরিপাক প্রণালী বিষয়ক, শারীরতত্ত্ব, চিকিৎসাতত্ত্ব বিষয়ক জ্ঞানে মনুষ্যজাতিকে জ্ঞানী হইতে হইয়াছে।

যাহারা গৃহিণী বা জননী হইয়া ঘরে ঘরে মনুষ্যশিশু পালন করেন, তাঁহাদিগকেও কিয়ৎপরিমাণে ঐ সকল বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রয়োজন হইতেছে।

আকাশে ভূতলে যাহা কিছু সৃষ্ট পদার্থ বিদ্যমান তৎসমুদায়ই মনুষ্যের জীবিকানির্ব্বাহের উপাদান। সুতরাং প্রত্যেক প্রাকৃতিক পদার্থ বিষয়ে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা আমাদিগের অতি আবশ্যক। অসভ্যগণ স্ব স্ব জীবনের উপযোগীতা চিন্তায় অশক্ত। তাহাদের জ্ঞানরাজ্যেও গতি নাই। যাহারা বিন্দুমাত্র জীবনের মূল্য অবগত হইয়াছে তাহারাই প্রকৃতির অনন্তভাণ্ডারে প্রবেশপূর্ব্বক জ্ঞান সঞ্চয়ে একান্ত চিত্ত হইতেছে।

যখন ভারতবর্ষের সেই সভ্যতার উন্মেষকাল তখনই এখানে খণিজ বিদ্যা, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, আয়ুর্ব্বিদ্যা ও সমাজতত্ত্বাদি বিষয়ে গবেষণার আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু অধ্যাত্মবিদ্যার অতিরিক্ত আলোচনা নিবন্ধন বহির্বিষয়ে বীতরাগ ঘটিয়াছিল। জীবনের শ্রেষ্ঠতর সম্ভোগ অধ্যাত্মলোকে-পরমাত্মাযোগে, এটি ভারতীয় সমাজনেতা ঋষিচিত্তে প্রবলরূপে প্রকটিত হওয়া প্রযুক্ত তাঁহারা বিস্তৃত মানব সমাজকে জ্ঞান বিজ্ঞানে সমধিক আকৃষ্ট করিয়া যাইতে পারেন নাই।

প্রাকৃতিক জগতে মনুষ্যের কত যে আধিপত্য তাহা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধনে পাশ্চাত্য জাতি যত অবগত হইয়াছে, প্রাচ্য জাতি তাহার তুলনায় অত্যন্ত অনভিজ্ঞ বলিলেও কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

প্রাচ্য সভ্যতার প্রভাবে সমস্ত মনুষ্য-

জাতির বহির্বিষয়ক আবশ্যকতা সাধ্যানুসারে ন্যূনতা সাধিত হইয়াছিল। প্রাচ্য সভ্যতার মূল সূত্র এই দেখা যায় যে, অভাবের অভাব হইলে দারিদ্র্যেরও অভাব ঘটিবে। অতএব যতদূর সম্ভব অল্প পরিমাণ বস্তুজাত আহরণেই যেন জীবনযাত্রা স্বচ্ছন্দভাবে যাপিত হইতে পারে তাহার চেষ্টা প্রাচ্য সভ্যতার লক্ষ্য ছিল। প্রাচ্য সভ্যতার অপর সূত্র এই যে, সকলের সহিত সাম্যাবস্থা লাভ, একারণে এদেশে (বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে দেখা যায়) রাজা, প্রজা, জ্ঞানী, মূর্খ, পদস্থ ও পদমর্য্যাদাহীন সকলেই এক প্রকার সমানভাবে সাংসারিক বিষয় প্রায়শঃ ভোগ করিয়া থাকেন। আহার পরিধেয় বিষয়ে উন্নত ও অবনত শ্রেণী মধ্যে সাধারণতঃ সামান্য ইতরবিশেষমাত্র পরিলক্ষিত হয়। এতদ্দেশীয় জল বায়ুর প্রভাবও এ বিষয়ে বিশেষ সহায়। নাতিশীতোষ্ণ দেশে ঐ অবস্থা স্বভাবতঃ ঘটিয়া থাকে।

ভারতবর্ষে ধর্ম্ম ও নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য বহুসংখ্যক মহাজন যুগে যুগে আবির্ভূত হইয়াছেন। বুদ্ধদেব, শ্রীচৈতন্য, নানক কবির, শঙ্কর রামানুজ প্রভৃতি মহাত্মাগণ ভারতের জ্ঞানীদিগকে যেমন আপন আপন সঙ্গ দান করিয়াছেন, তেমন মূর্খ অজ্ঞান আপামর সাধারণকেও সঙ্গ দিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সঙ্গ প্রভাবে এ দেশে অজ্ঞান নিম্নশ্রেণীতে যে ধর্ম্মজ্ঞান ও নীতিচরিত্র শান্তভাব প্রতিষ্ঠিত, সভ্যতাভিমানী পাশ্চাত্য কোন দেশেরও নিম্নশ্রেণীর লোক মধ্যে সেরূপ অবস্থা নহে। এ দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোক অপর সভ্য দেশীয় নিম্নশ্রেণীর তুলনায় দেবতা বলিলে কি বড়ই অত্যুক্তি হয়? জ্ঞানী পাঠক পাঠিকাগণ বিচার করুন।

বর্ত্তমান সময়ে ব্রাহ্মধর্ম্মের মহাত্মাগণ এ দেশীয় নিম্নশ্রেণীতে পূর্ব্বগত মহাজনদিগের ন্যায় তাঁহাদের সঙ্গ দিয়া যাইতে পারেন নাই। এ দেশীয় নিম্নশ্রেণীর লোকেরা এ জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম কিছুই বুঝিতে পারে না। যাহারা বর্ত্তমান সময়ে উন্নত ধর্ম্মালোক লাভ করিয়াছেন, সেই নরনারীগণ এ বিষয়ে দায়ী রহিয়াছেন।

এ দেশীয় নিরক্ষর চাষার সহিত আলাপ কর দেখিবে যে, সে এ দেশে প্রচলিত উন্নত অদ্বৈতবাদ হইতে ভক্তির অমৃতময় ধর্ম্ম পর্য্যন্ত বিলক্ষণ বুঝিতে পারে। এ দেশের গৃহস্থ মহিলাগণ অনেকে ধর্ম্ম ও নীতির সাক্ষাৎ আধার বা পাত্র স্বরূপ। পুরাতন ধর্ম্ম ও নীতি মহিলাগণ কর্ত্তৃকই সমাজে অদ্যাপি সংরক্ষিত হইতেছে।

পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রধান গৌরব জ্ঞানে ইতর ভদ্র সকলের সমানাধিকার। কি বিজ্ঞান কিবা ধর্ম্মজ্ঞান উচ্চবংশ নীচবংশ নির্ব্বিশেষে সকলেরই শিক্ষণীয়। এ দেশে বেদে শূদ্র ও নারীর অধিকার নাই। দ্রোণাচার্য্যের নিকটও সেই ব্যাধপুত্র বাণবিদ্যা শিক্ষা করিতে পারেন নাই। মনুষ্য হইয়া মনুষ্যকে যে দেশে এরূপে ঘৃণা করিতে অধিকার পায়, সে দেশ ব্রহ্মশাপে অধোগতি প্রাপ্ত হইয়া

থাকে। ব্রাহ্মধর্ম্মের দোহাই দিয়া বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানিগণ যতই উদারতার পক্ষপাত না করুন, অদ্যাবধি অনেকের অন্তরে জাত্যভিমান এবং নীচ জাতি ও নারীজাতির প্রতি অবজ্ঞা বিরাজ করিতেছে। মহিলাগণ ইহা লক্ষ্য করুন, শিক্ষিতাগণ এ পাপ ত্যাগ করিতে বদ্ধপরিকর হউন।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গৃহে বাস সভ্যতার অঙ্গ। অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্নতা, গৃহপরিবার সমাজ হইতে দূর করা সভ্যতার উদ্দেশ্য।

জ্ঞান বিজ্ঞান নরনারী নির্ব্বিশেষে সকলেরই শিক্ষণীয় ও আদরণীয়। কিন্তু জ্ঞানের অভিমান সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়। অধিকাংশ অজ্ঞান লোকমধ্যে দুই চারিজন জ্ঞানালোক পাইলে অহঙ্কার বৃদ্ধি হইতে পারে। কিন্তু প্রতিবেশীদিগের অজ্ঞানতা দূরীকরণার্থ জ্ঞান লব্ধ হইয়াছে, এ প্রতীতি অন্তরে স্থান দিলে কাহারও শূন্যগর্ব্ব অহঙ্কার দ্বারা বিকৃত হওয়ার আশঙ্কা থাকে না।

সভ্যতারূপ কিরীট মস্তকে ধারণ করিলে নরনারীকে মনুষ্যজাতির দাসত্ব গ্রহণ করিতে হয়। গৃহের কর্ত্রী এবং দাসী হওয়া যেমন এক, সমাজ মধ্যে সভ্য ভব্য হইয়া বাস করা এবং সকলের সেবিকা হওয়াও এক, জ্ঞানে অনুরক্ত প্রীতিতে কোমল নীতিতে দৃঢ় এবং লোকসেবাব্রতে তৎপর ব্যক্তিই প্রকৃত সভ্য নামের যোগ্য। মহিলাগণ কি সভ্যতার এ প্রকার লক্ষ্য কল্পনা করেন না?

ব্যক্তিগত উন্নতিসাধনে যাহারা তৎপর তাহারা সভ্যতার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারে না। সভ্যতা জনসমাজের সমবেত উন্নতির জন্য প্রতিষ্ঠিত। ভারতে ঋষিযুগে ব্যক্তিগত উন্নতির প্রবৃত্তি বলবতী হইয়াছিল। তৎপর ভারতবর্ষে বহু পরিবর্ত্তন সঙ্ঘটিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যক্তিগত ভাব ভারতীয় জনসমূহের অস্থিগত প্রায় পরিলক্ষিত হয়। এই কারণে ভারতীয় জনসমাজে জাতীয়তা নাই। কোন বিষয়ে সমবেত চেষ্টা করিতে হইলে ব্যক্তিগত স্বার্থ বুদ্ধি তাহার প্রতিকূলতা সাধন করে। শিক্ষা দীক্ষা সাধন উন্নতি অবনতি এখানে প্রায় সকলই ব্যক্তিগত। আপনার সুখের নিকট বা সুবিধার নিকট অন্যের সুখ সুবিধা অবজ্ঞেয় হইয়া পড়ে। এ সমদায় মারাত্মক লক্ষণ পাশ্চাত্যসভ্যতা সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বাসিত করিয়া দিয়াছে। ভারতীয় জনসমাজ যদি পৃথিবীর অপর দেশীয় জনসমাজের সহিত নূতন সভ্যতার আদর্শে সমুন্নত হইতে অভিলাষ করে, তবে উক্তবিধ স্বার্থ-বুদ্ধি এবং সঙ্কীর্ণতা সম্পূর্ণরূপ দূর করিতে হইবে। মহিলাগণ যদি এবিষয়ে প্রণিধান না করেন, মহিলাদিগের অন্তঃকরণে যদি সমবেতভাবে জাতীয় উন্নতির বীজ রোপিত না হয়, ভারতের প্রকৃত উন্নতি ও সভ্যতা বিস্তারের আশা অল্প।

মন্ত্রগুপ্তি, ঔষধগুপ্তি, শিল্পগুপ্তি ভারতবর্ষের সমুদায় প্রদেশেই দেখিতে পাওয়া যায়। জ্ঞানকে যে দেশে গোপন করিবার প্রয়াস, অন্ধকার সে দেশকে অবশ্য গ্রাস

করিবে। দীপ জ্বালিয়া করণ্ডিকাতলে রাখিলে ঘরত অন্ধকার অবশ্য হইবে। আমি যাহা জানিয়াছি, সকলকে তাহা জানাইব। আমা অপেক্ষা সকলে যাহাতে শ্রেষ্ঠ হয় সর্ব্বপ্রযত্নে আমি তাহাই করিব, এ সঙ্কল্প যদি মহিলাদিগের মধ্যে সঞ্চারিত হয় তবে ভারতের রন্ধ্রগত অসভ্যতার বীজ দূর হইতে পারে।

রাবণের মৃত্যুবাণ যেমন রাবণের গৃহেই ছিল; তেমন প্রথম সভ্যতাপ্রাপ্ত ভারতের গৃহে ঘোর অসভ্যতারূপ স্বার্থ-বুদ্ধি স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিল। সেই কারণে ভারত অনেক অসভ্যজাতির নিকটও পরাজিত হইয়াছে। মহিলাগণ অধুনাতন কালে নানাদেশের ইতিহাস অধ্যয়নি করিতেছেন, ভারতের অধঃপাতের কারণ কি তাঁহারা সন্ধান করিবেন না?

নারীগণ অলঙ্কার পরিয়া যেমন ধনগর্ব্ব প্রকাশ করেন, জ্ঞান-রত্নে মণ্ডিত হইয়া যদি সেইরূপ জ্ঞানগর্ব্বে গর্ব্বিতা হয়েন তবে ইহা ক্ষোভ ও দুঃখের সমূহ কারণ বর্ত্তিল। তাঁহারা জ্ঞানের দ্বারা সভ্য না হইয়া আরও অসভ্যতাতে আচ্ছন্ন হইলেন। জ্ঞান এবং চক্ষু উভয়ই এক। চক্ষুষ্মান ব্যক্তি চারিদিকের প্রকৃত অবস্থা সন্দর্শন করে। জ্ঞানলাভে নরনারীর স্বীয় দেশের ও সমাজের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত থাকা স্বাভাবিক। দেশের ও সমাজের অভাব দেখিয়া যদি তদ্বিমোচনে যত্ন না জন্মে তবে জ্ঞানলাভের সার্থকতা কি? সেরূপ অভাব মোচনে যাহারা শক্তি-প্রয়োগ না করে, তাহারাই আপন জ্ঞানের গরিমাতে অন্ধ হইয়া পড়ে। মহিলাগণ জ্ঞানলাভে যদি স্বদেশীয় মূর্খতা জালে জড়িত ভগিনীদিগের সেবাতে আত্ম-সমর্পণ করিতে পারেন তবেই ভারত ধন্য মানিতে পারে।

ইউরোপাদি দেশে ডোরা, নাইটিঙ্গেল, কার্পেণ্টার, কব প্রভৃতি শ্রদ্ধেয়া কুমারীগণ আজীবন নানা প্রকারে জনসমাজের সেবা করিয়া জ্ঞানের সার্থকতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। পরসেবা বা নরসেবা যদি জীবনের ব্রত না হয় তবে জীবন যৌবন জ্ঞান শক্তি সকলই নিষ্ফল।

পাশ্চাত্য সভ্য-দেশবাসিগণ এদেশের সঙ্কীর্ণতা এবং স্বার্থান্ধতা দেখিয়া যদি এদেশকে অসভ্য বর্ব্বর বলেন তাহা অসমীচীন বলা যায় না। প্রকৃত সভ্যতা প্রাপ্ত নরনারী সেবা-ধর্ম্ম পরায়ণ হইবেন। উঠিতে বসিতে চলিতে ফিরিতে যাহারা অপরের সেবার সুযোগ অন্বেষণ করেন, তাঁহারা সভ্যনামের উপযুক্ত। যাহারা সকল বিষয়ে সর্ব্বত্র কেবল আপনার সুবিধা খোঁজে তাহারা অসভ্য নামেরই যোগ্য।

এদেশীয় সভ্যতার যাহা উৎকৃষ্টাংশ তাহা যেন মহিলাগণ ত্যাগ না করেন। বিদেশীয় সভ্যতার যাহা সার তাহা গ্রহণেও যেন ঔদাস্য না ঘটে। এইরূপে অন্তঃপুররক্ষিণী নারীগণ শিক্ষা দীক্ষা প্রাপ্ত হইলে তাহাদের পবিত্র সেবায় এদেশ উন্নত সভ্যতার আলয় হইবে। সর্ব্বপ্রকার জ্ঞান ও গুণে ভারত বিমণ্ডিত হইবে। এদেশীয় মহিলাদিগকে অজ্ঞানতা ও অসভ্যতার অন্ধকারে বন্দী করিবার যত্ন হইতে সর্ব্বপ্রকার অকল্যাণ ঘটিয়াছে।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়োতি যত্নতঃ" কেবল কথা মাত্রে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। কন্যাকুল সভ্যতা না বুঝিলে, জ্ঞানে সমুন্নত না হইলে কোন দেশেরও বাস্তবিক মঙ্গল হইতে পারে না।

দেবী অঘোরকামিনীর পত্র।

বাঁকিপুর।

মা সরো,

তুমি কেন দুঃখ করিয়াছ, আমিতো পত্র লিখিতে দেরি করি না। এবার অনেক গোলমাল এবং আমার শরীর খুব ভাল না। তাই পত্র দিতে দেরি হইয়াছে। এবার ১০ দিন উৎসব ছিল। বোজীবাওয়াবে। ২৮শে জানুয়ারী ৯টার সময় আহার করিয়া বক্তিয়ারপুর অর্থাৎ (বেহার) যাত্রা। ১১টার সময় বক্তিয়ারপুর সেই ঘরে জল খাইয়া ৪ খানা গাড়ী একত্রে যাইতেছিল সকলতাতেই মার কৌশল। বেহার পৌঁছিবার এক মাইল থাকিতে দ্বিতীয় গাড়ীর সহিত তৃতীয় গাড়ী আড়ি করিয়া আগে যাইবার জন্য জোরে গাড়ী চালনা করে। ঐ তৃতীয় গাড়ীতে খুকীর মা, তোমার মোকামার জেঠাই মা, মেনী, সুজাতা, তোমার পিসীমা ও ভুটুর মা এবং তোমার কলিকাতার জ্যেঠা মহাশয় কোচমানের দিকে ছিলেন। আমি, তোমার বাবা, সুসার, খোকার মা, খোকার বাবা, শেষ গাড়ীতে ছিলাম। দেখিতে দেখিতে ৩য় গাড়ী একটী তাল গাছে লাগিয়া উল্টাইয়া চাকা চূর্ণ হইয়া পড়িয়া গেল। শেষ গাড়ী ও আগের দুইখান গাড়ী থামিল। সকলে নামিয়া পড়িল। সে বর্ণনার কথা পত্রে হয় না। তোমার ভক্তিদিদি গেলে সকল বিষয় ভাল করিয়া শুনিও। আশ্চর্য্য এই ৩জন মুমূর্ষু, আর ৪ জনের কিছুই লাগে নাই। ঐ ৩ জন মুমূর্ষু আপনাদের অবস্থা ভুলিয়া অন্য আঘাতপন্ন (প্রাপ্ত) লোক কেমন আছেন সংবাদ লইতেছেন। সে যে কি দৃশ্য বলিতে পারি না। সেইখানেই ডাক্তার ডাকা হইল। তিনি দেখিয়া যাহার যে ব্যবস্থা করিয়া পরে পাল্কীতে সেই বাগান বাটীতে গেলাম। মঙ্গলবারে সেইখানে থাকিয়া কিছু সুস্থ হইয়া বুধবারে রাজগৃহে যাত্রা যেরূপে হইয়া থাকে সেই রূপেই হইল। এবার সেখানকার এই বিষয় স্থির হইল কার্য্য সেবায় পরিণত করিতে হইবে। সেখান হইতে আসিয়া একদিন মেয়েদের রিসাইট (recite) ছিল। তারপর ১১ই ফেব্রুয়ারী মেয়েদের প্রাইজ ছিল। এবার খুব ধুমধাম হইল। ৯ জন ইংরেজ স্ত্রী পুরুষ ও এখানকার বড় বড় ভদ্রলোক ৫০ জনের কম নয় বেশী হইবে। এখানকার কমিশনার সাহেবের মেম প্রাইজ (prize) দিলেন। সকলে খুব খুসী হইলেন। ২টী পইট্রী, একটী বাঙ্গলা গান ও আর একটী ইংরাজী গান হইয়াছিল। তোমার কথা অনেকবার মনে হইল। তোমরা দেখিলে খুব খুসী হইতে। তোমার উপাসনা কেমন লিখ।

রোজ সরস উপাসনা করিবার চেষ্টা করিবে। উপাসনা অন্ন জল এ কথা স্মরণে রাখিও। আর কি লিখিব। আমাদের ভালবাসা লও।

তোমার মা।

এ পত্রখানি রাজগৃহে যাত্রা বিষয় ও পথে কি দুর্ঘটনা হইল, তাহার বর্ণনায় পূর্ণ। বাগানবাড়ী যাইবার সময় পাল্কীর উল্লেখ আছে। যিনি অত্যন্ত আঘাত পাইয়াছিলেন, কপাল ফাটিয়া গিয়াছিল। তাঁহাকেই পাল্কীতে করিয়া লইয়া যাইতে হইয়াছিল। আর সকলে টোঙ্গীতে গিয়াছিলেন। এ দিনেই ডাক্তার পরেশ বাবুকে তারদিতে হইয়াছিল। তাহার পর তোমার প্রিয় স্কুলের কতই বিবরণ দিয়াছ। মেয়েদের পুরস্কারের বিষয় তোমার বর্ণনা করিতেও ভাল লাগিত। কিন্তু তা হইলে কি হইবে। কন্যার উপাসনা কেমন হয়। সরস উপাসনা ব্যতীত তোমার মন উঠিত না। উপাসনা অন্ন, জল কজনে স্বীকার করে। স্মরণে রাখাত দূরের কথা। রাজগৃহে যে সত্য লাভ করিতে, কন্যাকে অমনি লিখিলে কার্য্য সেবায় পরিণত করিতে চেষ্টা করিও। তুমি যে কাজ করিতে তাহা তাঁহার জন্য কন্যাকেও তাহাই করিতে বলিতে। সেবাতেই আপনার পরিত্রাণ, স্থানান্তরে বলিয়াছ অপরের পরিত্রাণও হয়। যে সেবা করে আর যে সেবা গ্রহণ করে উভয়েরই পরিত্রাণ হয়। এ কথার মর্ম্ম এখন এ সেবক পদে পদে বুঝিতেছে। সেবা না হইলে ধর্ম্ম হয় না। তোমারও যে পথ, আমারও সেই পথ।

২৪শে মে, ১৮৯৫।

বাবা বিধান,

তোমার পত্র পাইলাম। একদিন অন্তর একখানি করিয়া কার্ড লিখিতে চেষ্টা করিও। আমরা ভাল আছি, তোমার পেটের অসুখ কেমন লিখ, খুব সাবধানে থেক, ভাল করিয়া পড়িও, পরীক্ষার কথা ভুলিও না। আমাদের ভালবাসা তোমরা লও, তবে আজ আর না। পত্রপাঠ উত্তর দিতে ভুলিও না।

তোমার মা।

২৪শে মে।

বাবা সাধন,

তোমার পত্র পাইলাম। যত শীঘ্র পারি টাকা পাঠাইব। পরে জুতা কিনিও। খুব ভাল করিয়া পড়িও তবে ভাল ছেলে হবে। তোমরা দুজনার কেহ এক দিন অন্তর একখানি কার্ড লিখিও, ভুল না। আমি একটু ভাল আছি। তোমার বাবা ভাল আছেন। এখানকার ও বাঁকিপুরের সকলে ভাল। তুমি কেমন আছ লিখিও, তবে আজ আর না।

তোমার মা।

তুমি ছেলেদের সংবাদ একদিন অন্তর একদিন চাইতে, পরীক্ষার কথা তুমি ভুলিতে দিতে না, লেখা পড়া না করিলে কোন ছেলে ভাল হয় না এ কথা তুমি বার বার তাহাদের স্মরণ করাইয়া দিতে।

৫ই জুলাই, বাঁকিপুর,
১৮৯৫।

মা সরো,

আজ কয়দিন আর তোমাদের কোন সংবাদ পাই নাই। পত্র পাঠ তোমরা কে কেমন আছ লিখ। সাধন, বিধানরা যথা-সময় এখানে আসিয়াছে। তোমার খুড়ো শ্বশুরের ছেলের নিকট ১ টাকা পাঠাই-য়াছি তোমার পিসীমার জন্য ৪টা আনা-রস, বাকি যে পয়সা থাকিবে, তাহা দ্বারা ১টা কিংবা ২টা মোটা মাদুর কিনিবে। হয় তাহাদের সহিত দিও, আর না হয় তোমার সঙ্গে এন, এখানকার সব ভাল। যদি মোটা মাদুর না পাওতো যেমন পাও তাই এন। তোমার শাশুড়ী মাতা ও শ্বশুর মহাশয়কে প্রণাম দিও। তোমরা উভয়ে আমাদের ভালবাসা লইও। জীবনবালাকে ও তাহার পুত্র কন্যাকে ভালবাসা দিও। এই পত্রে কেবলই কটী কাজের কথা আছে।

তোমার মা।

২০শে জুন, ১৮৯৫ বিটা।

সরো!

তোমার পত্র ছিতলাওয়ায় পাই। সেখান হইতে মনের গিয়াছিলাম। সেখান থেকে পত্র দিলে পাবে কিনা তাই আর লিখি নাই। তুমি এখানকার জন্য ভাবিও না। যদি কাহারও অসুখ করে, তেমন. তাহা হইলে শীঘ্রই পত্র পাইবে। মার কোলে সকলকে দেখিতে শেখ, শরীরতো চিরদিন থাকিবে না,পত্রও চিরদিন থাকিবে না, যাহা থাকিবে তাহার দিকে দৃষ্টি রাখিও। সর্ব্বদা সংসারে সাবধানে থাকিও যেন সে তোমাকে না ফেলিয়া দিতে পারে। উপাসনা কেমন হইতেছে লিখিও। জননীকে কর্ত্তা করিয়া সকল কাজ করিও। তাঁহার আজ্ঞার জন্য অপেক্ষা করিও। আর কি বলিব। এ কথা ভুলিও না যে ভক্তজন এবং ভগবান্, আর গরীব বাপ, মা তোমাদের উপর অনেক আশা রাখেন। যে তাঁহার হইতে চায় তিনি নিজে আর সকল করিয়া লন। কেবল ব্যাকুলতা চাই। আশা করি, সেবা, দয়া ও সন্তোষ, আর সেই পবিত্র হাসি তোমার আরও বাড়িয়াছে। সর্ব্বদা শ্বশুর মহাশয়, শাশুড়ী মাতার সেবা করিতে ও তাঁহাদের প্রিয়কার্য্য করিতে ভুলিও না। স্বামী মহাশয়কে ভক্তি ও ভালবাসার সহিত সেবা করিবে। আর কি বলিব। তোমার পড়িবার কেতাবগুলি কি তুমি লইয়া গিয়াছ না, বাটী গিয়া পাঠাইয়া দিব। আমরা ৩০শে বাটী যাইব। আজ বিটায় আছি। এবার আমার শরীর খুব ভাল না। তবে একটু ভাল। তোমার বাবা সেইরূপই আছেন, ছেলেরা ভাল। আমাদের ভালবাসা লও তবে আজ যাই।

তোমার মা।

কোথায় ছিতলাও কোথায় মনের কোথায় বিটা বেড়াইতে ছিলে, ইহাতে তোমার শরীর ও মন ভাল থাকিত, ছেলেরা সঙ্গেই থাকিত। কখন কখন ভাই বনেরাও দয়া করিয়া তোমার সঙ্গ-

লাভের জন্য অনেকদিন আসিয়া থাকিতেন। তখন হইতেই তুমি সকলকে বলিতে যে মার কোলে সকলকে দেখিতে শেখ। শরীর তো চিরদিন থাকিবে না তাহা তুমি জীবন দিয়া দেখাইয়া গেলে। পত্রও চিরদিন থাকিবে না। লক্ষ্ণৌ থাকিতে পত্র বন্ধ করিয়া মহাযোগ প্রমাণ করিয়া গেলে। সংসারে খুব সাবধানে থাকিতে—কন্যাকেও সাবধানে থাকিতে বলিয়াছ। তুমি মা জননীকে জিজ্ঞাসা করিয়া সকল কাজ করিতে, তাই কন্যাকেও বলিলে ভগবানের আজ্ঞা ভিন্ন কোন কাজ করিও না। কন্যা ও জামাতার উপর অনেকের আশা ছিল এবং এখনও আছে, যে তাঁহারা দুজনা এক হৃদয় হইয়া অনন্ত উন্নতির দিকে চলিবেন। ব্যাকুলতা হইলেই যে জননী আর সকল করিয়া লন ইহাতে আর কোন সন্দেহ নাই। নইলে যেটুকু তুমি করিয়া দেখাইয়া গেলে তাহা করিতে পারিতে না। বাল্যকাল হইতে সরোজিনীর মধ্যে সেবা, দয়া, আপনার অবস্থায় সন্তুষ্ট হইয়া থাকা এবং অল্পেতেই মুখভরা হাসি সকলেই দেখিতে পাইত। এ সকল গুণ গুলিই আছে কিন্তু সেবা ভিন্ন আর কিছু বাড়িয়াছে কি না, তাহা বলিতে পারি না। তুমি প্রার্থনা করিও অবশ্যই বাড়িবে।

২০শে জুন, (১৮৯৫) বিটা।

প্রিয় জ্ঞান!

তোমার মিষ্ট পত্রখানি পাইয়া বড়ই সুখী হইলাম। যখন তোমার সময় হইবে তখন তুমি এইরূপ মিষ্ট পত্র দারা সুখী করিও। পাঠের সময় নষ্ট করিয়া পত্র দিতে ব্যস্ত হইবে না। আশা করি তোমরা রোজ রোজ জীবনকে সেই স্বর্গের দিকে লইয়া যাইতে পারিতেছ। সকল বিষয়ে উভয়ে এক হইতে চেষ্টা করিয়া সফলতা লাভ করিতেছ। মা জননী সর্ব্বদা তোমাদের নিকটে থাকিয়া বলবিধান করুন তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করি। সংসার বড় ভাল স্থান, যদি তাহাতে মাতা বাস করেন, আশা করি তোমাদের সংসারে তাহাই হইবে। তোমরা দেবদেবী হইয়া মাতার মুখ উজ্জ্বল কর। গরীব মা বাপ আমরা দেখিয়া সুখী হই। আশা করি ভাল আছ। আমরা আজ বিটায় আছি, ৩০শে বাটী যাইব ২রা স্কুল খুলিবে। আমাদের উভয়ের হৃদয়ের ভালবাসা লও। তোমার পিতা মাতাকে আমাদের ভক্তিপূর্ণ প্রণাম দিও। বাটী গিয়া তাঁহাদের পত্র লিখিব। তবে আজ আর না।

তোমার শুভকাঙ্ক্ষী মা।

তোমার নব-বিবাহিত জামাতাকে ঠিক যেন আপনার পুত্রের মত পত্র লিখিতেছ। সন্তানের সংবাদ পাইতে সকলে ব্যস্ত হন কিন্তু তোমার সংবাদ না হইলেও চলে। ভগবান্ তোমাকে স্বয়ং ঝি জামাতার সংবাদ দিলে ব্যস্ত হইবে কেন? কিন্তু তাঁহারা দুজনে এক হইতেছেন কিনা তাহার জন্য শুভকামনা করিতেছ। সংসার যে ভাল স্থান একথা তুমি আমাকে অনেকবার বলিয়াছ। এই পত্রে তাহা লিখিয়া গেলে। তোমার সংসার

তপোবন হইয়াছিল। কেন না 'মা' বনদেবতা হইয়া তাহাতে বাস করিতেন; ঝি জামাতার সংসারে তাই হউক এই আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলে।

২১শে জুলাই, ১৮৯৫
বাঁকিপুর।

প্রিয় জ্ঞান,

তোমার পত্র পাইয়া বড় দুঃখিত হইলাম, তুমি যাহা বলিয়াছ তাহা সত্য। অমন পুণ্যবতী নারীর জন্য আমাদের দুঃখ করা উচিত নয়। কিন্তু এমন একটী রত্ন যে আমরা হারাইলাম এই দুঃখ। তিনি যে সেখানে সুখে আছেন, তাহা স্মরণে সুখ হয়। বোধ হয় তোমার মাতা বড় কাতর হইয়াছেন। এই সময়ে তোমরা উভয়ে তাঁহার সেবা করিয়া মনে শান্তি দিতে সর্ব্বদা চেষ্টা করিবে। তোমাদের দেবভাবে সংসার দেবভাব প্রাপ্ত হইবে। একথা আশা করি ভুলিবে না। জননী তোমাদের নিকট সর্ব্বদা থাকিয়া সুখী করুন। আর কি বলিব বড় সাধ দেখিতে তোমাদের একতা, জননী সে ইচ্ছাপূর্ণ করুন। আশা করি তোমরা উভয়ে এক হইয়া সংসারে আদর্শ-জীবন দেখাইবে। মা আশীর্ব্বাদ করুন। তোমরা উভয়ে আমাদের প্রাণের ভালবাসা লও। আমার শরীর মন্দ নয়। সহরে যাইয়া একটু উপকার পাইয়াছি। আর সকলে ভাল। শ্রীযুক্ত প্রতাপবাবু মহাশয়ের সহিত কি দেখা হইয়াছে? তোমার পড়াশুনা কেমন হইতেছে? শরীর কেমন? সকল বিষয় লিখ। তবে আজ আর না। ইতি

তোমার শুভাকাঙ্ক্ষিণী মাতা।

সময়ে অসময়ে তুমি এ মহামিলন বিষয়ে ঝি জামাইকে বলিয়া গিয়াছ। একতা ভিন্ন বিবাহ বৃথা হইয়া যায়। তাই নানারূপে সন্তানদের বলিতে আদর্শ-জীবন যাপন করিতে। আমিও তাই বলি মা আশীর্ব্বাদ করুন, এই পত্রে যে পুণ্যবতী নারীর কথা উল্লেখ আছে, তিনি জ্ঞানের দিদিমা শ্রদ্ধেয় শিবচন্দ্র দেবের পত্নী।

২৬শে জুলাই, ১৮৯৫।
বাঁকিপুর।

মা সরো!

তোমার পত্র এই মাত্র পাইলাম চেষ্টা করিলে মা কখন সে চেষ্টা বিফল করেন না। যাহাতে উপাসনা সরস হয় চেষ্টা করিও। খুব ভোরে উঠিয়া উপাসনা হইতে পারে না কি? দেখ যাহা ভাল হয় করিও। কোন সময় একটু নির্জ্জনে বসিও। জীবন চরিত পড়িও। তোমার বাবা মঙ্গলবারে আসিয়াছেন। তাঁহার শরীর সেইরূপই আছে। মধ্যে বাহিরে গিয়া পেটে বেদনা ধরে, যত্নে একটু ভাল। তোমার জ্যেঠামহাশয় কবে আসিবেন লেখেন নাই। তবে শীঘ্র আসিবেন। দাদাজীদের খোকা সেইরূপ আছে। আর সব ভাল। খগেনের সকলে ভাল, খুকী সেইরূপ। পিসীমাদের সব ভাল, কামাখ্যারা সব ভাল। নতুরা অক্টোবর মাসে পরীক্ষা দিবে। আমার শরীর সেইরূপ। আর সকলে ভাল। আমাদের ভালবাসা উভয়ে লও। তোমরা উভয়ে কেমন আছ? সর্ব্বদা কাজের ভিতর 'মা, মা'

বলিয়া ডাকিও। তোমার শ্বশুর ও শাশুড়ীমাতাকে আমাদের প্রণাম দিও। এখনও কোন মেয়ে আসে নাই। পূজার ছুটীর পর দেখা যাইবে। এখনি স্কুলে যাইব। তবে আজ আর না।

তোমার মা।

তোমার কি বিশ্বাস হইয়াছিল। বিশ্বাস ক্রমিক তাই কন্যাকে চেষ্টা করিতে বলিলে। ভগবান্ কোন চেষ্টা বিফল করেন না, চেষ্টা করিলে যে উপাসনা সরস হয় তাহা তুমি পরীক্ষায় জানিয়াছিলে। কখন উপাসনা করিলে সরস হয় তাহাও তুমি বলিয়াছিলে, কিন্তু স্বাধীন ভাবে, স্বামী, স্ত্রীতে পরামর্শ করিয়া দৈনিক উপাসনার সময় ঠিক করা উচিত, তাহাই করিতে বলিলে, নির্জ্জনে আত্ম-চিন্তা করা, উপাসনা সরস করার আর একটু উপায়, কর্ম্মের মধ্যে মা, মা বলিয়া ডাকিলে কর্ম্ম-যোগ শিক্ষা করা যায়, এটী বড় ভাল উপায়।

বাঁকিপুর।
১৪ই নবেম্বর, ১৮৯৫।

বাবা জ্ঞান,

তোমার পত্র পাইয়াছি, নানা ব্যস্ততা-বশতঃ উত্তর দিতে বিলম্ব হইয়াছে। এখন স্কুল হইতে দু কলম লিখিতেছি। ছুটী এখন নেওয়া হইল না। গরমের সময় হইবে। এখন শরীর অনেক ভাল বোধ হইতেছে। আমি এক রকম আছি। আর সব ভাল। জীবনবালাকে ও তাঁহার পুত্রটিকে ভালবাসা দিও। তোমরা আমার ভালবাসা লও। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন। তবে আজ যাই।

তোমার মাতা।

এ পত্র শীতের সময় লেখা, গরমের সময় বোম্বাই যাইবার পরামর্শ করিতে-ছিলে। সেখানে একটী ছোট বাঙ্গলা ভাড়া করার কথা ঠিক হইয়াছিল। পাথেয় ঠিক করিয়াছিলে। এমন সময় তোমার স্বর্গে যাইবার সংবাদ আসিল বোম্বাই যাওয়া আর হইল না।

৩০শে নবেম্বর, ১৮৯৫।
বাঁকিপুর।

মা সরো!

বিধানের পত্রে দেখিলাম তোমার জ্বর হইয়াছে। কাল সুবোধ পত্র লিখিয়া-ছেন, কিন্তু আজ তোমার সংবাদ পাইবার আশা ছিল, পাইলাম না। কেমন আছ, পত্র পাঠে উত্তর দিও। ২ কলম না হয় দিও। আমরা ব্যস্ত রহিলাম। তোমার কেন এত অসুখ করিতেছে? বোধ হয় কিছু অনিয়ম কর, যাই হউক সাবধানে থাকিবে। নইলে কেমন করিয়া সকলের সেবা করিয়া সুখী হইবে। সেবাই সুখ। তোমার শাশুড়ীমাতা কেমন আছেন? দেখ, ভাল থাকিলে তাঁহাদের কত সেবা করিতে পারিবে, তাঁহাদের আমার প্রণাম দিও। তোমরা উভয়ে ও জীবনবালা আমার ভালবাসা লও। খোকাকে ভালবাসা দিও। এখানকার সকলে মন্দ না।

তোমার মা।

পীড়ার সংবাদ পাইয়া কন্যাকে এই পত্র লিখিয়াছিলে ইহাতে ব্যস্ততার মধ্যে যে পথ তুমি ধরিয়াছিলে কন্যাকেও তাহাই বলিয়া দিলে। সেবা যাহাতে ভাল হয় তাহাই করিতে বলিলে। সেবাই প্রেমের মূলে জানিতে হইবে।

বাঁকিপুর, ১১ই জুন,
১৮৯৫ শক।

মা সরো!

অনেক দিন তোমার পত্র পাই নাই। কেমন আছ? উপাসনা কেমন লিখ. এই সময় মনকে খুব উচ্চ ভাবাপন্ন রাখিতে হয়, এ কথা ভুল না। সাধন, বিধান, এখন কোথায়? তাহাদের সংবাদ অনেক দিন পাই নাই। কিছু লিচু (১৬০) আজ কয়েক দিন পাঠাইয়াছি, তাহা কি তোমরা পাও নাই। অবশ্য করিয়া লিখিও। এখানে উমাচরণ বাবুর একটী সন্তান হইয়াছে। (পুত্র) পত্নী ও পুত্র ভাল আছে। তাঁহারা নয়াটোলতেই আছেন। এই খানেই ছেলে হইয়াছে। নূতন বাগানের আম পাকিয়াছে, কাল তোমাদের জন্য কিছু পাঠাইবার ইচ্ছা আছে। তোমার দিদি ও নলিনী মোকামায় আছেন। লতু ও তরু বাটীতে ও এখানকার সকলে ভাল। আমার আর তোমার বাবার শরীর সেইরূপই আছে. তোমার বাবার শরীর এ বৎসর একটু সুস্থ। তবে অনিয়ম হইলে সয় না। তুমি আমাদের জন্য চিন্তা করিও না, ভাবিবার কারণ কিছু নাই। তোমার বাবার ছুটী এখনও হয় নাই, হইলে সংবাদ দিব। সাধন বিধানকে পড়িতে বলিও। আমাদের উভয়ের ভালবাসা তোমরা লও। তবে আজ আর না, আজ আম পাঠাইলাম ৩২টী।

তোমার মা।

পত্র আরম্ভ করিবা মাত্র জিজ্ঞাসা করিলে উপাসনা কেমন? যে উপাসনার ফল না পাইয়াছে সে এমন করে বার বার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিবে কেন? এই সময় সরোজিনীর সন্তান হইবার কথা। বোধ হয় তখন ৮ মাস, তাই তাঁহাকে সাবধান করিয়া দিতেছ। মন খারাপ থাকিলে, উচ্চভাবাপন্ন না থাকিলে, সন্তানের অপকার হয়। বাঁকিপুর হইতে আম লিচু এই সময় পাঠাইয়াছ। ইহাতে এই বুঝা যায় যে, তুমি ছেলে মেয়েদের জন্য চিন্তা করিতে ভাল বাসিতে। অথচ বাপ মায়ের জন্য চিন্তা করিতে মানা করিতেছ, ছুটী লইয়া বোম্বাই যাইবার কথা হইতেছিল, সে সংবাদও দিয়াছ, এই পত্রের আর একটী সংবাদ পাওয়া যায়। তোমার শেষ জীবনে ভাল আমের বাগান হইয়াছিল। সেই আম বিতরণ করিয়া তুমি বড়ই আনন্দ অনুভব করিতে। পীড়িত হইবার পূর্ব্বেই নিজে গাড়ী করিয়া বাগানে গিয়াছিলে, বাগানের আম পাড়িয়াছিলে, ফিরিয়া আসিবার সময় ময়দানে মেয়েদের সঙ্গে দৌড়িয়াছিলে।

স্বর্গগত শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্র সেন।

মহিলার পাঠিকাগণের অবগতির জন্য আমরা মধ্যে মধ্যে ইহার প্রবর্ত্তক ও প্রথম সম্পাদক ভাই গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের শারীরিক অবস্থার বিষয় লিখিয়াছি। তিনি শেষে দুই মাসের কিছু অধিককাল ঢাকা নগরীতে বাস করিতেছিলেন। ৩০শে শ্রাবণ সোমবার সায়ংকালে ঢাকা হইতে তারযোগে সংবাদ পাওয়া যায় যে ঐ দিবস বেলা ১০টার সময় তিনি দেহবিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মলোকবাসী হইয়াছেন। তাঁহার মৃত্যু সময়ের এবং অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা ঢাকাব্যাসিনী তাঁহার অতি স্নেহপাত্রী শ্রীমতী ক্ষীরদাসুন্দরী সেন তাঁহার পূজনীয়া শ্বশ্রূমাতাঠাকুরাণীকে এইরূপ লিখিয়াছেন।

ঢাকা
৩১শে শ্রাবণ।

গত কল্য বেলা ১০টার সময় ভক্তি-ভাজন গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় পরলোকে গমন করিয়াছেন, তাহা শ্রীমান্ বিনয় যে কাকাবাবুর নিকট টেলিগ্রাম দিয়াছে তাহাতেই জানিয়াছেন। রবিবার বিকালে মনোরমা, তাহার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও জ্ঞান বাবুর স্ত্রী প্রভৃতি কয়েক জন গিরিশ বাবুকে দেখিতে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সঙ্গে অনেকক্ষণ বসিয়া কথা-বার্ত্তা বলিয়াছেন। মনোরমা তাঁহার জন্য আম, আতা, আনারস ও সন্দেশ নিয়া আসিয়াছিলেন, রাত্রিতে সেই ফল ও সন্দেশ, দুধ খাইয়া শয়ন করেন, খানিকক্ষণ পরেই শ্বাসকষ্ট খুব বৃদ্ধি পায়, তখন চাকর যাইয়া অক্ষয় দিদিকে সংবাদ দেয়, তিনি ও বৈকুণ্ঠদাদার স্ত্রী তখনই আসেন; সমস্ত রাত্রি তাঁহারাই ছিলেন। বাহ্যে প্রস্রাবের উদ্বেগ হয়, কিন্তু রাত্রিতে একবারও বাহ্যে প্রস্রাব হয় নাই, সমস্ত রাত্রি শ্বাসের কষ্ট খুব পান। ডাক্তার সুরেশ গুপ্তকে আনান হয়, তিনি রাত্রেই দেখিয়া যান, তখন গিরিশ বাবু অতুল ডাক্তারকে প্রাতে নিয়া আসিতে সুরেশ গুপ্তকে অনুরোধ করেন, সুরেশ গুপ্ত তাহাতে স্বীকার হইয়া যান। এত শীঘ্র যে চলিয়া যাইবেন তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই, মনে করিয়াছিলেন অতুল বাবুর ঔষধ খাইলেই শ্বাসকষ্ট কমিয়া যাইবে। রাত্রে জ্বরও হইয়াছিল, প্রাতে সরলার ও আমাদের বাড়ীতে খবর আসে, সরলা খুব ভোরেই তাঁহার ওখানে যায়, তখন পটে বসিয়া একবার বাহ্যে ও প্রস্রাব করেন। সরলা ধরিয়া বসিল, নিজেই শৌচকর্ম্ম করিলেন, তাহাকে কিছুই করিতে দিলেন না। বাহ্যে প্রস্রাব হওয়াতে যাতনা একটু কমে, একটু ভাল বোধ করেন, কিন্তু খুব ঘাম হইয়া সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হইয়া যায়। জ্ঞান বেশ ছিল, কথা সব সময় স্পষ্ট বুঝা যায় নাই, কোনটা বুঝা গিয়াছে কোনটা অস্পষ্ট হইয়াছে। প্রাতে একবার বলিলেন আমাকে বারেন্দায় চেয়ারে বসাও, সরলা তাঁহাকে বারেন্দায় নিয়া গেল, অল্পক্ষণ বসিয়াই আবার ঘরে

আসিয়া শুইলেন, খুব অল্প সময় একটু প্রার্থনা ও সঙ্গীত করিয়া নমস্কার করিলেন, পরে দুই চামিচা দুধ-বার্লি পথ্য করিলেন; বেশী খাইতে পারিলেন না, কষ্ট হইল। আমি ও শ্রীমান্ বিনয় প্রাতে ৭॥টায় তাঁহাকে দেখিতে গেলাম, সরলা বলিল বিনয় আসিয়াছে, তিনি বলিলেন, বিনয় বলিতেই আমার সেই বিনয়কে মনে পড়ে, সরলা বলিল ক্ষীরু আসিয়াছে, তিনি বলিলেন হাঁ ক্ষীরু আমার আদরের মা। আমরা যাইয়া তাঁহার শরীর খুব ঠাণ্ডা দেখিলাম, জ্ঞান আছে কিন্তু চোখ মেলিতে পারেন না, শ্বাসের কষ্ট খুব হইতেছে, এক একবার যন্ত্রণায় উঠিয়া বসেন, আবার শুইয়া পড়েন। একবার স্বর্ণসিন্দুর খাওয়ান হইল, তখন এক টুকরা আম চাহিয়া খাইলেন, একটু ভাল বোধ করিলেন, তন্দ্রা হইল। ৮টার সময় সুরেশ গুপ্ত আসিয়া দেখেন, তখন খাওয়ার ঔষধে কাজ করিবে না বলিয়া পিচ্‌কারী দিয়া শরীরে বিষ ভরিয়া দেন এবং অক্ষয়দিদিকে বলিয়া যান যে, ইনি আর বেশীক্ষণ থাকিবেন না, বোধ হয় ১২টার মধ্যেই চলিয়া যাইবেন। আমরা ডাক্তার আসিবার একটু আগে কিছুক্ষণের জন্য বাসায় আসিয়াছিলাম, অক্ষয়দিদি ডাক্তারের ঐ কথা শুনিয়া চাকরকে বলেন, ক্ষীরু ও সরলাকে ডাকিয়া আন, তাহারা আসিয়া একটু নাম করুক; ঐকথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, আমার অবস্থা কি এমনই হইয়াছে? তখন বোধ হয় বুঝিলেন যে আর বাঁচিবেন না। চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, গোপীবাবুর ছেলে বিনয়কে আমার কাছে ডাকিয়া আন, তাঁহার এখন আমার কাছে থাকা দরকার। চাকর আসিয়া সংবাদ দেওয়াতে আমরা তখনই গেলাম, অক্ষয়দিদি, বৈকুণ্ঠদাদা, তাঁহার স্ত্রী প্রভৃতি গিরিশ বাবুর আত্মীয়েরা রাত্রি হইতেই নিকটে ছিলেন, ১০টার একটু পূর্ব্বে সুরেশ গুপ্ত অতুল বাবুকে নিয়া আসিলেন, তাঁহাকে বলা হইল অতুল বাবু আপনাকে দেখিতে আসিয়াছেন, চক্ষু বুজিয়াই বলিলেন, "মহাশয় নমস্কার! আপনার সঙ্গে আলাপ নাই, কিন্তু নাম জানা আছে।" তিনি হাত দেখিয়া সুরেশ গুপ্তকে পিচ্‌কারীতে বিষ ভরিতে বলিলেন, ইহার মধ্যেই গিরিশবাবুর সমস্ত শরীর ঝাঁকিতে লাগিল, চক্ষু বুজিয়া ছিলেন, চোখ খুব বড় হইল, তাঁহার ফিট্ হইল, পাশ ফিরিয়া শুইয়াছিলেন, চিৎ হইয়া শুইলেন। সমস্ত শরীর ঝাঁকিয়া হাত দুইখানা মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বুকের উপরে আসিল, আর সেই ফিটের অবস্থায়ই প্রাণ বাহির হইল, আর বিষ দিবার অবসর হইল না। অতুলবাবু ও সুরেশ গুপ্তের সাক্ষাতেই এই ভাবে প্রাণ গেল! অতুল বাবু অবাক্ হইয়া রহিলেন, তাঁহার জন্যই প্রাণটা ছিল, তিনি বেশ গিয়াছেন। বিছানায় বাহ্যে প্রস্রাব কিছু না, কাহাকেও কোন কষ্ট দিলেন না, কষ্টে কেবল মা, মা, মাগো ইহাই বলিয়াছেন। শ্রীমান্ বিনয়, আমি, সরলা ও তাঁহার আত্মীয়েরা কয়েক জন নিকটে ছিলাম। প্রাণ গেলে সব কষ্ট শেষ

হইয়া গেল! মুখখানি বেশ সুন্দর হইল যেন ঘুমাইতে লাগিলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বের দিনও অক্ষয়দিদির কাছে বলিয়াছেন, আমি একটু ভাল হইলেই সুন্দরবনের পথে ষ্টীমারে কলিকাতায় চলিয়া যাইব, আমি তো এখানে বেশীদিন থাকিব না, কলিকাতায়ই চিরকাল থাকি, সেইখানেই যাইব। চাকরকে বলিয়াছেন, আমার সঙ্গে কলিকাতায় যাইবে তো? সে বলিল যাইব। মৃত্যুর পরে সকলকেই সংবাদ দেওয়া হইল, নববিধান সমাজের সকলেই আসিলেন, ঈশানবাবুর খুব অসুখ, তিনি আসিতে পারেন নাই, দুর্গানাথ বাবু ঢাকায় উপস্থিত নাই, বঙ্গদাদা যোগেশ সুরেশ চারু প্রশান্ত আসিয়াছিলেন। জ্ঞানবাবু, ললিতবাবু, মনোরথ, গোবিন্দবাবু, নির্ম্মল সাধারণ সমাজেরও কেউ কেউ আসিয়াছিলেন। বাড়ীতেই তাঁহাকে স্নান করাইয়া নূতন কাপড় পরাইয়া, ফুল ও সুগন্ধি প্রভৃতি দিয়া সাজান হইল। বঙ্গদাদা উপাসনা করিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ, তিনি শ্মশানে যাইতে পারেন নাই। আর আর সকলেই শ্মশানে গিয়াছিলেন, শ্রীমান্ শশাঙ্কও সঙ্গে গিয়াছিলেন। বেলা ৩টার সময় তাঁহাকে নিয়া যান, সকলেই আফিসে গিয়াছিলেন, একত্র হইতে একটু দেরী হইয়াছিল। রাত্রি সাড়ে নয়টায় সকলে বাড়ী ফিরিয়াছেন, আমরা শেষ পর্য্যন্ত তাঁহার কাছেই ছিলাম, তাঁহাকে নিয়া গেলে আমি সরলা ও অক্ষয়দিদি প্রভৃতি চলিয়া আসিয়াছি। শ্মশানে জ্ঞানবাবু প্রার্থনা করিয়াছেন, তাঁহার ভস্ম আনা হইয়াছে, শ্রীমান্ মনোরথের কাছে ভস্ম দেওয়া হইয়াছে, তিনি কলিকাতায় নিয়া যাইবেন।

আমি প্রাতে এই চিঠিখানা লিখিতেছি, এমন সময় কাকাবাবুর টেলিগ্রাম পাইলাম, তাঁহাকে আর বিনয় ভিন্ন চিঠি লিখিল না, এই চিঠিই তাঁহাকে দিবেন।

তাঁহাকে শ্মশানে নেওয়ার সময় সমস্ত রাস্তায়ই "জয় জয় সচ্চিদানন্দ হরে, হোক্ তব ইচ্ছা পূর্ণ সুখ দুঃখের ভিতরে" এই সঙ্গীত করিতে করিতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। ইতি

সেবিকা
আপনার বধূ।

গিরিশবাবুর আত্মীয় শ্রীমান্ শশাঙ্ক মোহন গুপ্ত ১৫ই আগষ্ট তারিখে ভাই কান্তিচন্দ্র মিত্রকে লিখিয়াছেন।

অক্ষয় কুটীর, হাটখোলা।
পোঃ রমনা।
১৫। ৮। ১০।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

প্রাতে আপনাকে চিঠি লিখিবার দুই ঘণ্টার মধ্যেই ঠাকুরদাদা ইহধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুর ৪। ৫ ঘণ্টা পূর্ব্বে সংজ্ঞা প্রায় বিলুপ্ত হইতেছিল, জিহ্বায় জড়তা আসিয়া বাক্য খুব অস্পষ্ট হইয়াছিল এবং ভালরূপ লোকও চিনিতে পারিতেন না। স্বর্ণসিন্দূর সেবন করান হয় এবং ইন্‌জেক্‌সনও দেওয়া হয়। তৎপর পুনঃ সংজ্ঞা হয়। কিঞ্চিৎ দুগ্ধ পথ্য করেন এবং একটু কথাবার্ত্তাও

বলেন। ডাক্তার অতুলচন্দ্র রায় এবং ডাক্তার সুরেশচন্দ্র গুপ্ত আসিলে পর, অতুল বাবুকে নমস্কার করেন এবং বলেন, "নমস্কার অতুল বাবু, আপনার নাম শুনেছি কিন্তু পরিচয় নাই।" ইহা বলিবার পরক্ষণেই হঠাৎ একটু স্প্যাজম্ হইয়া হাতখানি বুকের উপর রাখিয়া প্রাণত্যাগ করেন। সকলেই অবাক্! অতুল বাবু মনে করিলেন, তিনি বুঝি কেবল তাঁহারই জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। মরিবার কালে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবে বেষ্টিত হইয়া মরিয়াছেন এবং সেবা শুশ্রূষার কিছুই ত্রুটি হয় নাই। সৎকারেও অনেকে গিয়াছিলেন, সকলেই প্রায় নববিধানের লোক। সৎকার সুচারুরূপে হইয়াছে।"

নিঃ

শশাঙ্ক

ভাই গিরিশচন্দ্র সেন আর ইহলোকে নাই; নারীশিক্ষা ও নারীজাতির ধর্ম্মোন্নতি বিষয়ে তাঁহার যে একান্ত আগ্রহ ও অশেষ চেষ্টা ছিল তাহা আমরা আর দেখিতে পাইব না, কিন্তু সৎকর্ম্মের মৃত্যু হয় না, যাহা মঙ্গলময় অমৃতস্বরূপের প্রভাবে ভাব ও উদ্যমরূপে প্রকাশ হয় সে দেবভাব ও স্বর্গীয় কার্য্য চিরদিন পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত থাকে। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন প্রথম জীবনে নারীশিক্ষার যে হীন অবস্থা দেখিয়াছিলেন, এবং শেষ জীবনে অপেক্ষাকৃত যে উচ্চ অবস্থা দেখিয়া গিয়াছেন, অর্থাৎ গত অর্দ্ধশতাব্দী মধ্যে নারীশিক্ষার বিষয়ে যে উন্নতি হইয়াছে তাহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে এই পঞ্চাশ বৎসরে এক নবযুগ আগমন করিয়াছে। তখন কলিকাতা নগরেও একটি উচ্চশ্রেণীর নারীশিক্ষালয় ছিল না, এখন অনেক জেলায় পর্য্যাপ্ত উচ্চশ্রেণীর বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে। তখন পল্লীগ্রামে নারীর পক্ষে শিক্ষালাভ করা যেন অন্যায় বা অলক্ষণ মনে করা হইত, এখন অনেক গ্রামে বালিকাবিদ্যালয় হইয়াছে এবং অনেক গ্রাম্য পাঠশালাতে বালকগণের সহিত বালিকাগণও শিক্ষালাভ করিতেছে। সে সময়ে নারীগণ অল্প লেখা পড়া শিক্ষা করিলেই গৌরবলাভ করিতেন, এখন প্রতি বৎসর কত নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতেছেন এবং কেহ কেহবা ইংলণ্ডে যাইয়া উচ্চশিক্ষা লাভ করিতেছেন। এই উন্নতির জন্য আমরা আমাদিগের সুসভ্য রাজজাতির প্রতি কৃতজ্ঞ হইব। ভগবান্ এই উন্নতি বিধান করিতে যেমন প্রসিদ্ধ রাজপুরুষগণকে ব্যবহার করিয়াছেন তেমনই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেক লোককেও ব্যবহার করিয়াছেন। ভাই গিরিশচন্দ্র সেন এই শেষ শ্রেণীর মধ্যে একজন। তিনি যখন নিজগ্রামে পাঠশালাতে বালকগণকে শিক্ষা করিতে দেখিলেন ও বালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হয় না দেখিলেন, তখনই তাঁহার মনে একটি স্পন্দন আরম্ভ হইল, এই দেবভাবের স্পন্দন চিরজীবন তাঁহার অন্তরে কার্য্য করিয়াছে। যখন তিনি ময়মনসিংহে স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন তখন বালিকাদিগের জন্য একটি ক্ষুদ্র বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। সেই

ক্ষুদ্র বিদ্যালয় আজ ময়মনসিংহে একটি উচ্চশ্রেণীর নারীবিদ্যালয়ের আকার ধারণ করিয়াছে। যখন তিনি প্রচারক ব্রত গ্রহণ করিয়া কলিকাতাবাস করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন নিয়মিতরূপে নারী-শিক্ষা কার্য্যে ব্রতী ছিলেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন যে স্ত্রীবিদ্যালয় স্থাপন করেন ভাই গিরিশচন্দ্র তাহার উচ্চশ্রেণীর ছাত্রীগণকে বাঙ্গলা সাহিত্য পড়াইতেন। নারীজাতির উন্নতিকল্পে বামাবোধিনী পত্রিকা প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হইলে তিনি নিয়মিতরূপে তাহাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। যখন পরিচারিকা নামক পত্রিকা প্রকাশ হয়, ভাই গিরিশচন্দ্র সেন তাহার সম্পাদক না হইলেও তাহার একজন প্রধান লেখক ছিলেন। মহিলা পত্রিকা দরবার হইতে প্রকাশিত হয় ইহার সমস্ত ভার ভাই গিরিশচন্দ্র গ্রহণ করেন। প্রথম হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর পর্য্যন্ত যেরূপ নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য-পরায়ণতার সহিত তিনি 'মহিলার' সেবা করিয়াছেন, তাহা ধর্ম্মার্থ সেবাকার্য্যের একটি মহৎ দৃষ্টান্তস্থল। তাঁহার স্বাভাবিক কোমল প্রকৃতি নারীজাতির প্রতি অতি গভীর প্রেম প্রবণ ছিল। বিচিত্রকর্ম্মা বিধাতার বিধানে তাঁহার প্রায় প্রথম বয়সে নারীজাতির সহিত সমস্ত পার্থিব সম্বন্ধ সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়াছিল, কেবল অপার্থিব নিঃস্বার্থ মঙ্গলেচ্ছা চিরদিন তাঁহাকে এ বিষয়ে পরিচালিত করিয়াছে। তিনি নারী-জাতির জ্ঞান বৃদ্ধি কিসে হয় সে বিষয়ে কত চিন্তা করিতেন, কত পাঠ করিতেন, কত পরিশ্রম করিয়া নানা স্থান দর্শন করিতেন, অথচ তাঁহার সেবার জন্য যদি কেহ প্রশংসা করিতেন তাহা হইলে অত্যন্ত লজ্জাবোধ করিতেন, এবং অতি বিনীত হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেন। মহিলায় প্রকাশিত মত ও ভাব লইয়া পাঠক ও পাঠিকাগণের অনেক সময়ে অসন্তোষ উপস্থিত হইত, কেহ কেহ মহিলার লেখা পড়িয়া কৌতুক করিবার সামগ্রীও অনেক পাইতেন। এমনও শুনা গিয়াছে যে মহিলার তীব্র সমালোচনা পাঠ করিয়া কোন কোন পাঠিকা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন, এবং সেই মুহূর্ত্তেই পত্র লিখিয়া মহিলার গ্রাহিকাশ্রেণী হইতে নিজ নাম তুলিয়া লইয়াছেন। ফলে মহিলা পত্রিকার জীবনের ইতিহাস এই যে মহিলার প্রতি কেহ কেহ সময় সময় অসন্তুষ্ট হইয়াছেন, আজ আর সে দিন নাই। আজ সেই শ্রদ্ধেয় সম্পাদক অমরলোকবাসী, আজ আমরা গম্ভীরভাবে ন্যায়বান পরমেশ্বরের সম্মুখে সেই নারী-জাতির চিরহিতৈষী ঈশ্বর প্রেরিত-পুরুষের দেহ-বিমুক্ত আত্মাকে উপস্থিত জানিয়া দেখিতে পাইতেছি যে যাহা অনিত্য তাহা পড়িয়া রহিয়াছে, যাহা চঞ্চল মতের কথা, যাহা মনের সাময়িক উত্তেজনার ভাব, যাহা পৃথিবীর তাহা শেষ হইয়াছে, এখন দিব্যালোকে কেবল দেবভাব প্রকাশ হইতেছে। ভাই গিরিশচন্দ্র যাহা লিখুন, যাহা বলুন, যে মত প্রকাশ করুন, যে ভাব পোষণ করুন, তিনি দেশের,

মণ্ডলীর, বিশেষ নারীজাতির মঙ্গলের জন্য যাহা ভাল বুঝিয়াছেন তাহাই করিয়াছেন বা বলিয়াছেন। তাঁহার বিচারে ভুল ছিল, হয়ত আমাদের বিচারে এখনও ভুল আছে; কিন্তু তাঁহার অন্তরের অন্তরে মঙ্গলময় রাজ্য করিতেছিলেন, তিনি সেই প্রেমময়ের প্রেরণায় নারীজাতির প্রতি বিশুদ্ধ প্রেম পোষণ করিতেন, এবং মহিলাতে যদি কঠোর কথা লিখিয়া থাকেন, যদি এক দেশদর্শী হইয়া লিখিয়া থাকেন, সে সকল সেই শুদ্ধ প্রেমের পার্থিব জঞ্জালের ভিতর দিয়া প্রকাশ হইয়াছে বলিয়া জ্যোতিহীন হইয়াছে। আজ আমরা ব্রহ্মক্রোড়ে সেই ব্রহ্মসন্তানকে দর্শন করি, ঐ যে দেখা যায় আমাদের শ্রদ্ধেয় ভাই আপনার অতি পবিত্র কর্ত্তব্য বলিয়া মহিলাগণের মঙ্গল কামনা ও মঙ্গল সাধন চেষ্টা করিতেছেন।

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের সহিত শ্রদ্ধেয় ভাই গিরিশচন্দ্রের কিরূপ যোগ ছিল তাহা হয়ত অনেকে অবগত নহেন। দশ বৎসর পূর্ব্বে নূতন ব্যবস্থা অনুসারে যখন এই বিদ্যালয় স্থাপিত হয় গিরিশচন্দ্র ইহার জন্য অনেক পরিশ্রম করেন। তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট ও ধর্ম্ম বন্ধুগণের নিকট পত্র লিখিয়া ইহার জন্য অর্থ সাহায্য সংগ্রহ করেন। এক সময়ে ইহার অর্থের অনাটন হওয়াতে ডাকঘর হইতে আপনার টাকা বাহির করিয়া দিয়াছিলেন। দূরদেশে প্রচার করিতে যাইয়া একখানি ময়ূরকণ্ঠী রঙ্গের টেবিল ঢাকিবার কাপড় ইহার জন্য লইয়া আসেন। ব্রহ্মদেশে যাইয়া সে দেশের লোকের বস্ত্র, অলঙ্কার, আচার ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়েও ধর্ম্মযাজক ও ধর্ম্মমন্দির বিষয়ে অনেক সংবাদ সংগ্রহ করিয়া এবং প্রদর্শনের জন্য কতকগুলি সে দেশের ব্যবহারের সামগ্রী আনিয়া বিদ্যালয়ের মহিলাগণকে দেখাইয়াছিলেন। স্কুলের কোনরূপ উন্নতি হইলে অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিতেন এবং কোন কারণে ইহার নিন্দা বা ক্ষতি হইলে মনে অত্যন্ত ক্লেশ পাইতেন। গিরিশচন্দ্রের স্বর্গারোহণে মহিলাবিদ্যালয় যে একটি প্রকৃত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু হারাইয়াছে সেরূপ বন্ধু লাভ করা অতি কঠিন।

বিধাতার বিধানে নববিধান গ্রহণ, সাধন ও প্রচার করিতে যাঁহারা আচার্য্য কেশবচন্দ্রের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, ভাই গিরিশচন্দ্র তাঁহাদিগের মধ্যে একজন। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মবন্ধুগণের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা প্রত্যেকেই স্বাধীন প্রকৃতির লোক, অপর দিকে প্রত্যেকেই বিশ্বাসী শিষ্য প্রকৃতির লোক, প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ গুণ আছে, অথচ এক জনের যে গুণ অন্য কাহারও ভিতরে সে গুণ তেমন উজ্জ্বলভাবে দেখা যায় না। তাঁহারা অন্য বিভাগে অতি সামান্য হইলেও আপনার বিশেষ কার্য্য বিষয়ে অসামান্য। আর একটি বিশেষ কথা এই সকল প্রেরিত প্রচারকগণ যেন সময়ের বিশেষ অভাব পূর্ণ করিবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা গঠিত এক একটি বিশেষ চরিত্র।

নববিধানের আলোকে যখন পরস্পর বিরোধী ধর্ম্ম সকলের মধ্যেও ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ প্রকাশিত হইল, "যখন এক ব্রহ্ম, এক ধর্ম্ম এক মানব পরিবার" এই মহা-সত্য অবতীর্ণ হইল, তখন ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্রে সকল ধর্ম্মার্থিগণের জন্য কি মহামূল্য রত্ন সকল সঞ্চিত রহিয়াছে তাহার অন্বে-ষণ আরম্ভ হইল। এই সময়ে ভাই গিরিশচন্দ্রের প্রতি মুসলমান ধর্ম্মশাস্ত্র সকল পাঠ, আলোচনা ও প্রয়োজনানুসারে অনু-বাদের ভার অর্পিত হইল। এই বিশেষ কর্ত্তব্যপালনে ভাই গিরিশচন্দ্র সমস্ত জীবন ব্রতধারী ছিলেন, একথা সকল ব্রাহ্ম ব্রাহ্মিকা জ্ঞাত আছেন। অপ্রচলিত বিদেশী আরবী ভাষা পরিণত বয়সে অত্যন্ত কষ্ট স্বীকার করিয়া শিক্ষা করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় শাস্ত্র অনুবাদ কার্য্যে ব্যয় করিয়া ভাই গিরিশচন্দ্র বঙ্গসাহিত্যকে অতি মূল্যবান কোরাণের ও হদিসের অনুবাদ দান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা অনুবাদিত ও সঙ্কলিত তাপসমালা ধর্ম্ম সাধকগণের অত্যন্ত আদরের গ্রন্থ হইয়া উঠিয়াছে। মুসলমান সাধুদিগের এই চরিতাবলী সকল ধর্ম্মের সাধকগণকে চিরদিন সাহায্য করিবে, এবং এইরূপে ভাই গিরিশচন্দ্রের আত্মার সহিত সকল সাধক আত্মার পরিচয় ও যোগ হইবে। আমরা আশা করি ভবিষ্যতে যখন তাপস-মালা মুদ্রিত হইবে তখন মুসলমান সাধক-গণের জীবন চরিতের সঙ্গে নববিধানের সাধক ও প্রচারক তাপস গিরিশচন্দ্রের জীবন তাহার সহিত যুক্ত হইয়া গ্রন্থের কলেবর ও উপকারিতা বৃদ্ধি করিবে। তিনি আরও অনেকগুলি পুস্তক অনুবাদ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন, অথচ বলিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার এ দিকে আরও অনেক করিবার ছিল, কিন্তু পৃথিবীতে তাঁহার আর কার্য্য করিতে হইল না, তিনি লোকান্তরে না জানি কোন্ ভাবে কোন্ ক্ষেত্রে ঈশ্বরের মহিমা অনুভব করিয়া তাহা অপর সকল আত্মাকে জানাইয়া শুদ্ধ ও সুখী হইতেছেন। ধার্ম্মিক লোকের স্বভাব চিরদিনই অন্য সকল লোকের স্বভাব হইতে পৃথক্ হয়। আমরা যাঁহার চরিত্র আলোচনা করিতেছি তাঁহার ভিতরে কতকগুলি বিপরীত ভাবের গুণ মিলিত হইয়াছিল। এ জন্য তাঁহাকে ঠিক চিনিতে পারা কঠিন হইত। যে আশ্চর্য্যকর্ম্মা বিশ্বেশ্বর পর্ব্বতের উপরে জলকে স্থাপন করেন, সাগরগর্ভ হইতে অগ্নি প্রকাশিত করেন তাঁহার হস্তের রচিত নববিধানবিশ্বাসী সাধু গিরিশচন্দ্রের জীবন বুঝিতে হইলে প্রথমতঃ তাঁহার স্রষ্টা, পিতা ও প্রভু পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস এবং গিরিশচন্দ্রের জীবনে প্রকা-শিত বিশ্বাস বৈরাগ্য ধর্ম্মনিষ্ঠা, সেবাপরা-য়ণতা, এক দিকে আপনার বিষয়ে অকি-ঞ্চনতা অপর দিকে বিধানের গৌরবে গৌরবান্বিতের ভাব এবং অন্য কয়েকটি দেবগুণ বিশেষরূপে দর্শন করিতে প্রস্তুত হইতে হইবে।

(ক্রমশঃ)

ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়।

মহিলার পাঠিকাগণ অবশ্যই ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের সংবাদ অল্পাধিক রাখিয়া থাকেন। আচার্য্য কেশবচন্দ্র এই বিদ্যালয়ের প্রবর্ত্তক। তিনি বালক ও বালিকাগণকে ঠিক এক প্রকার শিক্ষা দানের পক্ষপাতী ছিলেন না। বর্ত্তমান সময়ে অনেক মহা মহা পণ্ডিত এই মত পোষণ করেন। বিশেষ যৌবনের প্রারম্ভে বালিকাগণ অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হয় ইহা এখন সকল বিজ্ঞ লোকেই স্বীকার করেন এবং আমরা আমাদের অনেক উচ্চশিক্ষিতা কন্যার শারীরিক অতিহীন অবস্থা দর্শন করিয়া এ সত্য জানিতে পারিতেছি যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সকলের জন্য প্রস্তুত হইতে অল্প বয়স্কা নারীগণের শরীর ও মনের উপর যে অতিরিক্ত চাপ পড়ে তাহাতে অতি বিষময় ফল প্রসব করে, অর্থাৎ কখনও অকালমৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, অথবা অনেক সময়ে কোন গুরুতর পীড়া উপস্থিত হইয়া জীবনকে ভারবহ করিয়া তুলে। আমরা জানি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার একটা সাধারণ আকর্ষণে ও পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে উচ্চ বেতনে চাকরী পাইবার আশায় অনেক বালিকা এবং তাহাদিগের পিতামাতাও সকল ব্যয়ভার বহন করিয়া ও সকল বিপদের আশঙ্কা জানিয়াও বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্যই বালিকাগণকে শিক্ষাদান করেন। আমাদের মত সামান্য লোকের কথায় সাধারণের এ মোহ দূর হইবে না। কন্যাকে তাহার ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট কার্য্যের জন্য সুশিক্ষা না দিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপযুক্ত করিয়া লওয়া অতি ঘৃণিত কার্য্য এ জ্ঞানও সহজে অনেকের মনে প্রবেশ করিবে না। আমরা বিলক্ষণ জানি যে আমাদের অনেক ধর্ম্মবন্ধু ও সমভাবাপন্ন ব্যক্তিও আমাদিগের সহিত এ বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্নমত। আমরা তাঁহাদিগের সহিত এ বিষয়ে অধিক তর্ক করিতে ইচ্ছা করি না, বরং অন্য সকল বিষয়ে যেমন প্রত্যেকে স্বাধীন ভাবে আপন আপন মঙ্গলের অন্বেষণ করিতেছেন, এ বিষয়েও সেইরূপ হওয়াই প্রার্থনীয় মনে করি। অপর যে সকল কুমারী বিশ্বাস করেন যে জ্ঞানালোচনা করা, বিদ্যা লাভ করা ও বিদ্যা দান করা তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্য আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাঁহাদিগকে বলি যতদূর ইচ্ছা কলেজে বিশ্ববিদালয়ের উচ্চ পরীক্ষা সকলে উত্তীর্ণ হউন, তাহার পর আরও জ্ঞানালোচনার পথে অগ্রসর হউন ও দেশের নরনারীকে বিদ্যা দান করিয়া আপনাদিগের জীবনকে সার্থক করুন। কিন্তু এই শ্রেণীর নারী অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। হয়ত সহস্রে এক জন মাত্র পাওয়া যায়। অপর সকল বালিকা কেবল সাধারণ ভাবে জ্ঞানশিক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হন এবং যদি স্বাভাবিক শক্তি ও অবস্থা শিক্ষার অনুকূল হয় তাহা হইলেই ক্রমে ক্রমে উচ্চ শিক্ষার আকর্ষণে পড়িয়া স্বাস্থ্য ও জীবনের স্বাভাবিক আদর্শ হারাইয়া এক প্রকার বিকৃত অবস্থায় পতিত হন। আমরা অত্যন্ত দুঃখের

সহিত স্বীকার করি যে, আচার্য্য কেশবচন্দ্র যে আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান সময়ের অনেক পণ্ডিত যেরূপ ভাবে নারীশিক্ষার বিষয় উপদেশ দিতেছেন এবং আমরাও নারীশিক্ষা বিষয়ে যেরূপ আদর্শ লাভ করিয়াছি, ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ে আমরা কার্য্যে তাহা উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিতে পারিতেছি না। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া ভিন্নও যে উচ্চ শিক্ষা হইতে পারে, এ বিষয় কার্য্যত প্রমাণ করিতে আমরা সক্ষম হই নাই; তাহার প্রধান কারণ এই যে, আমরা এত দিন অধিক অর্থব্যয় করিয়া উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীগণকে নিযুক্ত করিতে পারি নাই এবং অপর দিকে আমরা যাঁহাদিগের গৃহের বালিকাগণকে আমাদিগের আদর্শানুসারে শিক্ষা দিতে ইচ্ছা করি, হয়ত তাঁহারা অনেক সময় আমাদিগের সহিত একমত হয়েন নাই। ফলে শিক্ষাবিষয়ে যদি একটা সত্য আদর্শ আমাদিগের অন্তরে না থাকিত, অর্থাৎ নারীশিক্ষা বিষয়ে মঙ্গলময় ঈশ্বরের বিশেষ বিধি আছে তাহাতে যদি বিশ্বাস না থাকিত তাহা হইলে আমরা সময়ের সাধারণ স্রোতে ভাসিয়া যাইতাম ও দশ জনে যে পথে চলিতেছেন আমরাও সেই পথে চলিতাম! কিন্তু আমরা যত দেখিতেছি ও শুনিতেছি, যত এ বিষয় চিন্তা করিতেছি ও সত্য লাভ করিতেছি ততই আমরা বিশ্বাসে দৃঢ় হইতেছি যে পুরুষ ও নারীর শিক্ষা ঠিক একরূপ হওয়া উচিত নহে। এই জন্য ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়কে সাধারণের প্রিয় করিতে না পারিলেও আমরা নিরাশ হই নাই। যাঁহারা আমাদিগের সহিত নারীশিক্ষাবিষয়ে একভাবাপন্ন তাঁহাদিগের অবগতির জন্য এবং সকল পাঠিকাগণের এ বিষয়ে চিত্ত আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে আমরা প্রকাশ করিতেছি যে, এবার ভিক্টোরিয়া মহিলাবিদ্যালয়ের উন্নতি কল্পে অনেক চেষ্টা হইতেছে এবং কোন কোন বিষয়ে চেষ্টা সফলও হইয়াছে। গত গ্রীষ্মাবকাশের পর হইতে একটি উচ্চ শিক্ষিতা মহিলা ইহার প্রধান শিক্ষয়িত্রীর পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইনি শিক্ষাবিভাগে কার্য্য করিয়া যথেষ্ট বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন এবং এই অল্পকাল মধ্যে সকল শিক্ষয়িত্রী ও ছাত্রীগণের বিশেষ শ্রদ্ধা ও মান্যের পাত্রী হইয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে কিণ্ডার গার্টেণ নামক শিশুশিক্ষাপ্রণালী অত্যন্ত আদৃত, কিন্তু উপযুক্ত শিক্ষয়িত্রীর অভাবে এত দিন কিণ্ডারগার্টেণ প্রণালী অনুসারে শিক্ষা দান করা হইতে পারে নাই। মাসাধিককাল হইল এই বিষয়ে বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত একটি মহিলা এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন এবং এখন শিশুশিক্ষা কার্য্য অতি উত্তম রূপে সম্পন্ন হইতেছে।

বহু বৎসর হইতে শ্রীশ্রীমতী কুচবিহারের মহারাণী মহাশয়া এই বিদ্যালয়ের সাহায্যের জন্য মাসিক একশত টাকা দিতেছেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীশ্রীমতী ময়ুরভঞ্জের মহারাণীও মাসিক সাহায্য দান করিতেছেন এবং কাসিমবাজারের শ্রীশ্রী মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দী বাহাদুর বার্ষিক

দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। অপর কয়েকটী নারীশিক্ষার বন্ধু ব্যক্তি মাসিক পাঁচ টাকা করিয়া দান করিতেছেন। ছাত্রীদিগের বেতনেও মাসে ১২৫৲ টাকার কিছু অধিক আয় হইতেছে। এই বিদ্যালয়ের তিন বিভাগে এখন সরকারী সাহায্য মাসিক ১৬৭৲ টাকা। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষসভা সরকারী সাহায্য ৪২৫৲ টাকা প্রার্থনা করিয়া আবেদন করিয়াছিলেন, এ বৎসরে এই সাহায্য বৃদ্ধি হইবে না—আশা করা যায় যে আগামী বৎসর প্রার্থিত সরকারী সাহায্য মঞ্জুর হইবে। বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় বেঞ্চ, ডেস্ক, ম্যাপ, বোর্ড প্রভৃতি সরঞ্জামের জন্য এবৎসরে পাঁচশত টাকা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হইবার আশা আছে। তাহা হইলে সাত শত টাকার সরঞ্জাম শীঘ্রই ক্রয় করা হইবে। বর্ত্তমানে ছাত্রীসংখ্যা ৭৫ জনের অধিক নয় কিন্তু ইহা দিন দিন বাড়িতেছে। স্কুলের দুখানি অম্নিবাস গাড়ী আছে, তাহা দ্বারা ৮০। ৮৫ জন অপেক্ষা অধিক বালিকার আসা যাওয়া সম্ভব নয়। এজন্য মনে হয় পূজার অবকাশের পর বালিকার সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সঙ্গে সঙ্গে আর একখানি অম্নিবাসও প্রয়োজন হইবে। এই বিদ্যালয়ের অপর প্রধান উদ্দেশ্য এই যে, গৃহিণীগণ অবসর সময়ে গার্হস্থ্য-জীবনের প্রয়োজনীয়, শিক্ষাপ্রদ ও জ্ঞানানন্দদায়ক বিষয় সকলের বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া উপকার প্রাপ্ত হয়েন। আমাদিগের কৃতবিদ্য প্রসিদ্ধ বক্তাগণ বহু বৎসর হইতে নারীজাতির হিতকল্পে আপনাদিগের মূল্যবান্ সময় এই কার্য্যে ব্যয় করিয়া আসিতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে ডাঃ পরেশরঞ্জন রায় পি, এইচ, ডি, মিউনিসিপালিটির স্বাস্থ্যবিভাগের কর্ম্মচারী, "মানবদেহের ইতিহাস" নামক বক্তৃতাবলী প্রদান করিতেছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র মহালানবীস "অদৃশ্য-জীবজগতের" বিষয় বলিতেছেন। অধ্যাপক দেবেন্দ্রনাথ মল্লিক "পদার্থবিজ্ঞান" বিষয়ে বলিতেছেন। ডাঃ শ্রীযুক্ত বিমলচন্দ্র ঘোষ এম্, এ, এম্ বি, এবং অন্যান্য কয়েকটী বিদ্যালয়ের হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু বক্তৃতা দান করিতেছেন।

এই বিদ্যালয়ে যে আদর্শে শিক্ষা দান করা হয় তাহা যাঁহারা স্বাভাবিক ও উপযোগী মনে করেন, তাঁহাদিগের নিকট বিশেষ নিবেদন এই যে, নারীশিক্ষা কার্য্যে তাঁহারা আমাদিগকে পরামর্শ ও সাহায্য দান করুন। যাঁহারা অপেক্ষাকৃত উচ্চ শ্রেণীর বালিকাগণকে এই বিদ্যালয়ের আদর্শানুসারে শিক্ষার জন্য পাঠাইবেন তাঁহারা ইহার বিশেষ সাহায্য করিবেন।

সংবাদ।

আজকাল পান খাওয়া লইয়া এক হুলস্থুল ব্যাপার আরম্ভ হইয়াছে। প্রথম শুনা গেল ঢাকা জেলাতে পান খাইয়া মানুষ মরিয়াছে। পরে কলিকাতাতে শুনা গেল পান খাইয়া অজ্ঞান হইয়াছে বা মারা গিয়াছে। পরে সংবাদপত্রে পান খাইয়া বিষ খাওয়ার মত অবস্থা ঘটিবার

কথা অনেক পড়া গেল। সম্প্রতি মিউনিসিপাল কমিশনারগণের সভাতে কলিকাতা স্বাস্থ্য বিভাগের ডাক্তার কেমিকাল একজামিনার রায় বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয়ের মত প্রকাশ হওয়াতে জানা যাইতেছে যে পানে কোন বিষ নাই। পানের সঙ্গে যে সুপারী ব্যবহার করা হয়, তাহা কাঁচা থাকিলে একটু বিষের মত কার্য্য করে মাত্র। গত ২।৩ সপ্তাহ পানের বিষের কথা লইয়া চারিদিকে ভয় উপস্থিত হইয়াছিল, আশা হয় তাহা শীঘ্র চলিয়া যাইবে। বঙ্গমহিলার অতি প্রিয় পান হইতে তাঁহাদিগকে বঞ্চিত হইতে হইবে না ইহা সুখের সংবাদ সন্দেহ নাই।

আমাদের চিকিৎসকগণ বিলাতী ব্যবস্থা অনুসারে চিকিৎসা করেন, রোগীগণকে বিলাতী কেমিক্যাল পথ্য দিয়া অনেক সময়ে সুফল প্রাপ্ত হন না। এই অবস্থায় পড়িয়া তাঁহারা ঘোল খাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে এক নূতন আলোক আসিল, রোগীকে ঘোল পথ্য দিলে অনেক রোগীর মহা উপকার হয়। তাই এখন ঘোলই পথ্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান লাভ করিয়াছে। ৯ই ভাদ্র তারিখের সঞ্জীবনীতে দই ও ঘোলের উপকারিতা বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদের কতকগুলি কথা তুলিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা ২।৪টি কথা এখানে উদ্ধৃত করিব।

দধির গুণ।

জ্বরে দধির ব্যবস্থা।

দধি উষ্ণ, দীপন (উত্তেজক), স্নিগ্ধ, ঈষৎ কষায় রস, গুরু, পাকে অম্ল, গ্রাহী, বলকারক, ও বৃষ্য। অধিক দধি ভোজন করিলে, রক্তপিত্ত, মেদরোগ ও কফ প্রভৃতি ব্যাধির উৎপত্তি হয় বটে, কিন্তু যথানিয়মে সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র, প্রতিশ্যায়, শীতগ বিষমজ্বর, অতিসার, অরুচি ও কৃশতার বিশেষ উপকার হয়।

দধির ভেদ।

নাম এবং লক্ষণ।

দধি পাঁচ প্রকার. যথা—মন্দ, স্বাদু স্বাদ্বম্ল, অম্ল এবং অত্যম্ল অম্ল।

১। যে দধি দুগ্ধের ন্যায় অব্যক্ত রস ও ঈষৎ ঘন, তাহাকে মন্দ দধি বলা যায়। মন্দ দধি ত্রিদোষনাশক, বিদাহী এবং মলমূত্রের বিরেচক।

২। যে দধি ঘন ও যাহাতে মধুর রস ব্যক্ত এবং অম্লরস অব্যক্ত, তাহার নাম স্বাদু দধি। স্বাদু দধি অতিশয় অভিষ্যন্দী, বৃষ্য, মেদজনক, কফবর্দ্ধক, বাতঘ্ন, মধুরপাক এবং রক্তপিত্তের শান্তিকারক।

৩। ঘন মধুর ও ঈষৎ কষায় রস দধিকে স্বাদ্বম্ল বা অম্ল মধুর দধি বলে এই দধি সামান্য দধির ন্যায় জ্ঞান করিবে।

৪। যে দধির কিছুমাত্র মধুরতা নাই ও অম্লরসবিশিষ্ট, তাহাকে অম্ল দধি বলে। অম্লদধি দীপন এবং শ্লেষ্মা ও রক্তপিত্তের বর্দ্ধনকর।

৫। এই দধি অতিশয় অম্ল হইলে, দীপন (উত্তেজক) হয়, দন্ত ও রোমের

চর্ম, কণ্ঠাদির দাহ জন্মায় এবং রক্তও দূষিত করে।

শর্করা মিশ্রিত দধিই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কারণ ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ ও বাতপিত্তের শান্তি হয়। গুড়মিশ্রিত দধি—বাতহারী, বৃষ্য, বৃংহণ, তৃপ্তিজনক ও গুরু।

রাত্রিতে দধি ভোজন।

রাত্রিতে দধি ভোজন করিবে না, যদি করিতে হয়, তাহা হইলে ঘৃত শর্করা মধু ও আমলকীর সহিত অথবা উষ্ণ করিয়া ভোজন করিবে। ঘৃত, শর্করাদি-যুক্ত দধি রাত্রিতেও ভোজন করিতে পারা যায়।

ঋতুভেদে বিধি ও নিষেধ।

হেমন্ত, শীত এবং বর্ষাকালে দধি ভোজন প্রশস্ত, কিন্তু শরৎ, গ্রীষ্ম ও বসন্তকালে দধি প্রশস্ত নহে।

তক্র।

ভিন্ন ভিন্ন নাম, লক্ষণ ও গুণ।

ঘোল পাঁচ প্রকার যথা—ঘোল, মথিত, তক্র, উদশ্বিৎ ও ছচ্ছিকা।

(ক) সরবিশিষ্ট ও নির্জ্জল হইলে, তাহাকে ঘোল বলে। ঘোল বাত ও পিত্তের শান্তিকারক।

(খ) সরাবহীন ও নির্জ্জল হইলে, তাহাকে মথিত কহে। হিন্দিতে ইহার নাম মহুয়া। মথিত কফঘ্ন ও পিত্ত নাশক।

(গ) চতুর্থাংশ জল মিশ্রিত ঘোলের নাম তক্র। তক্র গ্রাহী, কষায়, অম্ল, পাকে স্বাদুরস, লঘু, উষ্ণবীর্য্য, দীপন, বৃষ্য, তৃপ্তিজনক, বাতঘ্ন এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকারী। ইহা লঘু বলিয়া সংগ্রাহী, স্বাদুপাক বলিয়া, পিত্তের প্রকোপজনক নহে এবং কষায়, উষ্ণ ও রুক্ষ বলিয়া কফঘ্ন। যে ব্যক্তি নিয়মমত তক্র সেবন করে, সে কখন রোগে ক্লেশ পায় না। তক্রের প্রভাবে রোগের বীজাণু সকল দগ্ধ হওয়ায়, রোগ প্রবল হইতে পারে না। গুণজ্ঞ পণ্ডিতেরা বলেন, অমৃত, যেমন দেবগণের সুখজনক, এই পৃথিবীতে মনুষ্যের পক্ষে তক্রও তেমনই সুখপ্রদ।

নতক্রসেবী ব্যথতে কদাচিৎ
নতক্রদগ্ধাঃ প্রভবন্তি রোগাঃ।
যথা সুরাণামমৃতং সুখায়
তথানরাণাং ভুবিতক্রমাহুঃ।

(ঘ) অর্দ্ধেক জল মিশ্রিত ঘোলকে উদশ্বিৎ বলে। উদশ্বিৎ কফকারী, বল-কারক ও শ্রমের বিশেষ শান্তিজনক।

(ঙ) সরহীন, নির্ম্মল ও প্রচুর পরিমাণে জল মিশ্রিত হইলে, ঘোলকে ছচ্ছিকা বলে। ছচ্ছিকা শীতল, লঘু, বাতঘ্ন, কফজনক এবং শ্রম ও তৃষ্ণার শান্তিকারক, কিন্তু লবণ মিশ্রিত হইলে দীপন হয়।

অবস্থাভেদে তক্রের গুণ।

যে তক্রের ঘৃত তুলিয়া লওয়া হই-য়াছে, তাহা অতিশয় হিতকারী ও লঘু। যাহা হইতে অল্প পরিমাণে ঘৃত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা গুরু, বৃষ্য কফনাশক এবং যাহার ঘৃত তুলিয়া লওয়া হয় নাই, তাহা ঘন, গুরু, বল ও পুষ্টিকারক।

মহিলার পঞ্চদশ বর্ষের নির্ঘণ্ট।